সিগমা ফোর্স

দ্য ডেভিল কলোনী

জেমস রলিন্স

রূপান্তরঃ আদনান আহমেদ রিজন

রকি পর্বতের গভীরে এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার- শ'খানেক মমি হয়ে যাওয়া আদিবাসীদের মৃতদেহ, সেই সাথে প্রাচীন লিপি সম্বলিত বিপুল পরিমাণ সোনার প্লেট, কাঁপিয়ে দিল গোটা বিশ্বকে। মৃতদেহগুলোর ইতিহাস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও, সবকিছুর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ঘোষণা করল স্থানীয় আমেরিকান সংস্কৃতিমূলক সংস্থা।

খননকাজ চলাকালে টিভি ক্যামেরার সামনেই গুহাসম্মুখে ঘটে গেল এক বিস্ফোরণ, সংশ্লিষ্ট গবেষকের মৃত্যুর পাশাপাশি ধ্বংস হয়ে গেল গুহায় পাওয়া অমূল্য আর্টিফ্যাক্টগুলো। সবকিছুর জন্য দায়ী করা হলো নেটিভ আমেরিকান একটা সংগঠনকে। আরও বিষদভাবে বলতে গেলে, বিস্ফোরণের সময় সেখানে উপস্থিত থাকা এক টিনএজার মেয়েকে। রকি পর্বতের গভীরে এক মারাত্মক চেইন বিক্রিয়ার সূচনা করল সেই আজব বিস্ফোরণ, হুমকির মুখে গোটা পশ্চিম আমেরিকা।

পলায়নরত মেয়েটা সাহায্যের জন্য আবেদন জানাল তার চাচা- সিগমা ফোর্স ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো'র কাছে। ভাতিজিকে বাঁচানো আর সেই সাথে সত্য উন্মোচনের জন্য মাঠে নামলেন পেইন্টার ক্রো, ছুটতে লাগলেন একের পর এক ছেঁড়া সুতোর পেছনে।

অন্যদিকে আবারও ফিরে এসেছে কুখ্যাত সাবেক গিল্ড এজেন্ট শেইচান। কমান্ডার গ্রে পিয়ার্সকে সাথে নিয়ে গিল্ড-এর হর্তাকর্তাদের পর্দা ফাঁসের জন্য কাজ শুরু করেছে সে।

আমেরিকার পাহাড়ি উপত্যকা থেকে এন্টার্কটিকার শীতল দ্বীপ, ফোর্ট নক্সের ভল্ট থেকে অ্যারিজোনার উসর মরুভূমি পর্যন্ত ছড়িয়ে যাওয়া সেই রহস্যের শিকড় লুকিয়ে আছে হাজার বছর আগে হারিয়ে যাওয়া এক জনগোষ্ঠীর ভেতর, যার নাম- দ্য ডেভিল কলোনী।

ভয়াবহ গোপনীয়তা, ইতিহাসের মারপ্যাঁচ, দমবন্ধ করা অ্যাকশন...সবকিছুকে এক সুতোয় গাঁথা জেমস রলিন্স ছাড়া কারও পক্ষেই সম্ভব না।

- লী চাইল্ড

একের পর এক লেখনীতে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন জেমস রলিন্স।

- পাবলিশার্স উইকলি

ইতিহাস, বিজ্ঞান আর অ্যাডভেঞ্চারের কী দারুণ মেলবন্ধন! রলিন্সের সেরা বইগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।

- লন্ডন টাইমস

ISBN 978 984 92438 7 8

9 789849 243878

দ্য ডেভিল কলোনী

জেমস রলিন্স

রূপান্তরঃ আদনান আহমেদ রিজন

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার ., ২য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন : 01626282827
প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন
অলংকরন : মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ৪৪০ টাকা

The Davil Colony By James Rollins
Published by Adee Prokashon
Islami Tower , Dhaka-1100
Printed by : Jonopriyo Printers
Price : 440 Tk. U.S. :08 $ only
ISBN : 978 984 92438 6 1

ভূমিকা

প্রকাশ হলো আমার দ্বিতীয় অনুবাদগ্রন্থ। পরম করুণাময়ের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

ধন্যবাদের প্রথম দাবীদার- যার হাত ধরে আমার লেখালেখির জগতে প্রবেশ, সেই সুলেখক-অনুবাদক ফুয়াদ আল ফিদাহ ভাই। কিন্তু ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে ছোট করতে চাই না।

এরপর আসে সাজিদ ভাই-এর নাম। আমার উপর আস্থা বজায় রাখার জন্য প্রকাশক থেকে লেখক-অনুবাদক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সদালাপী এই মানুষটার কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদের দাবীদার আমাদের নক্সা সার্কেল। রাফসান ভাই, রাফি ভাই, মারুফ, শুভঙ্করদা, বিশাল এবং সিয়াম। এবারের বইমেলায় সবারই বই বের হতে চলেছে। ধন্যবাদ এবং শুভকামনা।

আমার প্রথম বই প্রকাশিত হওয়ার পর আব্বা-আম্মাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। তাদের পাশাপাশি আমার কাজিন এবং ভার্সিটির সহপাঠীরাও পরবর্তী কাজের ব্যাপারে প্রতিনিয়ত উৎসাহ-উদ্দীপনা জুগিয়ে গিয়েছে। ধন্যবাদ সবাইকে।

বিশেষ ধন্যবাদ পাবে সানজিদা আফরিন। কারণটা না হয় আমাদের ভেতরই থাক।

এছাড়াও ধন্যবাদ ফেসবুকের সকল বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের। সবার উৎসাহই আমাকে প্রতিনিয়ত বলিয়ান করেছে।

জেমস রলিন্সের লেখনী কিংবা সিগমা ফোর্স সিরিজ নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। ইতিহাসের সাথে বিজ্ঞানের মেলবন্ধনকে ছাপার অক্ষরে তার চেয়ে ভালো কেউ ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। সিরিজের অন্যতম জনপ্রিয় বই 'দ্য ডেভিল কলোনী'।

কাহিনির ঘটনাপ্রবাহ পাঠকদের কল্পনায় ধারণ করার সুবিধার্থে, জেমস রলিন্স তার প্রতি বইয়ের ভেতরেই কিছু ছবি যুক্ত করেন। আমি এই বইয়ের শেষাংশে আলাদাভাবে আরও কিছু স্থাপনা এবং জিনিসের ছবি যোগ করেছি। আশা করি ব্যাপারটা সবার ভালো লাগবে।

ইতিহাস এবং বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিষয়গুলো যথাসম্ভব সাবলীল রাখতে চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হতে পেরেছি, সেই বিচার পাঠকদের হাতে। আপনাদের দোয়া এবং শুভকামনাই আমার পাথেয়।
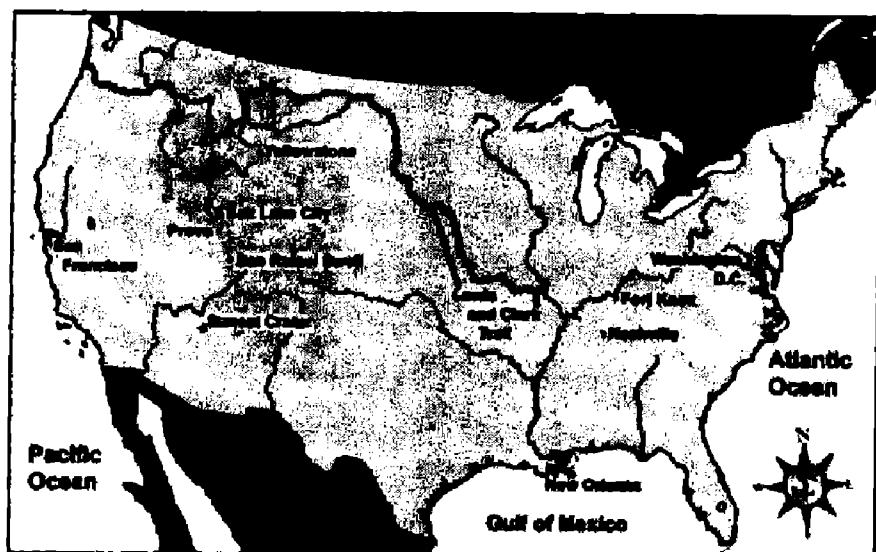
অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

আদনান আহমেদ রিজন
ঢাকা, ২০১৭

ম্যাপ

"রাজনীতি আমার পেশা, বিজ্ঞান আমার নেশা।"

-থমাস জেফারসন। (১৯৭১ সালে হ্যারি ইনেসকে লেখা এক চিঠিতে)

ইতিহাসের পাতা থেকেঃ

আমেরিকার প্রতিটি স্কুলপড়ুয়া বাচ্চাও স্বাধীন, সার্বভৌম আমেরিকার অন্যতম স্থপতি থমাস জেফারসনের নাম জানে। বন, পাহাড় আর মরুভূমিতে গোত্রবদ্ধ হয়ে বাস করা আদিবাসী আমেরিকানদের আজ পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পেছনে তার অবদান অনস্বীকার্য। রাশি রাশি বই লেখা হয়েছে এই মহান ব্যক্তিত্বকে নিয়ে। কিন্তু আজও স্বাধীন আমেরিকার অন্য সব প্রথপ্রদর্শকের তুলনায় গাঢ় রহস্যে আচ্ছন্ন তিনি।

আঠারোশো এক সালে আমেরিকান ফিলোসফিক্যাল সোসাইটি থেকে জেফারসনকে বিশেষ কোডে লেখা একটা চিঠি পাঠানো হয়। সম্প্রতি দু'হাজার সাত সালে, সেই চিঠির কোড ভাঙ্গা সম্ভব হয়েছে। আমেরিকান ফিলোসফিক্যাল সোসাইটি- একটা প্রখ্যাত গোত্রগত সংস্থা, যাদের আগ্রহ ছিলো শুধুমাত্র দুটো ব্যাপারে। এক- গোপন আর দুর্বোধ্য সব কোড ভাঙ্গা, আর পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে থাকা স্থানীয় আদিবাসী গোত্রগুলোর ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো।

নেটিভ আমেরিকান ইতিহাস আর সংস্কৃতির প্রতি ব্যাপক আগ্রহ ছিল থমাস জেফারসনের। মন্টিসেলোতে, তার বাড়ির ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়, প্রচুর পরিমাণে নেটিভ আমেরিকানদের নিদর্শন ঠাঁই পেয়েছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আশ্চর্যজনকভাবে বেশ কিছু নিদর্শন গায়েব হয়ে যায়, তদন্ত করেও সেগুলোর আর কোনও হদীস বের করা সম্ভব হয়নি। স্বনামধন্য অভিযাত্রী লুইস এবং ক্লার্ক তাদের বিখ্যাত 'পশ্চিম আমেরিকায় অভিযানে' এসব নিদর্শন সংগ্রহ করে তাকে পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু একটা বিষয় অনেকের কাছেই গোপন ছিল, আঠারোশো তিন সালে লুইস এবং ক্লার্কের উক্ত অভিযানের আসল কারণ উল্লেখ করে কংগ্রেসে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন জেফারসন।

এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় লুকিয়ে আছে সেই রহস্য। প্রাচীন আমেরিকার সেই রহস্য, যার ব্যাপারে শুধুমাত্র গুটিকয়েক লোকই জানতেন। তবে হ্যাঁ, গোটা ব্যাপারটার সাথে ফ্রি-ম্যাসন, নাইট টেম্পলার বা ক্র্যাকপট থিওরির কোনও মিল খুঁজতে গেলে ভুল করবেন। আরেকটা কথা না বললেই নয়, আমেরিকার রাজধানীর ক্যাপিটাল হলে ঝোলানো জন টার্নবুল-এর আঁকা বিখ্যাত ছবি, স্বাধীনতার ঘোষণা-তে সেই রহস্যের একটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। থমাস জেফারসনের দিকনির্দশনেই

আঁকা হয়েছিল ছবিটা। স্বাধীনতার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা প্রত্যেক প্রখ্যাত লোককে স্থান দেয়া হয়েছে সেই ছবিতে। কিন্তু তাদের সাথে আরও পাঁচজন অতিরিক্ত লোক ছিলেন, যাদের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার বা ছবিতে স্থান পাওয়ার কথা না। তাহলে কেন স্বাধীনতার দিকনির্দেশকদের সাথে এক ফ্রেমে আবদ্ধ করা হলো তাদের? কী তাদের পরিচয়?

জানতে হলে, পড়তে থাকুন।

বৈজ্ঞানিক নথি থেকে

বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির এই নতুন যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে ন্যানোটেকনোলজি। চোখে দেখা যায় না, এমন ক্ষুদ্র আকৃতি সম্বলিত কোনও বস্তুর ক্ষমতা যে কতখানি হতে পারে, তা আমাদের ধারণার সীমারও বাইরে। ন্যানোটেক অর্গানাইজেশনের বিজ্ঞানীরা এমন ক্ষুদ্র আকারের টেস্টটিউব বানাতে সক্ষম হয়েছেন যে, এক মিটার জায়গায় তিনশো বিলিয়ন টেস্টটিউব দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে।

এই ক্ষেত্রে সফলতার মাত্রা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। জরিপে দেখা গেছে, এই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সত্তর বিলিয়ন ন্যানোটেক পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রি হয়েছে। এমন কোনও জিনিস নেই, যাতে ন্যানোটেকনোলজির ছোঁয়া লাগেনি। টুথপেস্ট, সানস্ক্রিন, কেক আইসিং, দাঁতে পরার রিং, মোজা, প্রসাধনী, ওষুধপত্র, সব জায়গাতেই ন্যানোপার্টিকেলের জয়জয়কার।

কিন্তু বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞানের প্রতিটা বিষয়েরই ভালো দিকের পাশাপাশি খারাপ দিকও থাকে, এরও আছে। এসব ন্যানোপার্টিকেলের কারণে প্রানিদেহে সাময়িক বা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। ইউসিএলএ-এর বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, বাচ্চাদের সানস্ক্রিন লোশনসহ বেশ কিছু নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যে থাকা ন্যানো-টাইটেনিয়াম অক্সাইড, দেহকোষের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে। ফুসফুস আর মস্তিষ্কের ক্ষতি স্থায়ী করতে পারে কার্বন ন্যানোটিউব। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ব্যাপারটাই দেখুন, খাবারদাবারসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র জীবাণুমুক্ত রাখতে এটা দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়। দেখতে একেবারে নিরীহ, কিন্তু আণবিক পর্যায়ে বিভাজিত করলেই বিস্ফোরকে পরিণত হয় জিনিসটা।

অর্থাৎ, আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে জিনিসপত্রে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহারে আরও সতর্কতা অবলম্বন জরুরী। কিন্তু, আধুনিক এই প্রযুক্তির একটা গোপন দিক রয়েছে। এখনকার যুগে বহুল ব্যবহৃত হলেও গোটা ব্যাপারটার আবিষ্কার আসলে এই বিংশ শতাব্দীরও শত-সহস্র বছর আগে।

কোত্থেকে এর শুরু? এই আশ্চর্যজনক আবিষ্কার কার? কোথায় লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানের অবাক এই বিস্ময়-ন্যানোটেকনোলজির শিকড়?

জানতে হলে, পড়তে থাকুন।

১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দ, শরৎকাল
কেনটাকি অঙ্গরাজ্য

কালো মাটি ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে বিশালাকায় মাথার খুলিটা।

কালের আঁচড়ে হলুদ হয়ে এসেছে এককালের পুরু সাদা হাড়।

এতক্ষণ ধরে খোঁড়া গর্তের অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন মানুষ, সারা গায়ে মাটি লেগে আছে তাদের। একজন হলো বিলি প্রেসটনের বাবা, আরেকজন চাচা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে আঙুলের নখ কামড়াচ্ছে বিলি। বারো বছর বয়সের একটা বাচ্চার পক্ষে ব্যাপারটা বিস্ময়করই বলা যায়। এবারই প্রথম বাবা-চাচাদের সাথে অভিযানে এসেছে সে। অনেক বলে-কয়ে তাদের রাজি করাতে হয়েছে, নয়তো প্রতিবারই মা আর ছোটবোন নেল এর সাথে ফিলাডেলফিয়ায় রেখে আসা হয় তাকে।

বিস্ময়কর আবিষ্কারটার সামনে দাঁড়িয়ে খুব গর্ব হচ্ছে ছেলেটার।

তবে গর্বের সাথে ভয়ের একটা সূক্ষ্ম ছাপও ফুটে আছে চেহারায়। হয়তো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে বলে, কিংবা সারা সপ্তাহ জুড়ে মাটি খুঁড়ে বের করা অজস্র হাড়গোড় দেখে।

মাটি আর পাথর খুঁড়তে থাকা কালো চামড়ার শ্রমিকরা এখন কাজ বন্ধ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের চারপাশে। সাথে অপেক্ষাকৃত ভালো বেশভূষায় সজ্জিত কয়েকজন ছাত্রও আছে। আর আছেন কালো জ্যাকেট আর ওয়েস্টকোট পরা সেই বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী ভদ্রলোক- আরচার্ড ফোরটেস্কু, তিনিই কেনটাকি অঞ্চলে এই অভিযানের নেতা।

তার সম্বন্ধে ছড়িয়ে পড়া গুজবের কিছু কিছু বিলির কানেও এসেছে। সেই কারণেই লোকটার দিকে তাকাতে কেমন ভয় ভয় লাগে তার। মৃত ব্যক্তিদের নিয়ে গবেষণা করেন বিজ্ঞানী ভদ্রলোক। লাশগুলো কেটে কেটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। দৃশ্যটা ভাবতেই শিউরে উঠল বিলি।

তবে এখন তাদের সবাইকে সাহায্য করার জন্যই এখানে এসেছেন তিনি। আমেরিকান সোসাইটি নামে পরিচিত নতুন একটা বৈজ্ঞানিক সংস্থায় যোগদানের জন্য তাকে নির্বাচিত করেছেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন স্বয়ং। অতীতের কাজের জন্য ফ্রাঙ্কলিন তার উপর খুবই সন্তুষ্ট, তবে কোন কাজের জন্য, এ ব্যাপারে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায়নি। সেই সাথে, ভার্জিনিয়ার নতুন গভর্নরের সাথেও খুব ভালো সম্পর্ক আছে ফোরটেস্কুর। সেই গভর্নরের আদেশেই এই অদ্ভুত সাইটে এসেছে এসেছে তারা।

গত কয়েক সপ্তাহ যাবত আশেপাশের গাছের পাতাগুলোকে তামাটে থেকে গাঢ় লালচে বর্ণ ধারণ করতে দেখছে বিলি। সকালের শীত আরও জেঁকে বসছে কয়েকদিন ধরে। রাতের প্রবল বাতাসে ক্রমাগত ঝড়ে পড়ছে গাছের মরা পাতাগুলো। প্রতিদিন সকালে বিলিকেই ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে হয় এসব। মনে হয় যেন, পাতা দিয়ে সূর্যের আলো থেকে সবকিছুকে ঢেকে রাখতে চাচ্ছে প্রকৃতি।

এমনকি এখনও, ঝাড়ু হাতে নিয়েই বাবার দিকে তাকিয়ে আছে বিলি। গায়ে মাটি লেগে আছে তার, শার্টের হাতা কনুই পর্যন্ত গুটানো। সদ্যপ্রাপ্ত মূল্যবান নিদর্শনটা থেকে ময়লার শেষবিন্দু পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন তিনি।

"সাবধানে..." সবাইকে সতর্ক করলেন ফোরটেস্কু। একহাতে ধরে রাখা লাঠিতে ভর দিয়ে সামনে আরেকটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন তিনি। উদ্দেশ্য- আরও ভালোভাবে সবকিছুর উপর নজর রাখা।

লোকটার এমন মাতব্বরি দেখে রাগ হলো বিলির। ভার্জিনিয়া থেকে শুরু করে কেনটাকির দুর্গম অঞ্চল পর্যন্ত, প্রত্যেকটা জায়গাই অন্য যে কোনও লোকের চেয়ে ভালোভাবে চেনে তার বাবা। যুদ্ধের আগে এদিকের ইন্ডিয়ানদের সাথে ব্যবসা করার পাশাপাশি একসাথে শিকারেও বেরোতেন তিনি। তবে এখন, খুলিটা পরিষ্কার করার সময় তার ব্রাশধরা হাতের কম্পন পরিষ্কার বুঝতে পারছে বিলি।

"এটাই," উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন বিলির চাচা। "অবশেষে আমরা খুঁজে পেয়েছি জিনিসটা।"

তার ঘাড়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে সামনে তাকালেন ফোরটেস্কু। "পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এখানেই থাকার কথা ছিল জিনিসটা। সাপের একেবারে মাথায়।"

বিলি জানে না তারা কী খুঁজছে। শুধুমাত্র তার বাবা আর চাচা ছাড়া অন্য কাউকে ফোরটেস্কুর কাছে আসা সরকারি চিঠিটা দেখানো হয়নি। তবে সাপের মাথা বলতে বিজ্ঞানী কী বুঝিয়েছেন সেটা খুব ভালো করেই জানে বিলি।

পিছিয়ে গিয়ে আশেপাশে তাকাল সে। একটা লম্বাটে মাটির ঢিবি লক্ষ্য করে খননকাজ চালাচ্ছিল তারা। দুই গজের মতো উঁচু, প্রশস্ততায় তার দ্বিগুন, আর লম্বায় প্রায় দুই হাজার ফুট আকারের ঢিবিটা পাহাড়জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গাছের ফাঁক গলে সামনে এগিয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন বিশালাকায় কোনও সাপকে কবর দিয়ে রাখা হয়েছে এখানে।

আশেপাশে খুঁজলে এরকম আরো অনেক ঢিবির সন্ধান পাওয়া যাবে। তবে এসব ঢিবি কীভাবে তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে জানা নেই কারও। অনুসন্ধান চালিয়ে হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা, প্রাচীন সাম্রাজ্য সহ ভুত-প্রেত আর অভিশাপের কথা শোনা গেলেও সেগুলো নিতান্তই গুজব। আর হ্যাঁ, লুকানো গুপ্তধনের কথাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ততক্ষণে বিলির বাবা মাটি থেকে পুরোপুরি উদ্ধার করে ফেলেছেন জিনিসটা। কালো রঙের কিছু একটা দিয়ে মোড়ানো আছে ওটা। কাছে ঘেঁসতেই বিলি বুঝতে

পারল, কাপড়ের মতো বস্তুটা আসলে কোনও প্রাণীর চামড়া। কালো রঙের পশমগুলো এখনও অক্ষত। মেটে, স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ আসছে জিনিসটা থেকে।

"মহিষের চামড়া," ফোরটেস্কুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন বিলির বাবা।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী।

আস্তে করে চামড়ার একদিকের প্রান্ত উঁচু করলেন তিনি। দম বন্ধ হয়ে এল বিলির। কী সেই জিনিস, যা শতাব্দী ধরে এভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, দেখতে আর তর সইছে না কারোই।

এরকম আরও অনেক ঢিবি খুঁড়েছে স্থানীয় অধিবাসীরা। তবে প্রায় সবগুলোই ইন্ডিয়ানদের দেহাবশেষ দিয়ে ভর্তি। মূল্যবান জিনিস বলতে ছিল শুধু কিছু তীরের ফলা, চামড়ার ঢাল আর ইন্ডিয়ান তৈজসপত্র। সেগুলোই মহা উৎসাহে লুটপাট চালিয়েছে খননকারীরা।

তাহলে এই সাইটটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

প্রায় দুই মাস যাবত অসংখ্য পরীক্ষানিরীক্ষা, মাপজোক আর খননের পর কী পেয়েছে তারা? মনে মনে হিসাব করল বিলি। কিছু পরিত্যক্ত তীর-ধনুক, জং ধরা বর্শা, রান্না করতে ব্যবহৃত হওয়া বিশাল একটা পাত্র, পুঁতি লাগানো একজোড়া মোজা, কারুকাজ করা শিরস্ত্রাণ আর হাড়গোড়। অসংখ্য হাড়গোড়- মাথার খুলি, পাঁজর, পায়ের লম্বা হাড়, কোমরের হাড় ইত্যাদি। সে একবার ফোরটেস্কুকে বলতে শুনেছিল- কমপক্ষে হাজারখানেক মানুষকে কবর দেয়া হয়েছিল এখানে।

আস্তে আস্তে সাপের আকৃতির ঢিবিটা স্তরে স্তরে খুঁড়ে, সবকিছুর তালিকা করে মাথা পর্যন্ত আসতে খুব বেগ পেতে হয়েছে তাদের।

পুরনো মহিষের চামড়াটার ভাঁজ খুলে ফেললেন বিলির বাবা। দমবন্ধ করে সেদিকে তাকিয়ে আছে সবাই। এমনকি নাক কুঁচকে থমকে দাঁড়িয়ে আছেন ফোরটেস্কু নিজেও।

চামড়াটার ভেতরের দিকটা অপেক্ষাকৃত মসৃণ, তবে খালি নয় সেটা। একটা যুদ্ধের দৃশ্য সবিস্তারে আঁকা রয়েছে সেখানে। ঘোড়ায় চড়ে প্রতিপক্ষকে ধাওয়া করছে অশ্বারোহী সৈন্যরা। ঢাল বহন করছে কেউ কেউ। কারও হাতে আবার বর্শা। মাথার উপর দিয়ে উড়ছে তীরের সারি। লালচে কালিতে বীভৎস দেখাচ্ছে দৃশ্যটা। জিনিসটার তাকে তাকিয়ে যেন যুদ্ধের দামামা শুনতে পেল বিলি।

ততক্ষণে হাঁটু গেঁড়ে জিনিসটার উপর ঝুঁকে পড়েছেন ফোরটেস্কু। খুঁটিয়ে দেখছেন সবকিছু। "এরকম ছবি আগেও দেখেছি আমি। স্থানীয় অধিবাসীরা মহিষের চামড়ায় প্রাণীটার নিজের মগজের প্রলেপ দিত। তারপর ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে ওই একই মহিষের হাড় দিয়ে আঁকত এসব। আঁকাআঁকিতে নিজেদের উদ্ভাবিত রঙ ব্যবহার করত তারা। তবে আমি আগে যেসব ছবি দেখেছি সেগুলোর কোনওটাই এত নিখুঁত ছিল না।"

তারপর অন্য জিনিসটার দিকে ঘুরে গেল বিজ্ঞানীর নজর- একটা বিশালাকায় খুলি। এতো বছর ধরে মহিষের চামড়া দিয়ে আবৃত ছিল এটা। খননের সময়

উপরের দিকের চামড়ার আবরণ সরে গিয়ে মাটি ভেদ করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল খুলিটার উপরের অংশ। "কিন্তু এরকম জিনিস আগে কখনও দেখিনি আমি।"

দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে এতোকাল ধরে অন্ধকারে প্রোথিত থাকা খুলিটা। উপরের দিকের উত্তল অংশ চার্চের ঘন্টার মতো বিশাল। চামড়ার ভেতরের দিকের মতো খুলিটাও কোনও শিল্পীর হাতের ছোঁয়া পেয়েছে।

হাড়ের উপরিভাগে খোদাই করা আঁকিবুঁকিগুলোতে উজ্জ্বল রঙের প্রলেপের কারণে খানিকটা ভেজা ভেজা দেখাচ্ছে।

"ম্যামথের খুলি না এটা?" জিজ্ঞেস করল বিলির চাচা।

"না। ম্যামথ না," জবাব দিলেন ফোরটেস্কু। তারপর হাতের লাঠিটা দিয়ে খুলির দিকে ইশারা করলেন তিনি। "হাড়ের বাঁক আর দাঁতের গোড়াগুলো দেখুন। ম্যামথের সাথে মেলে না। হাতিগোত্রীয় প্রাণীদেরই প্রাচীন একটা প্রজাতি এটা- ম্যাস্টোডন। বিশেষত আমেরিকাতেই দেখা যেত এদের।"

"তা যা হয় হোক," মন্তব্য করেন বিলির বাবা। "আমি শুধু জানতে চাই, এটাই সেই কাঙ্ক্ষিত খুলিটা কি না।"

"সেটা জানার তো একটাই উপায়।"

খুলিটার উপরদিকে আঙুল বুলাতে লাগলেন ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী। পেছনদিকে একটা ফুটো খুঁজে পাওয়ার পর, আস্তে করে ফুটোটায় আঙুল ঢুকিয়ে উপরদিকে টান দিলেন তিনি।

আরও একবার দমবন্ধ হয়ে এল উপস্থিত সবার। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন শ্রমিক। বিলি দেখতে পেল, টান দেয়ার সাথে সাথে দুটো আলাদা অংশে ভাগ হয়ে ফাঁক হয়ে গেল খুলিটার উপরের হাড়, যেন একটা কেবিনেটের দুটো পাল্লা। তার বাবার সহায়তায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ মোটা আর বড়সড় ডিনার প্লেট আকারের হাড়ের টুকরো দুটো সরিয়ে ফেললেন ফোরটেস্কু।

সূর্যের স্তিমিত আলোতেও ঝিলিক দিয়ে উঠল এতো বছর ধরে খুলিটার ভেতরে লুকিয়ে রাখা উজ্জ্বল জিনিসটা।

"সোনা," অবাক কণ্ঠে বলে উঠল বিলির চাচা।

খুলিটার ভেতরদিকের গহ্বরের নিচের দিকে সোনার প্রলেপ দেয়া। হাড়ে ফাঁক গলে সোনার স্তরে আঙুল বুলালেন ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী। ভালোভাবে দেখার পর বিলি বুঝতে পারল, সোনার উপরের দিকটাও খুলির হাড়ের মতো অমসৃণ। মানচিত্রের মতো কিছু একটা আঁকা রয়েছে সেখানে। গাছ, পাহাড় আর নদীর আকৃতি পরিষ্কার ধরা পড়ল বিলির চোখে। সেই সাথে আরও কিছু জিনিস খোদাই করা আছে, সম্ভবত প্রাচীন কোনও লেখা।

আরেকটু সামনে এগিয়ে আসতেই ফোরটেস্কুকে ভয়ার্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে শুনল সে।

"হিব্রু।"

আকস্মিক শকটা কাটিয়ে উঠার পর সবার আগে মুখ খুললেন বিলির বাবা। "কিন্তু...খুলিটা তো শূন্য।"

আবারও গহ্বরটার দিকে নজর দিলেন ফোরটেস্কু। সোনার প্রলেপ দেয়া ক্রেনিয়াম আর খুলির ভেতরকার দেয়ালের ফাঁকটা একটা সদ্যোজাত বাচ্চাকে ধারণ করার মত যথেষ্ট বড়। কিন্তু জায়গাটা বর্তমানে খালি।

ফাঁকটা ভালোভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বিলি বুঝতে পারল কিছু একটা হিসাব করছেন তিনি।

কী পাওয়ার আশা করছিলেন তারা?

উঠে দাঁড়ালেন ফোরটেস্কু। "বন্ধ করো এটাকে। চামড়ায় মুড়িয়ে রেখে দাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভার্জিনিয়ায় পাঠাতে হবে জিনিসটা, আগামী এক ঘন্টার মধ্যেই।"

কেউ দ্বিমত করল না। সবাই জানে, সোনা পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে হুড়োহুড়ি লেগে যাবে এখানে। পরবর্তী এক ঘন্টায় সবকিছু গুছিয়ে নিল সবাই। ঘোড়া জুড়ে দিয়ে একটা ওয়াগন তৈরি করা হলো। প্রায় পুরোটা সময় কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করে কাটিয়ে দিলেন ফোরটেস্কু, বিলির বাবা এবং চাচা।

তাদের কথা শোনার জন্য আড়ি পেতেছিল বিলি। তবে সবাই এত নিচু কণ্ঠে কথা বলছিলেন যে, কয়েকটা শব্দ ছাড়া সে প্রায় কিছুই বুঝতে পারল না।

"যথেষ্ট হয়েছে..." বলে উঠলেন ফোরটেস্কু। "...শুরু করার জন্য সঠিক জায়গা। শত্রুপক্ষ জানতে পারলে ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছু।"

মাথা নাড়লেন বিলির বাবা। "তাহলে এটাকেই বরং ধ্বংস করে ফেলা যাক। একটা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হোক হাড়। গলিয়ে ফেলা হোক সোনার প্রলেপ।"

"হয়তো এটাই করা হবে। তবে সিদ্ধান্তটা গভর্নরের উপর ছেড়ে দেয়াই ভাল।"

ব্যাপারটা নিয়ে ফোরটেস্কুর সাথে তর্ক করতে যাচ্ছিলেন বিলির বাবা। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে বিলিকে দেখে ফেললেন তিনি। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুললেন।

কিন্তু আর কোন কথা বের হলো না তার গলা দিয়ে।

হবে কীভাবে? গলাটাই যে আর অক্ষত নেই। পেছনদিক থেকে ঢুকে চোয়ালের নিচ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা তীরের ফলা। অঝোরে রক্তের ধারা বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ক্ষতস্থান দিয়ে। গলা আঁকড়ে ধরে খাবি খেতে খেতে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লেন তিনি।

বাবার দিকে দৌড় শুরু করল বিলি। গলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে আতঙ্কিত চিৎকার। "বাবা...!"

ঘটনাটার আকস্মিকতায় যেন অন্ধ-কালা হয়ে গেছে সে। আর কোনওদিকে খেয়াল নেই বিলির। চোখের সামনে শুধু বাবাকেই দেখতে পাচ্ছে সে। কয়েকবার ঝাঁকি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শরীরটা।

বাবার শরীরটা পড়ে যেতেই পেছনের দৃশ্য নজরে এল বিলির। মাথা নিচু করে বসে আছেন তার চাচা, মৃত। পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক ভেদ করে, মাটিতে ঢুকে গেছে একটা বর্শার ধারালো ফলা। বর্শার হাতল অবলম্বন করে আটকে আছে শরীরটা।

কী হচ্ছে এসব! আতঙ্কের রেশ কাটার আগেই পাশ থেকে একটা হাত আঁকড়ে ধরল বিলিকে। জড়াজড়ি করে মাটিতে শরীর গড়িয়ে দিল দু'জনেই।

মানুষের মরণ আর্তনাদ ক্রমাগত ভেসে আসছে বিলির কানে। পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার পাল। সন্ধ্যার আবছা সূর্যালোকে এদিক সেদিক ছুটে বেড়াচ্ছে কিছু ছায়া।

ইন্ডিয়ানরা হামলা করেছে ক্যাম্পে।

ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করল বিলি। তবে শক্ত করে তাকে আঁকড়ে ধরে রাখলেন ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী- আরচার্ড ফোরটেস্কু। "শান্ত হও, ছেলে।"

ধস্তাধস্তি বন্ধ করার পর, বিলি উপর থেকে সরে গেলেন তিনি। উঠে দাঁড়াল দু'জনেই। হঠাৎ কোপ মারার ভঙ্গিতে পাশ থেকে ছুটে এল ধারালো একটা কুড়াল। হাতের একমাত্র অস্ত্র- লাঠিটা দিয়ে আক্রমণটা ঠেকালেন ফোরটেস্কু। আঘাতের তীব্রতায় লাঠিটার কিছুটা অংশের কাঠ ভেঙে ছিটকে যেতেই ভেতর থেকে ধাতব, চকচকে কিছু একটা উঁকি দিল। বিলি বুঝতে পারল, ওটা আসলে লাঠির ছদ্মবেশে থাকা একটা তলোয়ার। টান দিয়ে খাপ থেকে তলোয়ারটা বের করে আনলেন ফোরটেস্কু, চোখের পলকে হামলাকারীর বুকে ঢুকিয়ে দিলেন পুরোটা।

মরণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল হামলাকারী ইন্ডিয়ানের গলা বেয়ে। ফোরটেস্কু টান দিয়ে তলোয়ারটা বের করে আনতেই বিলির পাশে পড়ে গেল শরীরটা।

"তাড়াতাড়ি...আমার সাথে," এগোনোর জন্য তাড়া দিলেন ফোরটেস্কু।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এগোনোর জন্য উদ্যত হলো বিলি। তবে পেছন থেকে তার হাত আঁকড়ে ধরল মাটিতে পড়ে থাকা সেই হামলাকারী ইন্ডিয়ান। ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল সে। কিন্তু লোকটার হাত থেকে কিছু একটা লেগে গেছে তার হাতে।

রক্ত নয়...রং।

লোকটার হাতের দিকে তাকাল বিলি। পদ্মফুলের মতোই ধবধবে সাদা হাতের তালু, তবে চামড়ার ভাঁজে রঙের মত কিছু লেগে আছে।

ফোরটেস্কু বিলির কলার ধরে টান দিতেই, ঘুরে দাঁড়াল সে।

"ওরা...ওরা ইন্ডিয়ান না।"

"আমি জানি," জবাব দিলেন তিনি।

শেষ লণ্ঠন দুটোও নিভিয়ে দেয়া হলো। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে মৃত্যুপথযাত্রী লোকগুলোর চিৎকার। ক্যাম্পের ধ্বংসাবশেষের ফাঁক গলে নিচু হয়ে এগোতে লাগল দু'জন। কিছুক্ষণ পর ক্যাম্পের শেষ মাথায় এসে পৌঁছল তারা। মাঝখানে অবশ্য একবার থেমেছিল, ওয়াগনে সাজিয়ে রাখা খুলিটার সামনে।

বনের প্রান্তে একটা গাছে স্যাডল সাজানো একটা ঘোড়া বাঁধা। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে প্রাণীটা, চিৎকার-চেঁচামেচিতে ভয় পেয়েছে।

আঙুল তুলে ঘোড়াটা দেখালেন ফোরটেস্কু। "উঠে পড়, ছেলে।"

বিলি স্টিরাপে এক পা ঢোকাতে ঢোকাতে ক্যাম্পের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক।

খানিকটা কসরত করে ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ল বিলি। তার ওজনেই কারণেই হয়তো, শান্ত হয়ে এল ঘোড়াটা। প্রাণীটার ঘাড় জড়িয়ে ধরে উবু হয়ে বসল বিলি। আশেপাশের কোলাহল তোলপাড় করে ফেলছে তার মাথার ভেতরটা।

পেছনদিকে ডাল ভাঙার আওয়াজে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। গায়ের জ্যাকেট আর হাতের তলোয়ার দেখে ফোরটেস্কুকে চিনতে পারল বিলি। ঘোড়া থেকে নেমে তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল ছেলেটা। এই মুহূর্তে একটু আশ্রয় দরকার তার, একটু ভরসা দরকার।

কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন ফোরটেস্কু। সামনে এগোতেই দেখা গেল, তার এক পায়ের হাঁটুর একটু উপরে একটা তীর গেঁথে আছে।

বিলির কাছে পৌঁছে তার কোলে কিছু একটা তুলে দিলেন বিজ্ঞানী। ভালোভাবে লক্ষ্য করতেই বিলি দেখতে পেল, ওটা খুলির ভেতরে থাকা সেই সোনার প্রলেপ দেয়া অংশটা, মহিষের চামড়ায় মোড়ানো। সে বুঝতে পারল, কোনওভাবে জিনিস দুটো চুরি করে এনেছেন ফোরটেস্কু।

কিন্তু কেন?

প্রশ্নটা মুখে উচ্চারণ করার আগেই তাকে তাড়া দিলেন ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী। "যাও।"

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বিলি। "কিন্তু আপনার কী হবে, স্যার?"

এক হাতে জখম হওয়া উরুর দিকে ইশারা করলেন তিনি। "তুমি বা তোমার ঘোড়া, দু'জনের কেউই আমার বোঝা বহন করার উপযুক্ত নও, ছেলে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে তোমাকে। নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও জিনিসগুলো।"

"কোথায়?" ঘোড়ার লাগাম হাতে নিতে নিতে শেষ প্রশ্নটা করল বিলি।

"ভার্জিনিয়ার নতুন গভর্নর, থমাস জেফারসনের কাছে," জবাব দিয়ে পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসতে লাগলেন আরচার্ড ফোরটেস্কু। এক সময় হারিয়ে গেলেন জমাট বাঁধা অন্ধকারে।

প্রথম অংশ

অনুপ্রবেশ

অধ্যায় ১
বর্তমান সময়
১৮ মে, দুপুর ১:৩২
রকি পর্বতমালা, উটাহ

দৃশ্যটা দেখে মনে হচ্ছে যেন এটাই নরকের প্রবেশদ্বার।

ঢালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে, নিচের অসীম খাদের দিকে তাকিয়ে আছে দুই যুবক। রকি পর্বতের এই নির্জন শৈলশ্রেণীতে পৌছাতে দীর্ঘ আট ঘন্টা পাহাড় বাইতে হয়েছে তাদের।

"এটাই সেই জায়গা তো? তুমি নিশ্চিত?" জিজ্ঞেস করল ট্রেন্ট ওয়াইল্ডার।

পকেট থেকে সেলফোন বের করল চার্লি রীড। ফোনে জিপিএস সিগন্যাল পরীক্ষা করার পর হাতে ধরা হরিণের চামড়ায় আঁকা প্রাচীন ম্যাপটাতেও চোখ বুলাল একবার। তারপর প্লাস্টিকের জিপলক ব্যাগে সযত্নে ঢুকিয়ে রাখল জিনিসটা। "তাই তো মনে হচ্ছে। ম্যাপ অনুযায়ী, এই গিরিখাতের শুরুতেই কোথাও একটা জলপ্রবাহ আছে। খাঁড়িটা যেখানে উত্তরদিকে মোড় নিয়েছে, সেখানেই পাওয়া যাবে গুহার প্রবেশপথ।"

চুল থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস করল ট্রেন্ট। বসন্তের আগমনবার্তা হিসেবে পর্বতশ্রেণীর নিচের দিকে পাহাড়ি ফুলে ফুলে ছেয়ে গেলেও উপরের এই অংশটাতে এখনও জেঁকে বসে আছে তীব্র ঠান্ডা। পেঁজা তুলোর মতো ক্রমাগত ঝড়ছে তুষার।

ঢালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিচের উপত্যকার দিকে তাকাল ট্রেন্ট। মনে হচ্ছে যেন কোনও অতল গহ্বর ওটা। কুয়াশার ফাঁক গলে আবছাভাবে নিচের কালো পাইন বনের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে শুধু। উপত্যকার চারধারে খাড়া উপরে উঠে গেছে পর্বতশ্রেণী, যেন সুরক্ষা দিচ্ছে মাঝের কালো সমুদ্রকে। দড়ি আর র‍্যাপলিং হার্নেস গুছিয়ে রাখতে শুরু করল চার্লি। মনে হচ্ছে আজ আর দরকার পড়বে না সেগুলো।

"নিচে ফিরবে না নাকি আর?" জিজ্ঞেস করল ট্রেন্ট।

জবাবে এক চোখের ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকাল চার্লি। "সারাদিন পাহাড়ে চড়ার পর আবার আজকেই?"

"অভিশাপটার ব্যাপারে ভেবেছ কিছু? তোমার দাদা যেটার কথা বলেছিলেন..."

হাত নেড়ে কথার বাকি অংশটা উড়িয়ে দিল চার্লি। "বুড়োর এক পা কবেই কবরে চলে গেছে। আর মাথায় যা ছিল, গাঁজার ধোঁয়ায় উড়ে গেছে সব।" অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে ট্রেন্টের কাঁধে চাপড় দিল সে। "সুতরাং, অযথা ভয় পেয়ে প্যান্ট ভেজানোর

কোনও দরকার নেই বন্ধু। খুব সম্ভবত, গুহাটাতে কতগুলো মরচে ধরা তীরের ফলা আর ভাঙা পাত্র ছাড়া কিছুই পাব না আমরা। অবশ্য কপাল ভালো থাকলে কিছু হাড়গোড়ও পেতে পারি।" বলে মুচকি হাসল চার্লি।

সরু একটা ট্রেইল খুঁজে পেয়ে, সেটা ধরেই এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল তারা। আর কথা না বাড়িয়ে তাকে অনুসরণ করল ট্রেন্ট। চলতে চলতে চার্লির গাঢ় লাল রঙের জ্যাকেটে আটকানো পালক দুটোর চোখ পড়ল তার। উটাহ ইউনিভার্সিটির প্রতীক ওগুলো। প্রাইমারী স্কুল থেকেই খুব ভালো বন্ধু তারা। কিন্তু পরবর্তীতে দু'জনের জীবনের গতিপথ বেঁকে গেছে দু'দিকে। এখন কলেজের প্রথম বর্ষ প্রায় শেষ করে ফেলেছে চার্লি। সামনের গ্রীষ্মে উইনটাহ রিজার্ভেশন ল গ্রুপের অধীনে একটা ইন্টার্নশীপ প্রজেক্টেও জয়েন করতে চলেছে সে। আর অন্যদিকে, বাবার অটো-বডি শপে পুরোদস্তুর কাজে নেমে পড়েছে ট্রেন্ট।

চার্লি হচ্ছে একটা উদীয়মান নক্ষত্র। অগ্রগতির ফলে আর মাত্র কিছুদিন পরই টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে তাকে, ভাবল ট্রেন্ট। অবশ্য সেই ছোটবেলা থেকেই সব কাজে তাকে ছাড়িয়ে যেত চার্লি। ট্যান করা চামড়া আর ঐতিহ্যবাহী লম্বা চুলওয়ালা অর্ধেক উটে ইন্ডিয়ান হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপারটা তার সাফল্যের পথে কোনওরূপ বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

দু'জনেই বুঝতে পেরেছে- আস্তে আস্তে একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তারা। এক সময় হয়তো পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে যাবে যোগাযোগ। শেষবারের মতো অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় কিছু করতে চাইলে, এখনই উপযুক্ত সময়। তাই উটে গোত্রের ইন্ডিয়ানদের মুখে মুখে ছড়িয়ে থাকা এক কিংবদন্তীর গুহার খোঁজে বেরিয়েছে তারা।

জীবিত মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন লোকই ওই জায়গাটা সম্পর্কে জানে। চার্লিও হয়তো কখনও বিস্তারিত জানতে পারত না। কিন্তু তার দাদার অতিরিক্ত হুইস্কিপ্রীতিই কাজটা সহজ করে দিয়েছে তার জন্য। হুস্কির নেশায় চূর হয়ে, ক্ষয়ে যাওয়া মহিষের শিং-এর ভেতর রক্ষিত হরিণের চামড়ায় আঁকা প্রাচীন একটা ম্যাপও তাকে দেখিয়েছিল বুড়ো।

"দাদা বলেছিলেন, এখনও নাকি গুহাটাতে ঘুরে বেড়ায় পবিত্র আত্মারা। প্রাচীন এক গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে তারা।"

"গুপ্তধন! কীসের গুপ্তধন?" দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ট্রেন্ট।

শ্রাগ করল চার্লি। "জানি না। তবে ওগুলো নাকি অভিশপ্ত।"

"মানে?"

"দাদা বলেছেন, সেই গুহায় যারা অনুপ্রবেশ করবে, তাদের কারোই নাকি বাইরে বেরোনোর অনুমতি নেই।"

"কেন?"

"কারণ তারা বাইরে বেরিয়ে এলে ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী।" বলে নিজেই হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিল চার্লি। এই আধুনিক যুগে এসব গাঁজাখুরি কথা বিশ্বাস করে নাকি কেউ!

“গরম লাগছে,” সামনে এগোতে এগোতে মন্তব্য করল সে।

মাথা নেড়ে সায় দিল ট্রেন্ট। হিমশীতল তুষার, উষ্ণ বৃষ্টিধারায় পরিণত হয়েছে এখানে। প্যান্টে হাতের তালু ঘসল সে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, এতোক্ষন পেছন থেকে কুয়াশা বলে ভ্রম হওয়া জিনিসটা আসলে বাষ্প।

খানিকটা সামনেই বাষ্পের উৎস নজরে এল। গিরিখাতের একপাশ দিয়ে সরু নালার মতো একটা জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। বুদবুদ উঠছে পানি থেকে।

“সালফারের গন্ধ,” বলে উঠল চার্লি। এগিয়ে গিয়ে নালার পানিতে হাত ডুবিয়ে দেখল সে। “গরম। সম্ভবত কাছাকাছি কোথাও ভূগর্ভস্থ একটা ঝর্ণা আছে। গরম পানির উৎস ওটাই।”

অবাক হল না ট্রেন্ট। রকি পর্বতে এমন দৃশ্য নতুন কিছু না।

উঠে দাঁড়াল চার্লি। কণ্ঠ উত্তেজিত। “এটাই সেই জায়গা।”

“এটা মনে হলো কেন?”

“এই ধরনের উষ্ণ জলস্রোতকে ভয় পায় আমাদের গোত্রের লোকজন। গুহাটার ব্যাপারেও এরকম কথাই প্রচলিত আছে।” পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে নালাটা পেরিয়ে গেল চার্লি। “চল। কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা।”

বিনাবাক্য ব্যয়ে তাকে অনুসরণ করল ট্রেন্ট।

সামনে এগোনোর সাথে সাথে আরও উষ্ণ হয়ে আসতে লাগল আবহাওয়া। সালফারের গন্ধে নাক আর চোখ জ্বলতে শুরু করল। এতদিনেও জায়গাটায় কারও পা না পড়ার কারণ বোধ হয় এটাই।

চোখ ডলতে ডলতে সামনে তাকাল ট্রেন্ট। একটা বাঁকের কাছে পৌঁছে থেমে গেছে চার্লি। পকেট থেকে ফোন বের করে একবার স্ক্রিনের দিকে, আরেকবার হরিণের চামড়ার ম্যাপের দিকে তাকাচ্ছে সে। চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট।

“পৌঁছে গেছি।”

আশেপাশে তাকাল ট্রেন্ট। কই, কোনও গুহা তো চোখে পড়ছে না। শুধু গাছপালা। সামনের দিকে ঘন বৃষ্টি হয়ে ঝড়ছে তুষার।

“গুহামুখটা কাছাকাছি কোথাও থাকার কথা,” বিড়বিড় করে বলল চার্লি।

“হয়তো, এটা শুধুই একটা গল্প।”

আশেপাশে খুঁজতে শুরু করল চার্লি। “যাই হোক, খুঁজে দেখি কিছু পাই কি না।”

ট্রেন্টও চুপচাপ বসে নেই। চারদিকে ক্রমাগত নজর বুলাচ্ছে তার চোখ। “কই, কিছুই তো নেই। আমরা বরং ফিরে...”

তখনই চোখের কোণায় ধরা পড়ল জিনিসটা। গ্রানাইট পাথরের গায়ে গাছের ছায়ার আদলে অন্ধকার একটা আকৃতি। যেন প্রকৃতিই লুকিয়ে রেখেছে কিংবদন্তীর সেই গুহামুখ।

সামনে এগোল ট্রেন্ট। নিচু আর প্রশস্ত গহ্বরটা গিরিখাতের মেঝে থেকে ফুট চারেক উপর থেকে শুরু হয়েছে। গাঢ় অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে সেখানে।

কতক্ষণ থমকে দাঁড়িয়েছিল বলতে পারবে না ট্রেন্ট। চার্লির ডাকে সম্বিত ফিরল তার।

"এইতো পেয়ে গেছি!"

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'জনেই। অবশেষে যুগ যুগ ধরে লোকমুখে ঘুরে বেড়ানো কিংবদন্তীর সেই গুহা খুঁজে পেয়েছে তারা। তবে পরবর্তী কাজ সম্পর্কে সন্দিহান দেখাচ্ছে তাদের।

"ঢুকবে?" জিজ্ঞেস করল ট্রেন্ট।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল চার্লি, টানটান হয়ে গেছে পিঠ। "চল, দেখি। কী আছে কপালে।"

ফ্লাশলাইট বের করে আগে আগে চলল চার্লি। তাকে অনুসরণ করল ট্রেন্ট। সমতল থেকে চারধাপ নিচে নেমে গেছে টানেলটা, তারপর ভেতরদিকে অপেক্ষাকৃত সরু হয়ে সামনে এগিয়েছে। বাইরের চেয়ে আরও গরম লাগছে ভেতরে। তবে বাইরের বৃষ্টির তুলনায় এখানে অনেক শুকনো।

পাথরের একটা চোখা অংশে জ্যাকেটের এক প্রান্ত আটকে যেতেই টেনে ছাড়িয়ে নিল চার্লি। "আমি বাজি ধরে বলতে পারি বন্ধু, ভূগর্ভস্থ উষ্ণ ঝর্ণাটা ঠিক আমাদের পায়ের নিচ দিয়েই বইছে।"

গরম বেড়ে যাওয়ায় কেমন যেন অস্থির লাগছে ট্রেন্টের। তবে এতদূর এসে পিছিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

একটু পরেই বাস্কেটবল কোর্ট সাইজের নিচু ছাদওয়ালা একটা চেম্বারে এসে শেষ হলো টানেলটা। চারপাশে নজর বুলাল চার্লি, পরক্ষণেই আঁতকে উঠে বন্ধুর হাত আঁকড়ে ধরল সে। তার ভয় পাওয়ার কারণ বুঝতে পেরেছে ট্রেন্টও।

গুহাটা খালি নয়।

সারি সারি মানুষ শুয়ে আছে মেঝেতে। অবশ্য মানুষ না, লাশ বিশেষণটাই এখন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শুকিয়ে মমি হয়ে গেছে মৃতদেহগুলো। হাড়ের সাথে সেঁটে গেছে ফ্যাকাশে চামড়া। চুপসে গিয়ে কোটরে ঢুকে গেছে চোখ, নাক। ঠোঁট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে হলদেটে দাঁত। সবগুলো মৃতদেহের ঊর্ধাঙ্গই উলঙ্গ, এমনকি নারীদেরও। কারও কারও গায়ে আবার পালক আর পাথরের তৈরি অলঙ্কারও আছে।

"আমাদের গোত্রের লোকজন," অবাক কণ্ঠে বলে উঠল চার্লি। বিস্ময়ে যেন বুজে আসতে চাইতে চাইছে তার গলা।

"তুমি নিশ্চিত?"

জবাব দিল না চার্লি। ফ্লাশলাইটের আলোয় বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মৃতদেহগুলোর চামড়া আর চুল। তবে ব্যাপারটা শনাক্ত করার মতো কোনও বিশেষজ্ঞ নয় সে। হতে পারে, এতো বছর ধরে গুহায় থাকার ফলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের ক্রিয়ায় লাশগুলোর রঙ এমন হয়ে গেছে। এগিয়ে গিয়ে একটা মৃতদেহ পরীক্ষা করল সে। ঘাড়ে পালকের তৈরি একটা নেকলেস পরে আছে লোকটা। "দেখো, এটা লাল।"

অবশ্য লোকটার গায়ের রঙ সম্পর্কে সম্পর্কে মন্তব্য করেনি সে। খুলির উপরে, লাশের চুলের গোড়ায় গাঢ় লালচে রঙের ছোপ।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে ট্রেন্ট। চার্লির দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। "এদিকে দেখ।"

মেঝেতে শুয়ে থাকলেও লোকটার মাথা গ্রানাইটের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা। চোয়ালের নিচে গলার চামড়া কাটা। রক্ত শুকিয়ে গেছে অনেক আগেই, চামড়ার ফাঁক গলে ভেতরের শুকিয়ে যাওয়া মাংস আর হাড় উঁকি দিচ্ছে। লোকটার হাতে চ্যাপ্টা ধাতব একটা ছুরি ধরে রাখা। এখনও চকচক করছে ধারালো অস্ত্রটা।

আশেপাশে সবগুলো লাশের উপর দিয়ে ফ্লাশলাইটের আলোটা ঘুরিয়ে আনল চার্লি। প্রত্যেকেরই গলা কাটা, আর হাতে ছুরি ধরা।

"মনে হচ্ছে, আত্মহত্যা করেছে সবাই," বলে উঠল ট্রেন্ট, কণ্ঠে বিস্ময়।

"কিন্তু কেন?"

সামনের দিকে ইঙ্গিত করল ট্রেন্ট। চেম্বারটা পেরিয়ে আরেকটা টানেল পাহাড়ের গভীরে ঢুকে গেছে। "হয়তো ওখানে কিছু একটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বাইরের পৃথিবীর কাছ থেকে ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যই আত্মত্যাগ করেছে সবাই।"

কথাটা অনুধাবন করে কেঁপে উঠল দু'জনেই। তবে চার্লিই আগে নড়ে উঠল। "চল, বেরিয়ে যাই।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ট্রেন্ট। একদিনের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছু হটতে শুরু করল চার্লি। একমাত্র ফ্লাশলাইটটা তার হাতেই আছে। বন্ধুকে অনুসরণ করল ট্রেন্ট। তবে পেছনে ফেলে আসা দৃশ্যটাই মাথায় ঘুরছে এখনও। এতো এতো লাশ, ধারালো ছুরি, আত্মহত্যা, গুপ্তধন... আনমনে হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। তবে তার জন্য অপেক্ষা করল না চার্লি। বাইরে সাহস দেখালেও তার ভয়ের মাত্রা আসলে ট্রেন্টের চেয়ে বেশি। এই মুহূর্তে বাইরে বেরোনোই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

অভিশাপ দিতে দিতে উঠে দাঁড়াল ট্রেন্ট। হাত দিয়ে কাপড়ে লেগে যাওয়া ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে লক্ষ্য করল টানেল অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে গেছে চার্লি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিজেও সামনে এগোল। কিন্তু এক পা এগোতেই উত্তেজিত কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল গুহার বাইরের দিক থেকে।

"বুমম..." বদ্ধ জায়গায় ট্রেন্টের কানে তালা লাগিয়ে দিল পিস্তলের আওয়াজ।

লাফিয়ে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ট্রেন্ট। গুলির আওয়াজের পর টানেলের অন্ধকার ছাপিয়ে তার মনকে আঁকড়ে ধরেছে নীরবতার ভয়।

চার্লি......ও কি মারা গেছে?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবারও সেই মমি ভরা চেম্বারের দিকে ফিরে যেতে লাগল ট্রেন্ট। হোঁচট খেতে খেতে দেয়ালে হাতড়ে এগোতে লাগল সে, চেম্বারের প্রান্তে পৌঁছে গুহামুখের দিকে ফিরে মেঝেতে বসে পড়ল। বিস্ময়ে আর আতঙ্কে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। তবে সবার আগে তার মাথায় যে কথাটা এল, তা হলো- আত্মরক্ষা। একটা অস্ত্র চাই তার।

ততক্ষণে ভেতর অন্ধকার চোখে কিছুটা সয়ে এসেছে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে একটা মৃতদেহের দিকে এগোল সে। হাত থেকে খুলে নিল ধারালো ছুরিটা। ঠিক তখনই বুঝতে পারল কেউ একজন এগোচ্ছে টানেলটা ধরে। সম্ভবত, চার্লির আততায়ী।

লুকাতে হবে।

আর এখানে লুকানোর মতো শুধুমাত্র একটা জায়গাই অবশিষ্ট আছে। চেম্বারের অন্যদিকের টানেলটা। হাতড়ে হাতড়ে সেদিকেই এগোল সে। গুহামুখের তুলনায় এদিকের মেঝে অপেক্ষাকৃত মসৃণ মনে হলো। তবে কয়েক কদম সামনে যেতেই ফুরিয়ে গেল টানেলটা। আরেকটা চেম্বারে উন্মুক্ত হয়েছে সেটা। তবে অন্ধকারে ট্রেন্ট ঠিক বুঝতে পারল না, কী আছে সেখানে।

একটা শব্দ শুনে আবারও পেছন ফিরল সে, তাকাল মমিভর্তি চেম্বারটার দিকে। গুহামুখের টানেল ধরে ফ্লাশলাইটের আলো এগিয়ে আসছে। গুহায় ঢুকতে চলেছে হামলাকারীরা।

তারা কী জানে, আমি আছি এখানে?

খানিকক্ষণ পর নিচু হয়ে মমিভর্তি চেম্বারে প্রবেশ করল কেউ। ফ্লাশলাইটটা একহাতে ধরা, বিক্ষিপ্ত আলোয় বোঝা গেল, অন্যহাতে কিছু একটা টেনে আনছে সে। ভালোভাবে তাকাতেই, চার্লির গাঢ় লাল জ্যাকেটটা চিনতে পারল ট্রেন্ট। চার্লির দেহটা চেম্বারের মেঝেতে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল খুনী। ফ্লাশলাইটের আলোয় তাকে চিনতে পেরে বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল ট্রেন্টের।

চার্লির দাদা।

বুড়ো মানুষটার একহাতে একটা পিস্তল ধরা। আস্তে আস্তে চারপাশে নজর বুলালেন তিনি। তারপর পিস্তলধরা হাতটা মাথার একপাশে উঁচু করে ধরলেন। ট্রেন্টকে আরও একবার হতবাক করে দিয়ে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টিপে দিলেন ট্রিগার।

বদ্ধ গুহায় কান ফাটানো আওয়াজে বেরিয়ে গেল গুলি। হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল বুড়ো মানুষটা। হাত থেকে পিস্তল আর ফ্লাশলাইট, দুটোই ছুটে গেছে। ফ্লাশলাইটের পাশেই, নিজের নাতির মৃতদেহের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি। গুলি লেগে উধাও হয়ে গেছে মুখের একপাশ। লোকটার বলা কথাগুলো মনে পড়ল ট্রেন্টেরঃ গুহায় অনুপ্রবেশকারী কারোই বাইরে বেরোনোর অনুমতি নেই।

নাতিকে খুন করে, নিজে আত্মহত্যা করে, কথাটার সত্যতা প্রমাণ করলেন বুড়ো ইন্ডিয়ান।

কোনওভাবে হয়তো হরিণের চামড়া খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটা ধরে ফেলছিলেন তিনি। তারপর ম্যাপ চুরি আর গুহার প্রতি চার্লির আগ্রহ, দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিতে কষ্ট হয়নি তার। এই বৃদ্ধ বয়সে নিজেই চলে এসেছেন নাতিকে অনুসরণ করতে করতে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ল ট্রেন্ট।

কী হচ্ছে এসব! কোন কুক্ষণেই যে চার্লির কথায় এখানে আসতে রাজি হয়েছিল!

আরেকটা প্রশ্ন উঁকি দিল তার মনে। বুড়োর সাথে আর কেউ আসেনি তো?

নিশ্চিত হওয়ার জন্য মিনিট দশেক চুপচাপ অপেক্ষা করল সে। তারপর নীরবতাই তার প্রশ্নের জবাব দিল, নেই আর কেউ।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনের চেম্বারের দিকে তাকাল ট্রেন্ট। বুড়োর হাত থেকে পড়ার সময় ভেতরের চেম্বারের দিকেই ঘুরে গেছে ফ্লাশলাইটের মুখ। এতোকাল ধরে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার পর আলোর মুখ দেখেছে পাহাড়ের গভীরে প্রোথিত গোপনীয়তা।

পাথরের ক্রেট... অগণিত... আকারে বড়সড় লাঞ্চ বক্সের মতো দেখতে একেকটা। তবে সবার আগে নজরে পড়ে যে জিনিসটা, তা হলোঃ চেম্বারের একেবারে মাঝখানে, গ্রানাইটের বেদীর উপর রাখা একটা বড়সড় মাথার খুলি।

একটা টোটেম, ভাবল সে।

হাড়ের আকৃতি আর মুখের দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসা ফুটখানেক লম্বা দুটো দাঁত দেখে খুলিটা চিনতে পারল ট্রেন্ট। ভূগোল ক্লাসে প্রাগৈতিহাসিক এই প্রাণী সম্পর্কে পড়ানো হয়েছিল তাদের।

সেবার-টুথড টাইগার।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই নড়ে উঠল সে। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে তাকে, কাউকে বলতে হবে এই অদ্ভুত গুপ্তধন আর মৃতদেহ সম্পর্কে।

তাড়াতাড়ি পা চালাল ট্রেন্ট। মমিভর্তি চেম্বার পেরিয়ে ছুট লাগাল টানেল ধরে। কিছুক্ষণ পর অবশেষে দিনের আলো দেখতে পেল সে, পৌঁছে গেছে গুহামুখে। সিঁড়িগুলো পার হয়ে বাইরের পৃথিবীতে পা রাখার আগে চার্লির মুখে শোনা কথাগুলো মাথার ভেতর বেজে উঠল যেন।

গুহায় অনুপ্রবেশকারীদের কেউ বাইরে বেরোলেই ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী।

কান্নাভেজা চোখে মাথা নেড়ে কথাটা ভুলে যেতে চাইল ট্রেন্ট। কুসংস্কারই কেড়ে নিয়েছে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর জীবন। নিজের ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দিতে পারে না সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গুহা থেকে বেরিয়ে এল ট্রেন্ট ওয়াইল্ডার।

অধ্যায় ২
৩০ মে, সকাল ১০:৩৮
পাহাড়ি উইনটাস বনভূমি, উটাহ

শোরগোল তৈরির জন্য খুনের চেয়ে উপযুক্ত আর কিছু হতে পারে না।

ক্যাম্প পেরিয়ে গিরিখাতের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন মার্গারেট গ্রান্থাম। চামড়া-মাংস ভেদ করে যেন হাড়ে কামড় বসাতে চাইছে হিমশীতল বাতাস। মাথা থেকে হ্যাটটা উড়িয়ে নিতে চাইল এক ঝলক দমকা হাওয়া, হাত দিয়ে চেপে ধরে সেই পরিকল্পনাটা ব্যর্থ করে দিলেন তিনি। ধূসর চুলের গোছার উপর আবার ঠিকঠাক বসিয়ে নিলেন টুপিটা।

আশেপাশে কয়েক একর জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে একের পর এক তাঁবু। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে শুরু করে স্থানীয় সাংবাদিকরা, কারা নেই সেখানে! শান্তি বজায় রাখার জন্য পাঠানো হয়েছে ন্যাশনাল গার্ডের একটা ইউনিটকে।

গত দুই সপ্তাহ জুড়ে দেশের আনাচকানাচ থেকে এসে জড়ো হয়েছে নেটিভ আমেরিকানদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থার লোকজন। কী আজব আজব নাম তাদের গ্রুপের- এন.এ.বি.ও, এ.ইউ.এন.ইউ, এন.এ.জি, এন.সি.এ.আই... তবে সংক্ষিপ্ত নাম যাই হোক, তাদের সবার কাজের ধারাই এক ও অভিন্ন। নেটিভ আমেরিকানদের অধিকার রক্ষা করা এবং এই আধুনিক যুগেও প্রাচীন সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা- এটাই তাদের মূলমন্ত্র।

ক্যাম্পের বাইরে সমতল জমিতে একটা হেলিপকপ্টার এসে ল্যান্ড করল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল সংবাদপত্রের কর্মীরা। হতাশায় মাথা নাড়লেন মার্গারেট। এই অনাকাঙ্ক্ষিত জনসমাগম ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুলছে।

ব্রিগহ্যাম ইয়ং ইউনিভার্সিটির নৃতত্ত্বে বিভাগের একজন প্রফেসর তিনি। এখানকার আবিষ্কার সম্পর্কে খতিয়ে দেখার জন্য তাকে আমন্ত্রণ দিয়ে এনেছে উটাহ ডিভিশনের ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার বিভাগ। বিগত ত্রিশ বছর ধরে নেটিভ আমেরিকানদের সম্পর্কে গবেষণা করছেন মার্গারেট, ইন্ডিয়ান অধিবাসীদের প্রায় প্রতিটা বিষয় নিজের হাতের তালুর মতোই বোঝেন। প্রায়ই স্থানীয় শোশোন ইন্ডিয়ান গোত্রের এক ইতিহাসবিদ, প্রফেসর হেনরি কানোশ-এর সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করেন তিনি।

আজও তার ব্যতিক্রম নয়।

গুহামুখে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন প্রফেসর হেনরি কানোশ ওরফে হ্যাঙ্ক। মার্গারেটের মতোই জিন্স, বুট আর খাকি শার্ট পরে আছেন তিনি। কাঁচাপাকা

চুলগুলো মাথার পেছনে ঝুটি করে বাঁধা। প্রায় ষাট বছর বয়স হলেও শরীরের বাঁধন এখনও মজবুত। ছয় ফুট চার ইঞ্চির দীর্ঘকায় শরীরটার জায়গায় জায়গায় দলা পাকিয়ে আছে পেশী। বাদামী চোখের মণি দুটো থেকে দ্যুতি ঠিকরে বেরোচ্ছে যেন।

হ্যাঙ্কের কুকুরটাও তার পাশেই বসা, নাম- কাউচ। মালিকের মতোই প্রাণীটার শরীরের কাঠামোও যথেষ্ট ভালো। কুকুরটার এক চোখের মণি নীল হলেও অন্যটা বাদামী।

"ওদিকের খবর কী?" কর্মদরনের পর কুশল বিনিময় সেরে জানতে চাইলেন হ্যাঙ্ক।

"খুব একটা সুবিধা না," জবাব দিলেন মার্গারেট। "আরও খারাপ হচ্ছে পরিস্থিতি।"

"কেন?"

"কাউন্টি শেরিফের সাথে কথা হয়েছে আমার। বুড়ো লোকটার টক্সিক রিপোর্ট পজিটিভ।"

দাঁতের ফাঁকে ধরে রাখা সিগারে চেপে বসলো হ্যাঙ্কের ঠোঁটজোড়া, ধূমপান না করলেও প্রায় সময় মুখে সিগার গুঁজে রাখতে পছন্দ করেন। ইন্ডিয়ান হলেও মরমন ধর্মের অনুসারী তিনি। যে কোনও ধরণের মাদক গ্রহণে নিরুৎসাহিত করা তার ধর্মেরই একটা অনুশাসন। "রিপোর্টে কি বলা হয়েছে?"

"দীর্ঘসময় ধরে মাদকাসক্ত ছিল লোকটা," জবাব দিলেন মার্গারেট।

মাথা নাড়লেন হ্যাঙ্ক। "চমৎকার। টিভি ক্যামেরাগুলোর জন্য ভালো খোরাক হবে খবরটাঃ আধাপাগল এক ইন্ডিয়ান মাতাল হয়ে খুন করেছে তার নাতিকে, আর তারপর নিজেও আত্মহত্যা করেছে।"

"আপাতত আসল খবরটা চেপে রাখতে পারলেও কতক্ষণ রাখা যাবে, তা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে জটিল হয়ে আসছে পরিস্থিতি।

খুন হওয়া ছেলেটার বন্ধু পালিয়ে গিয়ে স্থানীয় কাউন্টি বিভাগকে খবর দেয়। তারাই সর্বপ্রথম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। হেলিকপ্টারে করে সল্ট লেক সিটির মর্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মৃতদেহ দুটো। করোনারের রিপোর্টের বদৌলতে পরোক্ষভাবে মাদকদ্রব্যের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে হত্যাকান্ডগুলোর দায়ভার। অবশ্য পরবর্তীতে মমি হয়ে যাওয়া মৃতদেহ, পাথরের স্লেট আর খুলিটার কথাও ফাঁস করে দিয়েছে ছেলেটা। স্থানীয় আর জাতীয়, দুটো সংবাদ মাধ্যমেই খবরটা ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে।

তবে মার্গারেট জানেন, আসল ঘটনা সবেমাত্র শুরু। উটাহতে...যেখানে সাদা চামড়ার মানুষ আর ইন্ডিয়ানদের একসূত্রে গেঁথে রেখেছে রক্তাক্ত ইতিহাস, সেখানে এমন একটা ঘটনা ঘটার পর পরিস্থিতি আর যাই হোক, স্বাভাবিক হতে বিস্তর সময় লাগবে।

গুহার দিকে এগোনোর জন্য হাত তুলে ইশারা করলেন হ্যাঙ্ক। "সার্ভেয়াররা তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। দেখেছ ওটা?"

হাঁটার ফাঁকে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মার্গারেট।

"সার্ভেয়ারদের রিপোর্ট অনুযায়ী, গুহামুখটা সরকারি জমিতে থাকলেও গুহার অভ্যন্তরীণ এলাকা নেটিভ আমেরিকানদের সংরক্ষিত জমির নিচ দিয়ে বিস্তৃত।"

"আরও ঝামেলার ব্যাপার।"

মাথা নাড়লেন হ্যাঙ্ক। "আগের রেকর্ড দেখেছি আমি। ১৮৬১ সালে, উইনটাহ এবং ওরে ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন- এর আওতায় ছেড়ে দেয়া হয় জায়গাটুকু। পরে অবশ্য সংরক্ষিত এলাকা আর সরকারি জমির সীমারেখা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা দেখা যায়নি। তেমন কোনও ঝামেলাও হয়নি।"

"তার মানে, নেটিভ ইন্ডিয়ান মানবাধিকার সংস্থাগুলো যদি গুহার মালিকানা দাবী করে বসে, তাহলে তাদের যুক্তি হেলায় উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়।"

"তারা কাজটা করবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়," জবাব দিলেন হ্যাঙ্ক। "অবশ্য যদি মৃতদেহগুলো আসলেই ইন্ডিয়ান হয়ে থাকে আর কি, নইলে তো আর তাদের কথা ধোপে টিকবে না।"

সায় দিলেন মার্গারেট। মমিগুলোর আসল পরিচয় নিরূপণের জন্য মূলত এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনা হয়েছে তাকে। প্রাথমিক দেহ শনাক্তকরণ পরীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ করেছেন তিনি। গায়ের রঙ, চুলের রঙ, মুখের হাড়ের কাঠামো দেখে লাশগুলো ককেশিয়ান বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাদের গায়ে থাকা অলঙ্কার আর কাপড়গুলো স্পষ্টতই ইন্ডিয়ান। ডিএনএ অ্যানালাইসিস, কেমিকেল টেস্ট ইত্যাদির ফলাফল এখনও হাতে আসেনি। এই ভুঁইফোড় সংস্থাগুলোর হাঙ্গামার কারণে সেগুলো কবে আসবে তাও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। এমনকি এন.এ.জি.পি.আর.এ.(নেটিভ আমেরিকানস গ্রেভস প্রোটেকশন অ্যান্ড রিপ্যাট্রিয়েশন অ্যাক্ট) নামের এক সংস্থার আপত্তির মুখে মমিগুলো গুহা থেকে সরানোও যাচ্ছে না।

"আগেও উত্তর আমেরিকায় ককেশিয়ানদের দেহাবশেষ পাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এমন বিশৃঙ্খলতার কারণেই মৃতদেহগুলো নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করা যায়নি। নাহলে হয়তো অন্যভাবে লেখা হতো প্রাচীন আমেরিকার ইতিহাস।" মন্তব্য করলেন মার্গারেট।

"আশা করি এখানে আর কোনও হাঙ্গামা হবে না। আমরা সফলভাবে নিজেদের কাজ শেষ করতে পারব।" সায় দিলেন হ্যাঙ্ক।

উপত্যকার শেষমাথায় পৌঁছে গেছে তারা। একপাশে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে কাউচ। সালফারের ডিমপচা গন্ধে ছেয়ে আছে চারপাশ। আবহাওয়াও যথেষ্ট গরম, ঘামে ভিজে উঠেছে মার্গারেটের চেহারা। কটুগন্ধ আটকানোর জন্য হাত দিয়ে নাকমুখ চেপে ধরলেন তিনি।

আর একটু সামনেই মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে গুহাটা। দু'জন ন্যাশনাল গার্ড ডিউটি করছে গুহামুখে, দু'জনেই সশস্ত্র। হ্যাঙ্ক আর মার্গারেটকে দেখে এগিয়ে এল একজন, নেমপ্লেটে নাম লেখা- প্রাইভেট স্টিনসন।

মুচকি হেসে নড করলো সৈনিক। "মেজর রায়ান আপনাদের জন্যই ভেতরে অপেক্ষা করছেন। আপনাদের অনুপস্থিতিতে আর্টিফ্যাক্টটা নাড়াতে চাননি তিনি।"

"হুম," জবাব দিলেন হ্যাঙ্ক। "সেটা না করাতে ভালোই হয়েছে। এমনিই যা ঝামেলা এখানে।"

"আর ক্যামেরাও," যোগ করলেন মার্গারেট। "মিলিটারি ইউনিফর্ম পড়া কাউকে একা একা অমূল্য আর্টফ্যাক্টটা নাড়াচাড়া করতে দেখলে সংস্থাগুলোর লোকজন খুশি হতো বলে মনে হয় না।"

একপাশে সরে গিয়ে তাদেরকে সামনে এগোনোর ইঙ্গিত করল প্রাইভেট স্টিনসন।

কোমরে ধরে মার্গারেটকে টানেলের মেঝেতে নামিয়ে দিলেন হ্যাঙ্ক। আলোর স্বল্পতায়ও মার্গারেটের গালের ঈষৎ লালচে আভা টের পেলেন তিনি। বহুবছর আগের কিছু স্মৃতি এক মুহূর্তের জন্য তার মনেও দোলা দিয়ে গেল। অনেকগুলো রাত একত্রে কাটিয়েছেন তারা। তারপর অবশ্য সত্যিটা দু'জনই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। প্রেম-ভালোবাসা ব্যাপারটা আসলে তাদের সাথে ঠিক খাপ খায় না। সম্পর্কের বাঁধনে জড়ানোর চেয়ে বন্ধু হিসেবে থাকাটাই ভালো মনে করেছিলেন তারা।

মাথা থেকে চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেললেন হ্যাঙ্ক। হাত উঁচু করে কাউচকে বাইরে থাকার জন্য ইশারা করলেন। লেজ নেড়ে মালিকের কথা সায় দিল প্রাণীটা।

হাঁটতে হাঁটতে মমিভর্তি চেম্বারে পৌঁছে গেলেন তারা। ইলেক্ট্রিক ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে চারপাশ। ভূগর্ভস্থ-উষ্ণ পানির ঝর্ণার তাপ চমৎকারভাবে সংরক্ষণ করেছে লাশগুলো। লোকগুলো কেন এভাবে আত্মহত্যা করল, ভেবে আরও একবার বিস্মিত হলেন মার্গারেট। ঐতিহাসিক একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল তার। ইহুদী আর রোমানদের যুদ্ধ চলাকালীন, ইজরায়েলের এক পাহাড়চূড়ায় আশ্রয় নেয় ইহুদি বিদ্রোহীরা। রোমান বাহিনীর আগ্রাসন ঠেকাতে না পেরে অবরুদ্ধ সবাই নিজ হাতে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

এখানেও কী এমন কিছু হয়েছিল?

চোখের কোনা দিয়ে চেম্বারের একপ্রান্তে ছায়ার মতো কিছু একটা যেন নড়ে উঠতে দেখলেন মার্গারেট। চমকে উঠলেন তিনি।

"কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঙ্ক।

"মনে হলো যেন..."

ভেতরের চেম্বার থেকে ভেসে আসা মেজর রায়ানের চিৎকারে তার কথায় ছেদ পড়ল।

"...বেকুব কোথাকার..."

তড়িঘড়ি করে সামনে এগোতেই ফ্লাশলাইট হাতে চেম্বারের মুখে এসে দাঁড়ালেন মেজর রায়ান, চোখেমুখে রাজ্যের বিতৃষ্ণা। এসব ঐতিহাসিক কাজকারবার নিয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। নিজের ডিউটির বাইরে কিছু বুঝতে চানও না। এসব আজগুবি জিনিসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাঠানো হয়েছে তাকে। সেটা কোনওরকমে শেষ করে গুহা থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেই বাঁচেন তিনি।

"হ্যালো, প্রফেসর কানোশ। এসে পড়েছেন তাহলে।"

"হ্যালো, মেজর," মুচকি হেসে অভ্যর্থনার জবাব দিলেন হ্যাঙ্ক।

"চলুন কাজে নেমে পড়া যাক। আপনার কথামতো ক্রেট আনিয়ে রেখেছি। আমার দু'জন লোক আপনাদের সাহায্য করবে।"

টানেলের মুখে দাঁড়িয়ে উৎসুকভঙ্গিতে পেছনদিকে তাকালেন মার্গারেট। কী ছিল ওটা?

আলোছায়ার খেলা, কিছু দেখতে না পেয়ে নিজেকে নিজেই বোঝালেন তিনি।

"তবে একটা ঝামেলা হয়ে গেছে," বলে উঠলেন মেজর রায়ান।

"কী?"

"নিজেই দেখে নিন।"

হ্যাঙ্ক আর মেজরের পিছু নিয়ে ভেতরের চেম্বারের দিকে এগোলেন মার্গারেট।

আবার কী হলো?

সকাল ১১:৪০

ছায়ায় লুকিয়ে লোকগুলোকে ভেতরের চেম্বারের দিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল মেয়েটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার গলা বেয়ে। আরেকটু হলে ধরাই পড়ে যাচ্ছিল।

মনে দ্বিধা জমাট বাঁধছে নামের মেয়েটার।

কী করতে চলেছি আমি?

হৃৎপিণ্ড ক্রমাগত ধুকপুক করেই যাচ্ছে কাই নামের মেয়েটার। ইন্ডিয়ান ভাষায় নামটার মানে হলো 'উইলো গাছ'। বসে থাকতে থাকতে পিঠ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। শরীরের ভর এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপাল সে।

সূর্যোদয়ের পর থেকেই এখানে এভাবে অপেক্ষা করছে সে। সাথে অবশ্য আরও দু'জন ছিল। মাতালের অভিনয় করে গুহামুখে পাহারায় থাকা দুই গার্ডকে কিছুক্ষণ ব্যস্ত রাখে তারা। সেই সুযোগে ভেতরে ঢুকে পড়েছে কাই।

এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে বসে থাকা খুব একটা সহজ কাজ না। তবে আঠারো বছর বয়সী হালকা পাতলা গড়নের শরীরের পাশাপাশি ছায়ায় আত্মগোপন করে থাকার বিশেষ গুণ রয়েছে তার। ছোটবেলা থেকে শুরু করে বোস্টনে গুলি খেয়ে মারা যাবার আগ পর্যন্ত, ইন্ডিয়ান বাবার কাছে এসব ব্যাপারে দীক্ষা নিয়েছে সে।

পুরনো কথা মনে হতেই রাগের একটা হলকা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

বাবার মৃত্যুর বছরখানেক পর, ওয়াহইয়া নামে পরিচিত একটা নেটিভ আমেরিকান মানবাধিকার গ্রুপে যোগ দেয় সে। চেরোকি ভাষায় ওয়াহইয়া নামটার অর্থ 'নেকড়ে'। তাদের কাজের পদ্ধতিও নেকড়ের মতোই ক্ষিপ্র। সব সদস্যের বয়সই ত্রিশের নিচে।

গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা জন হকস-এর জ্বালাময়ী ভাষণের একাংশ মনে করল সেঃ কেন নিজেদের অধিকার ভুলে সরকারের অনুগ্রহের আশায় বসে থাকব আমরা? কেন অপেক্ষা করব সাহায্যের নামে দেয়া ভিক্ষার জন্য?

অভিনব প্রতিবাদমূলক কাজের মাধ্যমে ইতিমধ্যে নিজেদের নাম জাহির করতে শুরু করেছে ওয়াহইয়া। গতমাসেও ইন্ডিয়ান অধিকারের বিপক্ষে বিবৃতি দেয়া এক বিচারপতির বাড়ির দেয়াল হিজিবিজি রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে তারা।

তবে এই ব্যাপারটা আরও গুরুতর। জন হকস-এর মতে, এখনই সময়...লুকানো অবস্থা থেকে বের হয়ে গোটা নেটিভ ইন্ডিয়ান সংস্কৃতির হাল ধরার। সরকারকে নিজেদের অবস্থান জানান দেয়ার।

সেজন্যই আজ তার এখানে আসা।

নড়েচড়ে বসল কাই। ধৈর্য ধরে সিগন্যালের অপেক্ষা করতে হবে তাকে। মেঝেতে নামিয়ে রাখা ব্যাগে হাত বুলালো সে। ডেটোনেটর লাগানো সিফোর এক্সপ্লোসিভ চার্জে ব্যাগটা ভর্তি।

আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসছে অপেক্ষার প্রহর।

সকাল ১১:৪৬

"কী হয়েছে?" বদ্ধ চেম্বারে গমগম করে উঠল হ্যাঙ্কের গলা।

অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে তার কাঁধে হাত রাখলেন মার্গারেট। চেম্বারে ঢোকার সাথে সাথে সমস্যাটা তার চোখে পড়েছে।

চেম্বারের দেয়ালের সাথে লাগোয়া সারি সারি কতগুলো বর্গাকার পাথরের বাক্স। প্রত্যেকটার আকার দৈর্ঘ-প্রস্থে প্রায় এক ফুটের মতো। গতকাল এগুলোর একটা বাইরে থেকে পরীক্ষা করেছেন মার্গারেট। ভেতরে খুব সম্ভবত, হাড়গোড় জাতীয় কিছু হবে। তবে ওজনে বেশ ভারি। মমিগুলোর মতো এগুলোও গুহা থেকে বের করার অনুমতি আদায় করা যায়নি। প্রতিটা বাক্সের বাইরের দিকে জুনিপার গাছের বাকল দিয়ে মোড়ানো।

তবে গতকালের তুলনায় থেকে আজ পরিস্থিতি সামান্য বদলে গেছে।

সবার সামনে রাখা বাক্সটার পাথরের কাঠামোটা ভাঙা। বাকলের আবরণের জন্যই এখনও স্বস্থানে টিকে আছে ওটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেজর রায়ানের দিকে তাকালেন হ্যাঙ্ক। "আপনার তো জানার কথা, অনুমতি ছাড়া এগুলোতে হাত দেয়া নিষেধ ছিল। বুঝতে পারছেন, কী রকম হাঙ্গামা হবে ব্যাপারটা ঘিরে?"

"জানি," বিড়বিড় করে জবাব দিলেন মেজর। "এই গর্দভগুলোর একজন ক্রেটটা বয়ে আনার সময় হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ে যায়। তখনই ক্রেটের নিচে পড়ে ভেঙে যায় বাক্সটা।" বলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকদের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

লোক দু'জনের ঘুরে তাকালেন মার্গারেট। মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। দোষ স্বীকার করে নীরব হয়ে আছে।

"কী করা যায় এখন?" খাদে নেমে এসেছে মেজরের গলার স্বর।

জবাব না দিয়ে হাঁটু গেড়ে ভাঙ্গা বাক্সটার পাশে বসে পড়লেন মার্গারেট।

হ্যাঙ্কও তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। "কী আর করা যাবে? ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ রিপোর্ট করে তারপর..."

"দেখা যাক ভেতরে কী আছে," মার্গারেটের কথায় ছেদ পড়ল তার পরিকল্পনায়। "যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।"

"ম্যাগি!" বিস্মিতকণ্ঠে মার্গারেটের ডাকনাম ধরে সম্বোধন করে ফেললেন হ্যাঙ্ক।

আলতো হাতে বাকলের মোড়কের একপাশ সরিয়ে নিলেন মার্গারেট। কে জানে, কত শতাব্দী পর আলো প্রবেশ করল বাক্সটার ভেতর। বাকল খুলে ভাঙা পাথরের একটা টুকরো সরিয়ে নিলেন তিনি। ভেতরের জিনিসগুলো কোনও ধাতু বলে মনে হলো, কালের আঁচড়ে কালচে রঙ ধারণ করেছে।

ভালোভাবে দেখার জন্য আরেকটু ঝুঁকে বসলেন মার্গারেট।

খোদাই করা ওগুলো কী?

অদ্ভুত তো...

"কিছু লেখা আছে বলে মনে হচ্ছে," মন্তব্য করলেন হ্যাঙ্ক। খোদাইয়ের ব্যাপারটা তার চোখেও ধরা পড়েছে।

ধাতব পাতের এক কোণায় আঙুল দিয়ে ডলা দিলেন মার্গারেট। উপরের কালো স্তর উঠে গিয়ে ভেতরের চকচকে হলদেটে রঙ বেরিয়ে এল।

"সোনা!" অবাক কণ্ঠে বলে উঠলেন হ্যাঙ্ক।

অবাক হয়ে গেছেন মার্গারেটও। এক পলক হ্যাঙ্কের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে অন্য বাক্সগুলোর দিকে তাকালেন তিনি। বিস্ময়ের আতিসহ্যে মনে হলো যেন গলায় উঠে আটকে গেছে হৃৎপিণ্ড।

এতো সোনা!

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। "মেজর রায়ান," ঘোর কেটে গিয়ে কণ্ঠে ফিরে এসেছে কর্তৃত্ব। "ভালোভাবে পাহারা দিয়ে রাখুন জায়গাটা।"

"খুলিটা," বলে উঠলেন হ্যাঙ্ক।

চেম্বারের একেবারে মাঝখানে, গ্রানাইটের বেদির উপর রাখা সেবার টুথড টাইগার-এর খুলিটার দিকে তাকালেন মার্গারেট। রাখার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে, প্রাচীন জিনিসটার খুব কদর করত আত্মহত্যাকারী লোকগুলো। হতে পারে, সোনা গলিয়ে খুলির ভেতরদিকের গহ্বরটা ভরে দিয়েছিল তারা।

বেদিটার চারপাশে একপাক ঘুরে এলেন তিনি। কেন যেন মনে হতে লাগল, জিনিসটার সাথে কিছু একটা গোলমাল আছে। তবে বিস্তারিত পরীক্ষা করার মতো সময় নেই এখন।

"আপাতত খুলিটাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া যাক," বলে উঠলেন মেজর রায়ান। "বাক্সগুলোর ব্যাপারে না হয় পরে ভাবা যাবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। "এসো।"

তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল গার্ড দু'জন। চারজনে মিলে খুলিটা বেদি থেকে তুলে প্লাস্টিকের ক্রেটে নামিয়ে রাখল। মনে হলো যেন ভেতরে বালুর মতো খসখসে কিছু আছে, নড়েও উঠল জিনিসটা। প্রচুর ভারি। আগে থেকেই ক্রেটের ভেতর রাখা ফোমের প্যাডে আলতো করে ডুবে গেল মহামূল্যবান আর্টিফ্যাক্টটা।

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলেন হ্যাঙ্ক আর মার্গারেট। গুহার ভেতরের আবহাওয়া অনুযায়ী তারা ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই খুলিটাও উষ্ণ হবে। কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডা ওটা। উপরদিকের হাড়টা একবার স্পর্শ করেই হাত সরিয়ে নিলেন হ্যাঙ্ক।

"আমার লোকেরা খুলিটা বহন করে গুহা থেকে বাইরে বের করে দেবে। তারপর এটা নিয়ে কী করবেন না করবেন, তা আপনাদের মাথাব্যথা," কেউ কিছু বলার আগেই দুম করে ক্রেটের ঢাকনা নামিয়ে দিলেন মেজর রায়ান।

দুপুর ১২:১২

মমিগুলোর মাঝে মাথা নিচু করে বসে দলটাকে চেম্বারটা পেরিয়ে যেতে দেখল কাই। সবার আগে হাঁটছেন হ্যাটপরা এক মহিলা। দু'জন গার্ড একটা বড় আকারের প্লাস্টিকের ক্রেট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

খুলিটা, ভাবল সে।

খুলিটা গুহার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। অবশ্য এমনটাই বলা হয়েছিল তাকে। মনে হচ্ছে, প্ল্যান অনুযায়ীই ঘটছে সবকিছু। খুলিটা বাইরে নিয়ে যাওয়া হলেই গুহায় এক্সপ্লোসিভ চার্জ লাগিয়ে দেবে কাই। তারপর শুধু রাতের অপেক্ষা। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কোনওরকমে বাইরে বেরিয়ে গিয়েই...বুম।

গুহাটা ধ্বসে গেলে মৃতদেহগুলো এখানেই সবসময়ের জন্য বিশ্রাম নিতে পারবে। কেউ আর তাদের জ্বালাতন করতে আসবে না। গবেষণার নামে তাদের পূর্বপুরুষদের দেহাবশেষ নিয়ে ছেলেখেলা করার অধিকার সরকারের নেই।

সবার পেছনে হাঁটতে থাকা দীর্ঘকায় লোকটা- প্রফেসর হেনরি কানোশকে চিনতে পেরেছে কাই। অধিকাংশ ইন্ডিয়ানদের কাছেই তিনি অতি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। আধুনিক দুনিয়ায় ইন্ডিয়ানদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি। তবে এই ব্যাপারটার ক্ষেত্রে প্রফেসর কানোশও সরকারের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন, ভাবল সে।

টানেলের শেষমাথায় পৌঁছে দলের বাকিদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন প্রফেসর কানোশ। "ঘটনাটা সামলে ওঠার আগপর্যন্ত বাক্সে থাকা সোনাগুলোর ব্যাপারে চুপ থাকতে হবে সবাইকে। আমি চাই না, সোনার খবর শুনে এখানে হামলে পড়ুক ট্রেজার হান্টাররা।"

কথাটা শুনে কাই-এর কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল যেন।

সোনা?

ওয়াহইয়া-র রিপোর্ট অনুযায়ী, গুহাটাতে একমাত্র গুপ্তধন বলতে ছিল শুধু ওই খুলিটাই। ওটা উদ্ধার করে একটা নেটিভ আমেরিকান মিউজিয়ামে রাখার কথা। আর মমিগুলোর মতো খুলিটাকেও গুহার সাথে ধ্বসিয়ে দেয়া হলে এটা উদ্ধারের জন্য কেউ না কেউ আবার ফিরে আসত, আবারও জ্বালাতন করত ঘুমিয়ে থাকা ইন্ডিয়ানদের পূর্বপুরুষদের। সেজন্যেই মূলত জিনিসটা গুহা থেকে বের করে নেয়ার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করছে কাই।

কিন্তু এখানে আরও সোনা থাকলে তো তালগোল পেঁচিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা......

সত্যিটা জানতে হবে তাকে।

উঠে দাঁড়াল কাই। মমিগুলো পেরিয়ে হাঁটা শুরু করল ভেতরের চেম্বারের উদ্দেশ্যে। আসলেই যদি এখানে আরও সোনা থেকে থাকে, তবে নিশ্চয়ই ওগুলো পাহারা দেয়ার জন্য আবার ফিরে আসবে গার্ডরা। তাহলে তো কাই-এর পক্ষে আর পালানো সম্ভব হবে না। এক ব্যাগ ভর্তি সিফোর এক্সপ্লোসিভ নিয়ে এমন একটা জায়গায় ধরা পড়ার পরিণতি কী হতে পারে, ভেবে শিউরে উঠল সে।

ভেতরের চেম্বারে পৌঁছে ব্যাগ থেকে একটা ছোট পেনলাইট বের করে জ্বালাল কাই। প্রথমে তার চোখে শুধুমাত্র কিছু কালচে হয়ে যাওয়া পাথরের ক্রেট ছাড়া আর কিছু ধরা পড়ল না। তবে ভালোভাবে নজর দিতেই দেখতে পেল আসল জিনিসটা। মেঝেতে রাখা একটা ক্রেট অর্ধেকটা ফাঁক হয়ে আছে।

হাঁটু গেঁড়ে বসে ক্রেটটা পরীক্ষা করল সে। ভেতর থেকে আধা ইঞ্চির মতো মোটা কিছু ধাতব প্লেট উঁকি দিচ্ছে। একটার একদিকের কোনাটা একটু ঘসা। পেনলাইটের আলো পড়তেই ঝিলিক দিয়ে উঠল উজ্জ্বল সোনালী রঙ।

আঁতকে উঠল কাই।

কী করব এখন?

তার সাথে কোনও রেডিও নেই। ওয়াহইয়া-এ সাথে যোগাযোগেরও কোনও উপায় নেই। যা সিদ্ধান্ত নেয়ার, তা তাকে একাই নিতে হবে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে শ্বাস-প্রঃশ্বাস ভারী হয়ে এল তার।

পরবর্তী কয়েকটা মুহূর্ত বাক্সটার পাশে চুপ করে বসে রইল সে। বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে দমাদম। টানেলের দিকে এক পলক তাকিয়ে বাক্সটার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল কাই। তার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে।

উপরের আবরণ সরিয়ে ভেতর থেকে তিনটা সোনার প্লেট বের করে আনল সে। আস্তে করে প্লেটগুলো গুঁজে রাখল পরনের জ্যাকেটের ভেতর। ওয়াহইয়া-র এতোদিন ধরে করা প্ল্যান ভেস্তে গেছে। বিস্ফোরণ ঘটানোর চিন্তা বাদ দিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু জন হকস-এর কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হবে তাকে। সোনার প্লেটগুলো তার সিদ্ধান্তের পক্ষে সাক্ষী দেবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল কাই। যেভাবেই হোক এখান থেকে এখন বেরিয়ে যেতে হবে তাকে। জন হকস-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। একবার

গুহা থেকে বেরোতে পারলেই বনের ভেতর হারিয়ে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন কিছু না। নিজের হালকাপাতলা দেহ আর সুগঠিত পায়ের উপর পুরো ভরসা আছে তার। ক্ষিপ্ত হরিণীর মতোই দ্রুত ছুটতে পারে সে।

দুপুর ১২:২২

গুহামুখ থেকে কয়েক কদম সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মার্গারেট। এটুকু আসতে না আসতেই তাদের নাগাল পেয়ে গেছে বাইরে অপেক্ষারত লোকজন।

ক্রমাগত জ্বলে উঠছে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। কিছুটা সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন এই অঞ্চলের গভর্নর। সামনেই নির্বাচন। ইস্যুটাকে নিজের প্রচারণার অনুকূলে ব্যবহার করতে চাইছে লোকটা। এজন্যই ন্যাশনাল গার্ডরা সাংবাদিক আর ক্যামেরা ক্রু-দের আটকে রাখতে পারেনি, ভাবলেন মার্গারেট।

"আমাদের ঐতিহ্য চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন আপনারা," ভিড়ের মাঝে চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। ইতস্তত তাকিয়ে মন্তব্যকারীকে খুঁজে পেলেন তিনি। মুখ রং করা এক হিপ্পি ইন্ডিয়ান। মুখের সামনে উঁচিয়ে রেখেছে হাল আমলের আইফোন, ভিডিও করছে পুরো ঘটনা। কিছুক্ষণের মাঝেই হয়তো ইউটিউবে চলে যাবে এই ফুটেজ।

চুপ করে রইলেন মার্গারেট। জানেন, তার একটা উত্তেজিত জবাবই আগুনে আরও ঘি ঢেলে দেবে। হ্যাঙ্ক, মেজর আর বাকি গার্ডরা উত্তেজিত লোকজনদের আটকানোর চেষ্টা করে চলেছে।

"আপনারা যদি আর্টিফ্যাক্টটা দেখতে চান-" চেঁচিয়ে উঠল হ্যাঙ্ক, "-আমরা দেখাতে রাজি আছি। কিন্তু দেখানো শেষ হলেই ড. গ্রাহাম জিনিসটা স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়ামের বিজ্ঞানীদের কাছে হস্তান্তর করবেন।"

আরেকটা উত্তেজিত গলা শোনা গেল। "তাহলে ব্ল্যাক হক-এর দেহাবশেষের সাথে আপনারা যা করেছেন, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে আবারও।"

ঘটনাটা মনে করতে পারলেন মার্গারেট। ব্ল্যাক হক এক প্রখ্যাত উটে ইন্ডিয়ান নেতার সাংকেতিক নাম। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে সরকারি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে মারা যান তিনি। তারপর তার মৃতদেহ পালাক্রমে কয়েকটা জাদুঘরে দেখানো হয়। কিন্তু কয়েক বছর পর চুরি হয়ে যায় জিনিসটা। অবশ্য কিছুদিন পর মরমন চার্চের গুদামে আবিষ্কৃত হয় কঙ্কালটা। তারপর পূর্ণ মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

"আমাদের লুকানোর কিছু নেই," বলে উঠলেন মার্গারেট। সাথে সাথে সবগুলো ক্যামেরার লেন্স ঘুরে গেল তার দিকে। "বুঝতে পারছি, ব্যাপারটার সাথে আবেগের প্রশ্ন জড়িত। কিন্তু আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যথাযোগ্য মর্যাদার সাথেই করা হবে সবকিছু।"

"যথেষ্ট হয়েছে। এবার বকবক না করে খুলিটা দেখান আমাদের।"

কথাটা গুঞ্জন হিসেবে শুরু হলেও একটু পরই স্লোগানে পরিণত হলো।

চুপচাপ মজা লুটছেন গভর্নর। এই লোক সমাগমকে সার্কাসের সাথে তুলনা করা হলে তাকে এখানকার রিংমাস্টার বলা যায়, ভাবলেন মার্গারেট।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রেটের ঢাকনা খোলার দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি। কুয়াশা ঘন হয়ে বৃষ্টির ফোঁটার রূপ নিচ্ছে এখন। এক মুহূর্ত কসরত করার পর উপরের ঢাকনাটা তুলে ফেললেন তিনি। সাথে সাথে চুপ হয়ে গেল কোলাহলরত লোকজন।

"কাছে আসবেন না কেউ।"

এই আবহাওয়ায় মিনিটখানেকের বেশি জিনিসটা উন্মুক্ত ফেলে রাখা যাবে না। নিচু হয়ে খুলিটার দিকে তাকালেন মার্গারেট। ফোমের প্যাডিং-এর উপর বসে যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে জিনিসটা। কয়েক পা সরে গেলেন তিনি। উদ্দেশ্য- ক্যামেরাম্যানদের ছবি তোলার জন্য জায়গা করে দেয়া। কিন্তু কেন যেন খুলিটা থেকে তার চোখ সরতে চাইছে না। হাড়ের উপর দিকে কুয়াশার মিহি একটা স্তর ঘিরে রেখেছে জিনিসটাকে।

একটা বৃষ্টির ফোঁটা খুলিটার উপর পড়তে দেখলেন মার্গারেট। সাথে সাথে জমে বরফ হয়ে গেল ফোঁটাটা। একটু দুরে দাঁড়ানো ক্যামেরাম্যানরাও লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা। অবিশ্বাসী কণ্ঠে উহহ... আওয়াজ করে উঠল কেউ কেউ।

গুহামুখ থেকে বুটজুতোর শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকালেন মার্গারেট। জ্যাকেট আর কালো জিন্স পরা এক মেয়ে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। এক হাতে পরনের জ্যাকেট আঁকড়ে ধরে রেখেছে সে, কিন্তু তার কাপড়ের ভেতর থেকে কিছু একটা ছিটকে বেরিয়ে এল। পাথরে আছড়ে পড়ে ঠনাৎ আওয়াজ তুলল জিনিসটা।

পাথরের বাক্সে থাকা সেই সোনার প্লেটগুলোর একটা।

চিৎকার করে মেয়েটাকে থামতে আদেশ করলেন মেজর রায়ান।

সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা, বনের দিকে দৌড় দিতে উদ্যত হলো। কিন্তু ভেজা পাথরে পিছলে গেল তার জুতো। একহাতে পাথর আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করতে লাগল মেয়েটা। সেই সুযোগে কাঁধ থেকে ফিতা সরে গিয়ে খুলে গেল তার পিঠে থাকা ব্যাগপ্যাক। খুলে রাখা ক্রেটের সামনে গড়িয়ে এসে থামল ওটা।

ততোক্ষণে সামলে নিয়েছে মেয়েটা। ছুট লাগিয়ে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আঁতকে উঠলেন মার্গারেট। খুলিটা রক্ষা করার জন্য ক্রেটের সামনে পৌছে গেলেন তিনি। এই অল্প সময়ে আরও কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছে খুলিটার গায়ে, জমে বরফ হয়ে আটকে আছে সেগুলো।

বোকার মতো একটা ফোঁটা স্পর্শ করলেন মার্গারেট। সাথে সাথে জ্বলে উঠল আঙুলটা। বৈদ্যুতিক শকের মতো তীব্র একটা ধাক্কা অনুভব করলেন তিনি। কিন্তু ধাক্কা খেয়ে সরে যাওয়ার বদলে হাড়ের গায়ে সেঁটে গেল পুরো হাতের তালু। ব্যাথায় মনে হলো যেন গোটা শরীরের মাংস হাড় থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঙ্ককে চেঁচিয়ে উঠতে শুনলেন তিনি।

কী একটা বলে চিৎকার করে উঠলেন মেজর রায়ানও।

সাথে সাথে তীব্র আলোর একটা ঝলকানি এসে সকল জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল ড. মার্গারেট গ্রাহামকে।

দুপুর ১২:৩৪

আলোর ঝলকটা চোখে আঘাত হানতেই সাময়িক অন্ধ হয়ে গেলেন হ্যাঙ্ক। মার্গারেটের নাম ধরে ডেকে ওঠার এক মুহূর্ত পরই ক্রেটের ভেতর থেকে আবির্ভূত হয় আলোর গোলকটা। শকওয়েভের ধকল সামলাতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। পরক্ষনেই মনে হতে লাগল, অদৃশ্য একটা টান যেন তাকে আকর্ষন করছে বিস্ফোরণটার দিকে।

মাটি খামচে ধরলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড পরই অতিপ্রাকৃত আকর্ষণটা মিলিয়ে গেল।

উঠে দাঁড়ালেন হ্যাঙ্ক। মাথার ভেতর ভোঁভোঁ আওয়াজ হচ্ছে। কান দিয়ে কোনও শব্দ ঢুকছে না। চোখে মৃদু ডলা দিয়ে ম্যাগি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেদিকে তাকালেন তিনি।

মার্গারেট, খুলি বহনকারী ক্রেট, গুহামুখসহ উপত্যকার একপাশ...কোনওকিছুরই অস্তিত্ব নেই। শুধুমাত্র কালো হয়ে যাওয়া পাথর দেখা যাচ্ছে সেখানে, মৃদু ধোঁয়া উঠছে সেখান থেকে। কোনও জাদুমন্ত্রবলে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সব।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে আবারও কাজে নেমে পড়েছে সাংবাদিকরা। হুড়োহুড়ি করে কাছাকাছি উঁচু জায়গায় অবস্থান নিচ্ছে সবাই। উপত্যাকার দৃশ্যটা ধারণ করতে চাইছে ক্যামেরায়। একপাশে গভর্নরকে ঘিরে রেখেছে কয়েকজন ন্যাশনাল গার্ড।

গুহা থেকে বেরিয়ে আসা মেয়েটার কথা মনে পড়ল হ্যাঙ্কের। পিছলে পড়ে যাওয়ার সময় কাঁধ থেকে তার ব্যাগটা ছিটকে গিয়েছিল। চেইন খুলে গড়িয়ে পড়েছিল ভেতরে থাকা তারের সাথে আটকানো কাদামাটির মতো দেখতে জিনিসগুলো।

সাথে সাথে বিপদ টের পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন মেজর রায়ান।

বোমা...

কিন্তু সেই সতর্কবার্তা মার্গারেটের কোনও কাজেই আসেনি।

রাগ দলা পাকিয়ে উঠল হ্যাঙ্কের বুকে। মেয়েটার চেহারা কল্পনা করলেন তিনি। তামাটে গায়ের রঙ, বাদামী চোখ আর কালো চুলে তাকে সহজেই স্থানীয় ইন্ডিয়ান বলে চেনা যায়। আপাতত ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে বিস্ফোরণস্থলের দিকে এগোলেন তিনি। মাথার হেলমেটটা যথাস্থানে বসাতে বসাতে মেজর রায়ানও যোগ দিল তার সাথে।

"আগে কখনোই এরকম কিছু চোখে পড়েনি," মন্তব্য করলেন মেজর। "বিস্ফোরণটার শক্তি অনুযায়ী আমরাসহ গোটা এলাকা উড়ে যাওয়ার কথা। উত্তাপের কথা তো বাদই দিলাম।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল যেন জ্বলন্ত চুল্লির ভেতর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।

হঠাৎ বিস্ফোরণস্থলের পাশের একটা বড় পাথর আপনাআপনিই ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। যেন ওটা গ্রানাইট না, ভঙ্গুর কোনও স্যান্ডস্টোন।

"পাথরটা দেখুন," বলে উঠলেন মেজর।

চোখে সামনে ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে যেতে লাগল পাথরটা। ভাঙতে ভাঙতে বালির মতো সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হলো ওটা।

অবাক হয়ে গেলেন দু'জনেই। হাঁটু গেঁড়ে বসে বিস্ফোরণস্থলের দিকে ভালোভাবে তাকালেন হ্যাঙ্ক। সারফেসটা আর সমতল নেই। বালির মতো দানাদার রূপ ধারণ করেছে গোটা জায়গার পাথর। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, স্থির হয়ে নেই সেটা। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

আঁতকে উঠলেন হ্যাঙ্ক। "ছড়িয়ে পড়ছে এটা!"

"কী যা তা বলছেন?" মেজর রায়ানের গলায় অবিশ্বাসের সুর।

"কিছু একটা এখনও সক্রিয় আছে। আশেপাশের পাথরকে ধুলিকণায় পরিণত করছে জিনিসটা।"

"পাগল হয়ে গেলেন নাকি? এমন কিছু..."

বিস্ফোরণস্থলের মাঝখান থেকে হিসহিস শব্দে পানির একটা ফোয়ারা বইতে শুরু করায় চুপ হয়ে গেলেন মেজর। কয়েক ফুট উঁচু, সরু পানির স্তম্ভের সাথে গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল ধোঁয়া। সালফারের কটুগন্ধে ভরে গেল চারপাশ। ধোঁয়া গায়ে লাগতেই হ্যাঙ্কের চামড়া জ্বলতে শুরু করল।

"নিশ্চয়ই উপত্যকার নিচ দিয়ে বইতে থাকা ভূগর্ভস্থ ঝর্ণাটায় ছিদ্র হয়ে গেছে," মন্তব্য করলেন তিনি।

"মানে?" মেজর রায়ান প্রফেসরের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না।

"এখানে যা ই ঘটছে সেটা শুধু চারপাশেই না-" বলে ফোয়ারাটার দিকে ইঙ্গিত করলেন হ্যাঙ্ক।

"বরং সমানতালে নিচের দিকেও ছড়িয়ে যাচ্ছে।"

অধ্যায় ৩
৩০ মে, বিকেল ৩:৩৯
ওয়াশিংটন ডি.সি.

উটাহ-তে বোমা বিস্ফোরণের পর মাত্র একঘন্টা পার হয়েছে। তবে পেইন্টার ক্রো জানেন, আজ সারারাত অফিসেই কাটাতে হবে তাকে। কিছুক্ষণ পরপর আপডেট এলেও, দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় খবরগুলো ধোঁয়াশায় ভরা। সিগমাসহ ওয়াশিংটনের সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোকে আদেশ করামাত্র অ্যাকশনে নামার জন্য তৈরি থাকতে বলা হয়েছে।

সিগমা- পেইন্টারের দলের নাম। ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি, সংক্ষেপে ডারপা-র একটা অঙ্গ সংগঠন এটা। সাবেক স্পেশাল ফোর্সের লোকদের নিয়ে গঠিত এই সংস্থার অপারেটররা ফিল্ড ওয়ার্কের পাশাপাশি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডেও দক্ষ। বৈশ্বিক ঝুঁকির ব্যাপারগুলো একসাথে মোকাবেলা করে তারা।

অবশ্য উটাহ-এর বিস্ফোরণটা ঠিক সিগমার কাজের আওতায় পড়ে না, কিন্তু ডারপা-র বর্তমান প্রধান, জেনারেল গ্রেগরি মেটকাফ- এর হস্তক্ষেপেই কাজে নামতে হয়েছে পেইন্টারকে। পাশাপাশি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, যিনি রাশিয়ার একটা ঘটনায় নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সিগমার কাছ কৃতজ্ঞ, তিনিও ব্যক্তিগতভাবে পেইন্টারকে অনুরোধ করেছেন ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য।

আর প্রেসিডেন্ট জেমস টি. গ্যান্ট-এর অনুরোধ উপেক্ষা করবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন সাহস কার আছে...

তাই গার্লফ্রেন্ডের সাথে বারবিকিউ ডিনারের প্ল্যান বাতিল করে কাজে নেমেছেন ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো।

দেয়ালে আটকানো তিনটা বিশালাকৃতি মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। বিস্ফোরণস্থলের বিভিন্ন ফুটেজ দেখাচ্ছে স্ক্রিনগুলোতে। সবগুলোর ভেতর সিএনএন-এর ফুটেজগুলোই সবচেয়ে

উন্নতমানের।

এই নিয়ে প্রায় একশোবারের মতো সেই বিশেষ ফুটেজটা দেখে ফেলেছেন ডিরেক্টর। জিনিসপত্র বহনে কাজে লাগে এমন সবুজ রঙের একটা মিলিটারি ক্রেটের উপর ঝুঁকে আছেন সেই বিজ্ঞানী ভদ্রমহিলা- ড. মার্গারেট গ্রান্থাম। ক্রেটের ঢাকনা খুলে ভেতরে থাকা জিনিসটা উন্মুক্ত করে দিলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড পর, তার পেছনদিক থেকে দৌড়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এল একটা চিকন অবয়ব। কোনওরকমে

পিছলে পড়ে যাওয়া সামলে ছুটে বনের দিকে হারিয়ে গেল সেই আকৃতিটা। আর তারপরই আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারপাশ।

রিমোটের বাটন চেপে দৃশ্যটা থামিয়ে দিলেন তিনি। আলোর গোলকের ভেতর থেকে আবছাভাবে বোঝা যাচ্ছে মহিলার শরীরের কাঠামো।

আস্তে আস্তে একেকবারে এক ফ্রেম করে সামনে বাড়তে লাগলেন পেইন্টার। আলোর ঝলকানি বাড়তে বাড়তে আচমকা হারিয়ে গেল শরীরটা। তারপর নড়ে উঠেছে ক্যামেরার ফ্রেম। সম্ভবত, বিস্ফোরণের পর দৌড় শুরু করেছিল ক্যামেরা ম্যান, ভাবলেন পেইন্টার। একের পর এক দৃশ্য ভেসে উঠছে স্ক্রিনে- গাছপালা, আকাশ, দৌড়াতে থাকা লোকজন...কয়েক মুহূর্ত পর আবারও স্থির হয়ে এল ক্যামেরাটা। বিস্ফোরণের পরের ঘটনাস্থল ভেসে উঠল স্ক্রিনে। গোটা এলাকাটা হালকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। চেঁচামেচি করছে লোকজন। কয়েকজন অতি উৎসাহী লোক এগিয়ে যাচ্ছে বিস্ফোরণস্থলের কেন্দ্রের দিকে। তারপর হঠাৎ হিসহিস শব্দে একটা ফোয়ারা বেরিয়ে এল পাথর ভেদ করে।

সিগমার ভূতত্ত্ববিদের কাছ থেকে প্রাথমিক রিপোর্ট এসে পৌঁছেছে। ফোয়ারটাকে ভূগর্ভস্থ ঝর্ণা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। তবে বিস্তারিত পরিদর্শন ছাড়া আর কিছু বলা সম্ভব না তার পক্ষে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন পেইন্টারও।

ফোয়ারাটাকে নিয়ে মাতামাতির পাশাপাশি গুহা থেকে বেরিয়ে আসা সেই মানুষটার সম্পর্কেও অনুসন্ধান চালাচ্ছে ন্যাশনাল গার্ড। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী, হামলাকারী যুবতী একটা মেয়ে। তার সাথে ব্যাগভর্তি ডেটোনেটর লাগানো সিফোর এক্সপ্লোসিভ ছিল। ব্যাগটা তার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার পরপরই দৌড়ে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায় সে।

ন্যাশনাল গার্ডের পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ বিভাগ আর সল্ট লেক সিটির এফবিআই ডিপার্টমেন্টও মেয়েটার খোঁজে পুরো এলাকা চষে ফেলছে। কিন্তু ওরকম পাহাড়ি বনভূমিতে কাউকে খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজার সমতুল্য।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে জানা গেছে মেয়েটা ইন্ডিয়ান। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাপারটা রাজনৈতিকভাবে আরও ঝামেলার সৃষ্টি করবে।

পেইন্টার নিজেও আধা ইন্ডিয়ান। শারীরিকভাবে পিকট ইন্ডিয়ান বাবার দৈহিক আদল পেলেও নীল চোখ আর উজ্জ্বল গায়ের রঙ এসেছে ইটালিয়ান মায়ের দিক থেকে। প্রশস্ত চোয়াল, ঘন কালো চুলে ইন্ডিয়ান ছাপ সুস্পষ্ট। বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেন আরও প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে বৈশিষ্টগুলো। পাশাপাশি গত কয়েক মাস ধরে সিগমাকে নিয়ে মেতে থাকায় চুল কাটানোর সময়টাও বের করতে পারেননি পেইন্টার।

ন্যাশনাল মলের স্মিথসোনিয়ান ক্যাসেলের মাটির নিচে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের এক ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে গড়ে তোলা হয়েছে সিগমার এই কমান্ড সেন্টার। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ স্মিথসোনিয়ান রিসার্চ ফ্যাসিলিটিগুলোর কাছাকাছি থাকার জন্যই এই জায়গাটা বেছে নেয়া হয়েছে। এখানেই দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে

পেইন্টারের। দেয়ালে লাগানো মনিটর তিনটাই বাইরের দুনিয়ায় তার চোখ হিসেবে কাজ করে।

পেছন ফিরে ডেস্কে বসে পড়লেন তিনি। ইন্ডিয়ান মেয়েটার এমন একটা কাজ নিঃসন্দেহে স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। পৈতৃক সম্পর্কের আত্মীয়দের কথা মনে পড়ল তার। বাবার মৃত্যুর পর তাদের সাথে তেমনভাবে যোগাযোগ না রাখলেও রক্তের টান তো আর অগ্রাহ্য করা যায় না।

অফিসের দরজায় টোকা পড়ার শব্দে সম্বিত ফিরল পেইন্টারের। সিগমার ভূতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ, রোনাল্ড শিন-কে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তিনি। ঝাড়া ছয়ফুট লম্বা অল্পবয়সী লোকটার মাথা পুরোপুরি ন্যাড়া। ধূসর একটা জাম্পসুট পড়ে আছে সে। আধখোলা জিপারের ফাঁক দিয়ে ভেতরের আর্মি রেঞ্জার টি শার্ট দেখা যাচ্ছে।

"ডিরেক্টর, আপনার এটা দেখা উচিত।"

"কী?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

কয়েকটা রিপোর্ট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম, আর তখনই ব্যাপারটা চোখে পড়ে আমার," বলে ডেস্কের উপর একটা ফাইল নামিয়ে রাখল সে। "ঘটনাস্থলে উপস্থিত অ্যাশলে রায়ান নামের ন্যাশনাল গার্ডের এক মেজরের বিবৃতি এটা। ইন্ডিয়ান মেয়েটার দৈহিক বিবরণসহ একেবার শুরু থেকে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে সে। কিন্তু বিস্ফোরণস্থল সম্পর্কে বিশেষ কিছু কথা বলেছে লোকটা।"

ফাইলটা হাতে তুলে নিলেন পেইন্টার।

"আঠারো নাম্বার পৃষ্ঠায় লাইনটা দাগিয়ে রেখেছি আমি।"

নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাটা খুলে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন ডিরেক্টর। অল্প কিছু কথা, কিন্তু সর্বশেষ লাইনটা পড়ে গা শিউরে উঠল তার।

"মনে হচ্ছে যেন আস্তে আস্তে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে বিস্ফোরণস্থলের পাথরের মেঝে।"

ডেস্কের উপর দু'হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিন। "শুরু থেকেই কিছু একটা গন্ডগোল আছে বলে মনে হচ্ছিল আমার। তাই সিগমার বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনিও আমার সাথে একমত হয়েছেন। বিস্ফোরণটার বিস্তৃতি, পাহাড়ের গভীরের ভূগর্ভস্থ ঝর্ণায় আঘাত করার সাথে ঠিক মিলছে না। ঝর্ণাটাকে মাটির উপরে নিয়ে আসার জন্য কোনও বিস্ফোরণকে এর চেয়েও কমপক্ষে দশগুণ শক্তিশালী হতে হবে।"

দরজার পেছন থেকে আরেকটা কণ্ঠ ভেসে এল। "কথা সত্যি।"

সাথে সাথে দরজার দিকে তাকালেন পেইন্টার আর শিন দু'জনেই। উপস্থিত হয়েছে সিগমার নতুন বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞ। দরজার ফ্রেমটা খানিকটা নিচু হয়ে গেছে তার পক্ষে। মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকতে হলো তাকে। শিনের ছুয়ফুটি শরীরের থেকেও ইঞ্চিছয়েক লম্বা সে, পেশীবহুল শরীরটার ওজনও চল্লিশ পাউন্ড বেশি। মাথার কালো চুলগুলো জেল দিয়ে স্পাইক করা। শিনের মতোই ধূসর জাম্পসুট পরে আছে লোকটা।

ডানহাতে কাদার মতো দেখতে একদলা মেটে রঙের জিনিস ধরে আছে সে।

তার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন পেইন্টার। " কোয়ালস্কি, তোমার হাতে ওটা কী? সিফোর এক্সপ্লোসিভ বলেই তো মনে হচ্ছে।"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শ্রাগ করল জো কোয়ালস্কি। "হ্যাঁ। একটা পরীক্ষা করার কথা ভাবছিলাম..."

আতঙ্ক দলা পাকিয়ে উঠল পেইন্টারের পেটে। নেভির এই লোকটাকে কয়েক বছর আগে ধার করেছিল সিগমা। তবে সেই থেকেই দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বাকিদের সাথে একেবারে মিশে গেছে সে। পাশাপাশি তার বোকা বোকা চেহারা এবং কাজের পেছনে লুকিয়ে থাকা ক্ষুরধার বুদ্ধির ভূমিকা চিনতে ভুল করেননি পেইন্টার। তাই কোয়ালস্কিকে আবার নেভিতে ফিরিয়ে দেয়ার বদলে একটা পদ দিয়ে সিগমাতেই রেখে দেয়ার লোভ সামলাতে পারেননি তিনি। আর বিশালদেহী লোকটার সাথে একটা পদই খাপে খাপ মিলে যায়- বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ।

"এই মুহূর্তে বিপজ্জনক জিনিসটা নিয়ে কোনও পরীক্ষানিরীক্ষার দরকার দেখছি না আমি," বলে হাতের ফাইলটা ডেস্কে নামিয়ে রাখলেন ডিরেক্টর। "পড়েছ এটা?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার মতামত কী?"

"অবশ্যই ওটা সিফোর-এর বিস্ফোরণ না," বলে হাতে থাকা কাদার দলার মতো জিনিসটায় আলতো মোচড় দিল সে। "অন্য কিছু।"

"কী হতে পারে?"

"বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শন করা ছাড়া তো সেটা বলা সম্ভব না।"

"ঠিক আছে। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানে এমন একজন আছে," বলে চেয়ারে হেলান দিলেন পেইন্টার। স্ক্রিনে তখনও হামলাকারী মেয়েটার ছবি ভেসে আছে। "ওকে খুঁজে বের করব আমরা।"

দুপুর ২:২২

উটাহ পার্বত্য বনভূমি

পাহাড়ি একটা ঝর্ণার পাশে বসে হাঁপাচ্ছে কাই। উবু হয়ে আঁজলা ভরে পানি তুলে মুখ দিল সে। পানিতে থাকা জীবাণু কিংবা স্বাদের কথা ভাবার সময় নেই এখন। কয়েক ঢোক পান করার পর ঠান্ডাপানিতে হাতমুখ ভালো করে ধুয়ে নিল সে।

এখনও চোখ বন্ধ করলে বিস্ফোরণটা দেখতে পায় কাই। মাথা ক্রমাগত ভোঁভোঁ করেই চলেছে।

কেন যে পড়তে দিলাম ব্যাগটাকে!

কিন্তু জন হকস তো বলেছিলেন, বিস্ফোরকগুলো যথেষ্ট নিরাপদ। এমনকি ওয়াহইয়া-র কমান্ড সেন্টার থেকে অ্যাক্টিভেট করার আগে গুলি করলেও ফাটবে না ওগুলো। তাহলে কি ওর পালানোর খবর পেয়ে গিয়েছিল কেউ? সে ই খবর দিয়েছে

হাই কমান্ডে? তারপরই কি বোমাগুলো অ্যাক্টিভেট করে দিয়েছে ওয়াহইয়া-র লোকজন?

কিন্তু কারও ক্ষতি করা তো ওয়াহইয়া-র উদ্দেশ্য নয়।

আর কিছু ভাবতে পারছে না কাই। গত দু'ঘন্টা একটানা ছুটে চলেছে সে। উপত্যকার শেষমাথায় অবশ্য একটা হেলিকপ্টার দেখা গিয়েছিল, কিন্তু মার্কিং দেখে ওটাকে সাংবাদিকদের হেলিকপ্টার বলেই মনে হয়েছে।

কাই জানে, অবশ্যই কেউ না কেউ তার পেছনে লেগেছে। দিনের আলো বাকি থাকতে থাকতে ধাওয়াকারীদের মাঝে দূরত্ব আরও বাড়িয়ে নিতে হবে। ক্যামেরার ফ্লাশগুলোর কথা মনে পড়ল কাই-এর। এদের মধ্যে কেউ না কেউ তার ছবিও তুলেছে অবশ্যই।

ধরা পড়ার আগে একটা জিনিস খুবই দরকার তার।

সাহায্য।

কিন্তু এই মুহূর্তে কাকে বিশ্বাস করবে সে?

বিকেল ৪:৩৫

ওয়াশিংটন ডি.সি.

"ডিরেক্টর, অবশেষে কিছু একটা ধরতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে।" ক্যাটের কথায় তার দিকে ফিরে তাকালেন পেইন্টার।

সিগমার স্যাটেলাইট রুমে বসে আছেন তারা। সারি সারি মনিটর আর যন্ত্রপাতির ভিড়ে গোটা জায়গাটাকে সাবমেরিনের কন্ট্রোলরুম বলে ভ্রম হয়।

একটা কীবোর্ডে নেচে বেড়াচ্ছে সিগমার প্রধান ইন্টেলিজেন্স এক্সপার্ট, ক্যাপ্টেন ক্যাথরিন ব্র্যায়ান্টের আঙুলগুলো। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর চরম বিপজ্জনক অবস্থাতেও মাথা ঠান্ডা রাখার ক্ষমতাই মেয়েটাকে সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে নির্বাচিত করেছে।

কাজের ফাঁকে এক হাতে পেটে আলতো করে হাত বুলাল মেয়েটা। গর্ভধারণের অষ্টম মাসে এসেও মাতৃত্বকালীন ছুটি নেয়নি ক্যাট। এই অবস্থায় শুধু ক্যাজুয়াল ড্রেসের বদলে ঢোলা জ্যাকেট পড়ার সুবিধাটুকু নিয়েছে সে।

"বসে কাজ করছ না কেন তুমি?" জানতে চাইলেন পেইন্টার।

"সারাদিন তো বসেই থাকি। কতক্ষণ যাবত বাচ্চাটা যেন পেটের ভেতর নাচানাচি করছে। এখন আর বসে থাকার জো নেই।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পেইন্টার। "ঠিক আছে। কী পেলে দেখাও।"

"ভিডিও ফুটেজগুলো ঘেঁটে ইন্ডিয়ান মেয়েটার অপেক্ষাকৃত ভালো একটা ছবি পেয়েছি আমি," বলে কীবোর্ডের নির্দিষ্ট একটা বাটন টিপে দিল ক্যাট। স্ক্রিনজুড়ে আবছা একটা ছবি ফুটে উঠল।

"আগেরগুলো থেকে বেশ ভালো। তবে তাও ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না।" মুখে কথাগুলো বললেও ভেতরে ভেতরে অজানা এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছে পেইন্টারের বুক।

"রেজুলেশন ভালো না। ঠিক করতে একটু সময় লাগবে," বলে আবারও কীবোর্ড নিয়ে কাজে নেমে পড়ল ক্যাট।

আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল মেয়েটার মুখাবয়ব। ভীত কালো চোখ, একে অন্যের উপর চেপে বসা ঠোঁটজোড়া, উজ্জ্বল লালচে চুলে ইন্ডিয়ান ছাপ সুস্পষ্ট। পুরো ছবিটা স্ক্রিনে ফুটে উঠতেই টেবিলে আলতো চাপড় বসালো ক্যাট, চোখেমুখে তৃপ্তির ছাপ।

"এবার এই সুন্দর মুখটার নাম খুঁজে পেতে খুব একটা সময় লাগবে বলে মনে হয় না। কেউ না কেউ তো ওকে চিনবে অবশ্যই।"

তবে কথাগুলো পেইন্টারের কানে ঢুকেছে বলে মনে হলো নয়া। বিস্ফোরিত চোখে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। এক মুহূর্ত পর ক্যাটের চোখে ধরা পড়ল ব্যাপারটা। "ডিরেক্টর, কী হয়েছে?"

জবাব দেয়ার আগেই পেইন্টারের পকেটে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রাখা এনক্রিপ্টেড ব্ল্যাকবেরি ফোনটা বেজে উঠল। স্ক্রিনের দিকে না তাকিয়েই কলটা রিসিভ করলেন তিনি।

সম্ভবত লিসা ফোন করেছে।

কিন্তু না, লিসা না এটা। হড়বড় করে উত্তেজিত কণ্ঠে কথা ভেসে আসতে লাগল ওপাশ থেকে।

"আঙ্কেল ক্রো...আপনার সাহায্য লাগবে আমার।"

কণ্ঠটা শুনে পেইন্টারের শিরদাঁড়া বেয়ে যেন ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল।

"খুব বড় বিপদে পড়ে গেছি আমি, আঙ্কেল। বুঝতে পারছি না কী করব..."

কথা শেষ না করেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল অন্যপ্রান্তে থাকা কণ্ঠের মালিক। পাশ থেকে কোনও প্রাণীর গর্জনের আওয়াজ ভেসে এল।

ফোনের গায়ে আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল পেইন্টারের আঙুলগুলো। "কাই!"

কেটে গেল কলটা।

অধ্যায় ৪
৩০ মে, দুপুর ২:৫০
উটাহ পার্বত্য বনভূমি

কুকুরটাকে দেখে সভয়ে পিছিয়ে গেল কাই।

কাদা লেপ্টে আছে কুকুরটার গায়ে। হিংস্র ভঙ্গিতে গরগর করছে প্রাণীটা, ঠোঁট ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে দাঁতের সারি। কামড় দেয়ার জন্য প্রস্তুত...

পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ, "কাউচ! থামো"

কণ্ঠটা শুনে সেদিকে ফিরে তাকাল কাই। কালো একটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে লম্বা, ঋজু একটা অবয়ব। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা, কুকুরটার তুলনায় অনেক শান্ত ওটা।

দৌড় দেয়ার জন্য মনে মনে নিজেকে তৈরি করে নিল কাই; লোকটা নিশ্চয়ই একজন ফেডারেল মার্শাল হবে। বুকে ঝোলানো একটা ব্যাজও নজরে এল কাইয়ের। তবে ঘোড়াটা আরেকটু এগিয়ে আসায়-দেখা গেল, ওটা কোনও মার্শালের ব্যাজ না, একটা নিরীহদর্শন কম্পাস।

"খুব দৌড় করিয়েছ, ইয়াং লেডি," রুক্ষস্বরে বলে উঠল আগন্তুক। চওড়া ব্রিমের হ্যাটের ছায়ায় ঢাকা পড়েছে লোকটার মুখের উপরের অংশ। "কিন্তু কাউচ ধরতে পারবে না, এমন কোনও ট্রেইল থাকতেই পারে না।"

আবারও মৃদু গর্জন করে উঠল কুকুরটা। সতর্ক চোখদুটো কাইয়ের উপর নিবদ্ধ।

ঘোড়া থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়াল আগন্তুক, কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে লাগল প্রাণীটাকে। "কিছু মনে করো না। বিস্ফোরণের পর থেকে মেজাজটা একটু চড়ে আছে কাউচের।"

লোকটার দাম্ভিক কথাবার্তায় অবাক হলো কাই। এটুকু অন্তত নিশ্চিত হওয়া গেছে, লোকটা ফেডারেল মার্শাল বা ন্যাশনাল গার্ডের কেউ না। তাহলে কে এই আগন্তুক? বাউন্টি হান্টার? লোকটার কোমরের ডানপাশে হোলস্টারে একটা পিস্তল ঝুলছে। এটা কি কাইয়ের জন্য আনা? নাকি বনে ঘুরে বেড়ানো ভালুক আর চিতাবাঘ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে?

কাই-কে প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে সাহায্য করার জন্যই হয়তো অবশেষে মাথার হ্যাটটা খুলে ফেলল লোকটা। এতোক্ষণ হ্যাটের ছায়ায় লুকিয়ে থাকা চেহারাটা দেখে হঠাৎ দম আটকে এল কাইয়ের। সেই নেটিভ আমেরিকান মুখায়বয়ব, সেই ঝুটি করে রাখা চুল...মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই গুহার ভেতর চেহারাটা দেখেছিল সে।

“প্রফেসর কানোশ...” নিজের অজান্তেই আগন্তুকের নামটা উচ্চারন করে ফেলল কাই, কণ্ঠস্বরে রাগের পাশাপাশি উত্তেজনার ছাপ।

মেয়েটার মুখে নিজের নাম শুনে মুচকি হাসি খেলে গেল হ্যাঙ্কের মুখে। হ্যান্ডশেকের উদ্দেশ্যে এক হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। “চিনতে পেরেছ তাহলে। তবে আমাকে হ্যাঙ্ক বলে ডাকলেই খুশি হব।”

কিন্তু বাড়িয়ে ধরা হাতটা ধরল না কাই। এই লোকের সম্পর্কে বলা জন হকস-এর কথাগুলো মনে পড়ল তার। সরকারের সাথে ঘোট পাকিয়ে নিজের লোকদের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করছেন ইনি।

মেয়েটার মনোভাব বুঝতে পেরেছেন হ্যাঙ্ক। কোমরের দু'পাশে দুই হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি, ডানহাতটা পিস্তলের বাঁটের খুব কাছে। “তো বলো, ইয়াং লেডি। কী করা যায় তোমাকে নিয়ে? পাহাড়সমান ঝামেলার নিচে নিজেকে আটকে ফেলেছ তুমি। এই মুহূর্তে রকি পর্বতের সবগুলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমাকে। বিস্ফোরণটা...”

“আমার কোনও দোষ নেই,” তার কথা শেষ হওয়ার আগেই চেঁচিয়ে উঠল কাই। “কী ঘটেছে, কীভাবে ঘটেছে, কিছুই বলতে পারব না আমি।”

“হতে পারে। তবে বিস্ফোরণে খুব কাছের একজনকে হারিয়েছি আমি। আর লোকজন এমন একজনকে খুঁজছে, যার কাঁধে সব দোষ চাপানো যায়।”

কাইয়ের কাঁধদুটো ঝুলে পড়ল। অপ্রিয় হলেও কথাগুলো সত্যি। দু'হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ল সে। তার কারণে কারও মৃত্যু হয়েছে। হাঁটু গেঁড়ে বসে ফোঁপাতে লাগল মেয়েটা। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে পিঠ।

“কারও তো ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল না,” ফোঁপানোর ফাঁকে বিড়বিড় করে বলে উঠল কাই।

তার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লেন হ্যাঙ্কও। সান্তনা দেয়ার ভঙ্গিতে এক হাতে কাঁধে মৃদু চাপড় দিলেন। “ব্যাগভর্তি সিফোর এক্সপ্লোসিভ কেন নিয়েছিলে, ব্যাপারটা যদিও আমার মাথায় ঢুকছে না। তবে আগে যে কথাটা বলেছি সেটাই ঠিক, বিস্ফোরণটা তোমার জন্য ঘটেনি।”

হ্যাঙ্কের নরম নরম কথায় আস্তে আস্তে থেমে এল মেয়েটার ফোঁপানো। সেই ছোটবেলা থেকে তার বাবা তাকে ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝিয়েছেন। তার জন্য কারোও মৃত্যু হলে ব্যাপারটা কাইয়ের পক্ষে চুপচাপ মেনে নেয়া সম্ভব না।

“আমি ঠিক জানি না ওখানে কী ঘটেছে,” বলে চলেছেন হ্যাঙ্ক, “তবে তোমার বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়নি, এটা নিশ্চিত। আমার মনে হয়, গোটা ব্যাপারটার পেছনে ওই খুলিটা বা খুলিটার ভেতরে যা ছিল, সেই জিনিসগুলোর ভূমিকা রয়েছে।”

হ্যাঙ্ক লক্ষ্য করলেন, তার কথায় আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসছে মেয়েটা, কান্না থেমে গেছে অনেক আগেই। আবারও মুখ খুললেন তিনি। “এখানে আসার রিপোর্টগুলো পড়েছি আমি। স্থানীয় গোত্রপ্রধানদের মতে, গুহায় কেউ অনুপ্রবেশ করলেই গোটা পৃথিবীর জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে ব্যাপারটা।”

"তাহলে...তাহলে আমার ব্যাগে থাকা বোমাগুলোর জন্য হয়নি বিস্ফোরণটা?"

"না, তবে তার চেয়েও খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। এজন্যই তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি আমি, তোমাকে রক্ষা করতে।"

সোজা হয়ে হ্যাঙ্কের দিকে তাকাল কাই। মেয়েটার চাউনিতে জিজ্ঞাসা ধরতে পারলেন তিনি।

"আমি রওনা দেয়ার আগে দেখেছিলাম, পাহাড়ের উপর চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে লোকজন। তবে বিভিন্ন সংস্থার কথা বল বা ন্যাশনাল গার্ড, সবার মূল বক্তব্য কিন্তু একটাই।"

"সবাই ভাবছে, আমিই প্রকৃত দোষী। তাই তো?"

"হ্যাঁ। আর ইতিমধ্যে তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েও পড়েছে গার্ডরা। লোকগুলোর হাবভাব দেখে ভয় পেয়ে যাই আমি। মনে হয়েছিল, তোমাকে পেলে আগে গুলি করবে, আর তারপর প্রশ্ন করবে ওরা।"

কথাটা শুনে কেঁপে উঠল কাই। "কী করব এখন আমি?"

"সবার আগে আমাকে সবকিছু বলবে। সব কিছু...একেবারে গোড়া থেকে। সত্যির চেয়ে বড় ঢাল আর কিছু হতে পারে না।"

কাই বুঝতে পারল না কোথা থেকে শুরু করবে। বাবার মতোই পরম মমতায় তাকে রক্ষা করতে চাচ্ছে লোকটা, ব্যাপারটা তাকে স্বস্তি জোগাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রফেসরকে নিজের জীবনের গল্প শোনাতে শুরু করল সে। প্রথম প্রথম একটু আড়ষ্ট ভাব থাকলেও একটু পরই কথার তোড়ে কেটে গেল সেটা। বুকে চেপে রাখা কথাগুলো কাউকে শোনাতে পেরে হালকা হয়ে উঠতে লাগল তার মনের ভার।

বিকেল ৩:০৮

শান্ত হয়ে মেয়েটার কাহিনী শুনে যেতে লাগলেন হ্যাঙ্ক, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন খুঁটিনাটি বিষয়গুলো। ছোটবেলায় মা মারা যাবার পর বাবাই ছিল কাইয়ের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। বাবার মৃত্যুর পর নতুন একটা ঠিকানা খুঁজে পায় এতিম মেয়েটা- ওয়াহইয়া।

পরিবারের ভাঙন, দারিদ্রতা, দেখাশোনা করার মতো লোকের অভাব, মাদকাশক্তি ইত্যাদি নানান সমস্যায় জর্জরিত নেটিভ আমেরিকানদের ক্ষেত্রে এমন কাহিনী নতুন কিছু না। ছোটবেলা থেকেই এসব দেখতে দেখতে মন-মানসিকতা পাল্টে যায় বাচ্চাদের। অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে তারা। আর সেই অবস্থার ফায়দা লোটে ওয়াহইয়া-র প্রতিষ্ঠাতা জন হকস-এর মতো লোকেরা। কমবয়সীদের ছাইপাশ বুঝিয়ে বিভিন্ন বিপজ্জনক কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয় তারা।

হ্যাঙ্ক নিজেও এরকম অবস্থার ভুক্তভোগী। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর মাদকের ব্যবসা শুরু করেছিলেন তিনি। প্রথমে স্কুলে, পরবর্তীতে বাইরের এলাকায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন কিশোর হ্যাঙ্ক। কিন্তু এক দলীয় কলহের জের ধরে খুন হয়ে যায়

তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ব্যাপারটা তার মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে ভুল বুঝতে পেরে নিজের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মরমন চার্চে যোগ দেন তিনি। ইন্ডিয়ান অধিবাসীদের এমন অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে শুরু করেন হ্যাঙ্ক, লেখাপড়ার পাশাপাশি ইন্ডিয়ান অধিকার রক্ষায় কাজ করতে শুরু করেন।

তখন থেকেই নিজের ভেতর বিপদে পড়া মানুষকে সাহায্য করার এক অদম্য অনুভূতি টের পান হ্যাঙ্ক। মৃত্যুর আগে তার দাদা তাকে একটা কথা বলেছিলেন, "জমি যত বেশি চাষ করা হয়, ফসল তত ভালো হয়।" সবসময় কথাটা মেনে চলেন তিনি।

কথা বলা শেষ হওয়ার পর, জ্যাকেটের জিপার খুলে ভেতর থেকে দুটো সোনার প্লেট বের করল কাই। "এজন্যই বোমা না পেতে গুহা থেকে বেরিয়ে আসি আমি, জন হকস-কে এগুলো দেখাতে।"

প্লেটগুলো দেখে হ্যাঙ্কের চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি ভেবেছিলেন, বিস্ফোরণের ফলে গুহার সাথে সাথে এই অমূল্য সম্পদগুলোও চিরতরে হারিয়ে গেছে।

যাক, অন্তত দুটো তো রক্ষা পেয়েছে।

একটা প্লেট হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন হ্যাঙ্ক। অদ্ভুত ভাষায় কিছু লাইন খোদাই করা আছে প্লেটগুলোর গায়ে। গুহায় পড়ে থাকা আদিবাসীদের মমিগুলোর কথা মনে পড়ল তার। এই জিনিসগুলোর কথা গোপন রাখতেই নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে লোকগুলো।

আরেকটা ব্যাপার মনে পড়তেই হ্যাঙ্কের প্লেট ধরা হাতটা অল্প একটু কেঁপে উঠল। নেটিভ আমেরিকান হওয়ার পাশাপাশি মরমন ধর্মবিশ্বাসের অনুসারি তিনি। নিজ ধর্মের ইতিহাস খুব ভালো করেই জানা আছে তার। প্রাচীন লোককথা অনুযায়ী, তাদের ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ন নিদর্শন হচ্ছে 'দ্য বুক অফ মরমন'। এই বইতে লেখা অনুশাসনগুলো প্রাচীন সোনার পাতে খোদাই করা একটা অদ্ভুত ভাষা থেকে অনুবাদ করা। জোসেফ স্মিথ নামের এক সেইন্ট সেই সোনার প্লেটগুলো আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় আরও কিছু সোনার প্লেট খুঁজে পাওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়লেও, সেগুলোর বেশিরভাগই ছিল গুজব।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে প্লেটটায় খোদাই করা লেখাগুলোতে হাত বুলাচ্ছিলেন হ্যাঙ্ক। কাইয়ের ডাকে সম্বিত ফিরল তার।

"কী করব এখন আমরা?"

জবাব না দিয়ে প্লেটটা কাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিলেন তিনি। আবারও জ্যাকেটের ভেতর গুঁজে রাখতে বললেন জিনিসটা। এখনও ভালোভাবে ওর সাথে পরিচয় হয়নি ভেবে কর্মদরনের উদ্দেশ্যে আবারও এক হাত বাড়িয়ে দিলেন। "হ্যাঙ্ক কানোশ।"

এবার আর প্রত্যাখ্যান করল না মেয়েটা। "কাই...কাই কৌশিট।"

"এটা তো নাভাজো ভাষা। তবে চেহারা আর কথার টানে মনে হয়, তুমি উত্তর-পূর্ব দিকের কোনও ইন্ডিয়ান গোত্রের।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কাই। "বাবার দিক থেকে আমি আসলে পিকোট ইন্ডিয়ান গোত্রের লোক। আমার মা নাভাজো ছিলেন। নামটা তারই দেয়া। তবে কথা আর আচার-আচরণে বাবাকে অনুসরণ করেছি আমি।"

সায় দিয়ে ঘোড়ার দিকে এগোলেন হ্যাঙ্ক। নিজে স্যাডলে উঠে বসার পর কাইকে তোলার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। তবে মেয়েটাকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে বুঝতে পারলেন ঘোড়ায় চড়তে অনীহা আছে তার।

"আগে কখনও চড়ো নি?"

না-বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে।

"সমস্যা নেই। হাতটা ধর। আমি তোমাকে তুলে নিচ্ছি। মারিয়াহ খুবই শান্ত ঘোড়া। ও তোমাকে পড়তে দেবে না।"

হ্যাঙ্কের বাড়িয়ে ধরা হাতটা আঁকড়ে ধরল কাই। "কোথায় যাব আমরা?"

"ন্যাশনাল গার্ডদের কাছে।"

কথাটা শুনে মুখ থেকে হাসি উধাও হয়ে গেল মেয়েটার।

"তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। তবে নিজের কৃতকর্মের মোকাবেলা তো করতেই হবে," বলে এক হ্যাঁচকা টানে মেয়েটাকে নিজের পেছনে বসিয়ে দিলেন প্রফেসর।

"কিন্তু বিস্ফোরণের পেছনে তো আমার হাত ছিল না।"

ঘুরে মেয়েটার চোখের দিকে তাকালেন হ্যাঙ্ক। "তা ঠিক। কিন্তু সবাই তোমাকেই দোষী মনে করছে। ধরা না দিলে ব্যাপারটা আরও শক্ত হয়ে চেপে বসবে তোমার ঘাড়ে। তবে চিন্তা করো না। ভালো কয়েকজন উকিলকে নিয়ে আমি তোমার পাশে থাকব।"

কিন্তু কথাগুলো কাইয়ের চোখেমুখে ফুটে ওঠা ভয়কে ঢাকতে পারল না।

এছাড়া কিছু করার নেই, ভাবলেন হ্যাঙ্ক। নিরাপত্তার খাতিরেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটাকে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে।

এমন সময় একটু দূর থেকে একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ ভেসে এল, আস্তে আস্তে আরও কাছে চলে আসছে। রোটরের আওয়াজ কাইও শুনতে পেয়েছে। পেছন থেকে হ্যাঙ্কের কোমর জড়িয়ে ধরল সে।

মেয়েটার মনে দানা বেঁধে ওঠা ভয় উপলব্ধি করতে পারলেন হ্যাঙ্ক। নিজেকে ঘর-সংসার, সন্তান ইত্যাদির জন্য কখনোই অবসর দেননি তিনি। এক মুহূর্তের জন্য ব্যাপারটা নিয়ে আফসোস হলো তার। মেয়েটাকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে সাধ্যের বাইরেও যাবেন, মনে মনে স্থির করলেন প্রফেসর।

গাছের ফাঁক দিয়ে হেলিকপ্টারটা দেখতে পেলেন হ্যাঙ্ক, মেয়েটাকে খুঁজতে বেরিয়েছে ওটা। লোগো না থাকলেও যান্ত্রিক ফড়িংটাকে ন্যাশনাল গার্ডের বলে চিনতে পারলেন তিনি। অ্যাপাচি লংবো নামের এই মডেলটা খুব ভালো করেই চেনা আছে তার।

আরোও শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরল কাই।

"চিন্তা করো না। আমাকে সামলাতে দাও ব্যাপারটা।"

পেটে আলতো গুঁতো দিয়ে মারিয়াহ-কে সামনের দিকে চালিয়ে দিলেন তিনি। চান না, হঠাৎ তাদেরকে দেখে চমকে যাক গার্ডরা। আস্তে আস্তে বনের প্রান্তের দিকে হাঁটতে শুরু করল ঘোড়াটা। উল্টোদিক থেকে হেলিকপ্টারটাও সরাসরি তাদের দিকেই আসছে।

খুব সম্ভবত, ইনফ্রারেড সেন্সর লাগানো আছে। দেহের উত্তাপ ব্যবহার করে খোঁজ পেয়ে গেছে তাদের।

আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে বন ছাড়িয়ে খোলা উপত্যকায় বেরিয়ে এলেন হ্যাঙ্ক। নাক নিচু করে এগিয়ে আসছে উড়ন্ত ফড়িং, রোটরের আওয়াজে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। কিন্তু হঠাৎ করেই রোটরের আওয়াজ ছাপিয়ে আরেকটা আওয়াজ ভেসে এল।

ক্যাট...ক্যাট...ক্যাট...ক্যাট...

এক সেকেন্ড পর ঘোড়ার খানিকটা সামনে মাটি আর ঘাস ছিটকে উঠল, আস্তে আস্তে দুই সারিতে ভাগ হয়ে সরাসরি তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে মাটি ছিটকানো।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন হ্যাঙ্ক।

গুলি করা হচ্ছে তাদের।

"শক্ত করে ধরো আমাকে," কাইয়ের উদ্দেশ্যে কথাটা বলেই জোর হাতে ঘোড়াটার লাগাম টেনে ধরলেন হ্যাঙ্ক।

অধ্যায় ৫
৩০ মে, বিকেল ৫:১৪
ওয়াশিংটন ডি.সি.

"আপনার ভাতিজির ফোন ট্রেস করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে," পেইন্টারের অফিসে ঢুকতে ঢুকতে ঘোষণা করল ক্যাট। "তবে হাল ছাড়ছি না আমরা।"

ডেস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে একটা ব্রিফকেসের ভেতরে থাকা জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করছিলেন ডিরেক্টর। রিগ্যান এয়ারপোর্ট থেকে ত্রিশ মিনিট পর তার প্লেন টেক অফ করবে। চার ঘন্টায় সল্ট লেক সিটিতে পৌঁছে যাবেন তিনি।

ক্যাটের দিকে ফিরে তাকালেন পেইন্টার। মেয়েটার কপালের ভাঁজটা নজর এড়াল না তার। কাইয়ের কলটা হঠাৎ কেটে যাওয়ার পর ইতিমধ্যে আধঘন্টা পেরিয়ে গেছে। কলব্যাক করলেও কোনও লাভ হয়নি। হয়তো নেটওয়ার্কের সমস্যা, কিংবা ফোনটাই সুইচ অফ করে ফেলেছে।

"উটাহ থেকে ওর ধরা পড়ার কোনও খবর এসেছে নাকি?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

না-বোধক মাথা নাড়ল ক্যাট। "সেজন্যই বলছিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে যাওয়া উচিত আপনার। কোনও খবর এলে সাথে সাথে ফোন করে জানিয়ে দেব আমি। কোয়ালস্কি আর শিন তৈরি হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।"

সশব্দে ব্রিফকেসের ডালা নামিয়ে নিলেন পেইন্টার। কাইয়ের ফোন পাওয়ার আগে থেকেই ঘটনাস্থলে একটা পরিদর্শক দল পাঠানোর কথা ভাবছিলেন তিনি। ভূতত্ত্ববিদ হিসেবে শিনকে তো যেতেই হতো, পাশাপাশি বিস্ফোরণটার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কোয়ালস্কিকে তার সাথে পাঠাবেন ভেবেছিলেন।

কিন্তু ফোনকলটা আসার পর থেকেই, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত রূপ নিয়েছে।

ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোনো শুরু করলেন পেইন্টার। ক্যাটের কথাই ঠিক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনাটা সামলাতে হবে তাকে। ইতিমধ্যে কাইয়ের খোঁজে নেমে পড়েছে ওখানকার লোকজন।

ডারপা-র হেড, জেনারেল গ্রেগরি মেটকাফকে নিজের যাওয়ার ব্যাপারটা জানাননি তিনি। জানতে পারলে পেইন্টারের নিজের মাঠে নামা নিয়ে ঝামেলা করতে পারেন ভদ্রলোক। তাকে এসব ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ততক্ষণে কাইয়ের বিপদ আরও বাড়বে বই কমবে না। তাই নিজের বসের কাছ থেকে আগে অনুমতি নেয়ার চেয়ে পরে ক্ষমা চেয়ে নেয়াটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছে পেইন্টারের।

পাশাপাশি মেটকাফ আর তার মধ্যে সম্পর্কটাও তেমন একটা ভালো যাচ্ছে না। মাস ছয়েক আগে থেকে একটা রহস্যজনক সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে তদন্তে নেমেছেন পেইন্টার। সিগমার শুরু থেকেই নানাভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে ওই বিপজ্জনক সংগঠনটা। খুবই গোপনীয়তার সাথে কাজ করছেন তিনি, গোটা পৃথিবীতে মাত্র পাঁচজন লোকই ব্যাপারটা সম্পর্কে জানে। কিন্তু মেটকাফ অতটা বোকাও নন। কিছু একটা অবশ্যই আন্দাজ করতে পেরেছেন তিনি। তাই বর্তমানে শীতল সম্পর্ক বিরাজ করছে ডারপা আর সিগমাপ্রধানের মাঝে।

এমন অবস্থায় ক'দিনের জন্য ওয়াশিংটন থেকে দূরে সরে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করছেন পেইন্টার।

পেইন্টারের পিছু নিয়ে হলওয়েতে বেরিয়ে এল ক্যাট।

হঠাৎ খাটো একটা অবয়ব তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। ক্যাটের স্বামী মঙ্ক কক্কালিসকে এভাবে আবির্ভূত হতে দেখে চমকে উঠলেন ডিরেক্টর।

টেকো মাথা, খাটো গড়ন আর কিলবিলে পেশীর মঙ্ককে প্রথম দেখায় কুস্তিগীর বলে ভ্রম হয় বেশিরভাগ লোকের। তবে তার এই দর্শনের পেছনে লুকিয়ে থাকা চরম বুদ্ধিমত্তা আর প্রতিভাধর রূপটা সম্পর্কে খুব মানুষই জানে। সিগমায় আসার আগে গ্রীন বেরেট কমান্ডো দলের সদস্য ছিল মঙ্ক। আগে থেকেই ফরেনসিক মেডিকেলের উপর দক্ষতা থাকলেও সিগমায় যোগদানের পর বিশেষ ট্রেনিং-এর পাশাপাশি বায়োটেকনোলজিতে ডিগ্রী নিয়েছে ও। কয়েক বছর আগে একটা অপারেশনে গিয়ে একটা হাত হারাতে হয়েছে তাকে। তবে ডারপা-র উদ্ভাবিত প্রযুক্তির এক বিস্ময়কর নিদর্শন-প্রস্থেটিক হাত এখন সেই হাতের স্থান দখল করেছে। আদতে হাত বলা হলেও ওটা আসলে অর্ধেক হাত আর অর্ধেক অস্ত্রের মিশেল।

"মঙ্ক, এখানে কী করছ তুমি? যতদূর জানি, তোমার তো আজ নতুন হাতটা নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করার কথা।"

"মাত্রই শেষ করে এলাম," পেইন্টারের প্রশ্নের জবাবে প্রস্থেটিক হাতটা উপরে তুলে লিকলিকে আঙুলগুলো নাড়াতে লাগল সে। "ভাবলাম এই সফরে আরও বাড়তি একজোড়া হাত পেলে মন্দ হয় না আপনার। এই আজব মালটার কথা বাদ দিলে অবশ্য একজোড়ার জায়গায় একটা হাত হবে কথাটায়।"

ক্যাটের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন পেইন্টার।

কোনও ভাবান্তর হলো না মেয়েটার মুখে। "আমারও মনে হয় পাহাড়ি এলাকায় এমন একটা অপারেশনে, অভিজ্ঞ কেউ সাথে থাকলে আপনার সুবিধা হবে।"

প্রস্তাবটা নাকচ করে দিলেন ডিরেক্টর। "ধন্যবাদ। তবে আমার মতে, এতো বেশি লোক নিয়ে ওখানে না যাওয়াটাই ভালো।"

কথাটা শুনে ক্যাটের চেহারায় স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠতে দেখলেন পেইন্টার। তার অনুপস্থিতিতে সিগমার সকল আনুষঙ্গিক কাজগুলো ক্যাটকেই সামলাতে হবে। মঙ্ক পাশে থাকলে বাড়তি সহায়তা পাবে সে। পাশাপাশি গর্ভধারণের এই অবস্থায় স্ত্রীর পাশে থাকা উচিত মঙ্কের।

মঙ্কও আর দ্বিমত করল না। হয়তো সে নিজেও এখন স্ত্রীর পাশেই থাকতে চায়। "ঠিক আছে, ডিরেক্টর। সাবধানে থাকবেন।"

বিকেল ৫:২২

কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্স বুঝতে পারছে না, তা মা-কে কি বলে নিবৃত করবে। মেডিকেল রুমের বাইরের হলওয়েতে অবিরত পায়চারি করে চলেছেন তিনি।

"বুঝতে পারছি না, তোমার বাবার পরীক্ষা চলাকালীন আমি ভেতরে থাকলে তাদের কী সমস্যা!"

"আহহা মা, জানোই তো-" শান্ত গলায় জবাব দিল গ্রে। "-পরিবারের কেউ সামনে না থাকলে থেরাপিটা আরও বেশি কার্যকর হবে।"

হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলেন তিনি। পায়চারি করার মাঝেই একবার তাল হারিয়ে হোঁচট খেলেন, মেঝেতে পড়ে যাওয়া থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল গ্রে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন মহিলা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল সিগমা কমান্ডারের গলা বেয়ে। মায়ের দিকে ভালোভাবে তাকাতেই বুঝতে পারল, গত কয়েক মাসে আরও ওজন হারিয়েছেন তিনি। ঢোলা হয়ে গেছে পরনের ব্লাউজটা। গর্তে ঢুকে গেছে চোখমুখ।

মায়ের হাঁটাচলার আওয়াজ ছাপিয়ে মেডিকেল রুমে ডাক্তার আর তার বাবার কথা বলার মৃদু আওয়াজ শুনতে পেল গ্রে। যদিও বুঝতে পারল না কী বলছেন, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে উৎকণ্ঠা দানা বেঁধে উঠছে তার মনে। জানে, যে কোনও মুহূর্তে মেজাজ হারিয়ে বিস্ফোরিত হতে পারেন তার বাবা। শান্ত মনোভাব কাকে বলে, তা কখনোই জানতেন না টেক্সাসের একটা তেল খনিতে কাজ করা এই ভদ্রলোক। ছোটবেলা থেকেই বাবার উগ্র মেজাজের সাথে পরিচয় আছে গ্রে-র। দুর্ঘটনায় একটা পা হারানোর পর আরও উগ্র হয়েছেন তিনি। আর এখন, আলঝেইমার তার স্মৃতির উপরও হামলা চালাচ্ছে। সব মিলিয়ে দিনকে দিন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে পরিস্থিতি।

"ওর সাথে থাকা উচিত আমার," আবারও বিড়বিড় করে উঠলেন গ্রে-র মা।

তর্কে গেল না গ্রে। কিছুদিন আগে একটা নার্সিং ফ্যাসিলিটিতে বাবাকে রাখার প্রস্তাব করেছিল সে। কিন্তু যতই ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকুক, স্ত্রী-কে ছেড়ে নার্সিং হোমে থাকতে রাজি হননি তার বাবা। তার মা ও ব্যাপারটায় তেমন একটা সায় দেননি। এই অবস্থায়ও একে অপরকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবেন না তারা, ব্যাপারটা ভালো লেগেছে গ্রে-র।

উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের এক হাত ধরে টান দিল সে। "বসছ না কেন তুমি? ওদের আর বেশিক্ষণ লাগার কথা না।"

হাতটা ধরতেই মায়ের শরীরের পলকা ভাব আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারল গ্রে। এভাবে চলতে থাকলে তিনি নিজেও তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন। কিন্তু গ্রে-র

পক্ষে আর কী ই বা করা সম্ভব? ইতিমধ্যে বাড়িতে বাবাকে দেখাশোনার জন্য একজন ফুল টাইম নার্স রাখার ব্যবস্থা করেছে সে। এতে মায়ের চাপ কিছুটা হলেও কমবে। বাবা-মাকে তার নিজের ফ্ল্যাটে এসে থাকার কথাও বলেছে সে। কিন্তু টকোহমা পার্কের তাদের স্মৃতি বিজড়িত পুরনো বাংলোটা ছেড়ে থাকার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন দু'জনেই। গ্রে আর তার বাবার সম্পর্ক খুব একটা ভালো না। এটাও হয়তো একসাথে থাকার পক্ষে একটা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে। আর তার মা ও চান না, স্বামীর এই ঝামেলা গ্রে-র কাজের উপর খারাপ প্রভাব ফেলুক।

মেডিকেল রুমের দরজাটা খুলে যেতেই ভেতরে ঢুকে গেল গ্রে। ডাক্তারের চিন্তিত মুখাবয়ব তাকে বলে দিল, কিছু একটা গন্ডগোল আছে। পরবর্তী কয়েক মিনিটে চিন্তিতভাবটা গ্রে-র নিজের মুখেও সঞ্চারিত হলো। সময়ের সাথে সাথে আরও খারাপ হয়ে উঠছে তার বাবার অবস্থা। এখন হয়তো নিজে নিজে জামাকাপড় পড়া, টয়লেট ব্যবহার করাতেও সমস্যা শুরু হবে তার। সেই সাথে স্মৃতি ভুলে যাবার ঝামেলা তো আছেই। গ্রে-কে বাড়ির দরজায় অ্যালার্ম লাগানোর পরামর্শ দিলেন ডাক্তার।

ডাক্তারের কথা শোনার ফাঁকে বাবাকে হলওয়েতে মায়ের পাশের চেয়ারে বসে থাকতে দেখল গ্রে, শক্ত করে একে অপরের হাত আঁকড়ে ধরে রেখেছেন তারা।

কাগজ-কলমের আরও কিছু কাজ সারার পর দু'জনকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল গ্রে। তাদেরকে বাংলোয় রেখে সাইকেল চালিয়ে রওনা হয়ে গেল নিজের ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে। বাবার কথা ভাবতে ভাবতে ঝিম ঝিম করতে লাগল তার মাথা।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে সবার আগে বাথরুমে ঢুকে গেল সে। লম্বা একটা গোসল ছাড়া মাথা ঠান্ডা হবে না। প্রথমে গরম, আর তারপর ঠান্ডা পানিতে অনেকক্ষণ যাবত ভিজল গ্রে। তারপর শাওয়ার বন্ধ করে তোয়ালে দিয়ে মুছে নিল শরীর। একটা বক্সার শর্টস পরে রান্নাঘরের দিকে এগোল সে। ফ্রিজে রাখা হুইস্কির বোতলটা না হলে মাথার জ্যাম ছুটবে না এখন।

ঘরের অর্ধেকটা পার হতেই, ওয়াশিং মেশিনের উপর বসা কালো পোশাক পরা অবয়বটা দেখতে পেল গ্রে। এক সেকেন্ডের জন্য ধুকপুক করে উঠেছিল হৃৎপিণ্ড। তারপরই কালো পোশাকধারীর চেহারা দেখতে পেয়ে উদ্বেগ কিছুটা কমে এল তার।

"শেইচান..."

জবাবে শুধু ঠোঁটের একপাশ একটু বেঁকে যাওয়া ছাড়া শরীরের অন্য কোন অংশ নড়ল না মেয়েটার। গ্রে-র দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সবুজ চোখজোড়া। মুখাবয়ব বরাবরের মতোই রহস্যে ঘেরা। কাঠিন্য ভরা গোটা চেহারায় নরম অংশ বলতে শুধু জ্যাকেটের কলার ছাড়িয়ে নেমে আসা চুলগুলো।

কীভাবে লক করা ফ্ল্যাটে ঢুকল, প্রশ্নটা করার ঝামেলায় আর গেল না গ্রে। জানে, তার মতো একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত আততায়ীর পক্ষে এটা অসম্ভব কিছু না। এক সময় নিজের মতোই আগাগোড়া রহস্যে ঘেরা সংগঠন গিল্ড এর হয়ে কাজ করত শেইচান। তবে যতদূর জানা গেছে, গিল্ড নামটা ওদের আসল নাম না। সংগঠনটার উৎপত্তি,

কাজের ধারা কিংবা উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোদ এর অপারেটররাও কেউ তেমন কিছু জানে না। গোটা পৃথিবীতে জালের মতো থাবা বিস্তার করে আছে এই গিল্ড।

সাবেক নিয়োগদাতাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার পর মাথা গোঁজার মতো কোনও আশ্রয় ছিল না শেইচানের। বিশ্বের প্রায় সবগুলো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি হন্যে হয়ে খুঁজছিল তাকে। এমনকি দেখামাত্র তাকে হত্যা করার ঘোষণা দেয় মোসাড। সেই বিপজ্জনক অবস্থায় শেইচানের ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয় সিগমা। আনঅফিশিয়ালি গোপনভাবে মেয়েটাকে সিগমায় যোগদান করান পেইন্টার। এক বছর ধরে একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করে চলেছে সে। মাত্র হাতেগোণা কয়েকজনই ব্যাপারটা সম্পর্কে জানে। তার দায়িত্ব হলো, আগের কন্ট্যাক্টদের কাজে লাগিয়ে গিল্ডের হর্তাকর্তাদের খুঁজে বের করা।

খুশিমনে কাজটা করে চলেছে মেয়েটা। তবে তার এমন ভোল পাল্টানোতে পেইন্টারসহ কেউই গলে যাননি। সবার খুব ভালো করেই জানা আছে, বিশ্বস্ততা থেকে না, বরং অনেকটা নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঠেকায় পড়েই এই কাজে সম্মত হয়েছে সে। তাকে খুঁজে বের করার আগেই গিল্ডকে শেষ করতে হবে তার।

কাজ শুরু করার পর থেকে নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে গ্রে-র কাছে রিপোর্ট করে শেইচান। তবে তাদের শেষ দেখা হয়েছিল প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখন তার ফ্রান্সে থাকার কথা।

তাহলে আমার ফ্ল্যাটে কী করছে মেয়েটা?

গ্রে-র মনে জেগে ওঠা প্রশ্নটা যেন আন্দাজ করতে পেরেছে শেইচান। সে ই আগে নীরবতা ভাঙল। "একটা সমস্যা হয়েছে।"

"উটাহ-এর সাথে সম্পর্কিত কিছু?" হেডকোয়ার্টার থেকে অদ্ভুত বিস্ফোরণটা সম্পরকে জানানো হয়েছিল গ্রে-কে। এটাই এখন সিগমার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ভ্রূ কুঁচকে শ্রাগ করল শেইচান, একতাড়া কাগজ বাড়িয়ে দিল গ্রে-র দিকে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, বিস্ফোরণের ব্যাপারে কিছু জানে না মেয়েটা।

"তোমাকে এগুলো দেখাতে এসেছি আমি।"

হাত বাড়িয়ে কাগজগুলো নিলেও শেইচানের মুখেই সেঁটে আছে গ্রে-র দৃষ্টি।

"হঠাৎ করেই যেন ঢিল পড়েছে মৌমাছির চাকে," বলে চলেছে সে। "বারো দিন আগে একটা বড় রকমের হুলস্থুলের রিপোর্ট পাই আমি। সাথে সাথে আমার খবর সংগ্রহের সব প্রক্রিয়াগুলো হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়।"

বারো দিন আগে...

গ্রে মনে করতে পারল, বারো দিন আগেই উটাহ-এর গুহায় একটা ছেলেকে খুন করা হয়েছিল। ওটার সাথে কী এই ব্যাপারটার কোনও সম্পর্ক আছে?

"বড় একটা কিছু ঘটতে চলেছে। ঘটনাটা গিল্ডের আকর্ষণ পুরোপুরিভাবে এদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আর ওই যে হুলস্থুলের কথা বললাম, ওটার কেন্দ্রও এই ওয়াশিংটনেই। নড়েচড়ে বসছে গিল্ডের প্রতিটা শাখা। তাতে অবশ্য লাভ আমারই

হয়েছে। ফাঁক গলে এই জিনিসটা পেয়ে গেছি আমি," বলে গ্রে-র হাতে ধরা কাগজগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা।

শেইচানের ইশারা অনুসরণ করে হাতে ধরা কাগুজগুলোর দিকে তাকাল গ্রে। সবার উপরের পৃষ্ঠায় একটা প্রতীক ছাপা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সীল ওটা।

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না গ্রে-র। পৃষ্ঠাটা উল্টাতেই ভেতরে কয়েক ধরণের রিসার্চ নোট, স্কেচ আর হাতে লেখা একটা চিঠির ফটোকপি নজরে এল। চিঠির লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে এলেও অক্ষরগুলো ফ্রেঞ্চ বলে চিনতে পারল সে। পৃষ্ঠাটার একেবারে উপরে প্রাপকের নাম লেখা- আরচার্ড ফোরটেস্কু। নামটা দেখে মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক ফ্রেঞ্চই হবেন। তবে গ্রে-র মনোযোগ আকর্ষণ করল চিঠিটার শেষে থাকা প্রেরকের সাক্ষর। আমেরিকার প্রতিটা স্কুলপড়ুয়া বাচ্চাও নামটা একবাক্যে চেনে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

বিস্ময়সূচক দৃষ্টিতে শেইচানের দিকে তাকাল গ্রে। "গিল্ডের সাথে এগুলোর সম্পর্ক কী?"

"তুমি আর পেইন্টার ক্রো আমাকে ওই শুয়োরগুলোর আসল পরিচয় খোঁজার জন্য বলেছিলে," বলে এগিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজার হাতলে হাত রাখল মেয়েটা। "তবে আমি যা পেয়েছি, তা তোমাদের কারোই ভালো লাগবে না।"

শেইচানের দিকে এক পা এগিয়ে গেল গ্রে। "কী পেয়েছ তুমি?"

একটানে দরজাটা খুলে রাস্তায় নেমে গেল মেয়েটা। "গিল্ড... আমেরিকার স্থপতিদের সাথে সম্পর্ক আছে এই রহস্যময় সংগঠনটার।"

অধ্যায় ৬
৩১ মে, সকাল ৬:২৪
গিফু গবেষণাকেন্দ্র, জাপান
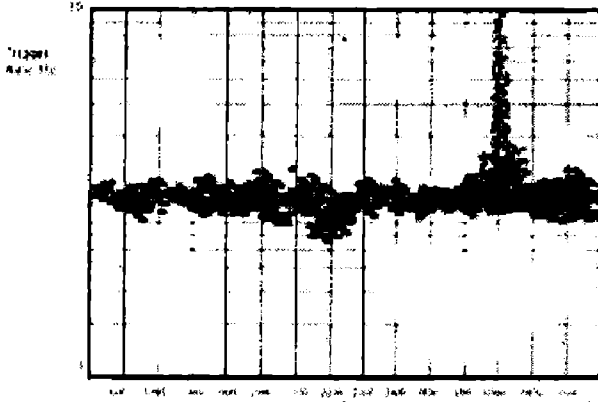
ক্যামিওকা অবজারভেটরিতে, নিজের অফিসে বসে আছেন জুন ইয়োশিদা। পিঠের ব্যথা অগ্রাহ্য করে একদৃষ্টে কম্পিউটার মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

মনিটরে ফুটে ওঠা তথ্যগুলো পায়ের নিচে, ইকেনো পর্বতের হাজার মিটার গভীরে থাকা একটা ট্যাংকের ভেতর থেকে আসছে। বিশেষভাবে পরিশোধিত পঞ্চাশ হাজার টন পানিতে কানায় কানায় ভর্তি চল্লিশ মিটার লম্বা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি ট্যাংকটা। গোটা ফ্যাসিলিটিটা গড়ে তোলার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহাবিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র কণা নিউট্রিনো-র গতিপথ পর্যবেক্ষণ করা। ইলেক্ট্রনিক চার্জ নিরপেক্ষ কণাগুলো এতটাই ক্ষুদ্র যে, বলতে গেলে প্রায় ওজনহীন। প্রায় সব ধরণের পদার্থের ভেতর দিয়েই নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে আজব এই সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলগুলো।

মহাশূন্য থেকে বিপুল পরিমাণে অনবরত পৃথিবীতে আসছে এই নিউট্রিনো। সংখ্যার হিসেবে বলতে গেলে, পৃথিবীর প্রতি অর্ধেক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ষাট বিলিয়ন কণা চলাচল করছে। মহাবিশ্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে এখনও পর্যন্ত রহস্য হয়েই আছে এই মহাজাগতিক কণা।

মাটির নিচে, কসমিক রশ্মির আড়ালে থেকে এই অদ্ভুত কণাগুলোকেই অনবরত পরীক্ষা করে চলেছে ফ্যাসিলিটির একমাত্র সুপার-ক্যামিওকান্ডে ডিটেক্টরটা। মাঝে মাঝে ট্যাংকে থাকা পানির অতি ক্ষুদ্র কণার সাথে ধাক্কা খায় কোনও নিউট্রিনো। সংঘর্ষের ফলে অতি ক্ষুদ্র এক ধরণের নীল আলো বিচ্ছুরিত হয়। এই আলোর বিচ্ছুরণ ধরার জন্য অনবরত কাজ করে চলেছে তেরো হাজার আলোক-বিবর্ধক টিউব। এভাবেই কালো রঙ করা ট্যাংকটার ভেতর নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা যায় নিউট্রিনোর গতিপথ। গ্রাফের সাহায্য সেই গতির মাত্রাটা ধারণ করে রাখা হয়।

এমনই একটা গ্রাফের দিকে এখন তাকিয়ে আছেন জুন ইয়োশিদা। গতকাল রাতের শুরু থেকে আজ সকাল পর্যন্ত ট্যাংক ভেদ করে যাওয়া নিউট্রিনোগুলোর হিসাব দেখাচ্ছে গ্রাফটা।

কম্পিউটার স্ক্রিনে গ্রাফের রেখা বরাবর একটা আঙুল বুলালেন ইয়োশিদা। দেখা যাচ্ছে, গতকাল রাত তিনটায় নিউট্রিনো স্তরে বিশাল একটা আলোড়ন ঘটেছে। এতো বড় স্পাইক এর আগে কখনও দেখেছেন বলে মনে পড়ছে না তার।

খুব সম্ভবত, যন্ত্রপাতির গোলমাল হবে।

এই সন্দেহে গত তিনঘন্টা ধরে পুরো ফ্যাসিলিটির সবগুলো যন্ত্রপাতি চেক করে দেখা হচ্ছে। সামনের মাসে সার্ন নামের একটা সুইস ফ্যাসিলিটির সাথে মিলিতভাবে একটা এক্সপেরিমেন্ট করার কথা চাছে তাদের।

যন্ত্রপাতির গোলমালে এক্সপেরিমেন্টটা বাতিল হয়ে গেলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে।

পিঠের ব্যাথাটাকে এতোক্ষণ আমল না দিলেও এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ইয়োশিদা। কয়েক পা এগিয়ে অফিসের একমাত্র জানালাটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কাঁচ ভেদ করে ওদিকের অবজারভেটরির ক্যাম্পাস দেখা যাচ্ছে। সাত সকালে ক্যাম্পাসের সামনে লেকের পাড় ঘেঁষে বানানো ছোট বাগানটা নজর কাড়ল তার। ক্যাম্পাস বিল্ডিং-এর পেছনে আকাশ ঢেকে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ পর্বতসারি। নিজের কথা ভাবলেন ইয়োশিদা। তিনি নিজেও পর্বতের মতোই অটল, কঠিন আর নিঃসঙ্গ।

এমন সময় সশব্দে খুলে গেল তার অফিসের দরজা। ভেতরে প্রবেশ করল ড. জেনিস কুপার, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে গবেষণা করতে এখানে পাঠানো হয়েছে তাকে। সোনালী চুলের হালকা পাতলা গড়নের মেয়েটা জুনের চেয়ে বয়সে প্রায় ত্রিশ বছরের ছোট। লম্বার দিক দিয়ে জেনিস তাকে ছাড়িয়ে গেলেও প্রস্থের দিক দিয়ে জয় জুনেরই হয়েছে। সবসময় নারকেল তেলের গন্ধ ভেসে আসে মেয়েটার গা থেকে, ব্যাপারটা পছন্দ করেন না তিনি।

"ড. ইয়োশিদা," নিঃশ্বাস ছাড়ার ফাঁকে তার নাম ধরে ডেকে উঠল কুপার, হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে দৌড়ে এসেছে। "কানাডার সাডবারি নিউট্রিনো অবজারভেটরি আর অ্যান্টার্কটিকার আইসকিউব অবজারভেটরি থেকে রিপোর্ট এসে পৌছেছে। আমাদের মতোই একই সময়ে নিউট্রিনো স্তরে আলোড়ন ধরা পড়েছে তাদের ডিটেক্টরেও।"

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মেয়েটা, কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন ইয়োশিদা। স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। তার মানে, যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকই আছে। কিন্তু পরক্ষণেই আরেকটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়, তাহলে নিউট্রিনোগুলোর এমন আচরণের মানে কী? মহাশূন্যে কী কোনও সুপারনোভা তৈরি হয়েছে? নাকি কোনও সৌরঝড়?

তার মনের কথাগুলো ধরতে পেরেই যেন আবার মুখ খুলল ড. কুপার। "রিকু আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিচে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। সে নাকি এই ব্যাপারটা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আবিষ্কার করেছে।"

তবে ব্যাপারটায় আগ্রহ জাগানোর মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না ইয়োশিদা। এতক্ষণ যন্ত্রপাতির গন্ডগোলের চিন্তাই তাকে কাজে আটকে রেখেছে। এখন, আসল ঘটনা জানার পর যেন ক্লান্তি পুরোপুরি জেঁকে বসেছে তার উপর। তেষট্টি বছর বয়সে একটা নির্ঘুম রাত কাটানোর পর এমনটা ভাবা অস্বাভাবিক কিছু না।

"আপনাকে অবশ্যই যেতে বলেছে ও," জোর দিল কুপার। "ব্যাপারটা নাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"ড. তানাকার কাছে গুরুত্ব পায় না এমন কিছু আছে নাকি!" বিড়বিড় করলেন ইয়োশিদা।

তবে কুপার এখনও হাল ছাড়েনি। "রিকুর মতে, ওগুলো জিওনিউট্রিনো ও হতে পারে।"

ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটার দিকে তাকালেন ইয়োশিদা। "অসম্ভব।"

প্রায় সব নিউট্রিনোই মহাশুন্য থেকে পৃথিবীতে আসে। সৌরঝড়, তারার বিস্ফোরণ, সুপারনোভা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে উৎপত্তি হয় কণাগুলোর। কিন্তু কিছু বিশেষ প্রজাতির কিছু নিউট্রিনো- জিওনিউট্রিনো বলা হয় এদেরকে, সৃষ্টি হয় পৃথিবী থেকে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙন, কসমিক রশ্মির সাথে বায়ুমন্ডলের সংঘর্ষ কিংবা পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হয় বিশেষ এ কণাগুলো।

"হ্যাঁ। অন্তত রিকু-র তাই বিশ্বাস।"

"যত্তসব ফালতু কথা। নিউট্রিনো স্তরে এরকম একটা আলোড়ন তৈরি করার জন্য কমপক্ষে একশো হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে।" মুখে এগুলো বললেও মনে মনে নিচে যেতে মনঃস্থির করলেন ড. ইয়োশিদা। তবে ড. তানাকার কথায় বিশ্বাস করে না, বরং কথাগুলো ভুল প্রমাণিত করার জন্যই সিদ্ধান্ত বদল করলেন তিনি।

ড. কুপারকে নিয়ে ভূগর্ভস্থ ল্যাবে যাওয়ার জন্য এলিভেটরের দিকে এগোলেন ইয়োশিদা। নিচে নামার নির্দিষ্ট বাটন টিপে দিল মেয়েটা। সাথে সাথে যেন পাথরের টুকরোর মতো নিচে পড়তে লাগল এলিভেটর। অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে যাওয়ার পর ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল খাঁচাটা, গন্তব্যে পৌছে গেছে। শাফট পেরিয়ে ডিটেক্টরের প্রধান কন্ট্রোল রুমে প্রবেশ করলেন দুই বিজ্ঞানী। সারি সারি সাজানো

কিউবিকল সাজানো রুমটাকে দেখলে বোঝার উপায় নেই মাথার উপর গোটা একটা পাহাড়ের চাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এটা।

ড. রিকু তানাকার বয়স কিছুতেই বিশের বেশি হবে না। তবে এই বয়সেই পদার্থবিদ্যায় দুটো ডক্টরেট ডিগ্রীর অধিকারী হয়ে গেছে পাঁচ ফুটেরও কম উচ্চতার ছোটোখাটো মানুষটা, এখন কাজ করছে তৃতীয় পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে।

বর্তমানে একটা মনিটরের দিকে একমনে তাকিয়ে আছে সে। একটা গ্লোব ফুটে আছে মনিটরে, আস্তে আস্তে ঘুরছে। স্ক্রিনের একপাশে দ্রুতগতিতে উপর-নিচ আসা-যাওয়া করছে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত।

"ফলাফল খুবই আশ্চর্যজনক," পেছনদিকে না তাকিয়েই বলে উঠল ড. তানাকা, সম্ভবত স্ক্রিনে ড. ইয়োশিদা আর ড. কুপারের অবয়বের প্রতিফলন দেখতে পেয়েছে।

হাঁটুর বয়সী ছেলেটার এমন ব্যবহারে ইয়োশিদার বিরক্তির মাত্রা আরেকটু বেড়ে গেল। কোনও অভ্যর্থনা নেই, কোনও সম্ভাষণ নেই, পদমর্যাদার ব্যাপারটা কী সে ভুলে গেছে নাকি? তবে ইয়োশিদার জানা আছে, তানাকার একটু মানসিক সমস্যা আছে। অ্যাসপারগার'স সিনড্রম নামক স্বল্পমাত্রার প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত সে। কথাটা ভেবে ছেলেটার আচরণের ব্যাপারে নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন তিনি।

এগিয়ে গিয়ে তানাকার পাশে দাঁড়ালেন তিনি। "কীসের ফলাফল?"

"রাশিয়ার বৈকাল হ্রদের ফ্যাসিলিটি, আমেরিকানদের লস অ্যালামোসের ফ্যাসিলিটি, ব্রিটিশদের সাডবারি অবজারভেটরিসহ বেশ কয়েকটা নিউট্রিনো ল্যাবের রিপোর্ট বিচার-বিশ্লেষণ করেছি আমি।"

মাথা নাড়লেন ইয়োশিদা। "হ্যাঁ, শুনেছি। নিউট্রিনো স্তরে বিশাল স্পাইকটা সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে সবাই।"

স্ক্রিনে ভেসে ওঠা তথ্যগুলোর দিকে ইশারা করল তানাকা। "নিউট্রিনোর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, অভিকর্ষ কিংবা চৌম্বকক্ষেত্রের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট না হলে কণাগুলো সবসময় সোজা পথে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ইয়োশিদা। আরও কয়েক যুগ আগে থেকেই কথাটা জানেন তিনি।

বলে চলেছে তরুণ বিজ্ঞানী, "অর্থাৎ সবগুলো ফ্যাসিলিটির রিপোর্ট থেকে পাওয়া নিউট্রিনোর গতিপথ ক্রসম্যাচিং করলেই আলোড়নটার কেন্দ্রস্থল শনাক্ত করা সম্ভব।"

নিজের উপর রাগ হলো ইয়োশিদার। এই কথাটি এতোক্ষন তার মাথায় কেন এল না!

"এ নিয়ে চারবার ক্রসম্যাচিং প্রোগ্রামটা চালিয়েছি আমি। আশা করা যায়, এবার একেবারে সঠিক ফলাফল পাব," বলে কীবোর্ডের একটা নির্দিষ্ট বাটন টিপে দিল তানাকা। সাথে সাথে মনিটরে ঘুরতে থাকা গ্লোবটা স্থির হয়ে গেল। পুরো উত্তর আমেরিকার মানচিত্রটা বড় আকারে স্ক্রিনে আবির্ভূত হলো। আরও জুম হতে হতে রকি পর্বতমালার বিশেষ একটা এলাকাকে চিহ্নিত করলো মানচিত্রটা।

"এই যে, এটাই সেই নিউট্রিনো বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দু।"

মনিটরে ভেসে ওঠা মানচিত্রটার দিকে ঝুঁকে তাকালেন ইয়োশিদা।

উটাহ।

এটা কীভাবে সম্ভব? কিছুক্ষণ আগে ড.কুপারকে বলা নিজের কথাটা মনে পড়ল তার। নিউট্রিনো স্তরে এরকম একটা স্পাইক তৈরির জন্য একশোটা হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ দরকার।

তার মনের কথা বুঝতে পেরেই হয়তো নাক দিয়ে ঘোঁত জাতীয় একটা শব্দ করে শ্রাগ করল ড. তানাকা। বেয়াদব ছেলেটাকে চড় মারার ইচ্ছা থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে নিবৃত করলেন ইয়োশিদা, আবারও নজর দিলেন স্ক্রিনের দিকে। মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে তার।

কী হচ্ছে উটাহ-তে?

অধ্যায় ৭
৩০ মে, দুপুর ৩:৫২
উটাহ্ বনভূমি

স্প্রুস আর পাইন গাছের ফাঁক গলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন হ্যাঙ্ক। পেছনে বসে তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে কাই। ঘোড়া ছোটানোর এক ফাঁকে মেয়েটাকে ফুঁপিয়ে উঠতে শুনলেন তিনি। এই মুহূর্তে অবশ্য ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

মারিয়াহ-কে নিজের ইচ্ছামতো দৌড়াতে দিচ্ছেন হ্যাঙ্ক, মাঝে মাঝে শুধু গাছের শাখা-প্রশাখার আড়ালে থাকার জন্য লাগাম টানতে হচ্ছে। কাউচও ঘোড়াটার পেছন পেছন ছুটে চলেছে।

তাদের মাথার উপর দিয়ে ধাওয়া করে এগিয়ে আসছে মিলিটারি হেলিকপ্টারটা। গাছের ডালপালা অবশ্য কিছুটা আড়াল যোগাচ্ছে। কিন্তু হ্যাঙ্ক নিশ্চিত, ইনফ্রারেডের মাধ্যমে দেহের উত্তাপ ট্র্যাক করেই তাদের অনুসরণ করছে ফড়িংটা।

গুলির আঘাতে বামদিকের একটা পাইন গাছ থেকে কিছুটা বাকল ছিটকে উঠল। রোটরের আওয়াজের সাথে পাল্লা দিয়ে কিছুক্ষণ পরপর গর্জে উঠছে মেশিনগান। আস্তে আস্তে মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে আনছে হেলিকপ্টারটা।

"প্রফেসর," চেঁচিয়ে উঠে সামনের দিকে ইশারা করল কাই। আর অল্প কিছুটা সামনে এগিয়েই থেমে গেছে গাছের সারি। মাঝখানে খানিকটা খোলা মাঠ রেখে আবার শুরু হয়েছে বন। ঘেসো জমির একপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে খাড়া পাহাড়। উন্মুক্ত জায়গাটুকু পেরোনো এখন আত্মহত্যার সামিল।

বিপদ টের পেয়েই যেন দৌড়ের গতি কমিয়ে দিল মারিয়াহ।

ধাওয়াকারীরাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। আবারও গর্জে উঠল মেশিনগান।

আমাদের তাড়িয়ে বন থেকে বের করতে চাইছে ওরা।

কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে হ্যাঙ্কের। "শক্ত করে ধর," কাইয়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবালেন তিনি। গতি কমার সুযোগে প্রায় মাথার উপর চলে এসেছে হেলিকপ্টারটা। উচ্চতাও অনেকটা কমে গেছে। বনের প্রান্তে পৌঁছে ছোট একটা লাফ দিল মারিয়াহ, বেরিয়ে এসেছে খোলা মাঠে। পেছনের স্প্রুস গাছের গুঁড়িতে মুখ গুঁজল কতগুলো লক্ষভ্রষ্ট বুলেট।

হঠাৎ লাগাম টেনে দিক বদল করলেন হ্যাঙ্ক, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন সরাসরি নেমে এগিয়ে আসতে থাকা হেলিকপ্টারটার দিকে। এমন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিল না ধাওয়াকারী হেলিকপ্টারের পাইলট। কন্ট্রোল স্টিক টেনে ধরে গতি কমাল সে। এই একটা সেকেন্ডই দরকার ছিল হ্যাঙ্কের। কোমরের হোলস্টার থেকে রুগার

ব্ল্যাকহক পিস্তলটা বের করে আনলেন তিনি। হেলিকপ্টারের উইন্ডশীল্ড লক্ষ্য করে খালি করলেন পুরো ম্যাগাজিন। কাছাকাছি দূরত্বে বুনো ভালুক শুইয়ে ফেললেও উড়ন্ত হেলিকপ্টারের কেবলমাত্র উইন্ডশীল্ডে চিড় ধরাতে সক্ষম হলো বুলেটগুলো। গোঁত্তা খেয়ে পেছনে সরে গেল যান্ত্রিক ফড়িংটা। সামলে উঠেই আবার গুলি শুরু করল খোলা দরজা দিয়ে অর্ধেক বেরিয়ে আসা গানার। তবে ততোক্ষণে হ্যাঙ্কও চুপচাপ বসে নেই। আবারও ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন তিনি, এগোচ্ছেন মাঠের অপর প্রান্তে থাকা ঘন বনের দিকে। মাটিতে মুখ গুঁজেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো বুলেটগুলোকে।

বনের ভেতর ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন হ্যাঙ্ক। ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলেন, আবারও ধাওয়া শুরু করেছে হেলিকপ্টারটা। আবার শুরু হয়েছে ইঁদুর-বেড়াল খেলা।

তবে এবারের অবস্থা আরও খারাপ। গুলি শেষ হয়ে গেছে হ্যাঙ্কের। গাছের সারির ফাঁক দিয়ে সামনে একটা গভীর নালা দেখতে পেয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক করে নিলেন প্রফেসর। আসলে নালা বলা হলেও পাহাড় থেকে নেমে আসা বরফগলা পানিতে ছোটোখাটো নদীতে পরিণত হয়েছে প্রশস্ত নালাটা। মারিয়াহ-কে সোজা ওই জলস্রোতে নামিয়ে দিলেন তিনি। ঘোড়াটা লাফিয়ে পানিতে পড়ার সাথে সাথে নড়ে উঠলেন হ্যাঙ্কও। কাইয়ের হাত ধরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পানিতে।

তাল সামলাতে না পেরে আঁতকে উঠল মেয়েটা, কয়েকবার হাবুডুবু খেয়ে ভেসে উঠে কাশতে লাগল। ইশারায় তাকে পানিতেই থাকতে বলে উঠে দাঁড়ালেন হ্যাঙ্ক, পেটে চাপড় দিয়ে ঘোড়াটাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন তিনি। মৃদু চিঁহিঁহিঁ স্বরে ডেকে ওঠে মনিবের আদেশ প্রতিপালন করল মারিয়াহ, ছুটে হারিয়ে গেল ঘন গাছের ভিড়ে।

"কেন?" ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল কাই।

জবাবে আঙুল তুলে উপরদিকে ইশারা করলেন হ্যাঙ্ক। হেলিকপ্টারটাও ঘোড়াটাকে অনুসরণ করতে করতে মাথার উপর দিয়ে পেরিয়ে গেল তাদের।

"দেহের তাপ," ব্যাখ্যা করলেন প্রফেসর। "এভাবেই এতোক্ষণ ধরে আমাদের ধাওয়া করছিল ওরা। এখনও মারিয়াহ-র শরীর থেকে নির্গত তাপ অনুসরণ করছে হেলিকপ্টারে থাকা ইনফ্রারেড সেন্সর।"

বুঝতে পেরেছে কাই। "আর এখানকার ঠান্ডা পানির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে আমাদের শরীরের অবয়ব।"

সায় দিয়ে মুচকি হাসলেন হ্যাঙ্ক। "বনের ভেতর একটা হেলিকপ্টারকে খসাতে না পারলে আর কীসের ইন্ডিয়ান হলাম আমরা।"

হেসে ফেলল মেয়েটাও।

"চলুন এবার।"

পানি থেকে উঠে পড়েছে কাউচ, একটা পাথরের বোল্ডারের উপর দাঁড়িয়ে প্রাণপণে গা ঝাড়ছে এখন। কাইও প্রাণীটাকে অনুসরণ করল। যতটা সম্ভব পানি ঝেড়ে নিল মাথা থেকে। পরনের জ্যাকেটটাও নিংরে নিল। গা ঝাড়ার সময় মেয়েটার

জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা সোনার প্লেট বের হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। জিনিসটা তুলে আবার কাইয়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন হ্যাঙ্ক। আবারও জ্যাকেটের ভেতর যথাস্থানে ফিরে গেল ওটা।

উপত্যকার নিচের দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রফেসর। "এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। থামলে চলবে না।"

"কোথায় যাব?" জিজ্ঞেস করল কাই, ঠান্ডায় এখনও দাঁতে দাঁত লেগে কটকট আওয়াজ করছে তার।

"লোকালয়ের দিকে। মারিয়াহ একবার বন থেকে খোলা মাঠে বেরিয়ে গেলেই ধোঁকাটা ধরে ফেলবে ধাওয়াকারীরা। আবারও আমাদের খোঁজে এদিকে ফিরে আসবে ওরা। তার আগেই যতদূর সম্ভব, এখান থেকে দূরে সরে যেতে হবে। সাহায্য করতে পারবে, এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।"

সরু একটা ট্র্যাক খুঁজে পেয়ে সেটা ধরেই এগিয়ে চলল তারা। কাইয়ের মনে পড়ল, প্রফেসর হ্যাঙ্কের সাথে দেখা হওয়ার আগে আঙ্কেল ক্রো-র সাথে কথা বলছিল সে। ওয়াশিংটনে থাকেন তিনি, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত বড় কী একটা পদে যেন কাজ করেন। সম্পর্কের দিক দিয়ে অবশ্য তারা খুব একটা কাছের আত্মীয় না, দেখাও হয়েছে মাত্র হাতেগোনা কয়েকবার। কিন্তু পিকোট গোত্রের ইন্ডিয়ানরা বাকি সবার থেকে আলাদা। কারও বিপদের সময় কাছের বা দূরের হোক, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সবাই।

"সাহায্য করতে পারবেন, এমন একজনকে চিনি আমি," বলে উঠল কাই।

হাঁটতে হাঁটতে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল সে। পানিতে ভিজে বন্ধ হয়ে আছে ফোনটা। অবশ্য চালু থাকলেও খুব একটা সুবিধা হত বলে মনে হয় না। পাহাড়ি এলাকায় নেটওয়ার্ক পাওয়া খুবই দুষ্কর। তখন উঁচু স্থানে ছিল বলেই হয়তো ধরা পড়েছিল একটা নেটওয়ার্ক বার।

তার কথায় সম্মত হলেন হ্যাঙ্ক। "ঠিক আছে। তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, বন থেকে বেরিয়ে একটা ফোনের নাগাল পাওয়া। আর সেটাও করতে হবে শিকারীরা আমাদের খোঁজ পেয়ে যাওয়ার আগেই। ষ্টেট পুলিশ বা ন্যাশনাল গার্ডকেও আমাদের অবস্থানের ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে হবে।"

কথাটা শুনে থমকে গেল কাই। "কিন্তু, ওরাই তো আমাদের মারার চেষ্টা করছে।"

"না। হেলিকপ্টারের গানারকে দেখেছি আমি। ফড়িংটা সরকারি হলেও আরোহীদের ইউনিফর্ম ন্যাশনাল গার্ডদের থেকে আলাদা ছিল, সম্ভবত কোনও মার্সেনারি গ্রুপ। তবে একটা ব্যাপার কিন্তু নিশ্চিত।"

"কী?"

হ্যাঙ্কের পরবর্তী কথাটা জমিয়ে দিল কাই-কে।

"ধাওয়াকারী লোকগুলো যে বা যারাই হোক না কেন, তোমাকে মৃত দেখতে চায় ওরা।"

অধ্যায় ৮
৩০ মে, রাত ৯:১৮
সল্ট লেক সিটি, উটাহ

"ও কী যোগাযোগের জন্য কোনও নাম্বার দিয়েছে?" দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার ড্রাইভারের পাশের সিটে উঠে বসতে বসতে ফোনে ক্যাটকে প্রশ্ন করলেন পেইন্টার। প্লেন ল্যান্ড করার আগে থেকেই টারমাকে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল সরকারি মনোগ্রাম লাগানো শেভি তাহোই মডেলের এসইউভি গাড়িটা।

কোয়ালস্কি ততোক্ষণে ড্রাইভিং সিটে বসে পড়েছে। গাড়ি চালানোর ব্যাপারে তার সীমাহীন আগ্রহের কথা জানা আছে পেইন্টারের। তাদের তৃতীয় সঙ্গী, রোনাল্ড শিন ইতিমধ্যে ন্যাশনাল গার্ডের একটা হেলিকপ্টারে করে রকি পর্বতের বিস্ফোরণস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছে। একটা কাজ সারতে হবে বলে আটকে গেছেন পেইন্টার, কোয়ালস্কিকে নিয়ে কাজটা শেষ করে সেখানে যাবেন তিনি।

ফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে ক্যাটের কণ্ঠ ভেসে শোনা গেল। "হ্যাঁ। সেই সাথে এটাও বলেছে, প্লেন ল্যান্ড করার সাথে সাথে যেন আপনি ওকে ফোন করেন। খুবই ভীত শোনাচ্ছিল মেয়েটার কথাগুলো।"

"নাম্বারটা দাও।"

ক্যাটের বলা নাম্বারটা মনে মনে কয়েকবার আউড়ে মুখস্ত করে নিলেন পেইন্টার।

বলে চলেছে ক্যাট, "কমান্ডার পিয়ার্স রিপোর্ট করেছিল।" নিজের সেকেন্ড ইন কমান্ডের কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা ধরতে পারলেন সিগমা ডিরেক্টর। "শেইচানের সাথে আছে ও।"

ফোনের গায়ে শক্ত হয়ে চেপে বসল পেইন্টারের আঙুলগুলো। "শেইচান আমেরিকায় ফিরে এসেছে!"

"হ্যাঁ।"

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পেইন্টার। মেয়েটার তো এখন আমেরিকায় থাকার কথা না। তবে খবরটা শুনে অবাক হননি তিনি। তার মতো সাংঘাতিক একজন ক্রিমিনালের পক্ষে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।

"কোনও খবর এনেছে ও?"

"হ্যাঁ। এচেলন-এর ব্যাপারে নাকি কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।" জবাব দিল ক্যাট।

"কী ধরণের অগ্রগতি?" জানতে চেয়ে সামনের সিটে বসা কোয়ালস্কির দিকে তাকালেন পেইন্টার। এচেলন হচ্ছে রহস্যময় সংগঠন গিল্ড-এর হর্তাকর্তাদের

সাংকেতিক নাম। খবরটা শুনে এই মুহূর্তে রাজধানী থেকে দূরে আছেন বলে আফসোস হচ্ছে তার।

"বিস্তারিত কিছু বলেনি গ্রে। শুধু ন্যাশনাল আর্কাইভে ঢোকার জন্য সাহায্য চেয়েছে। আজ রাতে নাকি মিউজিয়ামের এক কিউরেটরের সাথে দেখা করতে যাবে তারা।"

ভ্রূ কুঁচকালেন পেইন্টার। ন্যাশনাল আর্কাইভের সাথে শেইচানের কী সম্পর্ক? আমেরিকার মহামূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং কাগজপত্রের গুদামঘর বলা যায় জায়গাটাকে। গিল্ডের সাথে কী এসব কোনও কিছুর যোগাযোগ থাকা সম্ভব? মাথা থেকে আপাতত চিন্তাটা বাদ দিলেন তিনি। কব্জিতে আটকানো ঘড়ির দিকে তাকাতেই বুঝলেন, ওয়াশিংটনে এখন সন্ধ্যা। কিউরেটরের সাথে গ্রে-র দেখা করতে যাওয়ার আরও অনেক দেরি।

"কমান্ডার পিয়ার্স বলেছে, সাক্ষাতের পর বিস্তারিত বলবে আমাকে। কোনও খবর পাওয়ার সাথে সাথে আপনাকে ফোন করব আমি।"

"ঠিক আছে। আমি ততোক্ষণে আমার ভাতিঝির ব্যাপারটা সামলে নিচ্ছি। আশা করা যায় কাল সকালের আগেই ওয়াশিংটনে ফিরতে পারব।" বলে কলটা কেটে দিলেন পেইন্টার। তবে এক মুহূর্ত পরই আবার ফোনটা কানে ঠেকালেন তিনি। এবার কল করেছেন ক্যাটের থেকে পাওয়া কাই-এর সেই নাম্বারটায়।

রিং হওয়ার সাথে সাথে রিসিভ করা হলো কলটা, ভীতসন্ত্রস্ত একটা কণ্ঠ ভেসে এল অন্যপ্রান্ত থেকে।

"আঙ্কেল ক্রো?"

"কাই, কোথায় তুমি?"

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো মেয়েটা। তারপরই ফোনে কান্নার আওয়াজ পেলেন পেইন্টার। পাশ থেকে কথা বলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে তাড়া দিচ্ছে কেউ একজন।

"আমি...প্রোভোতে, ব্রিগহ্যাম ইয়ং ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে। ড. হেনরি কানোশ নামের এক প্রফেসরের অফিসে আছি এখন।"

নামটা চেনা চেনা মনে হলো পেইন্টারের। পরমুহূর্তেই মনে করতে পারলেন ব্যাপারটা। প্লেনে আসতে আসতে বিস্ফোরণস্থল থেকে আসা একটা রিপোর্ট পড়ছিলেন তিনি। ওখানে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর নামের সাথে এই প্রফেসরের নামও ছিল।

পেইন্টারকে ইউনিভার্সিটির ঠিকানাটা দিল কাই। সাথে সাথে ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা কোয়ালস্কিকে গন্তব্যটা জানিয়ে দিলেন তিনি।

"ওখানেই থাকো। এক ঘন্টার ভেতর প্রোভো-তে পৌঁছাচ্ছি আমি।"

কাই-এর বদলে অন্য একটা পুরুষ কণ্ঠ সাড়া দিল। "মি. ক্রো, আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম হ্যাঙ্ক কানোশ।"

"বিস্ফোরণে নিহত ড. মার্গারেট গ্র্যান্থামের সহকর্মী আপনি, সেই সাথে ঘটনাটার অন্যতম একজন প্রত্যক্ষদর্শীও।"

পেইন্টার তাকে চিনতে পেরেছেন শুনে কিছুটা অবাক হলেন হ্যাঙ্ক। "ম্যাগি...ওকে ম্যাগি বলে ডাকতাম আমি।" কণ্ঠে বেদনার সুর।

প্রফেসরের কথায় অব্যক্ত কষ্টটা অনুভব করতে পারলেন পেইন্টার। "ব্যাপারটার জন্য আমি দুঃখপ্রকাশ করছি।"

"ঠিক আছে। তবে আরেকটা বিষয় আপনাকে জানানো দরকার। কাই-কে নিয়ে বন থেকে পালানোর সময় ন্যাশনাল গার্ডের একটা হেলিকপ্টার আমাদের ধাওয়া করেছিল, আমাদের উপর গুলিও চালিয়েছিল লোকগুলো।"

"কী?" চেঁচিয়ে উঠলেন পেইন্টার। ন্যাশনাল গার্ড মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছে, এরকম কোনও খবর তো তার কানে আসেনি।

"তবে আমার মনে হয়, ধাওয়াকারীরা আসলে ন্যাশনাল গার্ড না। লোকগুলোর পরনে অন্যরকম ইউনিফর্ম ছিল, সম্ভবত একটা মার্সেনারি গ্রুপ। কোনওভাবে সরকারি হেলিকপ্টারটা ব্যবহার করেছে ওরা।"

এই কথাটা ভাবছেন পেইন্টারও। তথাকথিত টেরোরিস্ট অর্থাৎ কাই-কে খুঁজে পাওয়ার কিংবা তাদের উপর গুলি চালানোর খবর কোনও সংবাদমাধ্যম প্রচার করেনি। তার মানে, এর পেছনে যে বা যারই হাত থাকুক, খবরটাকে কোনওভাবে ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। আরেকটা ভয় জেঁকে বসল তার মনে। "প্রফেসর কানোশ, লোকগুলোকে আরেকবার দেখলে চিনতে পারবেন তো?"

দ্বিধা ফুটে উঠল প্রফেসরের কণ্ঠে। "উম...মনে হয় না। বেশিরভাগ সময় গাছের আড়ালে ছিলাম আমরা। দাঁড়ান...আপনি কি ভাবছেন, আমাদের পিছু নিয়ে এখানে চলে আসতে পারে ধাওয়াকারীরা? অবশ্য ব্যাপারটা আমার মাথায়ও এসেছিল।"

"আসতেও পারে," জবাব দিলেন পেইন্টার। "যেখানে থাকলে কেউ সরাসরি আপনার বা কাইয়ের নাগাল পাবে না, ওখানে কি এমন কোনও জায়গা আছে?"

এক মুহূর্ত ভাবার পর মুখ খুললেন হ্যাঙ্ক। "পার্শ্ববর্তী আর্থ-সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং-এ চলে যেতে পারি আমরা।"

"তাই করুন আপাতত। আমরা আসছি," বলে ফোন রেখে দিলেন পেইন্টার।

ইতিমধ্যে গন্তব্য অনুযায়ী ১৫ নাম্বার হাইওয়ে ধরে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে কোয়ালস্কি। "চল্লিশ মাইল দূরত্ব। জিপিএস-এর হিসাব অনুযায়ী পৌঁছাতে প্রায় বায়ান্ন মিনিটের মতো লাগবে," একটা সিগার ধরানোর ফাঁকে বলে উঠল বিশালদেহী লোকটা।

"বায়ান্ন মিনিট," বিড়বিড় করে বলে উঠলেন পেইন্টার।

বসের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল কোয়ালস্কি। "আপনি চাইলে সময়টুকু বায়ান্নর জায়গায় বেয়াল্লিশ মিনিটে নামিয়ে আনতে পারি আমি।"

সিটে হেলান দিয়ে বসলেন পেইন্টার। "তোমাকে বত্রিশ মিনিট সময় দেয়া হলো।"

খুশিতে বত্রিশ দাঁত বের করে হেসে ফেলল বিশালদেহী লোকটা। "আমাকে চ্যালেঞ্জ করা? দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।" কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে টপ গিয়ারে ছুটতে লাগল তাদের এসইউভি, একশো কিলোমিটার পেরিয়ে গেছে স্পিডোমিটারের কাঁটা।

ক্যাটের বলা কথাগুলো সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন পেইন্টার। উটাহ-তে এমন রহস্যজনক বিস্ফোরণ, শেইচানের আমেরিকায় ফিরে আসা, গিল্ডের নড়েচড়ে বসা...আসলে রহস্যময় সংগঠনটাকে অ্যাকশনে নামানোর জন্য এমন একটা ঘটনাই দরকার ছিল। এই সুবাদেই কিছু একটা ক্লু পেয়ে গেছে শেইচান।

অবশ্য মেয়েটার ভুলও হতে পারে, ভাবলেন তিনি। তবে তথ্যগুলো সঠিক হলেও চিন্তার কিছু নেই। মাঠে নেমে পড়েছে সিগমার অন্যতম সেরা এজেন্ট, কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স।

অধ্যায় ৯

৩০ মে, রাত ১১:৪৮

ওয়াশিংটন ডি.সি.

বিশালাকৃতির পিলারে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা ন্যাশনাল আর্কাইভ বিল্ডিং-এর দিকে এগোচ্ছে গ্রে। শেইচানও তার সাথেই আছে। বসন্তকাল হলেও শীত পুরোপুরি উধাও হয়নি। গরমকাল আসতে আর মাত্র অল্প কিছুদিন বাকি, তাই হয়তো বিদায়বেলায় শেষ কামড় বসিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। রাস্তায় যানবাহনের পরিমাণও খুব কম।

গ্রে-র পরনে কালো ট্রাউজার, ফুলহাতা আর্মি টি শার্ট, তার উপর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পশমের ওভারকোট, পায়ে বুট। তবে শেইচানকে দেখে মনে হচ্ছে, ঠান্ডা আবহাওয়া তার উপর কোনও প্রভাব ফেলছে না। পাতলা ব্লাউজের উপর জিপার খোলা মোটরসাইকেল জ্যাকেট আর নিম্নাঙ্গে উরু পর্যন্ত খাটো লেদারের প্যান্ট পরে আছে মেয়েটা। বুটপরা পায়ে সন্তর্পনে হাঁটছে, সেই সাথে চারপাশে সতর্ক নজর রাখতেও ভুলছে না। জানে, যে কোনও সময় যে কোনও দিক থেকেই বিপদ আসতে পারে তার উপর।

পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটছে দু'জন। খানিকটা দুরেই আর্কাইভ বিল্ডিং-এর বিশালাকায় ব্রোঞ্জের দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই একটা হলওয়ে সামনে পড়বে। দেয়ালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন ঝোলানো সেই হলওয়ে ধরে এগোলেই পৌছানো যাবে মূল ভবনে। জনসাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে, বিশেষ ধরণের কাঁচের বাক্সে হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে সবগুলো নিদর্শন। তবে এই শীতের রাতে যে ওখানে একটা কাকপক্ষীও থাকবে না, কথাটা ভালো করেই জানা আছে গ্রে-র।

তবে এতো রাতে শুধু এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখার উদ্দেশ্যেই এখানে আসেনি তারা দু'জন। বিভিন্ন ধরণের ছবি, দলিল-দস্তাবেজ, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি মিলিয়ে আমেরিকার ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত প্রায় দশ বিলিয়ন জিনিস আছে এখানে। নয় হাজার স্কয়ার ফুট আকৃতিবিশিষ্ট জায়গাটা থেকে কাঙ্ক্ষিত কাগজপত্রগুলো খুঁজে বের করতে হলে স্বভাবতই অভিজ্ঞ কারও সাহায্য দরকার হবে তাদের।

কাছাকাছি পৌছাতে ব্রোঞ্জের দরজাটা আপনাআপনিই খুলে গেল। ঘটনাটা কীভাবে ঘটল তা ভাবার আগেই দরজার পেছন থেকে চিকন একটা অবয়ব বেরিয়ে এল। লোকটার নাম ড. এরিক হেইসম্যান, প্রাচীন আমেরিকার ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ

হওয়ার পাশাপাশি আর্কাইভের একজন কিউরেটর তিনি। পেছন পেছন আসার জন্য ইশারা করে হলওয়ে ধরে হাঁটা শুরু করলেন ভদ্রলোক। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, এতো রাতে জরুরী তলব পেয়ে খুব একটা খুশি হননি।

"আপনাদের সহকর্মী ইতিমধ্যে এখানে পৌঁছে গেছেন।" অভ্যর্থনা জানানোর বদলে হাঁটার ফাঁকে বলে উঠলেন ড. হেইসম্যান।

লোকটার মাথা ভরা ধবধবে সাদা চুল, লম্বা হয়ে জামার কলার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সেগুলো। থুতনিতে ছোট করে ছাঁটা দাঁড়িগুলো চেহারাটাকে আরোও তীক্ষ্ণ রূপ দিয়েছে। গলায় ঝুলছে চেইনে বাঁধা একজোড়া রিডিং গ্লাস। জিন্স আর সোয়েটার পরনে থাকা সত্ত্বেও চেহারার অগোছালো ভাবটা বলে দিচ্ছে, তাদের আসার খবর পেয়ে অসময়ে ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে কিউরেটরকে।

তবে এছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না। প্রাচীন আমেরিকা সম্পর্কে ভালোভাবে জানে, চাহিদা পূরণের জন্য এখন এমন একজনকেই দরকার গ্রে-র।

হাঁটার ফাঁকে সে আর শেইচান হলওয়েতে ঝোলানো নিদর্শনগুলো দেখছিল। এমন সময় আবারও মুখ খুললেন হেইসম্যান। "আমাকে অনুসরণ করুন। প্রধান সংগ্রহশালার পাশেই একটা রিসার্চ রুমে সবার বসার ব্যবস্থা করে রেখেছি আমি। আপনাদের যা যা দরকার, আমার অ্যাসিস্টেন্ট সবকিছু যোগাড় করে দেবে। তবে এখনও আমার মাথায় ঢুকছে না ব্যাপারটা। এমনকি সুপ্রিমকোর্টও জানে, অফিস টাইম ছাড়া এখানে কারও ঢোকার অনুমতি নেই। ঠিক কেন আপনারা সাহায্য চাচ্ছেন, সেটা আগেভাগে জানিয়ে রাখলে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টগুলো গুছিয়ে রাখতে পারতাম আমি।"

কিউরেটরের মিষ্টিমধুর বাণী শুনতে শুনতে শেইচানের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল গ্রে। ঠিক তখনই আরেকটা ব্যাপার ধরতে পারল সে। মেয়েটার ডান কানের নিচে নতুন একটা ক্ষতচিহ্ন। যার মানে দাঁড়ায়, গিল্ডের ঝাঁপি থেকে সে যা-ই সরিয়ে থাকুক না কেন, তার জন্য কড়া মূল্য দিতে হয়েছে ওকে।

হেইসম্যানের পিছু পিছু কতক্ষণ হাঁটার পর অবশেষে ছোট একটা ঘরে এসে শেষ হলো তাদের যাত্রা। ঘরের একেবারে মাঝখানে একটা কনফারেন্স টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার সাজিয়ে রাখা। আগে থেকেই দু'টো চেয়ার দখল করে বসে আছে দু'জন। প্রথমজন এক যুবতী, গায়ের রঙ গাঢ় শ্যামলা। মেয়েটাকে দেখে গ্রে-র মনে হলো যেন ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা থেকে উঠে এসেছে। কালো রঙের আঁটোসাঁটো পোষাক আর প্রাণবন্ত চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, এখানে আসার আগে অন্তত কিউরেটর ভদ্রলোকের মতো ঘুমাচ্ছিল না সে।

পরিচয় করিয়ে দিলেন ড. হেইসম্যান। "শেরিন ডিউপ্রে, আমার অ্যাসিস্টেন্ট। পাঁচটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারলেও ফ্রেঞ্চ ভাষাটাই ওর সবচেয়ে প্রিয়।"

"পরিচিত হয়ে খুশি হলাম," উঠে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে এক হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা।

হ্যান্ডশেক করল গ্রে। কথার আঞ্চলিক টান শুনে আন্দাজ করল, খুব সম্ভবত আলজেরিয়ান হবে। ষাটের দশকের শুরুর দিকে ফ্রেঞ্চ কলোনীগুলোকে উচ্ছেদ করলেও তাদের ভাষার প্রতি টানটা এখনও অক্ষুন্ন আছে উত্তর আফ্রিকার দেশটায়।

"অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত," বলে উঠল গ্রে।

"কোনও সমস্যা নেই," জবাবটা এল চেয়ারে বসে থাকা অন্যজনের দিক থেকে। উত্তরদাতাকে খুব ভালো মতোই চেনে গ্রে। টেবিলের একপ্রান্তে বসে আঙুল দিয়ে তবলা বাজাচ্ছে সোয়েটশার্ট আর বলক্যাপ পরনে থাকা মঙ্ক কক্কালিস। মাথা নেড়ে শেরিনের দিকে ইশারা করল সে। "এমন একজন সুন্দরী সাথে থাকলে সময় কি আর খারাপ কাটে বল।"

তারিফ শুনে মুচকি হাসি খেলে গেল মেয়েটার ঠোঁটে।

গ্রে আর শেইচানের আগেই এখানে এসে পড়েছে মঙ্ক। সিগমা হেডকোয়ার্টার থেকে আর্কাইভ বিল্ডিং-এর দূরত্ব খুব একটা বেশি না। তার আসার খবরটা আগেই গ্রে-কে জানিয়ে দিয়েছিল ক্যাট। গর্ভকালীন অবস্থায় স্বামীর শ্যেনদৃষ্টি থেকে দূরে থাকার জন্যই মঙ্ককে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে মেয়েটা, ভাবল সে।

চেয়ারে বসে পড়ল হেইসম্যান ছাড়া বাকি সবাই। কোমরের পেছনে দু'হাত বেঁধে স্কুলমাস্টারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন কিউরেটর ভদ্রলোক। "তাহলে বলুন, কেন এই শীতের রাতে এখানে জড়ো হয়েছি আমরা?"

টেবিলে রাখা ফাইলটা খুলে, ভেতর থেকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা চিঠিটা বের করে আনল গ্রে। বাড়িয়ে দিল শেরিনের উদ্দেশ্যে। তবে অ্যাসিস্টেন্টের আগেই কাগজটা হাতে তুলে নিলেন হেইসম্যান। অন্য হাতে নাকের উপর বসিয়ে নিলেন গলায় ঝুলতে থাকা রিডিং গ্লাস।

"কী এটা?" বলে কাগজটার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চোখ বুলালেন তিনি। হাবভাব দেখে ফ্রেঞ্চ পড়তে পারেন না বলে মনে হলেও, চিঠির একেবারে নিচে প্রেরকের সাক্ষরটা ঠিকই চিনতে পারলেন কিউরেটর।

"বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন," বলে গ্রে-র দিকে তাকালেন তিনি। "এটা তো তার নিজের হাতের লেখা বলেই মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ। হাতের লেখাটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, এটা আসল। আর চিঠিটারও অনুবাদ... "

তবে গ্রে-র কথায় বাগড়া দিলেন হেইসম্যান। "কিন্তু এটা তো ফটোকপি। আসল কপিটা কোথায়?"

"সেটা জরুরী না।"

"অবশ্যই জরুরী," জোর দিয়ে বলে উঠলেন কিউরেটর। "ফ্র্যাঙ্কলিনের লেখা সব কাগজপত্রই পড়া আছে আমার। কিন্তু এটা তো আগে কখনও দেখিনি। আর এই ছবিটাও তো..." বলে টেবিলে রাখা কাগজগুলোর মাঝখান থেকে একটা স্কেচের দিকে ইশারা করলেন তিনি।

সাথে সাথে হাতে আঁকা ছবিটার দিকে তাকাল উপস্থিত সবাই। দু'পাশে দুই ডানা ছড়িয়ে রেখেছে একটা ঈগল। এক পায়ের থাবায় জলপাইয়ের একটা শাখা, অন্য থাবায় কতগুলো তীর আঁকা। ছবিটার উপর-নিচে সাংকেতিক ভাষায় কিছু লেখাও আছে।
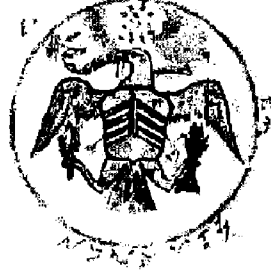
"আমেরিকার জাতীয় সীলের একটা খসড়া বলে মনে হচ্ছে জিনিসটা। কিন্তু চিঠিটা ১৭৭৮ সালে লেখা, আর সীলের নকশা সর্বপ্রথম ১৭৮২ সালে প্রকাশ করা হয়। না, মিললো না ব্যাপারটা। হয়তো এটা কোনও জালিয়াতি।"

"না।" কিউরেটরের কথায় সম্মতি দিল না গ্রে।

"মাফ করবেন," বলে উঠল শেরিন। "আপনি তো বললেন, চিঠিটা অনুবাদ করা হয়েছে, কিন্তু আপনি চাইলে আমি আবার লেখাগুলো মিলিয়ে দেখতে পারি।"

"বেশ তো," জবাব দিল গ্রে।

টেবিলের অন্যপ্রান্ত থেকে আবারও মুখ খুললেন হেইসম্যান। "বুঝতে পারছি, এই চিঠিটার জন্যই মাঝরাতে আমাদের এখানে ডেকে আনা হয়েছে। তবে দয়া করে আমাকে এটুকু বলুন, দুইশো বছর ধরে অপেক্ষা করতে থাকা জিনিসটা কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না কেন?"

জবাবে প্রথমবারের মতো মুখ খুলল শেইচান। "কারণ, কাগজগুলো এই পর্যন্ত আনতে প্রচুর রক্ত ঝরাতে হয়েছে।"

তার কথায় ভিড়মি খেয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন কিউরেটর। "ঠিক আছে, বুঝলাম। এখন তাহলে চিঠিটা সম্পর্কে শোনা যাক।"

বলতে শুরু করল গ্রে। "ফ্র্যাঙ্কলিন আর আরচার্ড ফোরটেস্কু নামের এক ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীর মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করেছে চিঠিটা। আমেরিকান সোসাইটি নামে পরিচিত তৎকালীন বিজ্ঞানীদের একটা সংগঠনের সদস্য ছিলেন ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক। আর সেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাও ফ্র্যাঙ্কলিন নিজেই।"

"হ্যাঁ। তাদের সম্পর্কে শুনেছি আমি," সায় দিলেন হেইসম্যান। "এটা আসলে আমেরিকান ফিলোসফিক্যাল সোসাইটির একটা শাখা, তবে বৈজ্ঞানিক কাজগুলোকেই বেশি প্রাধান্য দিত তারা। বিশেষ করে নেটিভ আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল এই সংগঠনটা। বলতে গেলে,

পুরনো ইন্ডিয়ান কবর আর ঢিবি খোঁড়াখুঁড়িকে নিজেদের নেশা বানিয়ে ফেলেছিল লোকগুলো।"

"চিঠিটাও এই ব্যাপারেই লেখা," মন্তব্য করল শেরিন। "কেনটাকিতে একটা অভিযানের ব্যাপারে ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোকের সাহায্য কামনা করেছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন," বলে চিঠিটা অনুবাদ করতে শুরু করল মেয়েটা। "-সাপের আকৃতির একটা পুরনো লম্বা ইন্ডিয়ান ঢিবি পুনরাবিষ্কার করতে হবে, আমেরিকার জন্য লুকিয়ে রাখা হুমকিটাকে খুঁজে বের করতে হবে।"

মুখ তুলে বাকিদের তাকাল শেরিন। "মনে হচ্ছে, খুব তাড়ার মধ্যে ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন," বলে নিজের কথাটা প্রমাণের জন্য আঙুল দিয়ে একটা লাইন স্পর্শ করল মেয়েটা। *"প্রিয় বন্ধু, অতি দুঃখের সাথে তোমাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, চোদ্দ নাম্বার কলোনী- ডেভিল কলোনী গঠন করার আশা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। গভর্নর জেফারসনের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় ইরোকি ঐক্যজোটের শামানদের উপর হামলা করা হয়েছিল। একজন বাদে বাকি সবাইকে খুন করেছে হামলাকারীরা। অন্যদের মৃতদেহের নিচে লুকিয়ে থেকে প্রাণে বেঁচে যায় লোকটা, যার ফলে গ্রেট এলিক্সার আর বিবর্ণ ইন্ডিয়ান সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। পালিয়ে আসার পর, শিংওয়ালা দানবের মাথার খুলির ভেতর থাকা একটা মানচিত্রের কথা বলেছে সেই শামান। খুলিটা নাকি একটা মহিষের চামড়ায় মুড়িয়ে কেনটাকির কোনও একটা ঢিবিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত লোকটার কথাগুলোর সত্যতা প্রমাণ করা না গেলেও, ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না আমাদের, শত্রুপক্ষের আগেই যে কোনও মূল্যে খুলিটা উদ্ধার করতে হবে। আরেকটা চিহ্নের ব্যাপারে খবর পেয়েছি আমি, আমাদের শত্রুরা নাকি এই চিহ্নের মাধ্যমেই নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়।"* এটুক পড়ার পর শেরিন কাগজটা উল্টে ধরল। অন্যপাশে কালো কালিতে একটা চিহ্ন আঁকা আছে। পরস্পরকে ছেদ করে চতুর্ভুজ আকৃতি গঠন করেছে ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো দুটো অবয়ব। চতুর্ভুজের মাঝখানে একটা চাঁদ আর একটা পাঁচমুখী তারা আঁকা।
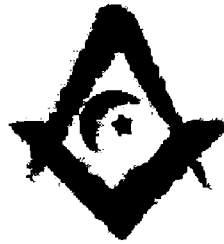
বাকি সবার দিকে নজর দিল মেয়েটা। "ফ্রিম্যাসনদের চিহ্নের মতো মনে হচ্ছে। কিন্তু তাদের চিহ্নে তো চাঁদ আর তারা থাকে না।"

চিহ্নটা ভালোভাবে দেখে মাথা নাড়লেন হেইসম্যান। "না, ফ্র্যাঙ্কলিন নিজেও একজন ফ্রিম্যাসন ছিলেন। নিজেদের ঐতিহ্যকে এভাবে বিকৃত করার কথা না তার। অবশ্যই এটা আলাদা কিছু হবে।"

ছবিটা দেখে চিন্তায় ডুবে গেছে গ্রে, কুঁচকে উঠেছে কপালের চামড়া। ব্যাপারটা মঙ্কেরও নজর এড়ায়নি। গ্রে-র মতো সেও ছবিটা চিনতে পেরেছে, এটা গিল্ডের প্রতীক।

একজন ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীকে লেখা বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের চিঠিতে এই চিহ্নটা কী করছে?

"কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিন বুড়ো একজন ফ্রেঞ্চ লোককে এই অভিযানে পাঠাতে চাইলেন কেন? কাছাকাছি কি অন্য কেউ ছিল না?" জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

"সম্ভবত, অন্য কেউ কাজটা করার মতো বিশ্বাসী ছিল না। নিশ্চয়ই তার কাছাকাছি লোকদের উপর নজর রাখছিল চিঠিতে উল্লেখিত সেই রহস্যময় শত্রুপক্ষ।" ব্যাখ্যা করল শেইচান।

"হতে পারে," সায় দিলেন হেইসম্যান। "তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার আছে। ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধের সময় আমেরিকানদের অন্যতম মিত্র ছিল ফ্রেঞ্চরা। তৎকালীন কলোনীগুলোর সাথেও ফ্রেঞ্চদের বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। পরস্পরের ব্যাপারে সবকিছু জানার পাশাপাশি একে অন্যকে যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করত তারা। এরকম একটা স্পর্শকাতর বিষয়ে যে ফ্র্যাঙ্কলিন কোনও ফ্রেঞ্চের সাহায্য চাইবেন, তা সহজেই অনুমেয়।"

"চিঠির পরবর্তী লাইনগুলোও তাই ইঙ্গিত করছে," বলে আবার পড়া শুরু করল শেরিন। "আরচার্ড, চিফ 'ক্যানাসাটিগো'-র একজন বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তুমিই কাজটার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। আর আমার মনে হয়, বিষ প্রয়োগে ক্যানাসাটিগোর মৃত্যুও আমাদের শত্রুপক্ষেরই একটা চাল। আশা করি, আমাকে হতাশ করবে না তুমি। যেভাবেই হোক, অভিযানটা সফল করতেই হবে।"

তার মানে, কিউরেটরের ধারণাই ঠিক। প্রাচীন ইন্ডিয়ান কলোনীগুলোর সাথে ভালো সম্পর্ক আছে বলেই আরচার্ডকে এই অভিযানের সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন, ভাবল গ্রে।

"এই ক্যানাসাটিগো আবার কে?" প্রশ্ন করল মঙ্ক।

বন্ধুর আকর্ষণ উপলব্ধি করতে পারল গ্রে। চিঠিতে বলা হয়েছে- ফ্র্যাঙ্কলিনের মতে, সেই রহস্যময় শত্রুপক্ষই নাকি খুন করেছে বুড়ো ইন্ডিয়ান চিফকে। আর পরবর্তী পৃষ্ঠায় আঁকা প্রতীকটা যদি কাকতালীয় না হয়ে থাকে, তবে গিল্ডই হচ্ছে সেই শত্রুপক্ষ। আমেরিকার জন্মলগ্ন থেকে এখনকার সিগমা পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে একের পর এক ঝামেলা পাকিয়ে চলেছে সংগঠনটা। ভাবতে গেলে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু তা যদি না হয় তবে এই কাগজপত্রগুলো গিল্ডের কাছে কী করছে?

বড় করে নিঃশ্বাস নিলেন হেইসম্যান। "চিফ ক্যানাসাটিগো," খুব ভক্তিভরে নামটা উচ্চারণ করলেন তিনি। "খুব কম লোকই এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে জানে। কিন্তু আমেরিকার জন্মের পেছনে খুব বড় ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি।"

"ইরোকি ঐক্যজোটের এই প্রধানের ব্যাপারে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন ড. হেইসম্যান," যোগ করল শেরিন।

প্রশংসা শুনে খানিকটা উজ্জ্বল হয়ে এল কিউরেটরের চোখের দৃষ্টি। "খুবই মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন ক্যানাসাটিগো। তৎকালীন সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নেটিভ আমেরিকান বলা হয় তাকে। তিনি এগিয়ে না এলে হয়তো বর্তমানে নেটিভ আমেরিকানদের সাথে আধুনিক বিশ্বের সম্পর্ক এতো ভালো হতো না।"

চেয়ারে হেলান দিল গ্রে। "তাকে কি ওইভাবেই খুন করা হয়েছিল?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন হেইসম্যান। "বিষ দিয়ে খুন করা হয় তাকে। খুনীকে ধরা সম্ভব না হলেও, কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে ওটা ব্রিটিশদের কাজ। আবার কেউ বলে, দলীয় কোন্দলের ফলে নিজের লোকদের হাতেই মারা যান তিনি।"

"মনে হয়, বুড়ো বেনের কথাই ঠিক।" যোগ করল মঙ্ক।

একটা চেয়ারে বসে চিঠিটার দিকে আগ্রহী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হেইসম্যান। গ্রে বুঝতে পারল, লোকটার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে তারা। এখন আর কিউরেটরকে দিয়ে জোর করে কিছু করাতে হবে না। নিজের উৎসাহেই তাদের সাহায্য করবেন তিনি।

"তো এই বুড়ো চিফকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন?" জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

আমেরিকার সীল আঁকা কাগজটা নিজের দিকে টেনে নিলেন হেইসম্যান, ঈগলের থাবায় ধরা তীরগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন। "এই কারণে," বলে বাকি সবার দিকে পালাক্রমে চোখ বুলালেন তিনি। "কেউ কী বলতে পারবেন, আমেরিকার সীলে ঈগলটা তীরের গুচ্ছ ধরে রেখেছে কেন?"

"এক থাবার জলপাইয়ের ডাল শান্তির প্রতিনিধিত্ব করে, আর যুদ্ধের প্রতীক হলো অন্য থাবার ধরে রাখা তীরগুলো।" জবাব দিল গ্রে।

প্রথমবারের মতো মুচকি হাসলেন কিউরেটর। "খুবই প্রচলিত ভুল ধারণা। থাবায় ধরা গুচ্ছে তেরোটা তীর আছে। ব্যাপারটা চিফ ক্যানাসাটিগোর সাথে সম্পর্কিত।"

হেইসম্যানের কথার প্রতিবাদ করল না গ্রে। জানে, তার কথা এখনও শেষ হয়নি।

"ছয়টা জাতি একত্রিত হয়ে ইরোকি ঐক্যজোট গঠন করেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে ছিল ১৫০০ সালে গঠিত এই মিত্রতা। হানাহানি ভুলে পারস্পরিক অধিকার বজায় রেখে কাজ করত ইরোকি ঐক্যজোট। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার মতোই একমত হয়ে সব ধরণের সিদ্ধান্ত নিত নির্বাচিত প্রতিনিধিরা।"

"বাহ, চমৎকার," উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল মঙ্ক।

"হ্যাঁ। ওনোনডাগা নামের একটা গোষ্ঠির প্রতিনিধি ছিলেন চিফ ক্যানাসাটিগো। ১৭৪৪ সালে আমেরিকার বিচ্ছিন্ন কলোনীগুলোর প্রধানের সাথে কথা বলেন তিনি, ইরোকি ঐক্যজোটের মতো একটা জোট গঠনের প্রস্তাব দেন। ওই মিটিং-এ বেঞ্জামিন

ফ্র্যাঙ্কলিনও উপস্থিত ছিলেন। ব্যাপারটাকে আরও বিশদভাবে, গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেন তিনি। মিটিং-এ সাউথ ক্যারোলিনার এক প্রতিনিধি- জন রুটলেজ ইরোকি জোটের নিয়মনীতিগুলো পাঠ করে শোনান। কথাগুলো শুরু হয়েছিল ঠিক এভাবেঃ আমরা, আমেরিকার নাগরিকরা, শান্তি স্থাপনের জন্য ঐক্যজোট গঠন করছি..."

"দাঁড়ান," কথার মাঝে বাগড়া দিল মঙ্ক। "এগুলো তো প্রায় আমেরিকার সংবিধানের মতোই মনে হচ্ছে। তার মানে আপনি বলতে চান, প্রাচীন কোনও ইন্ডিয়ান নীতিমালার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে আমাদের সংবিধান?"

"শুধু আমার না, এটা গোটা কংগ্রেসের বক্তব্য। ১৯৮৮ সালে সংবিধানের ৩৩১ তম সংশোধনীতে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, ইরোকি সংবিধানের মূলতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল আধুনিক আমেরিকার সংবিধান। স্বাধীনতার স্থপতিরা জাতীয় সীলের মধ্যেও ব্যাপারটার প্রমাণ রেখে গেছেন।"

"কীভাবে?" এবার প্রশ্ন করল গ্রে।

আবারও ঈগলের ছবিটার দিকে ইশারা করলেন হেইসম্যান। "১৭৪৪ সালে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের সাথে দেখা করে তাকে একটা তীর উপহার দেন চিফ ক্যানাসাটিগো। খানিকক্ষণ পরেই আবার তীরটা চেয়ে নেন তিনি, কনুই দিয়ে চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলেন জিনিসটা। তারপর লেদারে মোড়ানো তেরোটা তীরের একটা গুচ্ছ হাতে নেন ইন্ডিয়ান চিফ। এবার কনুই দিয়ে অনেক চেষ্টা করেও তীরগুলো ভাঙতে পারেন না তিনি। সেই তীরের গুচ্ছটা আবার ফ্র্যাঙ্কলিনকে উপহার দেন ক্যানাসাটিগো। কাজটার মাধ্যমে তিনি কী বোঝাতে চাইছেন, তা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল সবাই। শক্তিশালী হতে গেলে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে আমেরিকার তেরোটা কলোনীকে। সেই ঘটনার স্মৃতি হিসেবেই জাতীয় সীলে তেরোটা তীরের গুচ্ছ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"

হেইসম্যানের মুখে গল্পটা শুনতে শুনতে ছবিটা খুঁটিয়ে দেখছিল গ্রে। এক মুহূর্ত পরই অস্বস্তিকর ব্যাপারটা ধরতে পারল সে। "কিন্তু ছবিতে তো চোদ্দটা তীর দেখা যাচ্ছে।"

কথাটা শুনে ঘুরে তাকালেন কিউরেটর। "কী?"

ছবিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল গ্রে। "গুনে দেখুন। ঈগলের থাবায় চোদ্দটা তীর।"

ব্যাপারটা দেখার জন্য ছবিটার উপর ঝুঁকে পড়ল বাকিরা।

"তাই তো," সায় দিল শেরিন।

"এটা একটা খসড়া। হয়তো ভুলে তীরের ফলা একটা বেশি এঁকে ফেলেছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন।" মন্তব্য করলেন হেইসম্যান।

মাথা নাড়ল শেইচান। "কিংবা হতে পারে, জেনেশুনেই একটা তীর বেশি এঁকেছিলেন তিনি। চিঠিতে চোদ্দ নাম্বার একটা কলোনীর কথা উল্লেখ করেছেন ফ্র্যাঙ্কলিন। ওটা কী?"

আরেকটা ব্যাপার মনে পড়ল গ্রে-র। "চিঠিতে জেফারসনের সাথে ইরোকি জোটের প্রতিনিধিদের দেখা করার কথাও বলা আছে," কথাটা বলে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে কিউরেটরের দিকে তাকাল সে। "জেফারসন আর ফ্র্যাঙ্কলিন কি ওই তেরোটা কলোনীর বাইরে আরেকটা কলোনী গঠনের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছিলেন?"

"ডেভিল কলোনী," চিঠিতে উল্লেখিত নামটা উচ্চারণ করল মঙ্ক।

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। "হয়তো থাবার অতিরিক্ত তীরটা ওই অস্তিত্বহীন চোদ্দ নাম্বার কলোনীকেই নির্দেশ করছে।"

ব্যাপারটা সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছেন হেইসম্যানও। "যদি তাই হয়, তবে এই চিঠিটা আবার নতুন ইতিহাস লিখবে। কিন্তু এ ব্যাপারে এতোদিন কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি কেন?"

ফ্র্যাঙ্কলিনের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করল গ্রে। "কারণ পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হয়েছিল। আর কোনও কারণে সব ধরণের প্রমাণ বা কাগজপত্রগুলো লুকিয়ে ফেলতে হয়েছিল তাদের।"

"আপনার কথাই মানলাম। কিন্তু ইন্ডিয়ান ঢিবিতে কী লুকিয়েছিলেন তারা?"

মাথা নাড়ল গ্রে। "তা আমি কীভাবে বলব? হতে পারে সত্য উন্মোচন করতে সক্ষম, এমন কোন সূত্র। ফোরটেস্কু আর ফ্র্যাঙ্কলিনের পরবর্তী আলাপচারিতায় হয়তো এ সম্পর্কে জানতে পারব আমরা।"

পকেটে থাকা মোবাইলটা বেজে ওঠায় কথা বন্ধ করতে হলো গ্রে-কে। ফোনটা বের করে কলার আইডি চেক করতেই, ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে।

"মাফ করবেন, জরুরি কল এসেছে। কথা বলতে হবে।" বলে ঘরের এককোনায় চলে গেল গ্রে।

কল রিসিভ করে ফোনটা কানে ঠেকাতেই তার মায়ের ভয়ার্ত গলা ভেসে এল। "গ্রে...সাহায্য চাই আমার!" সাথে সাথে কিছু একটা পড়ার শব্দে কেটে গেল কলটা।

কলব্যাক করলেও লাভ হলো না, সুইচড অফ।

অধ্যায় ১০
৩০ মে, রাত ১০:০১
উইন্টাস পার্বত্য অঞ্চল, উটাহ

নরকের দ্বার পাহারা দিচ্ছেন মেজর অ্যাশলে রায়ান।

কমান্ড পোষ্ট থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে দাঁড়িয়ে, বিস্ফোরণস্থলের কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ক্রমাগত ফুটন্ত পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসছে জায়গাটা থেকে। সালফারের গন্ধে ঝাঁঝালো হয়ে আছে গোটা এলাকা। মাঝে মাঝে ছোটোখাটো ভূমিকম্প হওয়ায় কেঁপে উঠছে আশেপাশের পাহাড়চূড়া, গা থেকে খসিয়ে ফেলছে নানা আকৃতির পাথরের বোল্ডার।

রাত নামার সাথে সাথে কালিগোলা আঁধারে ঢেকে গেছে পুরো এলাকা। পরিস্থিতিটাকে আরও অশুভ করে তোলার জন্যই যেন ফোয়ারার কেন্দ্র থেকে জ্বলজ্বলে একটা আভা ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশে।

অবাঞ্চিত কাউকেই জায়গাটার কাছাকাছি আসতে দিচ্ছে না ন্যাশনাল গার্ড। চারপাশে তিন মাইল এলাকা জুড়ে বেষ্টনী তৈরি করেছে তারা, পাহারা দিচ্ছে এই ভুতুড়ে বিস্ফোরণস্থল। মেজর রায়ানের নেতৃত্বে উপত্যকায় ক্যাম্প বানিয়ে অবস্থান নিয়েছে ন্যাশনাল গার্ডের বিশেষ একটা স্কোয়াড। আগুন নেভানোর জন্য বিশেষ ট্রেনিং আছে সবারই। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে, আগুন-প্রতিরোধক পোশাক ছাড়া বিস্ফোরণস্থলের কাছে ঘেঁষছে না কেউ। একজোড়া মিলিটারি হেলিকপ্টার সারাক্ষণ মাথার উপর থেকে নজর রাখছে জায়গাটার উপর।

নিজের জন্য আগুন প্রতিরোধক বিশেষ পোশাক হাতে নিতে নিতে নতুন অতিথির দিকে তাকালেন মেজর। "তো আপনি বলছেন, এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন আপনি?"

একটা হেলমেট হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল নিজেকে রোনাল্ড শিন নামের সরকারি একজন ভূতাত্ত্বিক বলে পরিচয় দেয়া লোকটা। "হ্যাঁ, এজন্যই পাঠানো হয়েছে আমাকে। কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মেজর রায়ান। পনেরো মিনিট আগে হেলিকপ্টারে করে এখানে এসে পৌঁছেছে লোকটা। জায়গাটা পরিদর্শন করার জন্য ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো হয়েছে তাকে। অবশ্য তাতে মেজর খুব একটা খুশি হননি। সব কাজে অহেতুক নাক গলাতে পছন্দ করে সরকারি লোকেরা। ব্যাপারটা তার একদম পছন্দ না। নিজেকে সাধারণ একজন ভূতাত্ত্বিক বলে পরিচয় দিলেও, বলিষ্ঠ দেহ আর

কামানো মাথা দেখে রায়ানের মনে হলো, লোকটার অবশ্যই মিলিটারি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে।

মেজরের আগেই নিজের জন্য বরাদ্দ করা পোষাকটা গায়ে চড়িয়ে ফেলেছে শিন। "একাই যেতে পারব আমি," বলে যন্ত্রপাতির একটা বাক্স হাতে তুলে নিল সে।

"সে সুযোগ আপনি পাচ্ছেন না। যতক্ষণ এখানে আছেন, আপনার সবকিছু দেখভাল করার দায়িত্ব আমার উপরই বর্তায়," বলে নিজের একজন লোকের দিকে ইশারা করলেন মেজর। "প্রাইভেট বেলামি আর আমি আপনাকে বিস্ফোরণস্থলের কাছে নিয়ে যাব।"

তর্কে না গিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল শিন।

"চলুন তাহলে।" রায়ানের পোশাক পরা হয়ে গেছে। সবার আগে ফ্ল্যাশলাইট হাতে এগোতে লাগলেন তিনি।

বন থেকে বেরিয়ে বিস্ফোরণস্থলের কাছাকাছি এগোতেই উত্তাপটা টের পেতে শুরু করল সবাই। সালফারের গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়। হেলমেট মাথায় চড়িয়ে কৃত্রিম নিঃশ্বাসব্যবস্থা চালু করে দিলেন মেজর, বাকিদেরও তাই করতে ইশারা করলেন।

বিস্ফোরণকেন্দ্রের চারদিকে প্রায় ত্রিশ গজ জুড়ে ঢালু গর্তের মতো জায়গায় মসৃণ রূপ ধারণ করেছে পাথর। ঢালের প্রান্তে দাঁড়াতেই শিন বুঝতে পারল, ভেতরদিকে ওগুলো আসলে পাথর না...বালির দানার মতো ছোট ছোট পাথরের কণা। ঢালের শেষ প্রান্তে পাথর ভেদ করে উঁকি দিয়েছে ফোয়ারাটা, টগবগ করে ফুটছে পানির ধারা।

"একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের উপর বসে আছে এই পুরো এলাকাটা। বিস্ফোরণের ফলে ফাটল দেখা দিয়েছে সেই ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় স্তরে," মন্তব্য করল শিন।

সাবধানে এগোনোর জন্য তাকে সতর্ক করলেন মেজর। "ঢালু থেকে সামলে। পিছলে যেতে পারেন।"

সায় দিয়ে কিছুটা পিছিয়ে এল শিন, মেঝেতে এক হাঁটু গেড়ে বসে যন্ত্রপাতির বাক্সটা খুলতে শুরু করল। ভেতরে পাথর ভাঙার ছোট হাতুড়ি, কনটেইনার, কাঁচের জার, ব্রাশ ইত্যাদিসহ কয়েক ধরণের কেমিক্যাল দেখা যাচ্ছে। একটা হাতুড়ি বের করে বাকিদের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দিল সে।

"একটু সাহায্য লাগবে আমার। উপত্যকার প্রান্ত থেকে পাথরের ছোট একটা টুকরো সংগ্রহ করে দিন কেউ একজন।"

"কেন?" প্রশ্নটা মুখে উচ্চারণ করলেও, উত্তর পাওয়ার আগেই সাথের সৈনিককে কাজটা করার জন্য ইশারা করলেন মেজর।

"ঢালের নিচের পাথরের গুঁড়োর সাথে উপরের পাথরের তুলনা করব আমি।"

নিজের কাজ খুব ভালোভাবেই বোঝে বেলামি। একহাতে হাতুড়ি আর অন্যহাতে নমুনা সংগ্রহের একটা ব্যাগ নিয়ে উপত্যকার শেষমাথায় চলে গেল সে। আগে

মিলিটারিতে থাকলেও, একটা অভিযানে হাঁটুতে আঘাত পাওয়ার পর মিলিটারি থেকে ন্যাশনাল গার্ডে ট্রান্সফার করা হয় তাকে।

অন্যদিকে, লম্বা একটা অ্যালুমিনিয়ামের লাঠির একপ্রান্তে কাঁচের একটা ছোট জার আটকে নিয়েছে শিন, ঢালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিচের গুঁড়োর নমুনা সংগ্রহ করার জন্য ঝুঁকে পড়ল সে।

ঢালের শেষপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে আছেন মেজর। ক্রমাগত নিচের দিকে এগোনোর সাথে সাথে আরও সূক্ষ্ম আঁকার ধারণ করেছে পাথরের কণা।

নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে গেছে শিনের, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অ্যালুমিনিয়ামের লাঠিটা উঠিয়ে নিল সে। কিন্তু সামনে আনতেই দেখা গেল, চিড় ধরেছে কাঁচের জারে।

তাপের কারণে ফেটে গেল নাকি? সবেমাত্র প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলেন রায়ান, কিন্তু তার আগেই চোখের সামনে ভেঙে গেল গুঁড়োভর্তি জার। সবটুকু নমুনা সমেত ঢালের ভেতর হারিয়ে গেল ভাঙ্গা অংশটা।

অবাক হয়ে সামনে ঝুঁকে তাকাল শিন। জারের ভাঙা অংশসহ অ্যালুমিনিয়ামের লাঠিটা এখনও তার হাতেই ধরা। কিন্তু গলতে শুরু করেছে লাঠির আগায় আটকানো কাঁচের অংশটুকু। এক মুহূর্ত পর লাঠিটা নিজেও গলে যেতে লাগল, ক্রমাগত উঠে আসছে উপরের দিকে। আঁতকে উঠে জিনিসটা ঢালের ভেতর ছুঁড়ে দিল সে। একটা বর্শার মতোই পাথরের গুঁড়োর ভেতর গেঁথে গেল সেটা, কিন্তু পরক্ষণেই ডুবতে শুরু করল।

কিন্তু মেজর রায়ান খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছেন, ডুবছে না লাঠিটা।

"গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে ওটা," মন্তব্য করল শিন, মেজর রায়ানের মতো ব্যাপারটা তার মাথাতেও ঢুকেছে। "এখানে যাই ঘটে থাকুক, এখনও সক্রিয় আছে প্রক্রিয়াটা। সংস্পর্শে আসা সব জিনিসকে আণবিক স্তরে ভেঙে ফেলছে ওটা।"

"কিন্তু এটা হচ্ছে কীভাবে?" জিজ্ঞেস করলেন মেজর।

"জানি না।"

"বন্ধ করার উপায়?"

এবারও না-বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সিগমার ভূতত্ত্ববিদ।

দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করলেন রায়ান- ক্যান্সারের মতো আস্তে আস্তে পুরো এলাকাটাকে গ্রাস করে নিচ্ছে এই অভিশপ্ত গর্তটা, সেই সাথে ক্রমাগত নিচের দিকেও এগোচ্ছে। একটু আগে বলা শিনের কথাটা মনে হলো তার।

এই পুরো এলাকাটা একটা ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের উপর অবস্থিত।

ব্যাপারটা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যই যেন আবার ভূমিকম্প হলো, এবার আগের চেয়েও বড় রকমের। হিসহিস শব্দে লাফিয়ে উপরে উঠে গেল ফুটন্ত পানির ফোয়ারা।

গার্ড পোস্টের দিকে ইঙ্গিত করল শিন। "পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। খালি করে দিতে হবে পুরো এলাকা। অন্তত এক মাইল পেছনে সরিয়ে নিন আপনাদের ক্যাম্প।"

কথাটা মনে ধরেছে মেজর রায়ানের, পাথর কুঁদতে থাকা বেলামির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। "বাদ দাও। ক্যাম্পে ফিরে গুছিয়ে নাও সবকিছু।"

কিন্তু বেলামি নড়ে ওঠার আগেই, পাশের পাহাড় থেকে একটা বড় পাথরের টুকরো খসে পড়ল ঢালের ভেতর। ছিটকে উঠল ঢালের ভেতরে থাকা পাথরের গুঁড়ো। বেলামির ডানপায়ের নিচের দিকের পোশাকেও কিছুটা গুঁড়ো লেগে গেল।

"চলে এসো," আবারও চেঁচিয়ে উঠলেন রায়ান।

খানিকটা খুঁড়িয়ে, খানিকটা দৌড়ে তাদের পাশে চলে এল লোকটা। কুঁচকে রেখেছে চোখমুখ।

"কি হয়েছে?"

"পায়ে মনে হচ্ছে যেন আগুন জ্বলছে, স্যার।"

বেলামির পায়ের দিকে তাকালেন মেজর। আগুন-প্রতিরোধক পোশাক পরা অবস্থায় তো গরম গুঁড়ো থেকে গায়ের চামড়া নিরাপদেই থাকার কথা।

"শুইয়ে দিন ওকে," চেঁচিয়ে উঠল শিন। "তাড়াতাড়ি।"

কিন্তু মেজর নড়ে ওঠার আগেই উপত্যকার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল বেলামি। গলা দিয়ে বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এল লোকটার। "ধুশশালা!"

মেজর রায়ানের মাথায় কিছু ঢুকছে না। হচ্ছেটা কী এসব?

বেলামির হাঁটুর সামনে বসে পড়ল শিন, যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে একটা ছোট ছুরি হাতে তুলে নিয়েছে। ছুরিটা দিয়ে সৈনিকের হাঁটুর কাছ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত কাপড় কেটে ফেলল সে। ভেতরের দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠল মেজর।

চামড়া, মাংস ক্ষয়ে গিয়ে পায়ের সাদা হাড় বেরিয়ে এসেছে। ক্রমাগত আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষতটা।

ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চাইছে না রায়ানের। পরমুহূর্তে, তার চোখের সামনেই গলে যেতে শুরু করল সাদা হাড়।

"জিনিসগুলো আক্রমণ করেছে ওকে," মন্তব্য করল শিন। "পোশাক ভেদ করে বেলামির পায়ের নাগাল পেয়ে গিয়েছিল পাথরের গুঁড়োগুলো।"

"এ...এখন কী করব?" বিড়বিড় করে কোনওমতে জিজ্ঞেস করলেন রায়ান।

"একটা কুড়ালজাতীয় কিছু নিয়ে আসুন," আদেশ করল শিন। "তাড়াতাড়ি!"

তার গলার জোরেই হয়তো সম্বিত ফিরে পেলেন মেজর, ছুট লাগালেন ক্যাম্পের দিকে।

সাবধানে বেলামির পায়ের বাকি কাপড়টুকুও কেটে ফেলল শিন। খেয়াল রাখল, কোনওভাবে যেন হাতে না লেগে যায়। কাটা হয়ে গেলে চিমটা দিয়ে ধরে ঢালের ভেতর ছুঁড়ে ফেলল কাপড়টুকু। মেজর আসার আগেই নিজের কোমর থেকে বেল্ট খুলে আরেকটা কাজ সেরে রাখল সে।

"না!" তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আর্তনাদ করার ফাঁকে চেঁচিয়ে উঠল বেলামি। যন্ত্রণায় ক্ষীণ হয়ে এসেছে লোকটার কণ্ঠ।

"এটাই একমাত্র উপায়," জবাব দিল শিন। "তাছাড়া তোমাকে বাঁচানোর আর কোনও রাস্তা নেই।"

তার কথাই সত্যি, বুঝতে পেরে চুপ হয়ে গেল হতভাগ্য সৈনিক। বেঁচে থাকতে হলে এখন চড়া মূল্য দিতে হবে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত পর একটা কুড়াল হাতে ফিরে এলেন মেজর রায়ান, সাথে করে দু'জন লোকও নিয়ে এসেছেন। ততোক্ষণে বেলামির উরুতে বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে শিন।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল রায়ানের সাথে আসা দুই সৈন্য।

হতাশভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মেজর। বেলামির পা দেখে মনে হচ্ছে যেন হাঙর আক্রমণ করেছিল তাকে। ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে আসছে হাড়-মাংস ক্ষয় করে দেয়া সেই অদ্ভুত ক্ষত। ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে হাঁটুর কাছাকাছি।

কুড়ালটা নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল শিন। মাথা নেড়ে তাকে মানা করে দিল মেজর। "ও আমার লোক, তাই দায়িত্বটাও আমার," বলে দুহাতে কুড়ালটা মাথার উপর তুলে ধরলেন তিনি। কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন রয়ে গেছে। "হাঁটুর উপরে, না নিচে?"

শিনের মুখের ফ্যাকাশে ভাবই তার হয়ে উত্তরটা দিয়ে দিল।

ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মেজর রায়ান। শরীরের সব শক্তি একত্রিত করে কুড়ালটা নামিয়ে আনলেন হতভাগ্য বেলামির ডানপায়ের হাঁটুর একটু উপরে।

অধ্যায় ১১
৩০ মে, রাত ১০:২০
প্রোভো, উটাহ

দরজা খুলে কোনওরকমে গাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলেন পেইন্টার ক্রো। সল্ট লেক সিটি থেকে প্রোভো পর্যন্ত, কোয়ালস্কির ধুন্ধুমার ড্রাইভিং তার মতো কঠিন লোকের অন্তরাত্মাও একেবারে কাঁপিয়ে দিয়েছে। মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখার জন্য অবশ্য মাঝখানে একবার তার গার্লফ্রেন্ড–লিসাকে ফোন করেছিলেন সিগমা ডিরেক্টর, তবে তাতে কোনও কাজ হয়নি। যানজটে আটকে বসে থাকার বদলে রং সাইড দিয়ে গাড়িটাকে যেন উড়িয়ে এনেছে কোয়ালস্কি।

অবশেষে এসইউভি-র ইঞ্জিন বন্ধ করে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল বিশালদেহী লোকটা। "আটাশ মিনিট, নির্ধারিত সময়ের চেয়েও চার মিনিট কম। অর্থাৎ, আপনার কাছে আমার একটা সিগারেট পাওনা রইল ডিরেক্টর।"

"গ্রে-র কথা না শুনে ভুল করেছি বলে মনে হচ্ছে," পড়ে যেতে যেতে কোনওমতে ভারসাম্য রক্ষা করলেন পেইন্টার। "তোমাকে চাকাওয়ালা কোনওকিছু থেকে দূরে রাখার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল সে।"

শ্রাগ করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কোয়ালস্কি। "ঐ ব্যাটা কী জানে? ও তো সারাদিন সাইকেলে প্যাডেল মেরে টোটো করে পুরো ওয়াশিংটন ঘুরে বেড়ায়, গাড়ির মর্ম ও কী বুঝবে? সাইকেল হলো বিচিছাড়া মানুষদের বাহন।"

জবাবে বলার মতো কথা খুঁজে পেলেন না পেইন্টার, সিগমার নতুন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। পার্কিং লটে গাড়িটা রেখে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের দিকে হাঁটা শুরু করলেন দু'জন।

হাঁটুপর্যন্ত লম্বা একটা ওভারকোট পরে আছে কোয়ালস্কি। তাতে পায়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো মসবার্গ পাম্প-অ্যাকশন শটগানটা ঢাকা পড়ে গেছে। অস্ত্রটার একটা বিশেষত্ব আছে- সাধারণ বুলেটের বদলে তারবিহীন টেজার শেল লোড করা আছে শটগানটায়। একেকটা গুলি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সারা শরীর সাময়িকভাবে অসাড় করে দেয়ার মতো ইলেক্ট্রিসিটি ধারণ করে।

তার মতো একজন বিধ্বংসী লোকের পক্ষে এরকম অস্ত্রই ঠিক আছে, ভাবলেন পেইন্টার।

রাতের বেলায় ইউনিভার্সিটি এলাকায় লোকজনের আনাগোনা প্রায় নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে কয়েকজন ছাত্রকে আসা-যাওয়া করতে দেখা যাচ্ছে শুধু।

ক্যাম্পাসের বিল্ডিংগুলোতে হিমেল স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছে দূর পাহাড় থেকে আসা শীতল বাতাস।

ইন্টারনেট থেকে পুরো ইউনিভার্সিটি এলাকার মানচিত্র সেলফোনে ডাউনলোড করে নিয়েছেন পেইন্টার। আর্থ-সায়েন্স বিল্ডিং-এর একটা ল্যাবে দেখা করার কথা বলেছিলেন প্রফেসর কানোশ। মানচিত্রে জায়গাটা চিহ্নিত করে আগে আগে হাঁটা শুরু করলেন ডিরেক্টর।

আর্থ-সায়েন্স বিল্ডিংটা ক্যাম্পাসের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। ছাদের উপর প্রায় তিনতলা সমান উঁচু, কাঁচের ডোমওয়ালা বিশালাকায় অবজারভেটরি থাকায় সহজেই চেনা গেল ওটা। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ভ্রূ কুঁচকে গেল কোয়ালস্কির। সিলিং থেকে একটা পেন্ডুলাম ঝুলছে। একপাশে একটা ক্যাফের দরজা থাকলেও এখন বন্ধ আছে ওটা।

"এখন কোনদিকে?" জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি।

"বেসমেন্টের পদার্থবিদ্যা ল্যাবে ওদের সাথে দেখা করার কথা।"

"নিচে কেন?"

প্রশ্নটা যুক্তিযুক্তই বটে। কিন্তু প্রফেসর হ্যাঙ্ক বলেছেন, নিচের ল্যাবে কিছু একটা নিয়ে গবেষণা চলছে। ব্যাপারটা নাকি তাদের কাজের সাথে সম্পর্কিত। মানচিত্রটা আবার দেখে নিচে নামার সিঁড়িটা চিহ্নিত করলেন পেইন্টার। তবে বেসমেন্ট বলা হলেও ল্যাবটা আসলে মূল বিল্ডিং- এর নিচে, উত্তরদিকে আলাদাভাবে বানানো হয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার পর কাঙ্ক্ষিত ঘরটা খুঁজতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। খালি হলওয়েতে উচ্চস্বরে কথা বলার আওয়াজ শুনেই ল্যাবের অবস্থান টের পাওয়া গেল। খোলা দরজা দিয়ে ঘরে একবার উঁকি দিলেন পেইন্টার, সাথে সাথে হোলস্টারে রাখা পিস্তলের বাঁটে চলে গেল তার হাত। প্রফেসর কানোশের দিকে একটা ছুরি উঁচিয়ে রেখেছে সাদা ল্যাবকোট পরা এক ব্যক্তি। কিন্তু এক মুহূর্ত পরই নিজে সামলে নিলেন সিগমা ডিরেক্টর। ভয়ের বদলে প্রফেসর কানোশের চোখে কৌতুহলের ছাপ দেখা যাচ্ছে, ল্যাবকোট পরা লোকটাকে কোনও অবাঞ্ছিত আগন্তুকের বদলে প্রফেসরের সহকর্মী বলেই মনে হলো। আর তার হাতে ধরা ছুরিটাও বেশ পুরনো, সম্ভবত কোনও ঐতিহাসিক নিদর্শন।

"আমরা যেই জিনিসটা খুঁজছি, এটা তার একটা প্রমাণ হতে পারে!" বলে হাতের ছুরিটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ল্যাবকোটধারী লোকটা। "কিন্তু তুমি এমন জেদ দেখাচ্ছো কেন?"

জবাবে কিছু বলার আগেই পেইন্টার আর কোয়ালস্কিকে ঘরে ঢুকতে দেখলেন হ্যাঙ্ক। এক সেকেন্ড পর তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ব্যাপারটা ধরতে পারল ল্যাবকোটধারী।

ল্যাব হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ঘরটার একপ্রান্তে, লম্বা একটা টেবিলের পাশে বসে আছেন তারা দু'জন। ঘরে থাকা বাকি জিনিসপত্রগুলোকে উদ্ভাসিত করছে জ্বলতে

থাকা কয়েকটা ফ্লোরোসেন্ট লাইট। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দক্ষতা থাকায় কিছু যন্ত্রপাতি চিনতে পারলেন পেইন্টার- ম্যাস স্পেকট্রোমিটার, বিদ্যুৎ-নিরোধী বাক্স, বিভিন্ন আকারের কাঁচের জার, ব্যাটারি ইত্যাদি। তবে দেয়ালের খোপে রাখা বিশেষ একটা যন্ত্র তার মনোযোগ আকর্ষণ করল- কতগুলো মনিটর লাগানো একটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। মনিটরগুলো সচল থাকায় বোঝা গেল, চালু আছে জিনিসটা।

"আঙ্কেল ক্রো?"

মাইক্রোস্কোপের অন্যপাশে, ছায়ার ভেতর থেকে ভেসে এল কণ্ঠটা। বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একজন যুবতী মেয়ে......কাই।

"তুমি ঠিক আছো তো?" প্রশ্নটা করেই পেইন্টার বুঝতে পারলেন, এমন পরিস্থিতিতে এই প্রশ্ন করা বোকামি হয়ে গেছে।

বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে হ্যাঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। পেইন্টারও তার পিছু পিছু এগোলেন। প্রায় তিন বছর আগে, তার বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কাইয়ের সাথে শেষ দেখা হয়েছিল তার। মাঝের এই সময়টুকুতে বেশ বড় হয়ে উঠেছে সে, কিশোরী থেকে পরিণত হয়েছে পূর্ণ যুবতীতে। তবে মেয়েটার চোখজোড়া বলে দিল, বয়স বাড়ার সাথে সাথে কাঠিন্যও ভর করেছে তার উপর।

কাই-এর অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারলেন পেইন্টার। মা-বাবার মৃত্যুর পর কারও সাহায্য পায়নি এতিম মেয়েটা। নিষ্ঠুর সমাজে একা একা পথ চলতে হয়েছে ওকে। অপরাধবোধে ছেয়ে গেল পেইন্টারের মন, মেয়েটার জন্য কিছু করা উচিত ছিল তার। তখনই পদক্ষেপ নিলে হয়তো আজ এই দিনটা দেখতে হতো না।

"আসার জন্য ধন্যবাদ," বলে উঠলেন প্রফেসর কানোশ। হ্যান্ডশেকের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। "হয়তো আপনার সাহায্যে, বর্তমান পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাব আমরা।"

বাড়িয়ে ধরা হাতটা ধরে ঝাঁকি দিলেন পেইন্টার। "আমিও তাই আশা করি," বলে প্রফেসরের সহযোগীর দিকে তাকালেন। বুঝতে পারছেন না, লোকটার সামনে কথাগুলো বলা ঠিক হচ্ছে কি না।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই হয়তো হাত বাড়িয়ে দিলেন ল্যাবকোটধারীও। তবে তার হাবভাবে আন্তরিকতার চাইতে চ্যালেঞ্জের ছাপ ফুটে উঠতে দেখলেন পেইন্টার। বয়সে প্রায় হ্যাঙ্কের সমান হলেও চেহারায় একে অপরের থেকে বেশ ভিন্ন তারা। রোদে পুড়ে প্রফেসরের গায়ের রং তামাটে হয়ে গেলেও ল্যাবকোটধারীর গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে সাদা। গাল, থুতনির চামড়া ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে, যেন মাধ্যাকর্ষণের টান তার প্রতি খানিকটা বেশিই। পেইন্টার আন্দাজ করলেন, হয়তো কিছুদিন আগে স্ট্রোক করেছিলেন ভদ্রলোক, অথবা দিনের বেশিরভাগ সময় বিশুদ্ধ আলো-বাতাসহীন ভূগর্ভস্থ ল্যাবে কাজ করার ফলেই এই অবস্থা হয়েছে তার।

"ড. ম্যাট ডেন্টন," পরিচয় করিয়ে দিলেন হ্যাঙ্ক। "পদার্থবিদ্যা ডিপার্টমেন্টের প্রধান, সেই সাথে আমার ছোটবেলার বন্ধু। বর্তমান পরিস্থিতি ওকে পুরোটাই

জানিয়েছি আমি। ওর সামনে কথা বলতে কোনও সমস্যা নেই। আর হ্যাঁ, আমাকে হ্যাঙ্ক বলে ডাকলেই খুশি হব।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন পেইন্টার। "ঠিক আছে। এবার তাহলে ঘটনাটা আমাকেও শোনান আরেকবার।" তবে তার আগে কোয়ালস্কিকে নিজের ব্যক্তিগত সহকারী বলে বাকিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি।

কোয়ালস্কির সাথেও হ্যান্ডশেক করলেন হ্যাঙ্ক। "একটা ব্যাপার আগেই বলে নিই, বিস্ফোরণটার সাথে কাই-এর কোনও সম্পৃক্ততা নেই। ঘটনাটার কারণ ওর ব্যাগে থাকা বোমাগুলো না।"

তার কথায় বিশেষ একটা টান লক্ষ্য করলেন পেইন্টার। জানেন, বিস্ফোরণে নিহত বিজ্ঞানী মহিলার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল হ্যাঙ্কের। একপাশে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রফেসরের একটা হাত ধরে আছে কাই।

কথাটা শুনে বিড়বিড় করে উঠল কোয়ালস্কি। "আগেই বলেছিলাম, মালটা সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ না।"

তার কথায় পাত্তা না দিয়ে আবারও প্রফেসরের দিকে তাকালেন পেইন্টার। "তাহলে কী মনে হয়, কেন ঘটল বিস্ফোরণটা?"

"উত্তরটা খুবই সহজ," শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন হ্যাঙ্ক। "একটা ইন্ডিয়ান অভিশাপের ফলেই বিস্ফোরণটা ঘটেছে।"

রাত ১০:৩৫

রাফায়েল সেইন্ট জার্মেইন-কে হেলিকপ্টার থেকে নামতে সাহায্য করল দু'টো হাত। রোটরের তীব্র বাতাসের ফলে হেলিপ্যাডের সব ধুলোবালি উড়ে গিয়েছে অনেক আগেই। হেলিকপ্টার থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়ানোর মতো কাজও কারও সাহায্য ছাড়া করতে পারেন না তিনি। ছোট একটা লাফও তার শরীরের কাঠামোর জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

নিজেকে রেফ বলে পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করেন রাফায়েল। জন্ম থেকেই ব্রিটল বোন ডিজিজ নামের এক ধরণের প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত তিনি। যার ফলে তার শরীরের হাড় সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশ সরু, উচ্চতাও বেশ কম। চৌত্রিশ বছর বয়সের পক্ষে বেশ বয়স্ক দেখায় তাকে।

বিভিন্ন ধরণের হরমোন ব্যবহার করে শারীরিক দুর্বলতা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন রেফ। কিন্তু তার আসল ক্ষমতা হাড় বা উচ্চতায় না, মাথায়।

হেলিপ্যাডে দাঁড়িয়ে তারাভরা রাতের আকাশের দিকে তাকালেন রেফ। প্রতিটা প্রধান প্রধান তারা, নক্ষত্রপুঞ্জ আর ছায়াপথকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন তিনি। চরম বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারি রেফ। ছোটবেলা থেকেই সামনে যা পেয়েছেন, ঢুকিয়ে নিয়েছেন ফটোগ্রাফিক মেমরিতে। প্রকৃত অর্থেই, বুভুক্ষের মতো গিলে খেয়েছেন সব ধরণের বিদ্যা।

এই বিশেষ ক্ষমতার জন্য তার কাছে অনেক প্রত্যাশা ছিল পরিবারের। রেফও শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করে দূর করেছেন সামনে আসা একের পর এক প্রতিবন্ধকতা। তবে প্রায় সময় ঘরে বসে থাকলেও, এখন বিশেষ একটা কাজ সারতে বাইরে বেরোতে হয়েছে তাকে। ভালোভাবে কাজটা সারতে পারলে ব্যাপারটা তার পরিবারের জন্য অনাবিল সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

বলা হয়ে থাকে, ফ্রেঞ্চ বিপ্লবের অনেক আগেই উদ্ভব ঘটে সেইন্ট জার্মেইন পরিবারের। তাদের ঐশ্বর্যের বেশিরভাগও নাকি যুদ্ধের মাধ্যমেই প্রাপ্ত। আর বর্তমানে সেই ঐশ্বর্যকে কাজে লাগিয়ে বৈশ্বিক ব্যবসাবাণিজ্যের অন্যতম দিকপাল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে পরিবারটা।

বাবার মৃত্যুর পর রেফ নিজেই পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরেছেন। গোটা বিশ্বজুড়ে অগণিত ল্যাব আর কোম্পানির গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা করছে সেইন্ট জার্মেইন রিসার্চ এন্টারপ্রাইজ। বিশেষ করে ন্যানোটেকনোলজি আর মাইক্রোইলেকট্রনিকস এর ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহ তাদের কোম্পানির। রেফ- এর নিজের নামেই তেত্রিশটা পেটেন্ট করা আছে।

তবে সমৃদ্ধির পাশাপাশি জার্মেইন পরিবারের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে জানেন রেফ। বিশেষ একটা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক আছে তাদের। একহাতে মাথার পেছনদিকে স্পর্শ করলেন তিনি, চুলের আড়ালে খানিকটা জায়গা চেঁছে ফেলে সেখানে একটা ট্যাটু আঁকা হয়েছে। সেই গোষ্ঠীর সাথে তাদের সম্পর্কের স্বীকৃতি দিচ্ছে চিহ্নটা।

হাত নামিয়ে নিলেন রেফ। বিশেষ একটা কাজের নির্দেশনা দিয়ে তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। নিজেকে প্রমাণ করে জার্মেইন পরিবারকে আরও সমৃদ্ধিশালী বানানোর সুবর্ণ সুযোগ এখন তার সামনে।

তাকে ধরে রাখা মানুষটার দিকে ফিরে মুচকি হাসলেন রেফ। "ছাড়ো, আশান্দা।"

সরকারীর বাড়িয়ে দেয়া লাঠিতে শরীরের ভর রেখে, বাকিদের হেলিকপ্টার থেকে নামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

রেফের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কুচকুচে কালো গায়ের রঙ আর ছয় ফুটেরও বেশি উচ্চতার অধিকারী আশান্দা। তার খাটো আকৃতির পাশে মহিলাকে পাহাড়ের মতো বিশাল দেখাচ্ছে। পরিবারের লোকজন ছাড়া ছোটোবেলা থেকে রেফকে দেখে আসছে এমন শুধু আশান্দাই আছে। নার্সের ভূমিকার পাশাপাশি তার বডিগার্ড হিসেবেও কাজ করে সে। ছোটোবেলায় রেফের বাবা তাকে তিউনিশিয়ার এক বস্তি থেকে উদ্ধার করেছিলেন। জিভ কেটে ফেলে কৃতদাসী হিসেবে বিক্রি করার জন্য বাজারে ওঠানো হয়েছিল মেয়েটাকে। উদ্ধার করার পর তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন ভদ্রলোক, পরিচয় করিয়ে দেন হুইলচেয়ারে বসা ছোট্ট একটা প্রতিবন্ধী ছেলের সাথে। সেই থেকে বন্ধু এবং অভিভাবক হিসেবে রেফের সাথেই বড় হয়েছে সে।

হেলিপ্যাডের সামনে থাকা ম্যানসনের দিকে তাকালেন রেফ। জায়গাটার মালিক কে, জানেন না তিনি। প্রোভো শহরের দিকে মুখ করে থাকা একটা পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত বিশাল বাড়িটা। বিশেষ কাজটা সারার জন্যই এখানে পাঠানো হয়েছে তাকে।

রেফের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে কাজ করে বার্ন নামধারী এক জার্মান মার্সেনারী। আগে স্পেশাল ফোর্সের সদস্য ছিল সে। আপাদমস্তক কালো পোশাক পরে বসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। লম্বা গড়ন, কালো চোখের শীতল দৃষ্টিসম্পন্ন বার্ন যেন রেফের মনেরই অন্ধকার দিকটার প্রতিচ্ছবি।

"স্যার, কাজে নামার জন্য পুরোপুরি তৈরি আমরা। ক্যাম্পাস বিল্ডিং-এ টার্গেটকে চিহ্নিত করা গেছে। এখন শুধু আপনার আদেশের অপেক্ষা।"

"বেশ ভালো," জবাব দিলেন রেফ। "কিন্তু সবাইকে জীবিত চাই আমি, অন্তত সোনার প্লেটগুলো উদ্ধার করার আগপর্যন্ত কারও যেন ক্ষতি না হয়। বোঝা গেছে?"

"ঠিক আছে, স্যার।"

ঘোড়ার পিঠে করে পালাতে থাকা প্রফেসর আর মেয়েটার কথা মনে করলেন রেফ। হেলিকপ্টারে লাগানো ক্যামেরার ফুটেজ থেকে চেহারা-শনাক্তকরণ সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রফেসরের নাম, ঠিকানা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। আর পালানোর পর যে শিকার নিজের ডেরা, অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসেই ফিরে আসবে, তা আন্দাজ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তাকে।

লোকটার নির্বুদ্ধিতার কথা বিবেচনা করতেই হাসি পেল রেফের। অবশ্য তাকে ঠিক বোকাও বলা যায় না, বুদ্ধি খাটিয়ে বন থেকে ঠিকই পালিয়ে গিয়েছিলেন বুড়ো প্রফেসর। এবার আর তেমনটা হতে দেয়া যাবে না।

"যাও," নিজের লোকদের কাজে নেমে পড়ার আদেশ দিলেন রেফ। "নিয়ে এসো ওদেরকে আমার কাছে। আর এবার যেন কোনও ভুল না হয়।"

রাত ১০:৪০

"ইন্ডিয়ান অভিশাপ? মানে কী?" প্রশ্ন করলেন পেইন্টার।

"জানি, ব্যাপারটা হাস্যকর শোনায়," জবাব দিলেন হ্যাঙ্ক। "কিন্তু গুহাটা সম্পর্কে এতোকাল ধরে চলে আসা লোককথাকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যুগের পর যুগ ধরে নেটিভ আমেরিকান গোত্রপ্রধানরা একটাই কথা বলে আসছেন- সেই গুহায় অনধিকার প্রবেশকারী কেউ বাইরে বেরিয়ে এলেই হুমকির মুখে পড়ে যাবে গোটা পৃথিবী। আর যারা কথাগুলো বলেছেন, তারা কেউই ফেলনা লোক না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শামান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তারা। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এসব গোত্রপ্রধান।"

নাক দিয়ে ঘোঁত করে উঠল কোয়ালস্কি।

শ্রাগ করলেন প্রফেসর। "আমার মতে, এই পুরনো কাহিনীটা পুরোপুরি অতিপ্রাকৃত না হলেও কিছুটা গুরুত্ব রাখে অবশ্যই। মনে হয়, গুহায় অস্থিতিশীল কিছু একটা লুকানো ছিল। আমাদের মাধ্যমেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে জিনিসটা।"

"কী হতে পারে ওটা?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

"প্রথমবার গুহায় রাখা খুলিটা স্পর্শ করার সময় অস্বাভাবিক ঠান্ডা মনে হয়েছিল ওটাকে। আর উঠিয়ে ক্রেটে রাখার সময় মনে হচ্ছিল যেন ভেতরে কিছু একটা আছে। যা ই থাকুক, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খুলিটার ভেতর সীল করে রাখা হয়েছিল রহস্যময় জিনিসটা।"

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকাল লোয়ালস্কি। "রাখার মতো জিনিসের অভাব পড়েছিল নাকি? খুলির ভেতরেই কেন?"

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন হ্যাঙ্কঃ "প্রাচীন ইন্ডিয়ান কবরস্থানে খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে মানুষের দেহাবশেষের পাশাপাশি অনেক প্রাণীদের হাড়গোড়ও পাওয়া গিয়েছে। ম্যাস্টোডন, সেবার টুথড টাইগার, ম্যামথ ইত্যাদি প্রাণীদের খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত আগেকার যুগের ইন্ডিয়ানরা, সেই সাথে ভয়ও পেত। মনে করত, এসব প্রাণীর অস্তিত্ব এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান। তাই এরকম একটা রহস্যময় জিনিস লুকিয়ে রাখার জন্য পুরনো সেবার টুথড টাইগারের মাথার খুলির মতো জিনিস আর কী হতে পারে বলুন।"

"বুঝলাম," সায় দিলেন পেইন্টার। "কিন্তু তারা লুকিয়েছিল কী?"

"তা তো বলতে পারব না। গুহায় থাকা মমিগুলো নেটিভ আমেরিকান কি না, সেই ব্যাপারেও নিশ্চিত না আমি।"

এতোক্ষণ পর মুখ খুললেন পদার্থবিদ্যার প্রফেসর ডেন্টন। "হ্যাঙ্ক, উনাকে কার্বন-১৪ ডেটিং সম্পর্কে বল।"

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন পেইন্টার। তাতে উৎসাহ পেয়েই হয়তো হ্যাঙ্কের আগে তিনি নিজেই বলা শুরু করলেন। "আর্কিওলজি বিভাগের বিজ্ঞানীদের কার্বন ডেটিং পরীক্ষায় জানা গেছে, মৃতদেহগুলো দ্বাদশ শতাব্দী সময়কার।"

"তাহলে একটা বিষয় তো জানা গেল। লোকগুলো নেটিভ আমেরিকানই ছিল।" মন্তব্য করলেন পেইন্টার।

"এদিকে দেখুন," বলে টেবিলে রাখা ছুরিটার দিকে ইঙ্গিত করলেন। পেইন্টার মনে করতে পারলেন, এখানে এসে প্রফেসরের হাতে এই জিনিসটাই দেখেছিলেন তিনি। ছুরির হাতলটা হাড়ের মনে হলেও ফলা ইস্পাতের। পুরনো জিনিস, তবে এখনও চকচক করছে।

"ছুরিটা গুহা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল," যোগ করলেন প্রফেসর কানোশ।

ছুরিটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন পেইন্টার।

"বন্ধুকে খুন হতে দেখার পর, গুহা থেকে পালিয়ে আসা ছেলেটা হাতে করে এটা নিয়ে এসেছিল, একটা মমির হাত থেকে জিনিসটা পেয়েছিল সে। তারপর তার কাছ থেকে পেয়েছি আমরা। জিনিসটা ওর কাছে রাখতে দিলে ব্যাপারটা আইনবিরোধী

হয়ে যেত। তাছাড়া ছুরিটার অস্বাভাবিক গঠনের কারণে এটা নিয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণার দরকার ছিল।"

ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন পেইন্টার। "তৎকালীন ইন্ডিয়ানদের তো ইস্পাত বানাবার প্রক্রিয়া জানার কথা না।"

"তা ঠিক," সায় দিলেন ডেন্টন। "বিশেষ করে, এই ধরণের ইস্পাত।"

মাথা নাড়লেন সিগমা ডিরেক্টর। "বুঝলাম না।"

ছুরিটার দিকে ইঙ্গিত করলেন ডেন্টন। "ধাতুটাকে ইস্পাতের একটা অস্বাভাবিক গঠন বলা যায়। দামাস্কাস ইস্পাত বলা হয় এটাকে। মধ্যযুগীয় সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশের হাতেগোণা কিছু কারিগর এরকম ইস্পাত তৈরি করতে পারত। এই ধাতুর তৈরি তলোয়ারের প্রচুর দাম ছিল। অস্বাভাবিক কাঠিন্য আর তীক্ষ্ণধারের জন্য বিখ্যাত ছিল এসব অস্ত্র। এই ইস্পাত বানানোর প্রক্রিয়া সর্বসাধারণের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। কালের বিবর্তনে সপ্তদশ শতাব্দীতে পুরোপুরি হারিয়ে যায় এই অমূল্য বিদ্যা। এমনকি বর্তমান সময়েও, আমরা যতই শক্ত ইস্পাত বানাই যা কেন...এই ধাতুর অনুরূপ তৈরি করা সম্ভব না।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপটার মনিটরের দিকে বাকিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ডেন্টন। "আণবিক পর্যায়ে ছুরিটার উপাদান পরীক্ষা করেছি আমি। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই ধাতুতে ন্যানোওয়্যার এবং কার্বন ন্যানোটিউব বিদ্যমান। এই ধরণের বিশেষ পদার্থের কারণেই এমন অস্বাভাবিক কাঠিন্য পায় দামাস্কাস ইস্পাত। বিশ্বজুড়ে বেশ কিছু ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা এখনও এই ধাতুকে নকল করার ব্যাপারে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।"

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতে একটু সময় লাগল পেইন্টারের। ন্যানোওয়্যার আর ন্যানোটিউব, শব্দ দুটোর সাথে পরিচয় আছে তার। দুটো জিনিসই আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়- ন্যানোটেকনোলজির কামাল। ন্যানোটিউব হচ্ছে কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরি অতি ক্ষুদ্র সিলিন্ডার আকৃতির জিনিস, অত্যন্ত শক্ত। যার ফলে হেলমেট আর বডি আর্মার তৈরিতে কাজে লাগে এটা। আর ন্যানোওয়্যার হলো একই ধরণের পরমাণুর একের পর এক সাজানো চেইনের মতো গঠন। বিদ্যুৎ-সুপরিবাহী হওয়ার ফলে মাইক্রোইলেকট্রনিক্স আর কম্পিউটার চিপ তৈরিতে কাজে লাগে এগুলো। দিনকে দিন এসব জিনিসের ব্যবহার বেড়েই চলেছে।

ছুরিটার দিকে তাকিয়ে এসব ভাবতে ভাবতে আরেকটা প্রশ্ন এল পেইন্টারের মাথায়। "তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, আজ থেকে শত শত বছর আগে মধ্যযুগীয় কারিগররা পারমাণবিক পর্যায়ে ধাতুকে বিশ্লেষণ করতে পারত? ন্যানোটেকনোলজি তৎকালীন সময়ের আবিষ্কার?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডেন্টন। "হ্যাঁ। ব্যাপারটা তো তাই দাঁড়ায়। এছাড়া আরও প্রমাণ দেখাতে পারব আমি। শতাব্দী পুরনো বিভিন্ন গির্জার সাজসজ্জায় বিশেষ ধরণের কাঁচের ব্যবহার অনেক আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু

কিছু কাঁচের অনুরূপ তৈরি করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা গেছে, কাঁচগুলো তৈরির সময় ভেতরে অতি সূক্ষ্ম সোনার কণা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল।"

কথাগুলো বিশ্বাস হতে চাইছে না পেইন্টারের। "ধরে নিলাম, আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়। মধ্যযুগীয় এই ছুরি, আমেরিকার পাহাড়ী গুহায়, দ্বাদশ শতকের মমির হাতে এল কীভাবে?"

কথাটা শুনে পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলেন হ্যাঙ্ক আর ডেন্টন। মাথা নেড়ে কোনও একটা ব্যাপারে বন্ধুকে সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। কিন্তু ডেন্টনকে আরও উদ্বিগ্ন দেখাতে লাগল। চেহারা দেখে মনে হলো, কিছু বলার চাইতে চুপ থাকাটাই ভালো মনে করছেন তিনি। ঘরে ঢোকার আগে লোকটার বলা কথাগুলো মনে করতে পারলেন পেইন্টার।

আমরা যেই জিনিসটা খুঁজছি, এটা তার একটা প্রমাণ হতে পারে!......কিন্তু তুমি এমন জেদ দেখাচ্ছো কেন?

মনে হচ্ছে, দুই বিজ্ঞানীর মাঝে গোপন কিছু একটা ব্যাপার আছে। এই অবস্থায় বাইরের কারও কাছে সেটা প্রকাশ করতে চাইছেন না তারা। পেইন্টারও আর জোর দিলেন না। তার মাথায় গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা প্রশ্ন এসেছে।

কাই-এর দিকে ফিরলেন তিনি। "তোমাকে যারা ধাওয়া করেছিল, তাদের সম্পর্কে বল। কেন তোমাকে খুন করতে চাইবে কেউ?"

দ্বিধাগ্রস্থ দৃষ্টিতে হ্যাঙ্কের দিকে তাকাল মেয়েটা, মাথা নেড়ে সায় দিলেন প্রফেসর।

"মনে হয় গুহা থেকে আমি যে জিনিসগুলো সরিয়েছি, সেগুলোর জন্য।"

"দেখাও উনাকে," বলে উঠলেন হ্যাঙ্ক।

জ্যাকেটের ভেতর থেকে বর্গাকার দুটো সোনার প্লেট বের করল কাই। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে আট ইঞ্চি লম্বা জিনিসগুলো, প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি পরিমাণ পুরু। একটায় কালো রঙ পালিশ করা থাকলেও অন্যটা পরিষ্কার করায় একেবারে তকতক করছে।

ব্যাখ্যা করলেন প্রফেসর কানোশঃ "গুহায় এরকম আরও শত শত প্লেট ছিল। জুনিপারের বাকল দিয়ে মোড়া পাথরের বাক্সে সীল করা ছিল ওগুলো। পালানোর সময় তিনটা প্লেট চুরি করে নিয়ে এসেছে কাই।"

"কিন্তু এখানে তো দুটো দেখতে পাচ্ছি।"

"হ্যাঁ। গুহা থেকে বেরিয়ে আসার সময় উপস্থিত সবার সামনে আরেকটা প্লেট ফেলে দিয়েছিল সে। টিভি ক্যামেরাতেও ধরা পড়েছিল ব্যাপারটা।"

ঘটনাটা কল্পনা করলেন পেইন্টার। "তার মানে, কাই-এর কাছে সোনা থাকার ব্যাপারটা কেউ জানতে পেরে গিয়েছিল। তারাই আরও সোনার খোঁজে ধাওয়া করেছে ওকে।"

"যদি আসলেই সোনা হয়ে থাকে জিনিসটা," যোগ করলেন ডেন্টন।

উৎসুক দৃষ্টিতে প্রফেসরের দিকে তাকালেন পেইন্টার।

"একটা প্লেট ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে দেখেছি আমি। রঙের দিক দিয়ে জিনিসটা সোনা বলে মনে হলেও আসলে এটা প্রচুর শক্ত, ছুরিটার মতো। সোনা বেশ নরম ধাতু, তুলনামূলকভাবে বেশ কম উত্তাপ দিয়েই গলিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু এই প্লেটগুলো তার চেয়ে অনেক অনেক শক্ত। পারমাণবিক বিশ্লেষণে ধাতুটার অস্বাভাবিক গঠন শনাক্ত করতে পেরেছি আমি। জিনিসটা আসলে সোনাই, কিন্তু পরমাণুগুলো পরস্পর অনেক কাছাকাছি অবস্থান করছে। তাই সাধারণ সোনার চেয়ে অনেক গুণ দৃঢ় রূপ পেয়েছে এটা। বিশেষ ধরণের ন্যানোওয়্যার একসাথে আটকে রেখেছে পরমাণুগুলোকে। দামের দিক দিয়ে অমূল্য এই প্লেটগুলো।"

"মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি অবশ্যই," যোগ করলেন পেইন্টার।

হঠাৎ সবগুলো বাতি নিভে যেতেই অন্ধকারে ছেয়ে গেল পুরো ল্যাব। হলওয়েতে মৃদু কয়েকটা আলো জ্বলে ওঠে ইমারজেন্সি অবস্থার জানান দিতে লাগল। অ্যালার্মের শব্দে টেবিলের নিচ থেকে গর্জে উঠল একটা প্রাণী, শব্দটা শুনে চমকে উঠলের পেইন্টার। হলওয়ে থেকে আসা আবছা আলোয় নিচু একটা অবয়বকে হ্যাঙ্কের চেয়ারের নিচ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন তিনি।

"থামো, কাউচ!" কুকুরটাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন প্রফেসর। "কিচ্ছু হয়নি। সব ঠিক আছে।"

ঘোঁত করে উঠল কোয়ালস্কি। "মাফ করবেন ডক্টর। তবে এবার মনে হয়, কুকুরটার কথাই মেনে নেয়া উচিত আপনার। কিছু একটা ঘাপলা হয়েছে।"

পেইন্টারের কাছে এসে দাঁড়াল কাই। সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে মেয়েটার একটা হাত স্পর্শ করলেন তিনি।

করিডোরের শেষমাথায়, সিঁড়ির দিকে কিছু একটা পড়ার শব্দে আঁতকে উঠল সবাই। আবারও গর্জে উঠল কাউচ।

"এখান থেকে বেরোনোর আর কোনও রাস্তা আছে?" ফিসফিস করে হ্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন পেইন্টার।

"না," ভীত কণ্ঠে জবাব দিলেন প্রফেসর। "একমাত্র ওই সিঁড়িটা ছাড়া মেইন বিল্ডিং-এ যাওয়ার আর কোন উপায় নেই।"

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কোয়ালস্কি।

ফাঁদে পড়ে গেছি আমরা সবাই।

অধ্যায় ১২
৩১ মে, রাত ১:১২
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যান্ড

"বাম দিকে যান," ট্যাক্সি ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বলে উঠল গ্রে।

তার ক্রমাগত বেড়ে ওঠা উৎকণ্ঠা নজর এড়ায়নি শেইচানের। মায়ের ফোন পাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে সে।

সিটে হেলান দিয়ে বসে আবার বাড়ির টেলিফোনে কল করতে শুরু করল গ্রে। কিন্তু বরাবরের মতো এবারও ফোনটা রিসিভ করল না কেউ।

"বামদিকে," আবারও গর্জে উঠল সে। "এটা ধরে গেলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে।" হাবভাব দেখে শেইচানের মনে হলো, ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়ে গ্রে যেন নিজেই ট্যাক্সিটা চালানো শুরু করবে।

রাস্তার দুইপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা অন্ধকার বাড়িগুলো দেখতে দেখতে, নিজের শৈশবের কথা মনে পড়ল শেইচানের। তাদের বাড়ি ছিল ভিয়েতনামে। অনেক চেষ্টা করেও বাবার কথা কিছুই মনে করতে পারল না সে। আর মায়ের ব্যাপারে ভাবতেই সবার আগে যেই কথাটা মনে পড়ল, সেটা কখনোই ভোলা সম্ভব না তার পক্ষে। ঘরের দরজা দিয়ে মা-কে টেনেহিঁচড়ে বের করে এনেছিল মিলিটারি উর্দিপরা কিছু লোক, ছোট্ট শেইচানকে কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল রাস্তায়। তারপর থেকে অনাথ আশ্রমই হয়ে ওঠে তার একমাত্র ঠিকানা। অনাহারে, অর্ধাহারে কাটত সময়।

এসব বাড়িতে থাকা মানুষগুলো তার কষ্ট কখনোই বুঝবে না।

মোড় নিয়ে বাটারনাট অ্যাভিনিউতে ঢুকে গেল তাদের ট্যাক্সি। কয়েক বছর আগে গ্রে-র বাবা-মার সাথে দেখা হয়েছিল শেইচানের। গুলি খেয়ে পালানোর সময় সর্বপ্রথম গ্রে-র কথাই তার মনে এসেছিল। কথাটা মনে পড়তেই ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল মেয়েটা। আজ প্রায় তিন মাস পর গ্রে-কে আবার দেখেছে সে। এই ক'দিনে রুক্ষ চেহারাটা যেন আরও কঠিন রূপ ধারণ করেছে। পুরো চেহারায় নরম জিনিস বলতে শুধু ঠোঁটজোড়া, এখন পরস্পর চেপে বসে আছে সেগুলোও। একবার অবশ্য ঠোঁটগুলোতে চুমু খেয়েছিল সে। দুর্বল সেই মুহূর্তটার কথা জোর করে মাথা থেকে সরিয়ে দিল মেয়েটা।

সে জানে, ইতালিয়ান ক্যারাবিনিয়ারির এক লেফটেন্যান্টকে ভালোবাসে গ্রে।

গ্রে-কে হঠাৎ আবার সামনে ঝুঁকতে দেখে সম্বিত ফিরল শেইচানের। রাস্তার একপাশে, একটু দূরে তাদের ছোট ক্রাফটম্যান বাংলোটা দেখা যাচ্ছে। অন্যসব

বাড়ির মতো অন্ধকার না সেটা। জ্বলতে থাকা আলোই বলে দিচ্ছে, ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে।

"ওই যে, ওই বাড়িটা," ড্রাইভারকে গাড়ি থামানোর জন্য ইশারা করল গ্রে।

ট্যাক্সিটা পুরোপুরি থামার আগেই ড্রাইভারের দিকে কয়েকটা নোট ছুঁড়ে দিয়ে নেমে গেল সে। কিন্তু শেইচান ঠিকই বাকি টাকাটা চেয়ে নিল হতভম্ব লোকটার কাছ থেকে, তারপর অবশ্য বেশ ভালো রকমের বকশিসও দিল।

বাড়িটার একপাশে ছোট ড্রাইভওয়ের একপ্রান্তে একটা গ্যারেজ, আলো জ্বলছে সেখানে। খানিকটা এগোতেই ইলেকট্রিক করাতের শব্দের পাশাপাশি গ্রে-র মায়ের কথাও শোনা গেল। এজন্যই তাহলে বাড়ির টেলিফোনটা রিসিভ করেনি কেউ, ভাবল শেইচান।

"জ্যাক, কি করছ এসব! আওয়াজে প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে গেলে তো চেঁচামেচি শুরু করবে সবাই!"

"মা..." গ্যারেজে ঢুকেই নাটকটায় অংশ নিল গ্রে।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে রইল শেইচান। সরু চোখে তার দিকে তাকালেন গ্রে-র মা। দুই বছর আগে দেখা চেহারাটা চিনতে এক মুহূর্ত সময় লাগল তার। পরক্ষণেই ভয়ের একটা ছাপ ফুটে উঠল মহিলার চোখেমুখে।

অবশ্য শুধু তিনি একাই চমকাননি, গ্রে-র বাবা-মার অবস্থা দেখে চমকে গেছে শেইচানও। আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা। একটা হাউজকোট আর স্যান্ডেল পরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বামীর সামনে। অন্যদিকে টিশার্ট আর শর্টস পরে একটা টেবিলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন গ্রে-র বাবা, হাতে একটা ইলেকট্রিক করাত।

"হ্যারিয়েট! আমার অন্য যন্ত্রপাতিগুলো কোথায়?" চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। "কতবার বলেছি, জিনিসগুলো গুছিয়ে রেখো!"

বাবার হাত থেকে করাতটা নিয়ে নিল গ্রে, টান দিয়ে সকেট থেকে খুলে ফেলল যন্ত্রটার প্লাগ। সাথে সাথে ক্ষেপে উঠলেন ভদ্রলোক, কনুই দিয়ে সজোরে গুঁতো মারলেন ছেলের মুখে। হাতের করাতটাসহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল গ্রে।

"জ্যাক!" চেঁচিয়ে উঠলেন গ্রে-র মা।

নিজের নাম শুনেই হয়তো চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। "আমি...আমি আসলে বুঝতে পারিনি," বলে একহাতে নিজের কপাল ডলতে শুরু করলেন তিনি। এক মুহূর্ত পর কপাল থেকে হাতটা নামিয়ে বাড়িয়ে দিলেন পড়ে থাকা গ্রে-র উদ্দেশ্যে। "আমি দুঃখিত, কেনি।"

"আমি গ্রে, বাবা। কেনি ক্যালিফোর্নিয়াতেই আছে।"

শেইচান জানে, কেনি নামে গ্রে-র একটা ভাই আছে। সিলিকন ভ্যালিতে ইন্টারনেটের ব্যবসা করে সে।

বাবার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে উঠে দাঁড়াল গ্রে, ঠোঁটের একপাশ কেটে রক্ত গড়াচ্ছে।

"বাবা, এটা আমি... গ্রে।"

"গ্রেসন?" বিস্মিত চোখে ছেলের দিকে তাকালেন তিনি। "কখন এলে? ব্যথা পেলে কীভাবে?" হাবভাব দেখে শেইচান বুঝতে পারল, একটু আগে ঘটে যাওয়া নাটকটার কথা বেমালুম ভুলে গেছে লোকটা।

"তেমন কিছু না, বাবা। চল, ঘরে যাই।"

নিজের নকল পা-টায় হাত বুলালেন তার বাবা। "ঠিক আছে। কিন্তু একটা বিয়ার চাই আমি।"

"চল, দিচ্ছি।"

বাবাকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল গ্রে। কিন্তু তার মা তাদের সাথে না গিয়ে শেইচানের দিকে এগোলেন। "ওকে আমি থামাতে পারিনি," ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন তিনি। "হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর এমন ব্যবহার করতে শুরু করল, যেন টেক্সাসেই আছে সে। কাজে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে রাগ দেখাতে লাগল আমার সাথে। আমি একটু শান্ত করার চেষ্টা করতেই আরও ক্ষেপে গিয়ে এখানে চলে এল।"

তাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পেল না শেইচান। হাত বাড়িয়ে মহিলার একটা হাতে আলতো চাপড় দিল শুধু। "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমি বরং যাই, জ্যাককে আবার শুইয়ে দিতে গ্রে-কে সাহায্য করি। তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে," বলে মুচকি হাসলেন তিনি। তারপর ঢুকে গেলেন বাড়ির ভেতর।

এক সেকেন্ড পরই আবার দরজা দিয়ে উঁকি দিলেন মহিলা। "ভেতরে চলে এসো।"

কিন্তু তার কথায় রাজি হলো না শেইচান। "সমস্যা নেই। আমি বরং পোর্চে অপেক্ষা করি।"

"এই রাতের বেলায় সমস্যায় ফেলে দিলাম তোমাদের। কিছু মনে করো না," বলে ক্ষমাসূচক ভঙ্গিতে মুচকি হাসলেন তিনি, তারপর আবার উধাও হয়ে গেলেন ভেতরে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল শেইচান। তারপর একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে রাখা বেঞ্চে বসে তাকাল আশেপাশের বাড়িগুলোর দিকে। অন্ধকার গেটগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। কিন্তু সে খুব ভালো করেই জানে, এসব তার ধাতে সইবে না।

রাস্তাই তার আসল ঠিকানা।

কিছুক্ষণ পর বাংলোটার বাতিগুলো একে একে নিভতে শুরু করল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল গ্রে।

"তুমি ঠিক আছ তো?"

জবাব না দিয়ে শ্রাগ করল শেইচান।

"আরও প্রায় আধঘন্টার মতো এখানে থাকতে হবে আমাকে। দেখতে হবে, আবার যেন কোনও ঝামেলা না হয়। চাইলে তোমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারি আমি।"

"তারপর...কোথায় যাব?" মুচকি হেসে জানতে চাইল মেয়েটা।

জবাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গ্রে। "রাতের বেলা আলঝেইমার রোগীদের অবস্থা মাঝে মাঝে বেশ খারাপ হয়ে যায়। সানডাউনার্স সিনড্রোম বলা হয় এটাকে।"

"এরকমটা কয়দিন পরপর হয়?"

"মাসে প্রায় তিন-চারবার।"

"প্রতিবারই এভাবে ছুটে আসতে হয় তোমাকে?"

শ্রাগ করল গ্রে। "সম্ভব হলে আসি।"

চুপচাপ রাতের অন্ধকারের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল গ্রে। মনে মনে ভাবতে লাগল, এর শেষ কোথায়।

কয়েক মুহূর্ত পর নীরবতা ভাঙল শেইচান। "আর্কাইভ থেকে কোনও খবর এসেছে?"

মাথা নাড়ল গ্রে। "না। বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে হয়তো আরও সময় লাগবে ওদের। কিন্তু মনে হয়, কেন ফ্র্যাঙ্কলিনের চিঠিটা গিল্ডের মনোযোগ আকর্ষণ করল- ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি আমি।"

কথাটা শুনে শেইচানের পিঠটা টানটান হয়ে উঠল। চিঠিটা বাগে পেতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে ওকে।

"আমাকে একবার বলেছিলে, বারো দিন আগে চিঠিটা সর্বপ্রথম বের করেছিল গিল্ড।"

মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটা। "হ্যাঁ।"

"অর্থাৎ, উটাহ- এর গুহাটা আবিষ্কৃত হওয়ার ঠিক পরপরই।"

"কথাটা তো আগেও একবার বলেছিলে, অবশ্য আমার মাথায় ঢোকেনি একটুও।" মন্তব্য করল শেইচান।

"আমার মনে হয়, চিঠিটায় উল্লেখিত একটা শব্দ- বিবর্ণ ইন্ডিয়ান- এর সাথে ব্যাপারটার সম্পর্ক আছে।"

কথাটা মনে করতে পারল শেইচান। চিঠির একটা লাইনে শব্দটা উল্লেখ করেছেন ফ্র্যাঙ্কলিন।

অন্যদের মৃতদেহের নিচে লুকিয়ে থেকে প্রাণে বেঁচে যায় লোকটা, যার ফলে গ্রেট এলিক্সার আর বিবর্ণ ইন্ডিয়ান সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে।

কিন্তু এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি সে। "তো?"

তার দিকে খানিকটা সরে এল গ্রে। "গুহাটা আবিষ্কৃত হওয়ার পর ভেতরে থাকা মমিগুলোর খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মৃতদেহগুলোর উপর কর্তৃত্ব দাবী করে

বিভিন্ন ইন্ডিয়ান মানবাধিকার সংস্থা। অবশ্য বৈশিষ্ট দেখে মমিগুলো ককেশিয়ান বলে ধারণা করা হয়।"

"ককেশিয়ান?"

"বিবর্ণ ইন্ডিয়ান," জবাব দিল গ্রে। "ফ্র্যাঙ্কলিনের সেই পুরনো রহস্যময় শত্রু, অর্থাৎ গিল্ডের সাথে যদি বিবর্ণ ইন্ডিয়ান বা সাদা চামড়ার ইন্ডিয়ানদের কোনও সম্পর্ক থেকে থাকে, তবে এখন গুহাভর্তি সেরকম সাদা চামড়ার ইন্ডিয়ানদের মৃতদেহ অবশ্যই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তাছাড়া, আমেরিকার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন একটা কিছুর খোঁজ করছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন আর ফোরটেস্কু। তাদের সেই রহস্যময় শত্রুপক্ষও কিন্তু জিনিসটার পেছনে লেগে ছিল।"

"তোমার কথা সত্যি ধরে নিলে, এখনও সেটার খোঁজেই আছে ওরা।" যোগ করল শেইচান। "তোমার কী মনে হয়, উটাহ- এর বিস্ফোরণের পেছনে গিল্ডের হাত থাকতে পারে?"

"না। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার এসেছে আমার মাথায়। ডিরেক্টর ক্রো-কে ব্যাপারটা জানাতে হবে। যদি আমার ধারণা সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে শতাব্দী পুরনো একটা যুদ্ধে ফেঁসে গেছেন তিনি।"

অধ্যায় ১৩
৩০ মে, রাত ১১:৩৩
প্রোভো, উটাহ

হলওয়ে থেকে মৃদু আলো এসে ঘরের অন্ধকার কিছুটা হলেও ফিকে করে দিয়েছে। অন্ধকারে দৃষ্টি সয়ে আসতেই, এতোক্ষণ পেইন্টারের ধরে রাখা হাতটা ছেড়ে দিল কাই।

কাউচকে শান্ত করে উঠে দাঁড়ালেন হ্যাঙ্ক। "মেইন পাওয়ারের কোনও গোলমাল হয়েছে মনে হয়।"

এক মুহূর্তের জন্য কাই-এরও মনে হলো, কথাটা সত্যি। নিশ্চয়তার জন্য চাচার দিকে তাকাল সে।

দেয়ালে টানানো একটা ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন পেইন্টার। রিসিভারটা কানে লাগিয়ে পরীক্ষা করলেন, কোনও আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা।

"ডায়াল টোন নেই," ঘোষণা করার ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে রিসিভারটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন তিনি। "লাইনটা কেটে দিয়েছে কেউ।"

কথাটা শুনে আঁতকে উঠল কাই আর হ্যাঙ্ক দুজনেই। তার মানে, তাদের ধারণা ভুল। আসলেই কিছু একটা ঘাপলা আছে।

কোয়ালস্কির দিকে ফিরলেন পেইন্টার। "কোয়ালস্কি, হলের দিকে নজর রাখ। দরজা দিয়ে কেউ যেন ঢুকতে না পারে।"

সায় দিয়ে দরজার দিকে এগোল সিগমার বিশালদেহী বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। তারপর ওভারকোট সরিয়ে পায়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো শটগানটা বের করে আনল। বাবার সাথে শিকারে যাওয়ার সুবাদে অস্ত্রশস্ত্রের সাথে পরিচয় ছিল কাই-এর। তবে এই মৃদু আলোতেও সে বুঝতে পারল, কোয়ালস্কির হাতে ধরা জিনিসটা সাধারণ শটগান থেকে আলাদা। হ্যান্ডেলের সাথে আটকানো বাড়তি গুলিগুলোর স্বচ্ছ কেসিংও সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। অস্ত্র বের করার সাথে সাথে যেন পরিস্থিতিটা আরও গুমোট হয়ে এল।

"কী করব এখন আমরা?" জিজ্ঞেস করলেন ডেন্টন।

"লুকিয়ে থাকব," কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জবাব দিল কাই।

সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে মেয়েটার কাঁধে এক হাত রাখলেন পেইন্টার। "লুকিয়ে থাকা একমাত্র সমাধান না," ব্যাখ্যা করলেন তিনি। "যে বা যারাই তোমাদের খোঁজে এসে থাকুক, নিশ্চয়ই পুরো এলাকার উপর নজর রাখছিল তারা। জানে, তাদের শিকার ভেতরেই আছ। তোমাদের খুঁজে বের করার জন্য একটা স্ট্রাইক টিম পাঠাবে তারা।

তবে উপরের পুরো বিল্ডিং খুঁজে বেসমেন্টে নেমে আসতে আসতে লোকগুলোর কিছুটা সময় লেগে যাবে। এই সময়টুকুর ভেতর কোনওভাবে পালানোর একটা পথ খুঁজে নিতে হবে আমাদের।"

সিলিং-এর দিকে তাকাল কাই। "তাহলে চলুন উপরে যাই।"

"এখানে কোনও এয়ার ভেন্ট অথবা সার্ভিস টানেল আছে কি?" দুই প্রফেসরের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন পেইন্টার।

"না," জবাব দিলেন ডেন্টন। "থাকলেও সেগুলো মানুষ ঢোকার মতো চওড়া না। তাছাড়া ভূগর্ভস্থ এই ফ্যাসিলিটিটা মূল ভবন থেকে একটু ভেতরদিকে আলাদাভাবে বানানো, ক্যাম্পাসের লনের নিচে। আমাদের মাথা আর উপরের লনের মাঝে কয়েক ফুট পুরু কংক্রিট, মাটি আর পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই।"

"মেয়েটা খুব একটা খারাপ তো বলেনি। উপরেই যাব আমরা।" দরজার পাশ থেকে বলে উঠল কোয়ালস্কি। পকেট থেকে মুঠোর সমান আকারের, বলের মতো দেখতে কিছু একটা বের করে পেইন্টারের দিকে ছুঁড়ে দিল সে। "চলুন তাহলে, নিজেদের রাস্তা নিজেরাই বানিয়ে নেয়া যাক।"

বলের মতো জিনিসটা একহাতে লুফে নিলেন সিগমা ডিরেক্টর, আঁতকে উঠলেন সাথে সাথে।

রাত ১১:৩৫

হাতে নেয়ার সাথে সাথে কাদার মতো জিনিসটা চিনতে পারলেন পেইন্টার। "কোয়ালস্কি, সি-ফোর কেন এনেছ তুমি?"

জবাবে শ্রাগ করল বিশালদেহী লোকটা। "এটাতো আমার সাথেই ছিল।"

সাথেই ছিল?

কথাটা মাথায় ঢুকতে এক মুহূর্ত সময় লাগল পেইন্টারের। পরক্ষণেই মনে পড়ল, ওয়াশিংটনে তার অফিসে এই বিস্ফোরকটুকু হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে ছিল কোয়ালস্কি। বলের মত জিনিসটা মোচড়াচ্ছিল সে।

অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। কিন্তু সাথে সাথে আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল তার।

"কিন্তু এটার সাথে ব্যবহার করার মতো কোনও ব্লাস্টিং ক্যাপ কি এনেছ?"

ঘাড় ঘুরিয়ে হলওয়ের দিকে তাকাল কোয়ালস্কি। "কি যে বলেন বস, সবকিছু আমিই করব নাকি!"

পুরো ল্যাবে চোখ বোলালেন পেইন্টার। বুঝতে চেষ্টা করলেন, ডেটোনেটর হিসেবে ব্যবহার করার মতো কিছু পাওয়া যাবে কিনা। সি-ফোরের বিস্ফোরণমাত্রা ব্যাপক হলেও সাধারণ ভাবে এটা খুবই স্থিতিশীল। এমনকি গুলি করলে কিংবা আগুনে পোড়ালেও এটা ফাটবে না। এই বিপজ্জনক জিনিসটাকে সক্রিয় করার জন্য

একটা শক ওয়েভ দরকার। একটা ব্লাস্টিং ক্যাপের ছোট্ট বিস্ফোরণই পারে এই মারাত্মক বিস্ফোরককে কর্মক্ষম করতে।

জিনিসটা চিনতে পেরেছেন ডেন্টনও, একটা সম্ভাবনার কথা বললেন তিনি। "আপনারা যা খুঁজছেন, তা ফলিত পদার্থবিদ্যা ল্যাবে থাকার কথা। মাইনিং অপারেশন সংক্রান্ত কিছু জিনিসপত্র আছে ওখানে। ডাইনামাইট আর ব্লাস্টিং ক্যাপও থাকার কথা।"

"কোথায় ওটা?"

"উপরে...সিঁড়ি দিয়ে উঠে, কাছেই।"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন পেইন্টার। এই মুহূর্তে উপরে যাওয়াটা বিরাট ঝুঁকি হয়ে যায়। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই।

"প্রফেসর ডেন্টন, দয়া করে আমার সাথে চলুন। আমি চিনি না জায়গাটা।" এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সিভিলিয়ানদের নিয়ে কাজ করা পছন্দ করেন না পেইন্টার। কিন্তু হলওয়েটা পুরো একটা গোলকধাঁধার মতো। আর তাছাড়া উপরের ল্যাবে ব্লাস্টিং ক্যাপ ঠিক কোন জায়গায় থাকবে, তাও জানেন না তিনি।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন প্রফেসর।

কোয়ালস্কির হাতে সি-ফোরটুকু ধরিয়ে দিলেন ডিরেক্টর। "এটা লাগানোর মতো একটা জায়গা খুঁজে বের করো। তবে উপরের সায়েন্স সেন্টার থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারটা মাথায় রেখো।"

"পার্টিকেল এক্সেলারেটর চেম্বারে করা যেতে পারে কাজটা, মূল ভবন থেকে ওটা বেশ দূরে অবস্থিত," যোগ করলেন ডেন্টন।

"আমি জায়গাটা চিনি, হলের শেষমাথায়।" বলে উঠলেন হ্যাঙ্ক। "উনাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি আমি। আপনারা যান।"

"কাই আর কুকুরটাকেও সাথে নিয়ে যান। আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করবেন সবাই।" বলে নিজের শোল্ডার হোলস্টার থেকে সিগ সাওয়ার পিস্তলটা খুলে আনলেন পেইন্টার, কোয়ালস্কির শটগানের সাথে বদলে নিলেন অস্ত্রটা। "সবাইকে নিরাপদে রেখো। দরকার হলে গুলি করবে।"

নাক দিয়ে ঘোঁত জাতীয় আওয়াজ করল কোয়ালস্কি। "তা তো করবই।"

"আঙ্কেল ক্রো, সাবধানে থাকবেন," বলে উঠল কাই।

মেয়েটার দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন পেইন্টার, পরক্ষণেই সামলে নিলেন নিজেকে। কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় এখন হাতে নেই। "চলো সবাই।"

রাত ১১:৩৬

ম্যানসনের লাইব্রেরিতে বসে ল্যাপটপের মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন রেফ। মার্সেনারিদের হেলমেটে আটকানো ক্যামেরা থেকে ইউনিভার্সিটির অপারেশনের

লাইভ ফুটেজ ভেসে আসছে স্ক্রিনে। দৃশ্যগুলো খুব একটা পরিষ্কার দেখা না গেলেও ব্যাপক উত্তেজনা অনুভব করছেন তিনি।

সবার আগে ইলেকট্রিসিটি আর ফোনের লাইন কেটে দেয় মার্সেনারিরা। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং-এ ঢুকতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। অবশ্য চারজন ছাত্র সামনে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন টেজারগানের গুলি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সবাই। একে একে বিল্ডিং-এর প্রতি তলায় অনুসন্ধান চালাচ্ছে বার্নের বাহিনী।

স্ক্রিনের এককোনায় বার্নের চেহারা ফুটে উঠল। "স্যার, উপরের সবগুলো তলা চেক করা শেষ। এখন শুধু বেসমেন্ট বাকি।"

"খুব ভালো," জবাব দিলেন রেফ।

তার মানে, ভীত ইঁদুরের মতো গর্তে গিয়ে লুকিয়েছে শিকার। সমস্যা নেই। সবচেয়ে সেরা শিকারি বিড়ালগুলোই তার হাতে আছে।

ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা লম্বা অবয়ব রেফের মনোযোগ আকর্ষণ করল। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আশান্দা। আগুনের আড়ালে, কালো ছায়ায় আরও কালো মনে হচ্ছে তাকে।

ওর উদ্দেশ্যে মুচকি হেসে আবার স্ক্রিনের দিকে নজর দিলেন রেফ।

খেলা হবে।

রাত ১১:৩৮

ফলিত পদার্থবিদ্যা ল্যাবে, ডেন্টনের ধরে রাখা পেইনলাইটের আলোয়, একটা নিচু বেঞ্চে বসে কাজ করে চলেছেন পেইন্টার। ল্যাবটায় পৌঁছাতে কোনও কষ্টই হয়নি, মেইন বিল্ডিং-এর সিঁড়ির সামনেই হলের একপ্রান্তে অবস্থিত ওটা। নানারকম যন্ত্রপাতিতে ঠাসা ঘরটায় ঢুকেই কাজে নেমে পড়েছেন তারা।

নির্দিষ্ট তাক থেকে এক বাক্স ব্লাস্টিং ক্যাপ নামিয়ে পেইন্টারের দিকে এগিয়ে দিলেন ডেন্টন। "এগুলোতে কাজ হবে তো?"

"হ্যাঁ...তবে তার আগে একটু ঝালিয়ে নিতে হবে।"

চিমটা আর প্লায়ার্স নিয়ে কাজে লেগে গেলেন ডিরেক্টর। এই ধরণের ব্লাস্টিং ক্যাপগুলো মাইনিং এর জন্য তৈরি, যা বিস্ফোরিত হতে ইলেকট্রিসিটির শক প্রয়োজন হয়। সি-ফোরের সাথে এটা ব্যবহার করতে হলে ছোট ব্যাটারি বা এই জাতীয় কিছু দরকার পড়বে। কিন্তু এখন তেমন কিছু হাতে না থাকায় আরেকটা বুদ্ধি এসেছে পেইন্টারের মাথায়। কোয়ালস্কির কাছ থেকে আনা শটগানের গুলি ব্যবহার করে ফাটানো যাবে এই ব্লাস্টিং ক্যাপকে। তার জন্য গুলিটাকে একটু মডিফাই করে নিতে হবে।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দক্ষতা থাকায় কাজটা করা তার পক্ষে খুব একটা কঠিন কিছু না। সাবধানে ব্লাস্টিং ক্যাপের ফিউজের তারটা খুলে নিলেন পেইন্টার। একটা গুলির কেসিং খুলে নিয়ে ভেতরের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারির আউটপুটের

সাথে পেঁচিয়ে নিলেন তারটা। এমনিতে গুলিগুলোর আকার সাধারণ বারুদভরা গুলির সমান হলেও এগুলোর কেসিং স্বচ্ছ। ভেতরে গানপাউডারের বদলে ব্যাটারি ভরা।

গুলিটার ট্রান্সফর্মার আর মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে ব্লাস্টিং ক্যাপের শেষ তারটা পেঁচিয়ে নিলেন পেইন্টার, তারপর আবারও লাগিয়ে নিলেন স্বচ্ছ ক্যাপ...কাজ শেষ। সাথে সাথে হলওয়ে থেকে কতগুলো বুটপরা পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। নিজেদের ভেতর কথা বলছে লোকগুলো। তবে কণ্ঠগুলোর মাঝে সতর্কতার বদলে তাচ্ছিল্যের আভাস। জানে, তাদের টার্গেট হলো এক নিরস্ত্র বুড়ো প্রফেসর আর একটা বাচ্চা মেয়ে।

মডিফাই করা বুলেটটা সাবধানে পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন পেইন্টার। শটগানটা হাতে তুলে নিয়ে ফিসফিস করে উঠলেন ডেন্টনের উদ্দেশ্যে। "আমি ইশারা দেয়া মাত্র সিঁড়ির দিকে দৌড় লাগাবেন। অন্যদের আটকে রাখব আমি।"

সায় দিয়ে হাতের পেনলাইটটা নিভিয়ে দিলেন প্রফেসর।

দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে ডেন্টনের উদ্দেশ্যে ইশারা করলেন পেইন্টার। ল্যাবের দরজা থেকে নিচে নামার সিঁড়ির দূরত্ব খুব একটা বেশি না। হামলাকারীরা হলের উল্টোপাশের ঘরগুলো সার্চ করতে করতে এদিকে এগিয়ে আসছে। অল্প কয়েক মুহূর্ত সময় পেলেই নেমে যেতে পারবেন প্রফেসর।

সিগন্যাল পেয়ে বেরিয়ে পড়লেন ডেন্টন, পা টিপে টিপে এগোতে লাগলেন সিঁড়ির দিকে। উল্টোদিকে সতর্ক নজর রাখছেন পেইন্টার। হঠাৎ গুলির শব্দে চমকে উঠলেন তিনি। ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলেন, গুলির আঘাতে অর্ধেক উড়ে গেছে প্রফেসরের মাথা। ধাম করে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়লেন ডেন্টন, মারা গেছেন মেঝেতে পড়ার আগেই।

সাথে সাথে পিছিয়ে ল্যাবে ঢুকে গেলেন পেইন্টার। তিক্ত অনুভূতিতে ছেয়ে গেল মন। তার গাফিলতির কারণেই মরতে হলো মানুষটাকে। হামলাকারীরা সবাই হলের উল্টোপাশে আছে মনে করলেও, আগেই একজন হয়তো সিঁড়ির পাশে চলে এসেছিল।

কিন্তু এখন আফসোসের সময় নয়। গুলির শব্দে বেরিয়ে এসেছে বাকি লোকগুলোও। হলওয়ে ধরে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে তারা। এখন একটাই পথ খোলা আছে পেইন্টারের সামনে- আক্রমণে যাওয়া। দরজা দিয়ে দলটার উদ্দেশ্যে একটা গুলি করলেন তিনি। এই বিশেষ গুলিগুলো প্রাণঘাতী না হলেও একজন মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য পুরোপুরি অবশ করে দিতে সক্ষম। চেঁচিয়ে উঠে মেঝেতে আছড়ে পড়ল একজন। সাথে সাথে খোলা দরজা দিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকে কাভার নিল বাকিরা।

কিন্তু প্রফেসরকে গুলি করা লোকটা আড়াল নেয়নি। পেইন্টারের অবস্থান বুঝতে পেরে গেছে সে। ল্যাবের উদ্দেশ্যে আন্দাজে একটা গুলি পাঠালেও লক্ষ্যের ধারেকাছে পৌঁছাতে পারল না ওটা। এদিকে অন্ধকারের আড়ালে থেকে, দরজার ফোকর দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকা বিশালদেহী লোকটাকে দেখতে পেয়েছেন পেইন্টারও।

আপাদমস্তক কালো কমব্যাট গিয়ার পরনে, চোখে নাইট ভিশন গগলস, সেই সাথে হেলমেটে লাগানো একটা ক্যামেরাও দেখা যাচ্ছে। চালচলনে দাম্ভিকতার ছাপ। সেই সম্ভবত পুরো দলটার নেতা, ভাবলেন তিনি।

দরজার ফাঁক দিয়ে দানবটার বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিলেন পেইন্টার। গুলির আঘাত খেয়ে টলে উঠল বিশালদেহী লোকটা। খাবি খেতে খেতে মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে। সাথে সাথে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন পেইন্টার। দৌড় শুরু করলেন সিঁড়ির দিকে।

রাত ১১:৩৯

"ওঠ শালা," উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে না পেরে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন রেফ।

হেলমেটে আটকানো ক্যামেরার মাধ্যমে দেখতে পেয়েছেন, একটু আগে একটা সাদা ল্যাবকোট পরা লোককে গুলি করেছে বার্ন। রক্ত-মাংস ছিটকে ওঠার আগে লোকটা বিস্ফোরিত মুখটা এক সেকেন্ডের জন্য দেখতে পেয়েছেন তিনি। কিন্তু বিজয়টা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।

গুলি খেয়ে এখন মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে তার সেকেন্ড ইন কমান্ড। সিলিং-এর দৃশ্য স্থির হয়ে আছে তার হেলমেটে আটকানো ক্যামেরায়। এক মুহূর্ত পরই একটা আবছা অবয়বকে বার্নের শরীরের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখা গেল। লোকটার হাতে রাইফেল বা শটগান জাতীয় কোনও একটা অস্ত্র।

কিবোর্ডের নির্দিষ্ট একটা বাটন টিপে বার্নের রেডিও অ্যাক্টিভেট করলেন রেফ। "ওঠো!"

কিন্তু জার্মান মার্সেনারীর সাড়া দেয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবারও চেয়ারে হেলান দিলেন রেফ। ক্যামেরায় আর একটুর জন্য লোকটার চেহারা ধরা পড়েনি।

যাই হোক, খেলা এখনও শেষ হয়নি।

রাত ১১:৪০

সিঁড়ি দিয়ে নেমে হলের শেষপ্রান্তের দিকে দৌড়ে চলেছেন পেইন্টার। এই ঘরটার কথাই বলেছিল দুই প্রফেসর। কাছাকাছি পৌছাতেই দরজাটা খুলে গেল, উদ্যত পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল কোয়ালস্কি।

"পিছিয়ে যাও, সবাই...কভার নাও...তাড়াতাড়ি!" চেঁচিয়ে উঠলেন পেইন্টার।

তাই করল বিশালদেহী লোকটা। দৌড়াতে দৌড়াতেই হাতের শটগানটা পাম্প করে ফেলেছেন পেইন্টার, ব্যবহৃত শেলটা ফেলে মডিফাই করা গুলিটা ঢুকিয়ে নিয়েছেন চেম্বারে। দরজা দিয়ে ঢোকার ঠিক আগমুহূর্তে পেছন থেকে পিস্তলের

আওয়াজ ভেসে এল। তার কাঁধের মাংস ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল আদি ও অকৃত্রিম একটা গুলি। এক পলকের জন্য ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলেন, সেই গুলি খাওয়া নেতাগোছের লোকটাই পিছু নিয়েছে তার। আবার গুলি করল সে, কিন্তু হাত কাঁপতে থাকায় সিলিং এ আঘাত হানল ওটা।

"ব্যাটা তো কঠিন মাল!" ঘরে ঢুকেই একটানে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন পেইন্টার। সাথে সাথে অন্ধকারে ঢেকে গেল চারপাশ। "কোথায় তোমরা?"

জবাবে একটা ফ্লাশলাইট জ্বলে উঠতেই দেখা গেল, একটা বিশাল যন্ত্রের আড়ালে গুটিশুটি মেরে বসে আছে সবাই। ভ্যান-ডে-গ্রাফ এক্সেলারেটর নামে ডাকা হয় যন্ত্রটাকে, চিনতে পারলেন পেইন্টার। গুহার মতো ঘরটার প্রায় অর্ধেক জায়গা দখল করে রেখেছে জিনিসটা।

তাদের দিকে এগোতে এগোতে সি-ফোরের খোঁজে ইতিউতি তাকাতে লাগলেন ডিরেক্টর।

"আপনার পেছনে," ইঙ্গিত করল কোয়ালস্কি। "দরজার উপর।"

পেছনে ফিরতেই ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা গেল, হলদে-ধূসর রঙের একটা দলা আটকে আছে সিলিং-এ, দরজার একটু সামনেই।

বাকিদের নিয়ে ঘরের কোণায় চলে এলেন পেইন্টার। বিস্ফোরণের সময় কিছুতেই কাছাকাছি থাকা চলবে না।

বিস্ফোরকের দলাটার দিকে শটগান তাক করামাত্রই খুলে গেল দরজা, পৌঁছে গেছে হামলাকারীরা। খোলা দরজা বেয়ে ভেতরে ঢুকল দু'জন লোক। কোয়ালস্কির গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল একজন। সাথে সাথে পেছন থেকে এগিয়ে এল আরেকজন। হলওয়েতে দাঁড়ানো দলনেতার দিকে নজর পড়ল পেইন্টারের। উত্তেজিত ভঙ্গিত বাকিদের সামনে এগোনোর আদেশ দিচ্ছে লোকটা।

মাথা থেকে এদের কথা সরিয়ে টার্গেটের দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি। একটার বেশি সুযোগ হাতে নেই। দম আটকে রেখে ট্রিগার টিপে দিলেন পেইন্টার। ধুপ শব্দে কাদার মতো দেখতে সি-ফোরের গায়ে আটকে গেল গুলিটা। বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়লেও সাথে সাথে কিছুই হলো না।

"ধুশ...শালা," হতাশায় চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। সাথে সাথে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হয়ে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করল নিরীহদর্শন সি-ফোর। শকওয়েভের ধাক্কা ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে গেল পুরো ঘরে। সিলিং থেকে ধ্বসে পড়তে লাগল কংক্রিটের স্তুপ। সেগুলোর নিচে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল ঘরে ঢুকতে যাওয়া দুই মার্সেনারী। সেই সাথে ব্লক হয়ে গেছে দরজাটাও।

ধুলো আর ধোঁয়ায় ভরে গেছে পুরো ঘর। উঠে দাঁড়ালেন পেইন্টার, বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে তালা লেগে গেছে। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালতেই বুঝতে পারলেন, নিরাপদেই আছে বাকিরাও। কিন্তু লাইট জ্বালানোর অবশ্য কোনও দরকার ছিল না। বিস্ফোরণের ফলে সিলিং-এ তৈরি হওয়া ফোকর বেয়ে চাঁদের আলো নেমে আসছে।

সফল হয়েছেন তারা।

রাত ১১:৪২

দু'হাতে ডেস্কের উপর শরীরের ভর চাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রেফ, নজর ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে। হতাশায় কপালে হাত বুলাতে বুলাতে এতোক্ষণ আটকে রাখা নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে যেতে দিলেন তিনি। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া একটা হলওয়ের দৃশ্য ফুটে আছে মনিটরে।

পাশে দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনা লক্ষ্য করেছে আশান্দা।

তার মানে, কোনওভাবে দক্ষ একজন বডিগার্ড যোগাড় করতে পেরেছে আমাদের শিকার।

অবশ্য একটা কাজের কাজ হয়েছে। সিলিং ধ্বসে পড়ার ঠিক আগমুহূর্তে বার্নের হেলমেটের ক্যামেরায় সেই লোকটার চেহারা ধরা পড়েছে। ছবিটা পুরোপুরি পরিষ্কার না হলেও, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। ইতিমধ্যে ছবিটার রেজুলেশন বাড়ানোর কাজে নেমে পড়েছে সেইন্ট জার্মেইন ফ্যাসিলিটির বিজ্ঞানীরা।

রেডিও থেকে বার্নের ছাড়া ছাড়া কণ্ঠ ভেসে এল। "...পালিয়েছে। স্থানীয় পুলিশ আর দমকল বিভাগ রওনা হয়ে গেছে ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে। কী করব এখন?"

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রেফ। "চলে এসো। টার্গেটকে এখন আর ওই এলাকায় পাওয়া যাবে না। পরবর্তীতে আবার ওদের ট্রেইল খুঁজে নেব আমরা।"

বার্নের কণ্ঠ শুনে মনে হলো, আপত্তি করবে সে। নিজের লোক হারানোটা এতো সহজে মেনে নেয়ার কথা না তার। কিন্তু রেফের আদেশের বাইরে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব না।

সায় দিয়ে লাইন কেটে দিল মার্সেনারী গ্রুপলিডার।

ক্যামেরায় ধরা পড়া লোকটার ছবিটা ল্যাপটপে ওপেন করলেন রেফ। আপাতত মিশনে ব্যর্থতার ব্যাপারটা ছাপিয়ে আরেকটা প্রশ্ন খেলা করছে তার মাথায়।

কে এই লোক?

রাত ১২:২২

এসইউভির সামনের সিটে বসে, আয়নায় প্রোভো শহরটাকে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখছেন পেইন্টার। শহর থেকে বেরিয়ে আসার পর এই প্রথম শরীর ঢিল দিয়ে বসলেন তিনি।

আবারও ড্রাইভিং সিট দখল করে নিয়েছে কোয়ালস্কি। কাঁধে বুলেট আঁচড় কেটে যাওয়ায় পেইন্টারের পক্ষে গাড়ি চালানো সম্ভব না। পাশাপাশি বিস্ফোরণের পর থেকে কানের ভেতর অনবরত ভোঁ-ভোঁ শব্দ হচ্ছে তার।

বুড়িয়ে যাচ্ছি আমি...

এই বয়সে ফিল্ডওয়ার্ক করা আমার শোভা পায় না, কথাটা ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন পেইন্টার। পাশে বসে থাকা কোয়ালস্কির চাঙ্গা ভাবটা যেন সেই তারই প্রমাণ দিচ্ছে। এরকম একটা পরিস্থিতি থেকে বেঁচে আসার পর কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখায়নি সে। কোলে রাখা কফির ফ্লাস্কে মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে একমনে গাড়ি চালাচ্ছে সিগমার বিশালদেহী বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালেন পেইন্টার। হ্যাঙ্ক আর কাই, দু'জনেই ঘুমাচ্ছে। তবে পাশ থেকে চারদিকে সতর্ক নজর বোলাচ্ছে বাদামী আর নীল রঙধারী একজোড়া চোখ।

কাউচের উদ্দেশ্যে নড করলেন তিনি। কাই- কে দেখে রেখো।

লেজ নাড়ল কুকুরটা। মনে হলো, কথাটা বুঝতে পেরেছে।

হ্যাঙ্কের দু'জন বন্ধু আছেন, লোকালয় থেকে বেশ দূরে বাস করেন তারা। আশ্রয়ের আশায় দলবল নিয়ে এখন তাদের কাছেই যাচ্ছেন পেইন্টার। ইউনিভার্সিটি থেকে পালিয়ে আসার পর হ্যাঙ্ককে প্রফেসর ডেন্টনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন তিনি। খবরটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল মানুষটা। অল্প ক'টা দিনের ব্যবধানে দু'জন কাছের মানুষকে হারাতে হলো তাকে। প্রফেসরের মনের অবস্থা উপলব্ধি করেই আর দেরি করেননি পেইন্টার, একটা ফার্মেসী থেকে ফার্স্ট এইডের জন্য কিছু ওষুধপত্র কিনেই রওনা হয়ে গেছেন সবাইকে নিয়ে।

মোবাইলটা বেজে উঠতেই পকেট থেকে বের করে কলার আইডি চেক করলেন তিনি, তারপর রিসিভ করে কানে ঠেকালেন ফোনটা। "কমান্ডার পিয়ার্স?"

এই অসময়ে গ্রে-র কাছ থেকে ফোন পেয়ে বেশ অবাক হয়েছেন পেইন্টার। ওয়াশিংটনের ঘড়ি এখানকার চেয়ে দুই ঘন্টা লেট।

"ডিরেক্টর ক্রো," জবাব দিল গ্রে। "আপনি সুস্থ আছেন জানতে পেরে ভালো লাগছে। ক্যাটের কাছ থেকে হামলার ব্যাপারে শুনেছি আমি। আপনাকে ফোন করার অনুমতি দিয়েছে ও আমাকে।"

"বলো।"

গাড়িতে ওঠার পরপরই ক্যাটকে ফোন করে ইউনিভার্সিটিতে আক্রমণের ব্যাপারে জানিয়েছিলেন পেইন্টার। সিগমার নিজস্ব সোর্স ব্যবহার করে হামলাকারীদের সম্পর্কে কোনও খবর পাওয়া যায় কিনা, তা খতিয়ে দেখতে বলেছেন ক্যাটকে।

"সম্ভবত আপনাদের উপর আক্রমণের কারণ সম্বন্ধে কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছি আমি," ব্যাখ্যা করল গ্রে।

কথাটা শুনে নড়েচড়ে বসলেন পেইন্টার। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, গিল্ডের ব্যাপারে অনুসন্ধান করছিল গ্রে।

"হ্যাঁ, বলো" সায় দিলেন তিনি।

সংক্ষেপে তাকে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, আরচার্ড ফোরটেস্কু আর বিবর্ণ ইন্ডিয়ান সম্পর্কে জানাল গ্রে। চিঠিতে উল্লেখ করা বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের সেই রহস্যময় শত্রুপক্ষ আর গিল্ডের সাথে তাদের প্রতীকের মিল সম্পর্কেও ব্যাখ্যা করল সে।

"আমার মনে হয়, গুহায় মমিগুলো খুঁজে পাওয়াতে গিল্ডের মনোযোগ এদিকে আকর্ষিত হয়েছে," যোগ করল গ্রে। "নিশ্চয়ই এতোদিন যাবত গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা তাদের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।"

"আর এখন উন্মোচিত হয়েছে সেটা," বলে উঠলেন পেইন্টার।

যদিও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু পরিকল্পনা আর নৃশংসতার দিক দিয়ে মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই ঘটনাটার সাথে সম্পৃক্ততা আছে গিল্ডের।

"আমি দেখছি এদিকে আর কী কী খুঁজে বের করা যায়," যোগ করল গ্রে।

"করতে থাকো।"

"আরেকটা খবর আপনাকে জানাতে বলেছে ক্যাট।"

"কী?"

"জাপানি বিজ্ঞানীরা নাকি নিউট্রিনো স্তরে একটা বিশাল আলোড়ন লক্ষ্য করেছে।"

"নিউট্রিনো? সেই বিশেষ সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলগুলো?" পেইন্টারের কণ্ঠে বিস্ময়।

"হ্যাঁ। সাধারণত এরকম আলোড়ন তৈরির জন্য সৌরঝড়, নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ, তারার বিস্ফোরণ ইত্যাদি বিশেষ ধরণের ঘটনার প্রয়োজন। তাই নড়েচড়ে বসেছে নিউট্রিনো সম্পর্কে গবেষণা করে এমন সবগুলো ফ্যাসিলিটি।"

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না পেইন্টারের। "তা বুঝলাম। কিন্তু এসবের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক?"

"বিজ্ঞানীরা সেই নিউট্রিনো স্তরে আলোড়নের কারণ আর ঘটনাস্থল চিহ্নিত করতে পেরেছেন।"

"উটাহ- এর বিস্ফোরণ, তাই তো?" গ্রে কিছু বলার আগেই ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়েছেন পেইন্টার।

"ঠিক তাই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। "কী হয়েছে, বস?" ড্রাইভ করার ফাঁকে জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

মাথা নাড়লেন পেইন্টার। ক্রমেই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। চিন্তাভাবনা করার জন্য সময় দরকার তার। ইতিমধ্যে পাহাড়ে চলে যাওয়া সিগমার ভূতাত্ত্বিক- রোনাল্ড শিনের সাথে কথা বলেছেন তিনি। জায়গাটা সম্বন্ধে অদ্ভূত এক রিপোর্ট দিয়েছে সে। বিস্ফোরণস্থলের কেন্দ্রে যাই ঘটে থাকুক, এখনও সক্রিয় আছে ওটা। নতুন কোনও কিছুর সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে জিনিসটাকে আণবিক পর্যায়ে ভেঙে ফেলছে ঐ অদ্ভুতুড়ে জিনিসটা।

প্রফেসর কানোশ বলেছিলেন, গুহায় পাওয়া খুলিটার ভেতর বিশেষ কিছু ছিল। গুহা থেকে বাইরে বের করার ফলেই বিস্ফোরিত হয়েছে ওটা। মমি হয়ে যাওয়া ইন্ডিয়ানগুলো- যদি আসলেই তারা ইন্ডিয়ান হয়ে থাকে আর কি- তাদের কাছেও বিশেষ অস্ত্রের হদিশ পাওয়া গেছে। আণবিক পর্যায়ে বিশেষ কিছু উপাদান মিশ্রিত করে বানানো হয়েছিল ওই অস্ত্রের ধাতু।

আর এখন, নিউট্রিনোর মত বিশেষ কণার স্তরে আলোড়ন...এখানেও সেই অণু-পরমাণুর খেলা।

সবকিছু একসাথে ন্যানোটেকনোলজির দিকেই আঙুল তুলছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এসব ঘটনার যোগসূত্রটা কোথায়?

কানের ভেতর ভোঁ-ভোঁ করা বন্ধ হলেই চিন্তাভাবনা করে ব্যাপারটার একটা সুরাহা করতে হবে, ভাবলেন পেইন্টার।

কিন্তু মনের গভীর থেকে একটা কথা এখনই উপলব্ধি করতে পারছেন তিনি।

আসল খেলা সবে শুরু।

দ্বিতীয় অংশ

অগ্নিঝড়

অধ্যায় ১৪
৩১ মে, দুপুর ৩:৩০
গিফু গবেষণাকেন্দ্র, জাপান

"কাউকে বলা উচিত ব্যাপারটা," বলে উঠলেন জুন ইয়োশিদা।

কিন্তু কথাটা শুনে ড. রিকু তানাকা ধরতে গেলে কোনও প্রতিক্রিয়াই দেখাল না। শুধু একবার মাথা ঝাঁকিয়ে আবার মনিটরের দিকে নজর দিল সে। মাছ ধরার সময় সাধারণত বক-কে এমন ভঙ্গি করতে দেখা যায়। বেয়াদব ছেলেটাকে চড় মারার ইচ্ছাটা আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ইয়োশিদার।

"এখনই এটা করা উচিত হবে না," অবশেষে মুখ খুলল তরুণ বিজ্ঞানী। তবে মনে হলো কাউকে শোনানোর জন্য না, নিজের মনেই বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল সে।

সারারাত নির্ঘুম থাকা পরও এই বিকেল পর্যন্ত মনিটর সামনে বসে আছেন ড. ইয়োশিদা। এমন অবস্থায় অবজারভেটরির ডিরেক্টর হিসেবে তার ঘুমিয়ে পড়াটা ভালো দেখায় না। ড. জেনিস কুপার আর পাগলাটে গবেষক ড. রিকু তানাকাও আছে তার সাথে। স্ক্রিনে একের পর এক নিউট্রিনো মনিটরিং গ্রাফ ভেসে উঠছে। উটাহ থেকে উৎপত্তি হওয়া নিউট্রিনো আলোড়নের ব্যাপারে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। ব্যাপারটা ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি করে রেখেছে আমেরিকা।

এটা কী কোনও নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ? আমেরিকা কী ঘটনাটাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে?
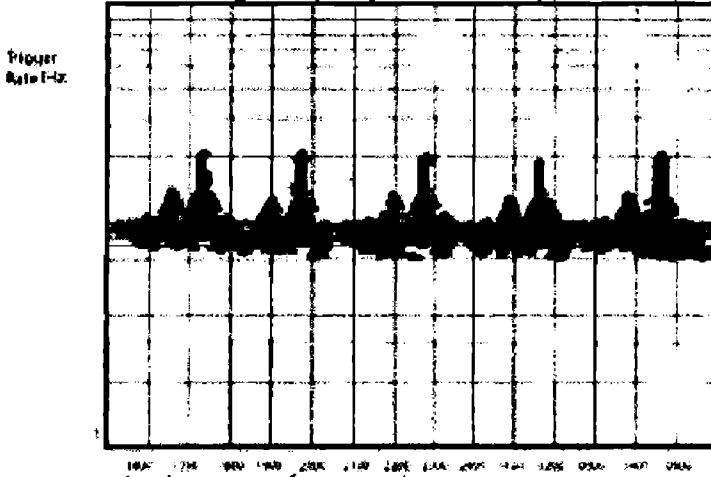
আর যাই হোক, আমেরিকানদের বিশ্বাস করেন না ইয়োশিদা। নিউক্লিয়ার বোমা ফেলে জাপানকে তারা কতটা ভুগিয়েছে, তা গোটা পৃথিবীই জানে। এখনও যদি সেরকম কোনও ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সবার সেটা জানার অধিকার আছে। কে জানে, আবার কোন দেশের সর্বনাশ করতে চলেছে ক্ষমতাধারী কসাইগুলো। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে প্রাথমিক একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি।

"আমার মনে হয়, রিকু ঠিকই বলছে," বলে উঠল ড. কুপার। "এখনও নতুন আলোড়নটার উৎপত্তিস্থল বের করতে পারিনি আমরা। তাছাড়া এটার স্পাইকগুলো উটাহ-এর আগের আলোড়নটার মত স্থির না। অফিশিয়াল ঘোষণা দেয়ার আগে আরও বিস্তারিত জেনে নেয়াটাই ভালো হবে।"

মেয়েটার কথায় আবারও স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকালেন ইয়োশিদা। বিগত আশি মিনিট ধরে আরেকটা নতুন আলোড়নের রিপোর্ট করছে ডিটেক্টর। মনে করা হচ্ছে, আগের আলোড়নের মতো এগুলোও জিওনিউট্রিনো। সেই তথ্যগুলোই এখন গ্রাফ আকারে

ফুটে উঠছে মনিটরে। পুরো অবজারভেটরির প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা।

তবে ড. কুপার ঠিকই বলেছে। এই আলোড়নের স্পাইক আগেরটার থেকে বেশ ভিন্ন। উটাহ থেকে উৎপত্তি হওয়া আলোড়নের ফলে গ্রাফে শুধুমাত্র একটা বিশালাকৃতির স্পাইক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখন একসাথে দুটো করে স্পাইক তৈরি হচ্ছে... একঘন্টারও বেশি সময় ধরে ক্রমাগত হয়েই চলেছে- একটা বড়, একটা ছোট। গ্রাফটাকে দেখতে অনেকটা হৃৎপিণ্ডের গতি মনিটর করার গ্রাফের মতো দেখাচ্ছে।

"এটার সাথে আগের ঘটনাটার সম্পর্ক না থেকেই পারে না," মন্তব্য করলেন ইয়োশিদা। "একই দিনে নিউট্রিনো স্তরে এরকম দুটো অস্বাভাবিক ঘটনা... নাহ, মেলানো যাচ্ছে না কিছুতেই।"

"সম্ভবত প্রথমটার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে দ্বিতীয়টা," যোগ করল তানাকা।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন ডিরেক্টর। বুঝতে পারছেন না তরুণ বিজ্ঞানীর কথাটা উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে কি না। "তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছ, প্রথম আলোড়ন দ্বিতীয় আলোড়নটা তৈরির ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছে? কোন একটা শক্তিশালী জিনিসকে সক্রিয় করে দিয়েছে ওটা?"

মনে মনে ব্যাপারটা কল্পনা করলেন ইয়োশিদা।

পৃথিবী থেকে ক্রমাগত তৈরি হয়ে চলেছে জিওনিউট্রিনো তরঙ্গ...চারদিকে স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ছে রহস্যময় কণাগুলো...কিন্তু নিজেদের পেছনে একটা করে ট্রেইল রেখে যাচ্ছে সেই স্রোত, তৈরি করছে আরেকটা ঢেউ।

"কিন্তু অন্য পদার্থের সাথে বলতে গেলে নিউট্রিনো প্রায় কোন প্রতিক্রিয়াই দেখায় না।" হঠাৎ কুপারের কথাগুলো যেন ইয়োশিদার চিন্তায় পানি ঢেলে দিল। "সবকিছুকেই স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে যায় ওগুলো, এমনকি পৃথিবীর কেন্দ্রকেও। তাহলে কণাগুলোর পক্ষে কীভাবে অন্য কোনও পদার্থকে সক্রিয় করা সম্ভব?"

"আমি কি জানি!" দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ইয়োশিদার মুখ দিয়ে।

কিন্তু হাল ছাড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তানাকার কথায়। "আমরা জানি, সকালের আলোড়নটা উটাহ- এর বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হয়েছিল। ঘটনাটা যাই হোক না কেন, মানতে হবে খুবই অস্বাভাবিক। নয়তো এরকম রিডিং আসতো না। আগে কোনওদিন এরকমটা দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।"

কুপারকে কথাটায় সন্দিগ্ধ দেখালেও মনে মনে তানাকার কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারছেন ইয়োশিদা। একসময় ভাবা হত, নিউট্রিনোর কোনও ভর নেই, কোন চার্জ নেই। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কথাগুলো ভুল প্রমাণ করা হয়েছে। নিউট্রিনোর মাধ্যমে নিষ্ক্রিয়াবস্থা থেকে সক্রিয় হতে পারে, এমন কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এখনও এই কণাগুলোর প্রকৃতি যথেষ্ট রহস্যে ঘেরা। হয়তো আসলেই সেরকম কোনও পরিস্থিতি তৈরি করেছে উটাহ থেকে উৎপত্তি হওয়া নিউট্রিনোগুলো।

"ঠিক আছে, অন্তত নতুন আলোড়নের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আগে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছি না আমরা।" ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন ড. ইয়োশিদা। "কাজে ফেরত যাওয়া যাক।"

পরবর্তী আধঘন্টায় অন্যান্য নিউট্রিনো মনিটরিং ফ্যাসিলিটিগুলোর রিপোর্ট পাওয়া গেল। এবার সবগুলো গ্রাফ ক্রসম্যাচিং করলেই বেরিয়ে আসবে থলের বেড়াল। একে একে সবগুলো তথ্য কম্পিউটারে টাইপ করতে লাগল কুপার। একটু পর গোটা পৃথিবীর মানিচত্র ভেসে উঠল স্ক্রিনে।

"কাজ হচ্ছে না," ইয়োশিদার কন্ঠে অনিশ্চয়তার ছাপ।

"দাঁড়ান," নিঃস্পৃহ কণ্ঠে তার কথায় প্রতিবাদ জানাল তানাকা।

পরবর্তী দশ মিনিটে আমেরিকা থেকে বেশ দূরের একটা অঞ্চলের ছবি ফুটে উঠল মনিটরে।

"মনে হচ্ছে এবার অন্তত আমেরিকাকে দোষারোপ করতে পারছি না আমরা," বলে উঠল কুপার।

এক মিনিট পর স্ক্রিনে একটা ছোট বৃত্ত ভেসে উঠল, পুরো মানচিত্রটায় ঘুরতে ঘুরতে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে স্থির হলো ওটা। যার মানে হচ্ছে, ওই জায়গাটাই দ্বিতীয় আলোড়নের উৎপত্তিস্থল।

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলেন তিন বিজ্ঞানী। তবে তানাকাই সবার আগে নীরবতা ভাঙল।

"এবার যাকে যা জানানোর, জানাতে পারেন আপনি ড. ইয়োশিদা।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডিরেক্টর। কিন্তু তিনি ফোনের দিকে হাত বাড়াতে না বাড়াতেই পাশের মনিটরে দ্বিতীয় আলোড়নটার বর্তমান পরিস্থিতি ভেসে উঠল। সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে স্পাইকগুলো।

তাড়াতাড়ি ফোনটা হাতে নিয়ে একটা প্রাইভেট নম্বরে ডায়াল করলেন ইয়োশিদা। দেরি হওয়ার আগেই কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। ওপ্রান্তে কেউ একজন রিসিভ করল কলটা। কথা বলতে বলতেই মনিটরের দিকে আবারও ঘুরে গের তার দৃষ্টি।

উত্তর আটলান্টিকের একটা জায়গায় স্থির হয়ে আছে বৃত্তটা।

অধ্যায় ১৫
৩১ মে, রাত ২:৪৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

"আইসল্যান্ড?" বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে এক মুহূর্ত সময় লাগল গ্রে-র। "এক ঘন্টার ভেতর রেইকজাভিক রওনা হতে হবে?" ক্যাট ব্র্যায়ান্টের সাথে কথা বলতে বলতে ফোনের গায়ে চেপে বসল তার আঙুলগুলো।

কালো রঙের একটা লিংকন টাউন কার- এর পেছনের সিটে বসে আছে গ্রে আর শেইচান। পেইন্টারের উপর হামলা হওয়ার পর তাদের নিয়ে ঝুঁকি নিতে চায়নি ক্যাট। তাদের ন্যাশনাল আর্কাইভে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য গাড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছে সে। মঙ্ক আর দুই মিউজিয়াম কর্মী নাকি বিশেষ কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে।

"ঠিক তাই," ফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে ক্যাটের গলা শোনা গেল। "ডিরেক্টর ক্রো কাজটা করতে বলেছেন তোমাকে। আর এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে মঙ্ককেও সাথে নিয়ে যেতে বলেছেন তিনি।"

"আমরা এখন ওর কাছেই যাচ্ছি। আমাকে মেসেজ করেছিল মঙ্ক। আর্কাইভে গুরুত্বপূর্ণ কি যেন একটা পাওয়া গিয়েছে।"

"যাই কর না কেন, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ভেতর এয়ারপোর্টে পৌঁছে যেও। আর হ্যাঁ, সাথে করে গরম কাপড় নিতে ভুলো না।"

"ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী?"

"জাপানি ফ্যাসিলিটি থেকে আসা নিউট্রিনো স্তরের আলোড়নের খবরটা তো আগেই বলেছিলাম তোমাকে। ওই ফ্যাসিলিটির ডিরেক্টরের সাথে একটু আগে আবার কথা বলেছি আমি। আইসল্যান্ডের উপকূলে অবস্থিত একটা দ্বীপ থেকে আরেকটা আলোড়ন তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, দুটো ঘটনা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সম্ভবত, ওই দ্বীপে এমন কিছু একটা ছিল, যেটাকে উটাহ থেকে উৎপত্তি হওয়া নিউট্রিনোগুলো সক্রিয় করে তুলেছে। ডিরেক্টর ক্রো চান, ব্যাপারটা সারেজমিনে তদন্ত করে দেখ তুমি।"

সায় দিল গ্রে। "ঠিক আছে। মঙ্ককে নিয়ে রওনা হচ্ছি আমি।"

"সাবধানে থেকো।"

কথাটা তার উদ্দেশ্যে বলা হলেও বাক্যটার মাঝে লুকিয়ে থাকা অর্থটা পরিষ্কার অনুধাবন করতে পেরেছে গ্রে।

আমার স্বামীকে দেখে রেখো।

ক্যাটের অবস্থাটা বুঝতে পেরে আবার মুখ খুলল সে। "আহ...ক্যাট, মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা আমি আর শেইচানই সামলে নিতে পারব। মঙ্ককে নেয়ার দরকার নেই। ও বরং গবেষকদের সাথে আর্কাইভেই থাকুক।"

কথাটা শুনে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল মেয়েটা। ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলা শুরু করল সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড। "সমস্যা নেই। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কী বলতে চাইছ। তবে কাজের সময় নিজেদের ঘাড়ের উপর মঙ্কের নিঃশ্বাস ফেলাটা মনে হয় মিউজিয়ামের লোকদের খুব একটা ভালো লাগবে না। তাছাড়া, কিছুদিনের ভেতর আমাদের সংসারে নতুন অতিথি আসতে চলেছে। পেনেলোপ আর ওকে আমি একা কিছুতেই সামলাতে পারব না। তখন আমাকে সাহায্য করার জন্য বেশ অনেক দিন ঘরবন্দী হয়ে থাকা লাগবে মঙ্কের। এখনই সময়, একটু হাত পা খেলিয়ে আসুক।"

অকাট্য যুক্তিটার বিরুদ্ধে আর কোনও অস্ত্র খুঁজে পেল না গ্রে। "তোমার স্বামীকে নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে আনব আমি, কথা দিলাম।"

"আমি জানি, সেটা তুমি খুব ভালোমতোই পারবে।" বলে মৃদু হাসল ক্যাট।

ফ্লাইটের ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য জেনে নিয়ে ফোন রেখে দিল গ্রে।

এতোক্ষণ চুপচাপ সিটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে ছিল শেইচান। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, ঘুমাচ্ছে। কথা শেষ হতেই নড়েচড়ে বসল মেয়েটা। "কোথাও যেতে হবে?"

"তাই মনে হচ্ছে।"

কয়েক মিনিট নীরবতার মাঝেই ন্যাশনাল আর্কাইভ বিল্ডিং- এর সামনে এসে থেমে গেল গাড়িটা। গেটে দাঁড়িয়ে ছিল মঙ্ক। ওদেরকে পথ দেখিয়ে রিসার্চ রুমে নিয়ে যেতে লাগল সে।

"আইসল্যান্ড, বুঝতে পেরেছ খোকা?" মঙ্কের কথায় মনে হলো ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে। অবশ্য ফিল্ডওয়ার্কের বেলায় বরাবরই আগ্রহী ছিল টেকো মাথার এই সিগমা অপারেটিভ, এমনকি দুর্ঘটনায় এক হাত হারানোর পরও।

মঙ্ক আর শেইচানকে নিয়ে রিসার্চ রুমে প্রবেশ করল গ্রে। তবে আগেরবার যেমন দেখেছিল, তার চেয়ে বেশ পাল্টে গেছে ঘরের ভেতরের দৃশ্য। পুরনো বই, মানচিত্র, পাণ্ডুলিপি, ছোট ছোট বাক্স ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে আছে কনফারেন্স টেবিলটা। দেয়ালে ঝোলানো তিনটা বড় মনিটরেও কালের আঁচড়ে হলুদ হয়ে যাওয়া কোনও না কোনও বইয়ের পৃষ্ঠা ভাসছে।

একটা বাক্সের উপর ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা খুঁজছেন ড. হেইসম্যান। শেরিনও তার সাথেই আছে। পরনের সোয়েটারের হাতা কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়েছেন কিউরেটর।

"এই যে, অগ্ন্যুৎপাত সম্পর্কে ফ্র্যাঙ্কলিনের আরেকটা লেখা..." বলতে বলতে মুখ তুলে মঙ্কদের ঘরে ঢুকতে দেখলেন তিনি। "বলেছেন নাকি এদের?"

"না," জবাব দিল মঙ্ক। "আপনাদের কাছ থেকে শোনাটাই ওদের জন্য ভালো হবে। তাছাড়া সবকিছু তো আপনারাই করেছেন। কাজ বলতে আমি শুধু এতোক্ষণে পিজ্জা অর্ডার করেছি।"

"কী?" জানতে চাইল গ্রে।

জবাব না দিয়ে শেরিনের দিকে তাকালেন কিউরেটর। আগের সেই আঁটসাঁট কালো পোশাকটাই পরে আছে মেয়েটা। তবে রূপ পরিবর্তন বলতে এখন উপরে সাদা একটা কোট চাপিয়েছে, সেই সাথে হাতে পাতলা গ্লাভস। "তুমিই শুরু কর, শেরিন।"

মাথা নেড়ে সায় দিল তার সহকারী। "আমাদের সার্ভারে জাদুঘরে থাকা প্রায় সব পুরনো কাগজপত্রের ডিজিটাল ভার্সন আছে, যা দরকার তা একটামাত্র সার্চ দিয়েই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমে ফোরটেস্কু আর ফ্র্যাঙ্কলিনের নাম একসাথে সার্চ দিয়ে কিছু পাওয়া যায়নি। তারপর নামের বানানগুলো একটু এদিক-সেদিক করে সার্চ দিলাম, এবারও ফলাফল শূন্য। তখন কী মনে করে আরচার্ড ফোরটেস্কু-র নামের ইংরেজি আদ্যাক্ষর এ আর এফ লিখে সার্চ দেই আমি।"

এবার মুখ খুললেন কিউরেটর, মুখে গর্বের হাসি। "তাতেই কাজ হলো," বলে হাতে ধরা কয়েকটা কাগজের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "থমাস জেফারসন তার ব্যক্তিগত সহকারী মেরিওয়েদার লুইসের কাছে লিখেছিলেন এই চিঠিটা।"

"লুইস?" লুইস এবং ক্লার্ক এর সেই লুইস নাকি ইনি? পুরো মহাদেশ পাড়ি দিয়ে প্যাসিফিকে পৌছানো সেই দুই বিখ্যাত অভিযাত্রীর একজন?" প্রশ্ন করল গ্রে।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন কিউরেটর। "একেবারে আদী ও অকৃত্রিম সেই লুইস। চিঠিটা আঠারোশো তিন সালের জুন মাসের আট তারিখে লেখা, সেই অভিযানের এক বছর আগে। একটা অগ্ন্যুৎপাত সম্পর্কে তাকে কিছু কথা বলেছিলেন জেফারসন।"

তবে গ্রে-র মাথায় কিছু ঢুকল না। "এসবের মাঝে আবার আগ্নেয়গিরি এলো কোথা থেকে?"

ব্যাখ্যা করতে লাগলেন হেইসম্যানঃ "ব্যাপারটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই ঘটনাটা সম্পর্কে আগে কেন কথা ওঠেনি, তা আন্দাজ করতে পারছি আমি। লুইস আর জেফারসন পরস্পর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বিজ্ঞান এবং দর্শনসংক্রান্ত অনেক কথাই তার সাথে আলোচনা করতেন জেফারসন। পেশাগত দিক দিয়ে মেরিওয়েদার লুইস সেনাবাহিনীর লোক হলেও, বিজ্ঞান এবং সমসাময়িক পৃথিবী সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ ছিল তার।"

গ্রে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, সিগমা এজেন্টদের মতোই একাধিক বিষয়ে দক্ষ ছিলেন ভদ্রলোক।

বলে চলেছেন হেইসম্যানঃ "পারিবারিক দিক দিয়ে সুসম্পর্ক থাকার সুবাদে তারা দু'জন বেশ কাছের বন্ধু ছিলেন। জেফারসন কাউকেই লুইসের চাইতে বেশি বিশ্বাস করতেন না।"

"অর্থাৎ জেফারসনের কোন গোপনীয়তা রক্ষার জন্য লুইসই ছিলেন একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি," মন্তব্য করল মঙ্ক।

সায় দিলেন কিউরেটর। "আর বন্ধুকে লেখা এই চিঠিতে বেশ কয়েকবার ফোরটেস্কুর নাম নিয়েছেন জেফারসন, তবে প্রতিবারই সংক্ষিপ্ত আকারে- এ.এফ."

"আরচার্ড ফোরটেস্কু..." বিড়বিড় করে নামটা উচ্চারণ করল গ্রে।

"খুব সম্ভবত, পুরো নামটা লেখর পক্ষে ভয়ে ছিলেন জেফারসন। অবশ্য জাতির পিতার এই স্বভাবটা সম্পর্কে অনেকেই জানে- সাংকেতিক ভাষা আর চিহ্নের ব্যাপারে আসক্ত ছিলেন তিনি। এমনকি মাত্র গত বছর সাংকেতিক ভাষায় তার লেখা একটা চিঠির অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।"

"ভীতু ছিল লোকটা," মন্তব্য করল মঙ্ক।

উষ্মা প্রকাশ পেল কিউরেটরের কণ্ঠে। "ফ্র্যাঙ্কলিনের আগের চিঠিটাতে যে রহস্যময় শত্রুর কথা বলা হয়েছে, তা সত্যি হয়ে থাকলে কি তার ভীতু হওয়াটাই যৌক্তিক নয়? আর এই ভয়ের কারণেই হয়তো পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর পুরো সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন তিনি। সুতরাং ভয় থেকে যদি দারুণ কিছু হয়, তবে তো ভয়ই ভালো।"

"কোন ব্যাপারে বলছেন?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

"প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর জেফারসনের প্রথম আদেশ ছিল, পুরো সেনাবাহিনী থেকে দুর্নীতি সম্পূর্ণরূপে দূর করা। মেরিওয়েদার লুইসের সাহায্য নিয়ে অসৎ অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে কোড করা চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করতেন তারা।"

গ্রে-র দিকে ইঙ্গিত করল মঙ্ক। "সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দেশদ্রোহীদের উৎখাত করতে চাইলে তো সবার আগে সেটাকেই বিশুদ্ধ করতে হত।"

তার ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছে গ্রে। সিগমার ভেতরে লুকানো গিল্ড এজেন্টদের নিকেশ করতে অতীতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে তাদের। স্বাধীনতার পথপ্রদর্শকদের সাথে নিজেদের কাজের ধারার মিল পেয়ে বিস্মিত হলো সে। আর লুইসের চরিত্রটাও তার মনে বেশ ভালোভাবে দাগ কেটেছে। একইসাথে সৈনিক আর বিজ্ঞানী ছিলেন ভদ্রলোক। আর এখন দেখা যাচ্ছে, গুপ্তচরের ভূমিকাতেও কাজ করেছিলেন তিনি। সিগমা অপারেটরদের সাথে বেশ মিল আছে বলতে হবে।

হাই তুলল শেইচান, ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। "সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আগ্নেয়গিরির সাথে আমাদের সম্পর্কটা কোথায়?"

নাকের উপর চশমাটা নেড়েচেড়ে বসালেন হেইসম্যান। "বলছি। চিঠিতে বিশ বছর আগে ঘটা একটা অগ্ন্যুৎপাতের কথা উল্লেখ করেছেন জেফারসন- ল্যাকি অগ্ন্যুৎপাত। স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলোর একটা বলে ধরা হয় ওটাকে। গোটা বিশ্বজুড়ে ছয় মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর কারণ ছিল ওটা। বাড়িঘর, ফসল, গবাদি পশু ইত্যাদি সব মাটিতে মিশে গিয়েছিল। ছাইয়ে ঢেকে গিয়েছিল পুরো আকাশ।"

চিঠির একটা অংশ পড়ে শোনাতে লাগল শেরিন। "সতেরশো তিরাশি সালে, গ্রীষ্মকালের এই সময়টাতে সাধারণত সূর্যের তাপে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠার কথা গোটা অঞ্চল। কিন্তু উত্তর আমেরিকায় সূর্যালোক মাটি পর্যন্তই পৌঁছাতে পারছে না। ছাই আর কুয়াশায় ঢেকে আছে চারদিক।"

"মনে হয়, আগ্নেয়গিরির এমন বেখাপ্পা আচরণে জেফারসন নিজেও ক্ষেপে ছিলেন," মন্তব্য করল গ্রে।

"তাই তো হওয়া উচিত," বলে এতোক্ষণ যাবৎ লুকিয়ে রাখা বোমাটা ফাটালেন হেইসম্যান। "ওই অগ্ন্যুৎপাতের জন্য নিজেকে দায়ী করছিলেন ফোরটেস্কু।"

"কী?" আরেকটু হলেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল গ্রে।

জবাবে হেইসম্যান কিছু বলার আগেই মুখ খুলল শেইচান। "মাফ করবেন, এই ভূগোলসংক্রান্ত ব্যাপারগুলো আমি একটু কম বুঝি। শুধু এটুকু বলুন, সেই আগ্নেয়গিরিটা কোথায়?"

প্রশ্নটা শোনার পর কিউরেটরের ভাব দেখে মনে হলো, জায়গার নামটা আগে বলেননি মনে করে নিজের উপর রাগ হচ্ছে তার। "আইসল্যান্ডে।"

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল মঙ্ক আর গ্রে।

ওই ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীর পদাঙ্কই অনুসরণ করতে চলেছি আমরা।

রাত ৩:১৩

বাকিরা আগ্নেয়গিরির অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা শুরু করায় কথা বলায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলল শেইচান, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল সে। পরক্ষণে অনেকটা আনমনেই গলায় ঝোলানো ছোট ড্রাগনটায় চলে গেল তার আঙুল।

ছোটবেলার কথা ভাবতে লাগল সে। তার মায়ের গলাতেও এমন একটা ড্রাগন পেন্ডেন্ট ছিল। প্রতি রাতে গল্প বলে বলে শেইচানকে ঘুম পাড়াতেন তিনি। কথা বলার সময় নিঃশ্বাসের তালে তালে ড্রাগনটা দুলত।

জোর করে দুঃসহ স্মৃতিগুলো মাথা থেকে সরিয়ে দিল সে, ভাবতে লাগল বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে। সাথে সাথে একটা প্রশ্ন চলে এল তার মাথায়।

"ডক্টর, অগ্ন্যুৎপাতের জন্য ফোরটেস্কু নিজেকে দায়ী করছিলেন বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন আপনি?"

এখনও হাতে চিঠিটা ধরে রেখেছেন হেইসম্যান। "এই তো, চিঠিতেই আছে এটা।" নির্দিষ্ট লাইনগুলো খুঁজে বের করে জোরে জোরে পড়া শুরু করলেন তিনি। "সতেরশো তিরাশি সালের দুর্যোগটা সম্পর্কে বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে আছে এ.এফ.। ও বলছে, আমার কথামতো ইন্ডিয়ান মানচিত্রের সেই পথটা অনুসরণ করার ফলেই ঘটেছে এই ঘটনাটা। তার মতে, ওই অগ্ন্যুৎপাতের কারণেই উপকূলে দূর্ভিক্ষ আঘাত হেনেছে। ফরাসী বিপ্লব ঘটার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ওই দুর্ভিক্ষ। যার কারণে মনঃকষ্ট আরও বেড়ে গিয়েছে তার।"

এই পর্যন্ত পড়ে হাতের কাগজটা নামিয়ে রাখলেন কিউরেটর। "আসলে এই একটা ব্যাপারে অন্তত সঠিক ভেবেছিলেন ফোরটেস্কু। বর্তমান সময়ের অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ ছিল ফ্রান্সে উপর করাল আঘাত হানা দুর্ভিক্ষ। আর সেই ল্যাকি অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই আবির্ভাব হয়েছিল সেই দুর্যোগের।"

"আর সেই অগ্ন্যুৎপাতের জন্য নিজেকে দায়ী করছিলেন তিনি," যোগ করল গ্রে। "কিন্তু এর মানে কী দাঁড়ায়?"

জবাব দিল না কেউ।

"তাহলে এই পর্যন্ত কী কী জানতে পারলাম আমরা?" কথাটা কাটিয়ে দিল শেইচান। "প্রথম চিঠিটা থেকে পাওয়া যায়, কেনটাকির কোনও ইন্ডিয়ান ঢিবিতে লুকানো পুরনো একটা মানচিত্র উদ্ধার করার জন্য ফোরটেস্কুকে অনুরোধ করেছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন। আর পরের জেফারসনের চিঠিটায় দেখা যাচ্ছে, জিনিসটা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন তিনি।"

সায় দিল গ্রে। "মানচিটা আইসল্যান্ডের দিকে নির্দেশ করে। সেই পথ অনুসরণ করে নির্দিষ্ট জায়গাটাতে পৌছান ফোরটেস্কু। আর সেখানে তিনি এমন কিছু একটা খুঁজে পান, যেটা মহাশক্তিশালী ল্যাকি অগ্ন্যুৎপাত শুরু হওয়ার পেছনে ভূমিকা রেখেছিল। এখন কথা হচ্ছে, ওই জিনিসটা কী?"

"প্রথম চিঠিটায় কিন্তু এই ব্যাপারে একটা ধারণা দেয়া হয়েছে," মন্তব্য করল শেইচান। "ইন্ডিয়ানদের আয়ত্তে থাকা কোনও একটা ক্ষমতা কিংবা গোপন কোনও জ্ঞান, জেফারসনকে ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে জানানোর জন্যই আসছিল তারা। সম্ভবত সেই কাল্পনিক ডেভিল কলোনীর স্থাপনের সাথে ব্যাপারটা সম্পর্কযুক্ত। হয়তো ওই কলোনী স্থাপনের বিনিময়েই জ্ঞান বা ক্ষমতাটা জেফারসনের কাছে হস্তান্তর করতে রাজি হয়েছিল তারা।"

"কিন্তু চুক্তিটা ভেঙে যায়। পথিমধ্যে আক্রমণের শিকার হয় লোকগুলো," হতাশ গলায় বলে উঠল মঙ্ক।

কাগজের স্তূপের ভেতর থেকে চিঠিটা খুঁজে বের করল শেরিন, আবারও পড়া শুরু করল সেই বিশেষ অংশটা। "চোদ্দ নাম্বার কলোনী- ডেভিল কলোনীর আশা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। গভর্নর জেফারসনের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় ইরোকি ঐক্যজোটের শামানদের উপর হামলা করা হয়েছিল। একজন বাদে বাকি সবাইকে খুন করেছে হামলাকারীরা। অন্যদের মৃতদেহের নিচে লুকিয়ে থেকে প্রাণে বেঁচে যায় লোকটা, যার ফলে গ্রেট এলিক্সার আর বিবর্ণ ইন্ডিয়ান সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে।"

মাথা নাড়ল গ্রে। "হামলা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন একজন শামান। পরবর্তীতে তিনি একটা মানচিত্রের কথা বলেন। সম্ভবত, চিঠিতে ইঙ্গিত করা সেই জ্ঞান বা ক্ষমতার পথনির্দেশ করছিল মানচিত্রটা। আর সেই পথটা অনুসরণ করার জন্য পাঠান হয়েছিল ফোরটেস্কুকে।"

"সফল হয়েছিলেন তিনি," যোগ করল মঙ্ক। "চিঠিতে বিবর্ণ ইন্ডিয়ানদের পাশাপাশি আরেকটা জিনিসের কথা বলা হয়েছে- গ্রেট এলিক্সার। জানিনা ওটা কী...কিন্তু ফোরটেস্কুর মতে, মারাত্মক একটা অগ্ন্যুৎপাত তৈরি করার মতো ক্ষমতা জিনিসটার ছিল। পরবর্তীতে এই ব্যাপারটা নিয়েই আত্মগ্লানিতে ভুগছিলেন ভদ্রলোক।"

"হ্যাঁ, কিন্তু বিশ বছর পর। যখন আবারও জেফারসন আমন্ত্রণ জানান তাকে।" যোগ করলেন হেইসম্যান।

কিউরেটরের দিকে ঘুরে গেল শেইচানের দৃষ্টি। "মানে?"

চশমাটা নেড়েচেড়ে আবারও চিঠি পড়ায় মনোযোগ দিলেন হেইসম্যান। "এরকম একটা মর্মান্তিক ঘটনার পর আবারও এ.এফ.-কে অভিযানে পাঠানোতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। কিন্তু তার অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলির সাথে ওই অঞ্চলের আদিবাসী সংক্রান্ত জ্ঞান তোমাদের কাজে আসবে। দরকারী জিনিসপত্রগুলোর ব্যবস্থা করে সেইন্ট চার্লসে তোমাদের সাথে যোগ দেবে সে, একসাথে পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা শুরু করবে তোমরা।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন, লুইস এবং ক্লার্কের অভিযানের সাথে ফোরটেস্কুও জড়িত ছিলেন?" প্রশ্ন করল গ্রে।

"আমি নই," বলে হাতে ধরা কাগজটার দিকে ইঙ্গিত করলেন কিউরেটর। "স্বয়ং জেফারসন এটা বলেছেন।"

"কিন্তু এ সম্পর্কে আর তো কোনও রেকর্ড নেই..."

"হয়তো অন্যান্য নথির মতো এই সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলোও লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল," জবাব দিলেন হেইসম্যান। "প্রমাণ বলতে আমাদের হাতে শুধু এই চিঠিটাই আছে। এছাড়া এই অভিযানে যাওয়ার পর ফোরটেস্কু সংক্রান্ত আর কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।"

"কিন্তু জেফারসন তাকে লুইস আর ক্লার্কের সাথে কেন পাঠালেন?" প্রশ্ন করল গ্রে।

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল শেইচান, উত্তরটা ধারণা করতে পেরেছে ও। "সম্ভবত মানচিত্রটাতে শুধু আইসল্যান্ডই একমাত্র চিহ্নিত জায়গা ছিল না। চিঠিতে উত্তরদিকে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন জেফারসন। হয়তো আইসল্যান্ড কাছে বলেই, সেখানে আগে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন তারা।"

পাজলের টুকরোগুলো আস্তে আস্তে গ্রে-র মাথায় থাপে থাপে বসতে শুরু করেছে। "ধরে নিলাম, দুটো জায়গাই ছিল। কিন্তু প্রথম অভিযানের পর বিশ বছর দেরি করার পেছনে কারণ কী?"

এবার জবাব দিল মঙ্ক। "প্রথম অভিযানের পর কী ঘটেছিল ভুলে গেলে নাকি? ফোরটেস্কুর ধারণা সঠিক হলে, তাদের কাজের প্রেক্ষিতে প্রায় ছয় মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল, উদ্ভূত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লব। দেরি হলেও, দ্বিতীয়বার অভিযানের পক্ষে ভালোমতো চিন্তাভাবনা করে নেয়াটাই তো বেশি যুক্তিযুক্ত।"

"আরেকটা ব্যাপার আছে," বলে উঠলেন হেইসম্যান। "ঐতিহাসিকদের মতে, লুইস আর ক্লার্কের সেই অভিযান শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ছিল না।"

"মানে?"

"অভিযানের আগে কংগ্রেসের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন জেফারসন। অভিযানের আসল কারণটা সেই চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন তিনিঃ পশ্চিমদিকের ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা। আর তখন যোগাযোগ করার জন্য লুইসের সাথে মিলে একটা সাংকেতিক ভাষা আবিষ্কার করেছিলে তিনি। শুধুমাত্র জেফারসনের বিশ্বাসী লোকদেরকেই সেই ভাষাটা শেখানো হয়েছিল। এসব দেখে কী মনে হয় আপনাদের, এটা সাধারণ কোনও অভিযান ছিল? না, নিশ্চয়ই পশ্চিমে বিশেষ কিছু একটার খোঁজে ছিলেন জেফারসন।"

"কিন্তু তিনি কি জিনিসটা পেয়েছিলেন?" জিজ্ঞেস করল শেইচান।

"এই ব্যাপারে আর তেমন কিছু জানা যায়নি," জবাব দিলেন কিউরেটর। "ফোরটেস্কু সম্পর্কিত সকল কাগজপত্র লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, তাকে একপ্রকার মুছে ফেলা হয়েছিল ইতিহাসের পাতা থেকে। কিন্তু আরেকটা ঘটনা এই ব্যাপারটার সত্যতা প্রমাণ করে।"

সামনের দিকে ঝুঁকে এল মঙ্ক। "কী সেটা?"

"আঠারোশো নয় সালের অক্টোবরের তিন তারিখে, পশ্চিমের অভিযান থেকে ফিরে আসার তিন বছর পর, টেনেসির একটা সরাইখানার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় লুইসকে। মাথা আর বুকে দুটো গুলির আঘাতে মারা গিয়েছিলেন তিনি। তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হয়, সরাইখার কাছেই কবর দেয়া হয়েছিল লাশটা। তবে পরবর্তীতে ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করেন, আসলে খুন করা হয়েছিল তাকে।" এ পর্যন্ত বলে এক মুহূর্তের জন্য বিরতি নিলেন হেইসম্যান। "মারা যাওয়ার সময় থমাস জেফারসনের সাথে দেখা করার জন্য ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন লুইস। কারও কারও মতে, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত এমন কোনও তথ্য ছিল তার কাছে, সেটা জানানোর জন্যই জেফারসনের কাছে আসছিলেন তিনি। কিন্তু ট্রেইলটা পরবর্তীতে প্রমাণের অভাবে হারিয়ে যায়।"

গ্রে-র দিকে তাকাল শেইচান, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কপালের একপাশে হাত বুলাচ্ছে সে। সন্দেহ নেই, এতোক্ষণ শোনা কথাগুলো সম্পর্কেই ভাবছে সিগমা কমান্ডার।

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলালেন কিউরেটর। "লেডিজ অ্যান জেন্টলমেন, আজ রাতে এখানেই শেষ করা যাক। তাছাড়া, আপনাদের একটা ফ্লাইটও ধরতে হবে।"

উঠে দাঁড়াল সবাই। হেইসম্যান আর শেরিন জানালেন, কাল সকালে আবারও কাজে নামবেন তারা। দেখবেন আরও বিস্তারিত কোনও তথ্য পাওয়া যায় কি না। কিন্তু কথাগুলো খুব একটা আশাব্যঞ্জক ঠেকল না গ্রে-র কাছে।

বিদায় সম্ভাষণের পর রাস্তায় বেরিয়ে এল তারা। লিংকন টাউন কারটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

"কী হয়েছে গ্রে? অনেকক্ষণ ধরেই বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে তোমাকে।" হাঁটার ফাঁকে বলে উঠল মঙ্ক।

জবাবে মাথা নাড়ল সিগমা কমান্ডার। "উটাহ সম্পর্কে চিন্তা হচ্ছে আমার। আজ যা জানলাম, সেই সাথে দুটো জায়গা থেকেই নিউট্রিনোর উৎপত্তি, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে উটাহ- এর বিপদ এখনও কাটেনি।"

গাড়ির একপাশের দরজার হ্যান্ডেল ধরে টান দিল মঙ্ক। "তাহলে তো ওখানে নজর রাখার জন্য বিশেষ কাউকে দরকার।"

ভেতরে ঢুকে সিটে হেলান দিয়ে বসল গ্রে। "নজর যে রাখবে, তার পরিণতি সম্পর্কেই ভাবছি আমি।"

অধ্যায় ১৬
৩১ মে, ভোর ৪:৫৫
উইনটাস পার্বত্য বনভূমি, উটাহ

ভূতাত্ত্বিক রোনাল্ড শিনের সাথে খাদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন মেজর রায়ান। সূর্য উঠতে খুব একটা বাকি নেই। কিন্তু তার জন্য সূর্যোদয় আরও অনেক দেরি।

রাতের বাকি অংশটুকু তাদের সবার জন্য বেশ তিক্ত কেটেছে। জখম হওয়া সঙ্গীর শুশ্রূষা, হেলিকপ্টারে করে তাকে হাসপাতালে পাঠানোতে বেশ ঝক্কি পোহাতে হয়েছে সবাইকে। তারপর একটু ঘুমানোর চেষ্টা অবশ্য মেজর করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবার চোখ বন্ধ করার পরই একটা দৃশ্য ভেসে উঠেছে তার চোখের সামনে।

সবেগে একটা কুড়াল নেমে আসছে প্রাইভেট বেলামি-র পায়ের উপর...রক্তক্ষরণে দূর্বল হয়ে পড়া লোকটার আর্তনাদ...কর্তিত পা-টা সাবধানে তুলে গর্তের দিকে ছুঁড়ে দিল শিন...

এসব ভাবতে ভাবতে মেজর রায়ানের ঘুমানোর ইচ্ছা একেবারে মাঠে মারা গিয়েছে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতেই, ভূতাত্ত্বিককে আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখেন তিনি। জায়গায় জায়গায় ভিডিও ক্যামেরা, ইনফ্রারেড স্ক্যানার, সিসমোগ্রাফ, ম্যাগনেটোমিটারসহ আরও কিছু যন্ত্রপাতি সেট করছিল সে।

গত কয়েক ঘন্টা ধরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। বিস্ফোরণস্থলের কেন্দ্রের দিকে নির্দেশ করছিল এক ধরণের কম্পাসের কাঁটা। সেই সাথে মৃদু ভূমিকম্পে বারবার কেঁপে উঠছিল গোটা পাহাড়।

"সৈন্যরা এলাকাটা খালি করে দিয়েছে," নীরবতা ভাঙলেন মেজর। "পাহাড়ের প্রায় দুই মাইল নিচে ক্যাম্প সরিয়ে নিয়েছি আমরা। এটুকু দূরত্বই যথেষ্ট না?"

"হয়তো," জবাব দিল শিন। "এদিকে দেখুন।"

একটা ভিডিও মনিটরের দিকে ইশারা করল সিগমার ভূতাত্ত্বিক। গর্তের ভেতর, বিস্ফোরণস্থলের কেন্দ্র থেকে মৃদু ধোঁয়ায় রেখা উপরে উঠে যাচ্ছে।

"প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে ফোয়ারা আর দেখা যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, ভূগর্ভস্থ উষ্ণ ঝর্ণাটায় যা পানি ছিল, সব বাষ্প হয়ে গেছে।"

"এখন কী হচ্ছে?" প্রশ্ন করলেন মেজর।

"গ্যাস বেরুচ্ছে। হাইড্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড ইত্যাদির মিশ্রণ। এখানে যাই ঘটুক না কেন, ঝর্ণা পেরিয়ে ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় স্তর পর্যন্ত ছিদ্র করে ফেলছে ওটা।"

রায়ান কিছু বলার আগেই মনিটরে আগুনের একটা ঝলক দেখা গেল। গর্তের একেবারে মাঝখান থেকে, একবার দেখা দিয়েই হারিয়ে গেল আগুনের ফুলকি।

"আরিব্বাস! ওটা কী ছিল?" জিজ্ঞেস করলেন মেজর।

আগুনের ঝিলিক দেখেই ফ্যাকাসে হয়ে গেছে শিনের মুখ।

"ডক্টর?" উত্তর না পেয়ে জোর দিলেন রায়ান।

"মনে হয়...একটা লাভা বোমা।"

"কী?" উত্তরটা অবাক করে দিয়েছে মেজরকে। "এখন নিশ্চয়ই বলবেন না, এখানে অগ্নুৎপাত হতে চলেছে।"

শিন কিছু বলার আগেই আরো দু'বার আগুনের ঝলক দেখা গেল গর্তের ভেতর। ভক শব্দ করে ছিদ্রটা দিয়ে মাঝারি আকৃতির একটা গলিত পাথরের দলাও বেরিয়ে এল। কী ঘটতে চলেছে, এখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না কারও।

"লাভাস্তরে ফুটো তৈরি হয়েছে। ভাগতে হবে এখান থেকে।" বলে তথ্য জমা করে রাখা হার্ডড্রাইভগুলো গোছাতে শুরু করল শিন। এখন আর অন্য যন্ত্রপাতিগুলো খুলে আনার সময় নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মেজর। আবারও মেজর বেলামির পায়ের কথা মনে পড়ে গেছে তার। আরও দূরে সরিয়ে নিতে হবে গার্ডদের ক্যাম্পটা। নিজের লোকদের জীবন নিয়ে খেলা করতে পারেন না তিনি।

রেডিওটা মুখের সামনে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন রায়ান। "মেজর রায়ান বলছি! পিছিয়ে যাও! এক্ষুনি পিছিয়ে যাও! পাহাড় থেকে যতটা সম্ভব সরে পড়!"

কিন্তু জবাবে শুধু স্ট্যাটিকের খড়খড় আওয়াজ ভেসে এল। কয়েক সেকেন্ড পর কেউ একজন অন্যপ্রান্তে কথা বলে উঠলেও, শব্দের আড়ালে চাপা পড়ে গেল কণ্ঠটা।

তারা কি আদেশ শুনতে পেয়েছে?

সশব্দে নিজের ব্রিফকেসটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল শিন। "মেজর, আমাদের এক্ষুনি চলে যেতে হবে।"

তার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই যেন আবারও থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা পাহাড়। চমকে উঠলেন রায়ান, পড়ে যেতে যেতে কোনওমতে ভারসাম্য রক্ষা

করলেন তিনি। ভিডিও মনিটরের দিকে ঘুরে গেল দু'জনের দৃষ্টি। ভূমিকম্পে ক্যামেরাটা কিছুটা হেলে পড়লেও মুখ এখনও গর্তের দিকেই তাক করা।

ফোয়ারাটা ফিরে এসেছে। কিন্তু গরম পানির বদলে এখন দমকে দমকে কাদা আর গলিত পাথরের স্রোত বেরিয়ে আসছে গর্তের মাঝখান থেকে। সেই সাথে ছড়িয়ে পড়ছে ধোঁয়া আর গরম ছাই। পায়ের নিচে পাহাড়টা ক্রমাগত কেঁপেই চলেছে।

"চলুন," চেঁচিয়ে উঠল শিন।

সম্বিত ফিরে পেয়ে পেছনে পার্ক করিয়ে রাখা জীপের দিকে দৌড় শুরু করলেন রায়ান, শিন তার আগে আগে চলেছে।

গাড়িটার কাছে পৌঁছে একটানে ড্রাইভারের পাশের সিটের দরজা খুলে ফেলল শিন। ততোক্ষণে ড্রাইভিং সিটে বসে পড়েছে মেজর, হাতে বেরিয়ে এসেছে চাবির রিং। স্টার্ট দিতে দিতে সিটে বসে দরজাটা বন্ধ করে দিল সিগমার তরুণ ভূতাত্ত্বিক। ইঞ্জিন গর্জন করে উঠতেই গিয়ার দিয়ে হুইলের এক তীক্ষ্ণ মোচরে জীপটা ঘুড়িয়ে নিল রায়ান, পাহাড়ের নিচদিকে তাক করল মুখ। তাল সামলাতে না পেরে বন্ধ দরজায় বাড়ি খেল শিন।

"ব্যথা পেয়েছেন?"

"যান!"

সন্ধ্যার দিকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গাড়ি নামানোর জন্য একটা সরু পথ তৈরি করেছিল গার্ডরা। তাড়াহুড়ো করে তৈরি করায় খুব একটা মসৃণ হয়নি ট্রেইলটা। বেশ আস্তে আস্তে, সাবধানে নামতে হবে। কিন্তু সেরকম সুযোগ বা সময়, কোনওটাই এখন তাদের হাতে নেই। জীপটা ঘুরিয়ে নিয়েই এক্সেলারেটরে পা দাবালেন মেজর।

রিয়ারভিউ গ্লাসে দেখা যাচ্ছে, কালো ধোঁয়া হুহু করে উঠে যাচ্ছে উপরে। ছাইতে ঢেকে যাচ্ছে গোটা আকাশ। সেই সাথে গলিত পাথর আর কাদার উদ্গীরণ তো আছেই। মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে কিছুক্ষণ পরপর জ্বলন্ত লাভার বিশাল বিশাল দলা উঠে যাচ্ছে উপরে, তারপর সশব্দে চারদিকে আছড়ে পড়ছে। কানফাটানো শব্দের সাথে সাথে লাভার দলার আঘাতে আগুন ধরে যাচ্ছে গাছপালা। কেন ওগুলোকে লাভা বোমা বলা হয়, এবার বুঝতে পারলেন মেজর।

জীপের উপরে কোনও ছাদ না থাকায় দু'জনের শরীরেই ঝড়ে পড়ছে উত্তপ্ত ছাই। জায়গায় জায়গায় ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে তাদের গায়ে। ব্যথা অগ্রাহ্য করে সামনের দিকে নজর দিলেন মেজর। এবড়োখেবড়ো ট্রেইলের ঝাঁকিতে হাড়মাংস আলাদা হবার উপক্রম। একটা উঁচু পাথর চাকার নিচে চলে আসতেই উঁচু হয়ে গেল গাড়ির

একপাশ। শ্বাসরুদ্ধকর কয়েক সেকেন্ড দুই চাকায় ভর করে চলার পর আবারও সমান্তরাল হয় গেল জীপটা।

"সাবধানে," চেঁচিয়ে উঠল শিন।

রাগে, হতাশায় খিস্তি বেরিয়ে এল মেজরের মুখ দিয়ে। "তো কী করছি আমি!"

গাড়ির দু'পাশ দিয়ে ক্রমাগত জ্বলন্ত লাভা গড়িয়ে পড়ছে, যাত্রাপথের গাছগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিতে দিতে পাহাড় বেয়ে নামছে সেগুলো। রিয়ারভিউ গ্লাসে দেখা গেল, পেছন থেকে পাথর গড়িয়ে ধ্বস তৈরি হচ্ছে।

"লাভা আর পাথরের নিচে চাপা পড়তে চলেছি আমরা। গাড়ির গতি এর চেয়ে বাড়ানো সম্ভব না।" চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর।

"তাহলে নিচে নামার দরকার কী?"

শিনের প্রশ্নের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না রায়ান, আবারও খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি। "কী বললেন?"

ঢালের একটু সামনে ডানদিকে মোড় নেয়া ট্রেইলের দিকে ইঙ্গিত করল শিন। পাহাড়ের একপ্রান্তে, একটা উঁচু পাথরে উঠে শেষ হয়ে গেছে পথটা।

"ওদিকে তো..." বাক্যটা শেষ করার আগেই শিন কী বুঝিয়েছে, ধরতে পারলেন রায়ান।

পথের শেষপ্রান্তে খাদ পেরিয়ে আরেকটা উপত্যকা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানের দূরত্ব প্রায় পনেরো ফুট। উল্টোদিকের উপত্যকার চূড়াটা এই পাহাড় থেকে খানিকটা নিচু।

"গাড়ি ঘোরান," শিনের কণ্ঠে কর্তৃত্বের ছাপ ধরতে পারলেন মেজর। লোকটা আগে সামরিক বাহিনীতে ছিল, ধারণাটা আবারও গেড়ে বসলো তার মনে।

কথা না বাড়িয়ে একটানে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে দিলেন মেজর। সোজা রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে ঘুরে গেল জীপের মুখ। ঢাল বেয়ে নামার চেয়ে সমান্তরালে এগোনোয় কিছুটা বেড়ে গেল গাড়ির গতি।

উপর থেকে ক্রমাগত ধেয়ে পড়ছে ছোট বড় অর্ধগলিত পাথরের টুকরো। সেই সাথে কুখ্যাত লাভার বোমা তো আছেই।

"আমরা এটা করতে পারব না, শিন!" রায়ানের গলায় হতাশার ছাপ।

"কথা না বাড়িয়ে গতি বাড়ান," ধমকে উঠে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল সিগমার ভূতাত্ত্বিক। "পাহাড়ের মাঝের ফাঁকা জায়গাটুকুতে ছাই আর গ্যাসের মেঘ ভেসে

আছে...সাধারণ বাতাসের চেয়ে বেশ ভারী ওগুলো...আশা করা যায়, গাড়িটা অনায়াসেই ফাঁকটুকু পেরিয়ে যেতে পারবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এক্সেলারেটরে পায়ের চাপ বাড়ালেন মেজর। ক্রমাগত সামনে এগিয়ে আসছে অসীম খাদ। সরু ট্রেইলটার শেষ মাথায় প্রায় তিনকোনা আকৃতির একটা পাথর উঁচু হয়ে আছে, প্রাকৃতিক একটা র‍্যাম্প বানিয়ে রেখেছে যেন। দম বন্ধ করে সর্বশক্তিতে এক্সেলারেটর চেপে ধরলেন রায়ান। যা আছে কপালে...

রোলার কোস্টারের মতো মসৃণভাবে পাথরের উপর উঠে গেল গাড়িটা। নিচে আর কিছু না পেয়ে হাওয়ায় কামড় বসাতে লাগল চাকাগুলো। গ্যাস আর ছাইয়ের ঝাঁঝে দম আটকে এল দু'জনেরই। অস্বস্তিকর কয়েকটা সেকেন্ড বাতাসে ভাসার পর, সামনের উপত্যকার ঢালে গাড়ির সামনের চাকা স্পর্শ করার আওয়াজ পেলেন মেজর।

"আমরা পেরেছি!"

"সাবধান, মেজর!" আবারও ধমকে উঠল শিন।

এক সেকেন্ড পর দেখা গেল পিচ্ছিল গ্রানাইটের ঢালে ঠিকমত কামড় বসাতে পারছে না গাড়ির চাকাগুলো। সামনে এগোনোর বদলে পিছিয়ে যাচ্ছে জীপটা। দম আটকে এক্সেলারেটরে পায়ের চাপ বাড়ালেন রায়ান। তবে পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধা মনে হচ্ছে না।

"চলুন, মেজর!" আচমকা নিজের কলারে শিনের হাতের টান অনুভব করলেন রায়ান। ঘাড় ঘোরাতেই দেখলেন, নিজের দিকের দরজা খুলে ফেলেছে ভূতাত্ত্বিক। আধ সেকেন্ড ব্যবধানে গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়লেন দু'জনেই। এবড়োখেবড়ো পাথর আঁকড়ে ধরে গড়িয়ে পড়া রোধ করলেন। তাদের নামার ইশারাতেই যেন দাঁড়িয়ে ছিল জীপটা। এখন নিজের কাজ শেষ হয়েছে বুঝতে পেরেই ঢাল বেয়ে গড়াতে শুরু করল অন্ধকার অসীম খাদের উদ্দেশ্যে।

"আমার লোকেরা," খাবি খেতে খেতে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর।

সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে তার কাঁধ স্পর্শ করল শিন। "প্রার্থনা করুন, যেন একটু আগে আপনার আদেশটা তাদের কানে পৌঁছায়।"

অধ্যায় ১৭
৩১ মে, সকাল ৬:০৫
সান রাফায়েল উচ্চভূমি, উটাহ

উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছেন হ্যাঙ্ক কানোশ। সূর্যোদয়ের আগেই কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি, চড়াই ট্রেইল পাড়ি দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন এখানে। গিরিসংকটের ফাঁকে ফাঁকে গোলকধাঁধার মতো একেবেঁকে সামনে এগিয়েছে ট্রেইলটা। হ্যাঙ্কের পাশে বসে জিহ্বা নাড়ছে কাউচ। সূর্যোদয়ের পরও আবহাওয়া বেশ·ঠান্ডা। দুর্গম পথটা পাড়ি দেয়া খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। তাছাড়া, দু'দজনের কেউই তারা তরুণ নন।

কিন্তু হ্যাঙ্ক জানেন, তার আসল দূর্বলতা শরীরে নয়, মনে। এখনও মনটা পাথরের মতো ভারী বোধ হচ্ছে তার কাছে। গতকাল পালানোর সময় উত্তেজনা, বন্ধু হারানোর কষ্টটা চেপে রাখতে পারলেও, আজ আর বাঁধ মানছে না কিছুতেই।

পাহাড়ের নিচের দিকে তাকালেন হ্যাঙ্ক। প্রায় এক দশক আগে সর্বশেষ এখানে এসেছিলেন তিনি। তখন সাথে আরেকজন ছিল অবশ্য, ম্যাগি। দু'জনে হাত হাত ধরে একসাথে পাড়ি দিয়েছিলেন বন্ধুর পথ। সেই অমূল্য মুহূর্তগুলো কি ভোলা সম্ভব? এখনও ম্যাগির ঠোঁটের সেই স্বাদ অনুভব করতে পারেন তিনি...খানিকটা নোনতা, খানিকটা মিষ্টি। আজ কোথায় সে?

লিটল গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন নামের এই উপত্যকাটা সান রাফায়েল উচ্চভূমির একেবারে মাঝখানে অবস্থিত। সান রাফায়েল উচ্চভূমি- ষাট মাইল প্রশস্ত একটা পাললিক শীলা, পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর আগে দু'পাশের ভূপৃষ্ঠের চাপে মাটির উপরে উঠে এসেছিল এটা। তারপর ক্ষিপ্ত বাতাস আর প্রবল বৃষ্টির কর্কশ ছোঁয়ায় ক্ষয় হতে হতে বিশালাকায় পাথরখন্ডটার জায়গায় জায়গায় খাড়া ঢাল, গভীর খাদ আর টুকরো টুকরো রুক্ষ সমতল ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। একেবারে নিচ দিয়ে কলোরাডোর দিকে পানি বয়ে চলেছে সান রাফায়েল নদী।

গোলকধাঁধার মতো এলাকাটা বেশ দুর্গম। মাঝেমধ্যে হাতেগোনা দু'একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দেখা মেলে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাদগুলো আউট'ল-দের আখড়া। সব জেনেশুনেও এই সভ্যতাবিবর্জিত এলাকাতেই আবাস গড়েছেন হ্যাঙ্কের এক সাবেক সহকর্মী দম্পতি- আলভিন হুমেতেওয়া আর আইরিশ হুমেতেওয়া।

সকাল হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে বাকিদের নিয়ে আলভিন আর আইরিশের ছোট্ট বাড়িটায় পৌছেছেন হ্যাঙ্ক। তবে বাড়ি বলা হলেও আদতে ওটা গোটা পাঁচেক

পাথরের কেবিনের সমষ্টি। থাকার পাশাপাশি স্থানীয় হোপি আদিবাসী বাচ্চাদের পড়ানোর কাজে কেবিনগুলো ব্যবহার করেন দু'জন।

ট্রেইল থেকে মৃদু খসখস আওয়াজ ভেসে এল হ্যাঙ্কের কানে। "কে ওখানে?"

একটা পাথরের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল কাই। খুব সম্ভবত, লুকিয়ে লুকিয়ে হ্যাঙ্ককে অনুসরণ করছিল সে।

আস্তে আস্তে ঢালের প্রান্তে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। "জায়গাটা কি নিরাপদ?"

"হাজার হাজার বছর ধরে পাথরটা অনড়। আশা করা যায় আমাদের ভার ওটাকে জায়গা থেকে নড়াতে পারবে না।"

তবুও ভয় পুরোপুরি দূর হলো না কাইয়ের মন থেকে। "আঙ্কেল ক্রো আর তার সঙ্গী স্যাটেলাইট ডিশ আর ল্যাপটপ দিয়ে কী যেন করছেন।"

"আমি তো ভেবেছিলাম ঝুঁকি নিয়ে কারও সাথে যোগাযোগ করতে চাইবেন না উনি।"

শ্রাগ করল মেয়েটা। "এনক্রিপশন সফটওয়্যার নিয়ে তাকে কথা বলতে শুনেছি আমি। মনে হয় নিরাপদেই থাকতে পারব আমরা।"

ঘাড় ঘুরিয়ে কাইয়ের দিকে তাকালেন হ্যাঙ্ক। "এই কথাটা বলার জন্য এতদূর এসেছ নাকি?"

"না," একটা পাথরের উপর বসতে বসতে জবাব দিল সে। "হাত-পা একটু খেলিয়ে নিলাম আর কি।"

কাইয়ের মনোভাব আঁচ করতে পেরেছেন হ্যাঙ্ক। বিপদে পড়ে সাহায্য চাইলেও, চাচার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকতে চাইছে মেয়েটা। এ বিষয়ে আর কথা বাড়ালেন না তিনি। "না'ই'স অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু জান তুমি?"

"কী ওটা?"

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। তরুণ ইন্ডিয়ানদের নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি জানতে খুবই অনীহা। "সূর্যোদয়ের অনুষ্ঠান এটা," ব্যাখ্যা করলেন হ্যাঙ্ক। "এ অনুষ্ঠানের সময় চার দিন চার রাত নাচগান ও বিভিন্ন ঐতিহ্যগত রীতিনীতি পালনের মাধ্যমে মেয়ে থেকে নারীতে পরিণত হয় ইন্ডিয়ান যুবতীরা, এসময় তারা গায়ে সাদা রঙও মাখে।"

অবাক হলো কাই। "এখনও এসব পালন করা হয়?"

"এখন তো নেটিভ আমেরিকানদের অনেক আচার-অনুষ্ঠান পালনে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে সরকার। অল্প কয়েকটা গোত্র যাও পালন করে, আস্তে আস্তে হয়তো তারাও ভুলে যাবে সব।"

কঠিন হয়ে এল মেয়েটার মুখভঙ্গি। "আমাদের কাছ থেকে প্রায় সবই কেড়ে নিয়েছে ওরা।"

"যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। নিজেদের সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার জন্য এখন আমাদের নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হবে। যুগে যুগে পৈশাচিকতা ঢাকার জন্য ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যখন সংস্কৃতির প্রশ্ন, তখন ব্যাপারটা

ধর্মেরও উর্ধ্বে। আমার মা-বাবা দুজনেই মরমন ধর্মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু আমি তাদের দেখাদেখি সেই ধর্মে বিশ্বাস আনিনি। বড় হওয়ার সময় আমি আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে পারলাম, মরমনদের ধর্মগ্রন্থ 'দ্য বুক অফ মরমন' আমাকে শান্তির বাণী শোনাচ্ছে, আমাকে সর্বশক্তিমানের দিকে ধাবিত করছে। তাই ধর্ম হিসেবে মরমন বেছে নিয়েছে আমি। সেই সাথে আমাদের সত্যিকার অতীত সম্পর্কে জানার ইচ্ছাই একজন ঐতিহাসিক আর পরিবেশবিদ হিসেবে গড়ে তুলেছে আমাকে।"

"বুঝলাম না," বলে উঠল কাই। "মরমন ধর্ম কীভাবে আমাদের অতীত সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে?"

এই অবস্থায় মেয়েটাকে ধর্মের বিষয়আশয় বোঝানোর চাইতে একটা জিনিস দেখানোর ব্যাপারে মনঃস্থির করলেন হ্যাঙ্ক। "এদিকে এসো।"

ট্রেইল ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোনোর পর, পাথরের গায়ে একটা বিশালাকায় কার্নিশের নিচে একটা ইন্ডিয়ান বাড়ির মতো ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল।

"তুমি যা জানতে চাইছ, সেরকম বিস্তারিত কিছু এখনও জানা যায়নি," বলে ভাঙা প্রবেশপথ পেরিয়ে একটা দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রফেসর। "আমেরিকার পশ্চিমদিকে অবিষ্কৃত প্রাচীন ইন্ডিয়ান ঢিবিগুলো সম্পর্কে কী জান তুমি?"

শ্রাগ করল কাই। বোঝা গেল, কিছুই জানেনা।

"কিছু কিছু ঢিবি প্রায় ছয় হাজারেরও বেশি পুরনো। বলা হয়ে থাকে, ইউরোপিয়ানরা সর্বপ্রথম আমেরিকায় পা ফেলার সময়ও ওই এলাকায় বাস করা স্থানীয় ইন্ডিয়ানরা ঢিবিগুলোর সম্পর্কে কিছুই জানতো না- সেগুলো কোথা থেকে এসেছে বা কে বানিয়েছে। এমনই ধোঁয়াশায় ঘেরা আমাদের ইতিহাস।"

দেয়ালটার দিকে এগোলেন হ্যাঙ্ক। হলদে হয়ে যাওয়া স্যান্ডস্টোনের গায়ে লাল কালিতে তিনটা মানুষের মতো লম্বা আকৃতি আঁকা। প্রাচীন দেয়ালচিত্রটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

"এই এলাকায় এরকম হাজারো দেয়ালচিত্র খুঁজে পাবে তুমি। ঐতিহাসিকদের মতে এগুলোর কিছু কিছু প্রায় আট হাজার বছর পুরনো। আর চায়না লেকের সল্ট বেডে আবিষ্কৃত চিত্রগুলো আরও পুরনো। বলা হয়ে থাকে, ওগুলোর বয়স প্রায় ষোল হাজার বছর। বরফ যুগে যখন বিশালাকায় ম্যামথ, বাইসন, সেবার টুথড টাইগাররা এই অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াত, তারও আগে থেকে শুরু হয়েছে প্রাচীন আমেরিকার ইতিহাস।" ঘোরলাগা কণ্ঠে কথাগুলো বলে কাই-এর দিকে ফিরলেন প্রফেসর।

"আপাতত এই পর্যন্তই জানি আমরা। এমনকি এসব এলাকায় বসবাসরত লোকের সংখ্যা নিরুপণের ক্ষেত্রেও আমাদের বিশাল বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান সময়ে স্ট্যালাগমাইটের রাসায়নিক গঠন আর সে সাথে উত্তর আমেরিকায় প্রাপ্ত কয়লা খনির প্রশস্ততা ও গভীরতা বিবেচনা করে বলা যায়, নেটিভ আমেরিকানদের সংখ্যা একশ মিলিয়নের চাইতেও অনেক বেশি ছিল।"

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল কাই-এর চোখ। "তারপর কী হলো তাদের?"

"ইউরোপিয়ানদের আসার পর গুটিবসন্তসহ বিভিন্ন রোগে ছেয়ে গেল পুরো অঞ্চল। অভ্যাগতদের চেয়ে স্থানীয়দেরই বেশি ভুগতে হলো সেসব রোগে। আস্তে আস্তে জনবিরল ভূমিতে পরিণত হলো আমেরিকার পার্বত্য বনাঞ্চল। লোকমুখে প্রচলিত এই কারণটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেও এটাকে ভুয়া বলেই ধরা হয়।"

"মনে হয়, আপনার কথায় লুকানো রহস্যটা ধরতে পেরেছি আমি," বলে উঠল কাই। "নিজেদের জানতে হলে সবার আগে আমাদের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে।"

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন হ্যাঙ্ক। যতটা ভেবেছিলেন, সে তার চাইতেও বুদ্ধিমান।

পরক্ষণেই আবারও মুখ খুলল কাই। "কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর এখনও দেননি আপনি। 'বুক অফ মরমন' কীভাবে ইন্ডিয়ানদের ইতিহাসের দিকে আলোকপাত করে?"

জবাবে হ্যাঙ্ক কিছু বলার আগেই, সতর্ক করার ভঙ্গিতে মৃদু গর্জন করে উঠল কাউচ। নাচ উঁচু করে বাতাসে শুঁকতে লাগল কিছু একটা। কুকুরটার দৃষ্টি অনুসরণ করে উত্তর-পূর্বদিকে দৃষ্টি ফেরাল দু'জনেই। সূর্যের আলোয় আস্তে আস্তে উদ্ভাসিত হতে থাকা লালচে আকাশে আবছা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে।

"ধোঁয়া," বিড়বিড় করে বললেন হ্যাঙ্ক।

"প্রচুর ধোঁয়া। দাবানল নাকি?" জিজ্ঞেস করল কাই।

"মনে হয় না।" কু-ডাক ডাকতে শুরু করেছে প্রফেসরের মন। "আমাদের নেমে যাওয়া উচিত।"

সকাল ৬:৩৮
প্রোভো, উটাহ

ম্যানশনের বিশালাকায় কিচেনে বসে, এসপ্রেসো কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন রেফ। কিচেনের বিশালত্বে মুগ্ধ হলেও সস্তা ডেকোরেশন দেখে হতাশ তিনি। তার নিজের বাড়ির ডেকোরেশনে ষোড়শ শতকের মূল্যবান সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয়েছে, সেই তুলনায় এখানকার জিনিসপত্রগুলো কিছুই না। তবে কফিটা চমৎকার। এই মুহূর্তে এটাই তাকে শান্ত রাখার একমাত্র কারণ।

টেবিল ছাড়িয়ে কিচেনের জানালায় চলে গেল রেফ-এর দৃষ্টি। স্বচ্ছ কাঁচের ওপারে একটা হেলিকপ্টার ওড়ার জন্য তৈরি করছে ক্রু-রা। টেবিলে বেশ কিছু কাগজপত্র সাজিয়ে রাখা আছে। নাস্তা করার আগেই সেগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন তিনি, আর ভুলবেন না কখনো। যখন দরকার, গড়গড় করে আউড়ে যেতে পারবেন প্রতিটা লাইন।

সবার উপরে একটা লোকের ছবি রাখা। এই লোকটাই গতকাল রাতে ইউনিভার্সিটিতে তাদের অপারেশন ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তার পরিচয় বের করতে

খুব একটা সময় লাগেনি সেইন্ট জার্মেইন ফ্যাসিলিটির বিজ্ঞানীদের। রেফ-সহ তার সংগঠনের বেশিরভাগ মানুষ লোকটাকে বেশ ভালো করে চেনে। ছবিটা ঘোলাটে না হলে সাথে সাথে চিনে ফেলতে পারতেন তিনি।

"পেইন্টার ক্রো..." বিড়বিড় করে নামটা উচ্চারণ করলেন রেফ। "সিগমা ডিরেক্টর... নিজের গর্ত থেকে বের হলে কেন তুমি?"

রেফ বুঝতে পারেননি, উটাহ- এর বিস্ফোরণের ব্যাপারে এতো তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া দেখাবে সিগমা। অবশ্য তাকেও খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। কোনও ক্লু ছাড়া কারও পক্ষেই পাজলের টুকরোগুলো মেলানো সম্ভব না। লেজ গুটিয়ে পালাতে থাকা সেই চিকন মেয়েটা, নিশ্চয়ই স্থানীয় ইন্ডিয়ান কোনও গোত্রেরই হবে। বিপদে পড়ে সে নিজের গোত্রের কারও কাছে সাহায্য চাইবে, জানতেন রেফ! কিন্তু সেই ত্রানকর্তা যে পেইন্টার ক্রো-ই হবে, তা কি কারও পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব?

বাকি রাতটুকু দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি রেফ। পাজলের টুকরোগুলো কীভাবে মেলাবেন, সেই কথাই ভেবেছেন। অবশেষে ভোরবেলা একটা সমাধানে আসতে পেরেছেন তিনি।

হলওয়ে থেকে বুটপরা পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। "স্যার, আমরা রওনা হওয়ার জন্য তৈরি।"

"ঠিক আছে, বার্ন," সায় দিয়ে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন রেফ। "তবে ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।"

"সমস্যা নেই, স্যার। রাস্তায় সেটুকু পুষিয়ে নেয়া যাবে।"

"খুব ভালো। আশান্দা কোথায়, বার্ন?"

"লাইব্রেরিতে সম্ভবত।"

"ওকে খবর পাঠাও। বল, যাওয়ার সময় হয়েছে।"

"ঠিক আছে, স্যার।" বলে হলওয়ে ধরে হারিয়ে গেল রেফ-এর সেকেন্ড ইন কমান্ড।

কফির কাপটায় শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রেফ। আবারও বাড়ির মালিকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল তার মন। আর কিছু না হলেও সেরা কফিটাই আনিয়ে রেখেছিল ম্যানশনের সাবেক বাসিন্দারা।

লাঠি ভর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। গত রাতে খাঁচা ভেঙে পালিয়ে যাওয়া পাখিগুলোকে আবার ধরতে হবে।

পালাতে থাকা চড়ুইগুলোকে ধরার জন্য এই মুহূর্তে একটা বাজপাখি দরকার।

সকাল ৭:০২
সান রাফায়েল উচ্চভূমি

“কয়জন মারা গেছে?” স্যাটেলাইট ফোনটা আরও শক্ত করে নিজের কানে চেপে ধরলেন পেইন্টার।

সবচেয়ে বড় পাথরের কেবিনের ভেতর বসে আছেন তিনি এখন, সামনে রাখা কফির কাপ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। পাশের একটা সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে কোয়ালস্কি। লম্বা সময় ধরে গাড়ি চালানোর পর বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

অপর প্রান্ত থেকে ভূতাত্ত্বিক রোনাল্ড শিনের কণ্ঠ ভেসে এল, নেটওয়ার্ক দুর্বল হওয়ার মাঝে মাঝে ভেঙে যাচ্ছে কথা। “শুধু পাঁচজন ন্যাশনাল গার্ড মারা গেছে। ভাগ্য ভালো, মেজর রায়ান আগেভাগেই তার লোকদের সতর্ক করতে পেরেছিলেন। অবশ্য এদিকের পাহাড়ে কোনও অভিযাত্রীর থাকার খবর আমাদের জানা নেই। তবে আশার কথা, বিস্ফোরণের পরপরই সরিয়ে দেয়া হয়েছিল সবাইকে।”

কেবিনের সিলিং-এর দিকে নজর দিলেন পেইন্টার। হুমেতেওয়া গোত্রের ঐতিহ্য অনুযায়ী পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কাদা লেপে তৈরি করা হয়েছে এসব কেবিন। সেই সাথে পাতার ছাউনি। এরকম একটা ঘরে বসে আগ্নেয়গিরি সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ করাটা ঠিক শোভা পায় না।

ওদিকে বলে চলেছে শিন, “সূর্যোদয়ের আগে হেলিকপ্টারে করে গোটা এলাকা পরিদর্শন করেছি আমি। লাভা উদ্গীরন বন্ধ হয়ে গেছে। চারদিকের লাভার স্রোতও জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। এখন বিপদ বলতে শুধু দাবানল। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করে চলেছে। হেলিকপ্টারে করেও পানি ছিটানো হচ্ছে। আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়িই পরিস্থিতির উন্নতি হবে।”

“যদি না আবার উদ্গীরন আরম্ভ হয় আর কি,” মন্তব্য করলেন পেইন্টার।

কথাটা শিনের মাথাতেও এসেছিল। “সেদিক থেকেও আমরা নিরাপদ বলা যায়,” জবাব দিল সে।

“কীভাবে?”

“বিস্ফোরণস্থলটা খুব কাছ থেকে দেখেছি আমি। প্রান্ত থেকে আস্তে আস্তে ভেতরদিকে ঢালু হয়ে গেছে গর্ত। নতুন করে আর পাথর গুড়ো হতেও দেখা যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, যেই জিনিসটা বা জিনিসগুলো ওখানে সক্রিয় ছিল, লাভার উত্তাপ সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে।”

“নিষ্ক্রিয়?” ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না পেইন্টার।

“হ্যাঁ,” ব্যাখ্যা করল শিন। “এটা কোনও কেমিক্যাল রিয়েকশন না। প্রচন্ড শক্তিশালী সক্রিয় কিছু একটা নিজের সংস্পর্শে আসা সব জিনিসকে ধুলোয় পরিণত করছিল, বৈজ্ঞানিকভাবে যা দাঁড়ায়, অণুতে ভেঙে ফেলছিল। চারদিকে ছড়ানোর পাশাপাশি এটা সমানতালে নিচের দিকেও অগ্রসর হচ্ছিল। যার ফলে একটা ম্যাগমা

চেম্বার ফুটো হয়ে এই অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি। আর লাভার প্রচন্ড উত্তাপের ফলে এখন আর সক্রিয় নেই ওগুলো।"

ব্যাপারটা আগ্রহী করে তুলল পেইন্টারকে। "বলে যান।"

"আধুনিক বিজ্ঞানে ন্যানোটেকনোলজির একটা অন্যতম শাখা হচ্ছে ন্যানোবট- অণু আকৃতির ছোট ছোট মেশিন যা পদার্থকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকারে বিভাজন করতে সক্ষম। হতে পারে প্রাচীন সেই লোকেরা ন্যানোবট তৈরিতেও সফল হয়েছিল। বিস্ফোরণের ফলে লক্ষকোটি ন্যানোবট ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা পাহাড়জুড়ে, গুঁড়ো করে দিচ্ছিল সংস্পর্শে আসা সবকিছু।"

ব্যাপারটা অলীক কল্পনা বলে মনে হলো পেইন্টারের কাছে।

"ডিরেক্টর, আমি জানি পুরোটাই পাগলের প্রলাপের মতো শোনায়। কিন্তু পৃথিবীজুড়ে বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই এই ব্যাপারে গবেষণা করে যাচ্ছেন, কেউ কেউ আবার সফলও হয়েছেন। কিছুদিন আগে খবর শোনা গিয়েছিল, একটা ল্যাবে ন্যানাইটস নামের সিলিকনভিত্তিক এক ধরণের ন্যানোবট তৈরি করা হয়েছে, যেগুলো সংস্পর্শে আসা সকল পদার্থকে ভেঙে নিজেদের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে।"

মনে মনে গোটা দৃশ্যটা কল্পনা করলেন সিগমা ডিরেক্টর। "শিন, ব্যাপারটা খুবই আজব শোনাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, আমি জানি। তবে পৃথিবীতে মুক্ত আকারেও অনেক ন্যানোবটজাতীয় বস্তুর অস্তিত্ব আছে। কোষমধ্যস্থ বিভিন্ন এনজাইমও একই রীতিতে কাজ করে। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া অন্য মাধ্যমে নিজেদের প্রতিরূপও তৈরী করতে পারে। তাই এটা হতেই পারে- প্রাচীন সেই রহস্যময় লোকেরা অভঙ্গুর দামাস্কাস ইস্পাত তৈরির সময় ন্যানোবটও আবিষ্কার করেছিল। তবে আরেকটা কথা এসেছে আমার মাথায়।"

"কী?"

"ন্যানোবট তথা ন্যানোটেকনোলজির ক্ষেত্রে তাপ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ন্যানোবটকে সক্রিয় রাখার জন্য অতিরিক্ত উত্তাপ থেকে ওটাকে বাঁচাতে হয়। এতো ক্ষুদ্র পর্যায়ে কাজটা করা খুব কঠিন।"

পাজলের টুকরোগুলো খাপে খাপে বসাতে লাগলেন পেইন্টার। "অর্থাৎ, সবচেয়ে সহজ উপায় হলো গরম কোথাও জিনিসগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখা, যেমন ভূগর্ভস্থ উষ্ণ ঝর্ণার উপর অবস্থিত একটা গুহা।"

"ঠিক তাই," সায় দিল সিগমার ভূতাত্ত্বিক।

আদতে জিনিসগুলো বিপজ্জনক হলেও এগুলো তৈরির পেছনে ভূমিকা রাখা টেকনোলজি বিপজ্জনক নয়। বর্তমান যুগে সম্ভাবনার এক দুয়ার খুলে দিয়ে দিয়েছে ন্যানোটেকনোলজি, সারা বিশ্ব ছুটছে এর পেছনে। এই ন্যানোবট রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারলে অমূল্য দাম হবে সেই প্রাচীন জ্ঞানের।

তবে তারপরও আরেকটা প্রশ্ন থেকেই যায়।

"ধরে নিলাম, আমাদের ধারণাই সত্যি। কিন্তু গুহায় থাকা ওই মমি হয়ে যাওয়া লোকগুলো কারা?" জিজ্ঞেস করল শিন।

জবাব না দিয়ে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন পেইন্টার। এই প্রশ্নের জবাব আগামী এক ঘন্টার ভেতর পেয়ে যাওয়ার কথা। শিনের সাথে টুকটাক আরও কিছু কথা বলার পর, তাকে উপত্যকার উপর ভালোমতো নজর রাখার আদেশ দিয়ে ফোন রাখলেন তিনি।

এতোক্ষণ পেইন্টারের কথাগুলো কোয়ালস্কিও শুনেছে। "এই যদি হয় অগ্নুৎপাতের কারণ-" এটুকু বলে একটা হাই তুলল সে, "-তাহলে গ্রে-কে জানিয়ে দিন, ও যেন শক্তপোক্ত জাঙ্গিয়া পরে আইসল্যান্ডে যায়। নইলে পাছায় ফোস্কা পড়বে যে!"

অধ্যায় ১৮
৩১ মে, দুপুর ১:১০
ওয়েস্টম্যান দ্বীপপুঞ্জ, আইসল্যান্ড

মাছ ধরা ট্রলারের স্টার্নে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে। আবহাওয়া পরিষ্কার হলেও কিছুক্ষণ পর পর ঠান্ডা হাওয়ার ঝলকে শিউরে উঠছে গা। ট্রলারের অন্যপাশে রেলিং-এ ভর দিয়ে শান্ত সাগরের দিকে তাকিয় আছে মঙ্ক আর শেইচান। দুপুরের রোদও পরিবেশের শীতলতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

"ক্যাপ্টেনের কথা অনুযায়ী," বলে উঠল গ্রে, "বিশ মিনিটের ভেতর এলিরেই দ্বীপে পৌঁছে যাব আমরা।"

ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকাল শেইচান। "ওটাই যে আসল দ্বীপ, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?"

"কো-অর্ডিনেট সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে।"

একঘন্টা আগে রেইকজাভিক এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছে এই তিনমূর্তি। তারপর সেখান থেকে একটা প্রাইভেট প্লেনে করে রওনা হয়েছে আইসল্যান্ডের উপকূলের এই দ্বীপগুলোর উদ্দেশ্যে। ওয়েস্টম্যান দ্বীপপুঞ্জ- ওয়েস্টমেন নামে পরিচিত কয়েকজন বিপ্লবী আইরিস কৃতদাসদের নামে এর নামকরণ করা হয়েছিল। আটশো চল্লিশ খ্রিষ্টাব্দে, অত্যাচারী মনিবদের খুন করে এসব দ্বীপে এসে লুকিয়েছিল লোকগুলো। পরে অবশ্য খুঁজে বের করে হত্যা করা হয়েছিল তাদের। তবে কাজটা খুব একটা সহজ হয়নি। আজও দ্বীপগুলোর বেশিরভাগই দুর্গম। শুধুমাত্র হাতেগোনা কিছু সাহসী মানুষ বাস করে এদিকে।

দ্বীপপুঞ্জের একমাত্র এয়ারপোর্টটা হেইমেই দ্বীপে অবস্থিত। সেখানে নামার পর, জাপানি গবেষকদের পাঠানো কো-অর্ডিনেট অনুযায়ী নির্দিষ্ট দ্বীপটায় পৌঁছানোর জন্য এই ট্রলারটা ভাড়া করতে হয়েছে ওদের। প্রায় বিশ হাজার বছর আগে, সী বেডের নিচে লাভান্তরের আলোড়নের ফলে এই দ্বীপগুলোর জন্ম। সেই আলোড়ন এখনও অব্যাহত আছে। উনিশশো সত্তর সালে হেইমেই দ্বীপের দু'টো আগ্নেয়গিরির একটা- এল্ডফেল আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটেছিল। সমুদ্র সৈকতের প্রায় অর্ধেক অংশ গ্রাস করে নিয়েছিল লাভা আর ছাইয়ের স্তুপ। এখনও দ্বীপটার জায়গায় জায়গায় সেই চিহ্ন রয়ে গেছে। ছোট্ট শহরটাকে এই কারণে 'উত্তরের পম্পেই' নামেও ডাকা হয়।

"ওটাই মনে হয়," আঙুল দিয়ে সামনের দিকে ইশারা করল মঙ্ক।

ঘাড় ঘুরিয়ে হতাশ হতে হলো গ্রে-কে। দ্বীপ বলতে এই কালো পাথরের বিশাল খণ্ডটা সে মোটেও আশা করেনি। কোন বিচের বালাই নেই, সাগর থেকে খাড়া উঠে গেছে পাথরের ঢাল। অবশ্য একেবারে উপরে, এক টুকরো সমতল জায়গা জুড়ে খানিকটা সবুজের ছোঁয়া আছে। দুপুরের কড়া রোদে যেন ঝিলিক দিচ্ছে কুয়াশাভেজা ঘাসগুলো।

"ওখানে উঠব কীভাবে?" জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

"বাঁদরের মতো বেয়ে উঠতে হবে, আমেরিকান বন্ধুরা," জবাব দিলেন হুইলহাউজে দাঁড়ানো ট্রলারের ক্যাপ্টেন রেগনার হান্ড। গভীর দৃষ্টিতে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে করতে বোট চালাচ্ছেন ভারী সোয়েটার, খাকি প্যান্ট আর বুট পরনে থাকা অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন। ফ্যাকাসে চামড়া, ধূসর হয়ে আসা লালচে দাঁড়ি আর কাঁচাপাকা চুলের জন্য তাকে প্রথম দেখায় ভাইকিং বলে ভ্রম হয়। তবে হাসিমাখা সবুজ চোখ দুটোর কথা ভিন্ন।

"উপরে ওঠার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে দড়ি বাওয়া," ব্যাখ্যা করলেন তিনি। "আপনাদের সবাইকে বেশ ফিট মনে হচ্ছে। সমস্যা হওয়ার কথা না। দ্বীপের পূর্বদিকে ঢাল অপেক্ষাকৃত নিচু, পিচ্চি এগ বোটটা ওখানে নোঙর করবে।"

কেবিনের দিকে ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন হান্ড। তার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে- এগার্ট হান্ড, ওরফে এগ। বিশের মতো বয়স ওর, মাথা ন্যাড়া হলেও দু'হাতের কাঁধ থেকে কবজি পর্যন্ত ট্যাটু আঁকা।

"চিন্তার কিছু নেই," পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য আবারও বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন। "কখনও আপনাদের মতো বিজ্ঞানী প্যাসেঞ্জার না পেলেও, প্রায়ই বিভিন্ন শিকারী আর ফোটোগ্রাফারদের এখানে আনা নেয়া করি আমি। একজনকেও অক্ষতদেহে ফিরিয়ে না নেয়ার রেকর্ড নেই আমার।" বলে শেইচানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে চোখ টিপলেন তিনি। বোঝা গেল, এই বয়সেও বেশ রসিক তিনি।

কিন্তু ক্যাপ্টেনের কৌতুকে সাড়া দিল না শেইচান। করনেল ইউনিভার্সিটির গবেষক পরিচয়ে এখানে এসেছে তারা, আগ্নেয় দ্বীপ সম্বন্ধে গবেষণা করছে।

কাছাকাছি আসার পর, হাত তুলে দ্বীপটার দিকে ইশারা করলেন ক্যাপ্টেন। "ওখানে একটা লজ আছে। দরকার হলে রুম ভাড়া করতে পারিবেন আপনারা।"

চোখ সরু করে তাকাতেই গ্রে-ও দ্বীপের মাঝামাঝি অংশে একটা ছোট আকৃতি চিহ্নিত করতে পারল। নীল টালির ছাদে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যের আলো।

"অবশ্য আজ ঘর খালি আছে কি না জানা নেই," আবারও মুখ খুললেন হান্ড। "গতকাল ফেরিতে করে একটা শিকারীদের দল এসেছে এখানে। সম্ভবত, সুইস কিংবা বেলজিয়ান হবে। শুনেছি কিছুদিন থাকবে তারা।"

সেক্ষেত্রে নিউট্রিনো আলোড়নের জায়গাটা অনুসন্ধানের ব্যাপারে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, ভাবল গ্রে।

হঠাৎ আঁতকে উঠে রেলিং ছেড়ে পিছিয়ে এল শেইচান।

"কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

জবাবে হাত তুলে সাগরের দিকে ইশারা করল মেয়েটা। পানি কেটে এগিয়ে আসছে কালো রঙের, ত্রিকোণাকৃতির কয়েকটা উঁচু পাখা।

"এদিকেও আছে," ট্রয়ালের উল্টো দিক থেকে বলে উঠল মঙ্ক। "অর্কা, পুরো একটা দল।"

মুচকি হাসলেন ক্যাপ্টেন। "অস্বাভাবিক কিছু না। এদিকের সাগরে ডলফিন আর কিলার হোয়েলের আনাগোনা একটু বেশিই। তবে চিন্তার কিছু নেই। উৎসাহী হয়েই বোটের দিকে এগিয়ে আসে ওরা, ক্ষতি করার জন্য নয়। বেশি মাছ পেলে সৌভাগ্যের কৃতজ্ঞতা হিসেবে খানিকটা ভাগ ওদেরও দেই আমি।"

কিছুক্ষণ পর উৎসাহ হারিয়ে উধাও হয়ে গেল তিমির দল। তারপরও শেইচানের দৃষ্টিতে ভয় লক্ষ্য করল গ্রে।

যাক অন্তত কিছু একটা তো আছে, যা ওই ইস্পাতকঠিন মনে ভয় ধরাতে পারে।

দ্বীপের আরো কাছে চলে এল বোটটা। দক্ষিণ দিকের ঢালের গায়ে কিছু সরু গুহা দেখতে পেল গ্রে। ক্রমাগত আছড়ে পড়া ঢেউ ফেনা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে গুহাগুলোর মুখে। কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা যেন এগুলোর কোনওটার ভেতর না থাকে, মনে মনে প্রার্থনা করল সে।

কিন্তু খোঁজা শুরু করব কোথা থেকে?

ক্যাপ্টেন হান্ডের দিকে তাকাল গ্রে। "কিছু যন্ত্রপাতি সেট করার জন্য দ্বীপের সবচেয়ে গভীর অংশে পৌঁছাতে হবে আমাদের। সেরকম জায়গার ব্যাপারে কিছু জানা আছে আপনার?"

ঢালের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল লোকটা। "গুহা আর টানেলের কোনও অভাব নেই এই দ্বীপে। ঠিক যেন এক টুকরো ক্ষয়ে যাওয়া পনিরের দলা।" বলে নিজের রসিকতায় হেসে ফেললেন নিজেই। "কথিত আছে, তুর্কি জলদস্যুদের হাত থেকে পালিয়ে এসে এক মহিলা এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর একটা ছেলেসন্তান জন্ম দেয় সে। দ্বীপের অভিভাবক হিসেবে ওর নাকি কিছু অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত ছেলেটা।"

মঙ্কের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল গ্রে। হতে পারে, এই গল্পের পেছনে কোনও সত্যও লুকিয়ে আছে।

"গুহাটা কোথায়, বলতে পারবেন?"

"না," শ্রাগ করলেন ক্যাপ্টেন। "তবে ওই লজের একজন কেয়ারটেকার আছে- ওলাফুর ব্র্যাগসন ওরফে ওলি। ষাট বছর ধরে এখানেই থাকে লোকটা। বুড়ো হাড়ে মরচে ধরে গেলেও ব্যাটা এখনও বেশ কাজের। হাতের তালুর মতো গোটা দ্বীপটাকে চেনে সে। তাকে জিজ্ঞেস করলেই বিস্তারিত জানতে পারবেন।"

দ্বীপের পূর্বদিকে এসে পড়েছে ট্রলারটা। উপর থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। জিনিসটা এক পলক দেখেই গ্রে বুঝতে পারল, এটাই তাদের উপরে ওঠার একমাত্র বাহন।

দক্ষ হাতে বোটটাকে দড়ির একেবারে পাশে নিয়ে নিয়ে এল ক্যাপ্টেনের ছেলে। রেলিং পেরিয়ে, বেদির মতো দেখতে একটা নিচু পাথরে নেমে দাঁড়াল তারা তিনজন।

"এগ আর আমি আশেপাশেই আছি। দেখি কিছু মাছ পাই কিনা। কাজ শেষ হয়ে গেলে রেডিও করবেন, তুলে নেব আপনাদের। রাতে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেও জানাতে ভুলবেন না। সেক্ষেত্রে, আগামীকাল আসব আমি।" বলে বিদায় নিলেন ক্যাপ্টেন।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ব্যাগপ্যাকটা শক্ত করে পিঠে বাঁধল গ্রে। ইতিমধ্যে দড়ি ধরে ঝুলে পড়েছে শেইচান। মঙ্কের প্রস্থেটিক হাতের কথা ভাবল গ্রে। এই কাজে তাকে বেশ সাহায্য করবে জিনিসটা।

গ্রে-র পিছু পিছু উঠতে শুরু করেছে মঙ্কও। কয়েক পা ওঠার পর শেইচানের পেছনদিকে গ্রে-কে তাকিয়ে দেখতে দেখে মুখ খুলল সে। "ভাগ্য ভালো, তোমার ইটালিয়ান গার্লফ্রেন্ড সাথে নেই। এভাবে অন্য মেয়ের পাছার দিকে তোমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখলে ও মনে হয় খুব একটা খুশি হত না।"

চোখ কটমট করে নিচে ঝুলতে থাকা মঙ্কের দিকে তাকাল গ্রে। বাতাসের ধাক্কায় শেইচানের কানে পৌছায়নি কথাগুলো। প্রায় চার মাস ধরে র‍্যাচেলের সাথে দেখা হয়না ওর। ক্যারাবিনিয়ারিতে প্রমোশন পাওয়ার পর আরও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মেয়েটা। আর গ্রে-র নিজের পক্ষেও কাজের চাপ সামাল দিয়ে, বাবা-মার দেখাশোনা করার পর সময় বের করা সম্ভব না। আটলান্টিকের দুই পারের দুই প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন ফোন আর ভিডিও চ্যাটই একমাত্র ভরসা।

খানিকক্ষণ পর ঢাল পেরিয়ে সমতল ভূমিতে উঠে এল সবাই। যতটা মনে হয়েছিল, পথটা ততটা কঠিন না। পাথরের খাঁজে পা রেখে বেশ সহজেই ওঠা গেছে। উপরে কালো পাথরের মাঝে সবুজ প্রকৃতির সমারোহ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল তাদের।

"মনে হচ্ছে যেন কোনও আইরিশ রূপকথায় পা দিলাম," মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল মঙ্ক।

তবে কাজের ব্যাপারে বেশ সচেতন দেখাচ্ছে শেইচানকে। "চল, ওই কেয়ারটেকারের সাথে কথা বলা যাক।"

ডানপাশে খানিকটা দূরে দাঁড়ানো লজটার দিকে এগোতে শুরু করল সবাই। বামদিকে উঁচু পাথর ক্ষয় হয়ে গোলকধাঁধার মতো আকৃতি তৈরি করেছে। একমাত্র সেই কেয়ারটেকারই পারে, ওদেরকে শর্টকাট রাস্তা বাতলে দিতে।

নামে লজ হলেও বাইরের চেহারা দেখে একটা গুদামঘর বলে মনে হচ্ছে ওটাকে। সরু চিমনি বেয়ে ধোঁয়া বলে দিচ্ছে, ভেতরে এখনও জীবিত মানুষ আছে। একপাশের সবুজ ঢালে চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা গরু।

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটা ছোট সবজির বাগান বজরে এল। বাগানের ওপারেই প্রধান সদর দরজা। বেশ কয়েকবার নক করার পরও কেউ সাড়া না দেয়ায় বেশ অবাক হলো গ্রে। আলতো ধাক্কা দিতেই দেখা গেল, দরজাটা খোলাই ছিল।

বাইরের ঠান্ডার তুলনায় ভেতরে বেশ আরাম বোধ হলো। লবির পরের অংশে, ফায়ারপ্লেসের পাশে কয়েকটা চেয়ার-টেবিল সাজানো থাকায় বোঝা গেল, এটা লজের ডাইনিং রুম। একটা টেবিলের উপর অগোছালোভাবে কিছু টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ আর সী-চার্ট পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হলো গ্রে-র। কোটের উপরদিকের জিপার খুলে রাখল সে, ফাঁক গলে উঁকি দিতে লাগল হোলস্টারে রাখা সিগ সাওয়ার পিস্তলটা।

তার এই সতর্কভাব লক্ষ্য করেছে শেইচানও। নিঃশব্দে একটা ছুরি বেরিয়ে এল তার হাতে।

"কী হলো?" জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

জবাব দিল না কেউ। খুব বেশি নীরব মনে হচ্ছে পুরো জায়গাটা। টেবিলে ছড়ানো কাগজগুলো বলে দিচ্ছে, ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটেছিল ওখানে।

পিস্তলটা বের করে নিল গ্রে, হলওয়ের দেয়াল ঘেঁষে এগোতে লাগল সামনে। অন্যপাশের দেয়াল ধরে এগোল শেইচান। লজের সামনের দিকে একটা জানালার সামনে পাহারায় রইল মঙ্ক।

একটা ঘরে একজন বুড়ো লোককে দেখতে পেল গ্রে। নাক ভাঙা, ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। একটা চেয়ারে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। সম্ভবত এই ব্যক্তিই ওলাফুর ব্র্যাগসন, লজের কেয়ারটেকার। ঘরে ঢোকার আগে গ্রে নিশ্চিত হয়ে নিল কেউ আছে কিনা।

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। "না না...যা জানতাম সবই তো বলেছি তোমাদের।"

গ্রে-র সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল শেইচান। "মনে হয় আমাদের আগেই কেউ নিউট্রিনো আলোড়নের ব্যাপারটা জেনে গিয়েছিল।"

মেয়েটা কাদের কথা বলছে, স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে গ্রে। কিন্তু গিল্ড এই কথা জানল কীভাবে? কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তো? নিজের অজান্তেই শেইচানের দিকে রাগী চোখে তাকাল গ্রে। পাল্টা জ্বলন্ত চাউনি দিল সেও। নিজেকে সামলে নিল সিগমা কমান্ডার। ইতিমধ্যে নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছে মেয়েটা, অন্তত তাকে এখন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা উচিত হবে না।

দরজা পেরিয়ে সামনে এগোল গ্রে, ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে শেইচানের কাঁধে আলতো চাপড় দিল। "আমি মঙ্ককে নিয়ে লজের বাকি অংশটা দেখে আসছি। তুমি বৃদ্ধ লোকটাকে সাহায্য কর। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। যে বা যারাই এখানে থেকে থাকুক না কেন, নিশ্চয়ই সাগরপথে আমাদেরকে আসতে দেখেছে ওরা।"

এমন সময় বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা লজ। আওয়াজ শুনেই গ্রে বুঝতে পারল, ওটা টিএনটি-র বিস্ফোরণ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দ্বীপের মাঝামাঝি অংশের পাথরের ফাঁক গলে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেল। পাথর ভেঙে আরও গভীরে নিজেদের রাস্তা তৈরি করছে কেউ।

এক মুহূর্ত পর বোল্ডারের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল কয়েকজন লোক। মাথা নিচু করে পাথরের ফাঁক বেয়ে এগোচ্ছে সবাই। মোট আটজন, গুনে দেখল গ্রে। সবার হাতেই রাইফেল। ক্যাপ্টেন হান্ডের বলা শিকারী দলের কথা মনে পড়ল তার।

মনে হচ্ছে, এবার তাদের আসল শিকার শুরু হতে চলেছে।

রাত ১০:১৪
গিফু গবেষণাকেন্দ্র, জাপান

ডেস্কে বসে ঢুলছিলেন জুন ইয়োশিদা, হঠাৎ দরজায় নক হওয়ার শব্দে চমকে উঠলেন তিনি। নিজেকে ধাতস্থ করার আগেই তড়িঘড়ি করে ঘরে ঢুকল ড. রিকু তানাকা, সাথে ড. জেনিস কুপারও আছে।

"আপনার এটা দেখা দরকার," বলে ধপাস করে ইয়োশিদার ডেস্কে একতাড়া কাগজ নামিয়ে রাখল তানাকা।

"কী হয়েছে?" অনেক কষ্টে রাগ দমিয়ে প্রশ্ন করলেন ফ্যাসিলিটির ডিরেক্টর। কিছু পেপারওয়ার্ক সেরে সবেমাত্র একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন তিনি। "আবারও সেই নিউট্রিনো?"
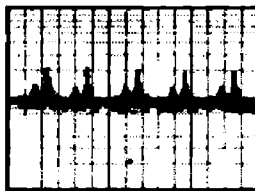
"না...মানে...হ্যাঁ," বিভ্রান্ত দেখাল তানাকাকে। "তেমন জরুরী না। সাধারণ কিছু সংকেত এসেছে। আমি পর্যবেক্ষণে ছিলাম। ওগুলোকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে মনে হয়নি।"

তাকে থামিয়ে দিয়ে মুখ খুলল কুপার। "এ কারণে আমরা এখানে আসিনি, ড. ইয়োশিদা। রিকু, দেখাও উনাকে।"

টেবিলে নামিয়ে রাখা কাগজগুলো থেকে একটা বিশেষ পৃষ্ঠা খুঁজে বের করল তানাকা। "আমরা আইসল্যান্ডের নিউট্রিনো স্পাইকগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলাম। এক সময় উপলব্ধি করতে পারলাম যে, স্পাইকগুলোর অবস্থা আস্তে আস্তে পরিবর্তীত হচ্ছে। ছোট স্পাইকগুলো বড় হচ্ছে, আর বড় স্পাইকগুলো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে।"

"অবস্থা পরিবর্তনের হার খুবই ধীর। এজন্যই ব্যাপারটা নজরে পড়তে এতোখানি সময় লেগেছে," যোগ করল কুপার।

আরেকটা কাগজ বের করে, আগের কাগজটার সাথে সমান্তরালভাবে ধরল রিকু। "প্রথমটা চার ঘন্টা আগের, পরেরটা এইমাত্র প্রিন্ট করে আনা।"
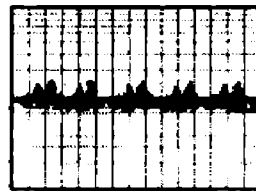
রিডিং গ্লাসটা নাকের উপর বসিয়ে নিয়ে কাগজগুলোর দিকে তাকালেন ইয়োশিদা। তানাকার ধারণাই সত্যি। দুটো স্পাইকের উচ্চতার ব্যবধান আস্তে আস্তে কমে আসছে। এভাবে চলতে থাকলে হয়তো এক সময় দুটোর উচ্চতাই সমান হয়ে যাবে।

"কিন্তু এর মানে কী?" রিডিং গ্লাস খুলে রেখে জানতে চাইলেন ডিরেক্টর।

কুপারের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল তানাকা। সচরাচর তাকে এরকম করতে দেখা যায় না। বোঝা গেল, খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছে, যা প্রকাশ করতে ইতস্তত করছে পাগলাটে তরুণ গবেষক।

"আমার মনে হয়," অবশেষে মুখ খুলল সে, "বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটতে চলেছে। দুটো স্পাইক, অর্থাৎ আলোড়নের মাত্রা সমান্তরালে চলে এলে, যেই জিনিসটা থেকে এই সংকেতগুলো আসছে, সেই উৎসে একটা চেইন রিঅ্যাকশনের উৎপত্তি হবে।"

"নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের মেল্টডাউনের মতো," যোগ করল কুপার। "রিকু আর আমি, দু'জনেই মনে করি, এই স্পাইকের মাত্রার ব্যাবধান কমে আসা একটা টাইমারের মতো কাজ করছে। আইসল্যান্ডের নিউট্রিনো আলোড়নের উৎসের অস্থিতিশীলতার রূপ প্রকাশ করছে ওই টাইমার।"

একটা পাথর চেপে বসল এক্সেন ইয়োশিদার বুকে। "তাহলে? আরেকটা বিস্ফোরণ?"

"হ্যাঁ," জবাব দিল তানাকা। "তবে আগেরটার চেয়েও শতগুণ মারাত্মক।"

"কখন?"

"স্পাইকের ব্যাবধান কমে আসার হার বের করতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আমাকে-"

হাত তুলে তরুণ গবেষককে থামতে ইশারা করলেন ডিরেক্টর। এখন এতোসব বর্ণনা শোনার সময় নেই। "শুধু সময়টা বল।"

উত্তরটা কুপারের কাছ থেকে এল। "প্রায় একঘন্টা।"

"না, বায়ান্ন মিনিট।" নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল তানাকা।

দুপুর ২:৩২
এলিরেই দ্বীপ

একটা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে শেইচান। লজটাকে ঘিরে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করেছে রাইফেলধারী আট হামলাকারী। পাথরের বোল্ডার তাদেরকে বাড়তি সুরক্ষা যোগাচ্ছে। উপরমহলের আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে লোকগুলো, আন্দাজ করল শেইচান। নতুন আগন্তুকদের ব্যাপারে কী করবে, হয়তো এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

পিস্তল হাতে জানালার পাশে অবস্থান নিয়েছে তিনজনই। কিন্তু প্রতিপক্ষের তুলনায় তাদের লোকবল, অস্ত্রবল বেশ অপ্রতুল। সামনের দিকে থাবা বাগিয়ে বসে আছে শত্রুপক্ষ। এখন পালানোর একমাত্র রাস্তা বলতে শুধু লজের পেছনদিক। কিন্তু তারপর? চেষ্ট করলে হয়তো দ্বীপের পেছনদিকে পৌছানো যাবে। সেখানেও হাতের মুঠোয় মৃত্যু নিয়ে অপেক্ষা করছে সাগর।

বজ্র আঁটুনিতে ফেঁসে গেছে তিন সিগমা এজেন্ট।

একহাতে পিস্তল নিয়ে অন্যহাতে ঝড়ের গতিতে মোবাইল টিপে চলেছে গ্রে। নেটওয়ার্ক একবার আসছে, একবার যাচ্ছে। অবশ্য এরকম সভ্যতাবর্জিত দ্বীপে এর থেকে বেশি কিছু আশা করাও বোকামি। আর হাইকমান্ডে যোগাযোগ করতে পারলেও সাহায্য আসতে আসতে অনেক সময় লেগে যাবে। ততটুকু সময় রাইফেলধারী বন্ধুরা তাদের দেবে কিনা, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ, যা করার একাই করতে হবে এখন।

অ্যাড্রেনালিনের স্রোত বইছে শেইচানের পুরো শরীরে। তবে একটু আগে গ্রে-র ব্যবহারের কথা মনে পড়তেই উত্তেজনার সাথে সাথে খানিকটা রাগও জায়গা করে নিল তার মনে। গ্রে-র বিশ্বাস অর্জনের জন্য আর কী কী করতে হবে তাকে? হয়তো মৃত্যুই হবে তার বিশ্বস্ততার সঠিক প্রমাণ।

বুড়ো কেয়ারটেকারের সাথে মঙ্ককে কিছু একটা নিয়ে ফিসিফিস করতে শুনল সে। বেশ মারধর করা হলেও, খানিকটা স্মেলিং সল্ট শোঁকানোর পরই পুরোপুরি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে পোড় খাওয়া লোকটা। কোত্থেকে একটা শটগানও বের করে এনেছে যেন, মারের প্রতিশোধ নেবে।

গ্রে-কে ফোনে কথা বলতে দেখে বোঝা গেল, অবশেষে সিগনাল পেয়েছে সে।

"চল্লিশ মিনিট? এই সময়ের ভেতর দ্বীপ ছাড়তে হবে?"

চিন্তিত ভঙ্গিতে বাইরের দিকে নজর ফেরাল শেইচান। আবার কী হলো? তবে যাই হয়ে থাকুক, জবাব পেতে গ্রে-র ফোন রাখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এমন সময় নড়ে উঠল বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা হামলাকারীরা। মনে হচ্ছে, তারা আদেশ পেয়ে গেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের পিস্তলটা উঁচু করল শেইচান, "খেলা শুরু।"

অধ্যায় ১৯
৩১ মে, সকাল ৮:৩৪
সান রাফায়েল উচ্চভূমি, উটাহ

গেস্টরুম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া সবচেয়ে ছোট কেবিনগুলোর একটায় ঢুকতেই কাই দেখতে পেল, খোলা ল্যাপটপ সামনে নিয়ে বসে আছেন প্রফেসর হ্যাঙ্ক কানোশ। তবে তার দৃষ্টি ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে নিবদ্ধ না। দু'হাতে মুখ ঢেকে কিছু একটা ভাবছেন তিনি।

"প্রফেসর কানোশ..."

কাই-এর গলা শুনে চমকে উঠলেন হ্যাঙ্ক।

"বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত," বলে উঠল মেয়েটা।

মুচকি হেসে ল্যাপটপটা বন্ধ করলেন হ্যাঙ্ক। কিন্তু ততোক্ষণে যা দেখার, দেখে ফেলেছে কাই। নিজের কোনও একটা মেইল চেক করছিলেন প্রফেসর। মনিটরে গুহায় পাওয়া সোনার প্লেটগুলোর মতো হিজিবিজি কিছু লেখা ভাসছিল। হয়তো সেগুলোর রহস্যোদ্ধারেই কাজ করছিলেন তিনি।

এনক্রিপ্টেড স্যাটেলাইটের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন পেইন্টার। তাদেরকে ইন্টারনেট ব্যবহারের অনুমতিও দিয়েছেন। তবে সেই সাথে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। নিজেদের কাছে আসা ই-মেইল চেক করতে পারবে তারা, অনলাইনে খবর পড়তে পারবে। কিন্তু কাউকে ই-মেইল পাঠানো কিংবা ফেইসবুক ব্যবহার করা যাবে না। এতে তাদের অবস্থান ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যাবে।

বড় করে নিঃশ্বাস নিলেন প্রফেসর। "কী হয়েছে, কাই?"

"আঙ্কেল ক্রো আপনাকে বড় ঘরটায় যেতে বলেছেন। বাকিরা ফিরে আসার আগেই আপনার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলাপ সেরে নিতে চান তিনি।"

মুচকি হেসে মেয়েটার কাঁধে আলতো চাপড় দিলেন প্রফেসর। "তাহলে তাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখাটা ভালো দেখায় না।"

"আমি এখানেই থাকি," আবারও মুখ খুলল কাই। "উনি আপনার সাথে একা কথা বলতে চান।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বেরিয়ে গেলেন হ্যাঙ্ক। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে প্রফেসরের চেয়ারটাতে বসে পড়ল কাই। ল্যাপটপের দিকে তাকাতেই তার নিজের ই-মেইল অ্যাকাউন্টটা চেক করতে ইচ্ছা হলো। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল সে। পরে হয়তো আর সুযোগ না ও মিলতে পারে।

ল্যাপটপটা অন করল কাই। ব্রাউজার ওপেন করে নির্দিষ্ট বক্সে নিজের জিমেইল অ্যাকাউন্টের নাম আর পাসওয়ার্ড প্রবেশ করাল।

কানেকশন পাওয়ার সময়টুকু দম আটকে বসে রইল মেয়েটা। বেশ কয়েকবার ইচ্ছা হলো, বন্ধ করে দেয় ল্যাপটপটা। কিন্তু শেষপর্যন্ত কৌতুহলই জয়ী হলো। এক মুহূর্ত পর ই-মেইলের লিস্টে ভরে গেল পুরো স্ক্রিন। ঝুঁকে পড়ে নামগুলো চেক করতে লাগল কাই। বেশিরভাগই স্প্যাম, সেই সাথে পুরনো কিছু মেইলও আছে। তবে উপরের সারিতে একটা মেইল তার নজর কাড়ল।

প্রেরকের মেইল আইডিটা দেখেই ঠান্ডা হয়ে এল তার গোটা শরীর।

jh_wahya@cloudbridge.com

ওয়াহইয়া-র প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, জন হকস- এর আইডি ওটা। মেইলে কি লেখা আছে সেটা আন্দাজ করতে পারছে কাই। তার সেই ধারণাকে আরো সুদৃঢ় করে দিল সাবজেক্টের নামের জায়গায় লেখা তিনটা অক্ষরঃ WTF.

আশা নিরাশার দোলাচলে দুলতে দুলতে মেইলটায় ক্লিক করল সে।

From: jh_wahya@cloudbridge.com
Subject: WTF
To: Kai Quocheets willow3tree@gmail.com

কী করলে তুমি? আমরা তোমাকে একটা নির্বিঘ্ন, শান্তিপূর্ণ মিশন সফল করতে পাঠিয়েছিলাম। আর তুমি সেটা ব্যর্থ তো করেছই, সেই সাথে তৈরি করেছ একগাদা নতুন ঝামেলা। খুনি, সন্ত্রাসী হিসেবে সবগুলো সংবাদমাধ্যমে দেখানো হচ্ছে তোমার ছবি। আর সেই সূত্র ধরে আরোপটা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়তেও খুব একটা সময় লাগবে না।

পাশাপাশি, ঘটনাটার পর থেকে তোমার কোনও পাত্তাই নেই। সরকার কি তোমাকে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য টাকা দিয়েছে? বিক্রি হয়ে গেছ নাকি তুমি?

তোমার সম্পর্কে বাকি সদস্যরা এগুলোই কানাঘুষা করছে। আমার পক্ষে তাদেরকে আর বেশিক্ষণ চুপ করিয়ে রাখা সম্ভব না। জবাব চাই আমরা সবাই।

কিছুক্ষণ আগে ওয়াহইয়া কাউন্সিলের মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ দুপুরের ভেতর তোমার কাছ থেকে যথোপযুক্ত জবাব না পেলে একটা সংবাদ সম্মেলন করব আমরা। আমাদের নীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া এক সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা করা হবে তোমার নাম।

হাতে সময় খুবই কম। তোমার উত্তরের অপেক্ষায়।

-জন হকস

মেইলটা পড়া শেষ হতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল কাইয়ের গলা বেয়ে। চোখের পানিতে ঝাপসা হয়ে এসেছে দৃষ্টি। পরিবার হারানোর পর ওয়াহইয়া-ই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। তাদের সাথেই হেসেখেলে বেড়ে উঠেছে সে। আজ সবাই এভাবে পর করে দিচ্ছে তাকে।

গ্রুপের তরুণ আইনজীবী শেইটন শ- এর কথা মনে পড়ল তার। আস্তে আস্তে বন্ধু থেকে আরও কাছাকাছি চলে আসছিল দু'জন। মাত্র দুটো দিন আগেও হাতে হাত রেখে সারারাত গল্প করেছে তারা। আর মাঝের সেই দু'দিনকেই আজ যেন মহাকাল বলে মনে হচ্ছে। সেদিন থেকে আজ, কতোই না তফাৎ!

হতাশায় দু'হাতে মুখ ঢাকল কাই। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে থাকা পিঠটা। মনে একটাই চিন্তাঃ

কী করব আমি?

সকাল ৮:৩৫

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন প্রফেসর হ্যাঙ্ক কানোশ। টেবিলের উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসে, সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন পেইন্টার। কোয়ালস্কি পাশে রাখা একটা সোফায় আধশোয়া ভঙ্গিতে ঝিমাচ্ছে।

পেইন্টারের চোখের নিচে কালির ছোপ বলে দিচ্ছে, ঘুম দরকার তার। হ্যাঙ্ক বুঝতে পারছেন না, ব্যাপারটা কী। পেটে যাই থাকুক না কেন, তা মুখে আনতে দেরি করছেন কেন ভদ্রলোক? সারাটা সকাল তাকে ফোনে কথা বলতে দেখেছেন প্রফেসর। হয়তো অগ্নুৎপাত সংক্রান্ত কিছু একটা হবে।

খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন পেইন্টার। "যা বলার সরাসরিই বলছি। আশা করি, আপনিও আমার সাথে একই রকম ব্যবহার করবেন। লোকজন মারা যাচ্ছে, আরও যাবে। ব্যাপারটা সম্পর্কে খোলাখুলি আলাপ করা দরকার আমাদের।"

মাথা নাড়লেন হ্যাঙ্ক। "অবশ্যই।"

"ঘটনাস্থলে থাকা ভূতাত্ত্বিকের সাথে কথা বলেছি আমি। তার ধারণা, গুহায় যা ই লুকানো থাকুক না কেন, ওগুলো আণবিক পর্যায়ে ক্রিয়াশীল। প্রাচীন লোকেরা সচেতন বা অবচেতনভাবে যা ই আবিষ্কার করে থাকুক, হতে পারে কোনও ধরণের বিস্ফোরক, জিনিসগুলোকে নিষ্ক্রিয় রাখার জন্য তাপের প্রয়োজন। এজন্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, গুহায় ভূগর্ভস্থ উষ্ণ ঝর্ণার উপর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ওগুলো।"

প্রফেসরের চেহারায় দুঃখের ছাপ দেখা গেল। "তারপর আমরাই বাইরে বের করে এনেছিলাম জিনিসগুলো।"

"হ্যাঁ। তারপরই বিস্ফোরণটা ঘটল। আমাদের ভূতাত্ত্বিকের মতে, ওই বিস্ফোরণের ফলে লক্ষ কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্যানোমেশিন অর্থাৎ ন্যানোবট ছড়িয়ে পড়ল পরিবেশে। সামনে যা আসে, সবকিছুকে আণবিক পর্যায়ে ভেঙে ফেলতে শুরু করল সেগুলো।

কিন্তু ভাগ্যক্রমেই হোক, কিংবা গুহায় থাকা লোকগুলোর পরিকল্পনা অনুযায়ীই হোক, ভূগর্ভস্থ লাভার স্তরের উত্তাপ জিনিসগুলোকে নষ্ট করে ফেলল।"

"ম্যাগি...কী করেছি আমরা!" এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে দৃশ্যটা কল্পনা করতে করতে বিড়বিড় করে উঠলেন হ্যাঙ্ক। "এজন্যই স্থানীয় গালগল্পে গুহাটায় ঢুকতে নিষেধ করা হয়েছিল।"

"সম্ভবত ওটাই একমাত্র গুহা নয়," যোগ করলেন পেইন্টার।

"মানে?"

"আইসল্যান্ডেও এরকম একটা জায়গার সন্ধান পাওয়া গেছে।"

"আইসল্যান্ড?" বিড়বিড় করলেন হ্যাঙ্ক।

সংক্ষেপে নিউট্রিনো আলোড়নের ব্যাপারটা তাকে ব্যাখ্যা করলেন পেইন্টার। "জায়গাটা পরিদর্শন করতে লোক পাঠানো হয়েছে। কিন্তু পাজলের আরেকটা টুকরো কিছুতেই মেলাতে পারছি না আমি।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন প্রফেসর।

"গুহায় কী লুকানো ছিল, সেটা নিয়ে আলোচনা করছি আমরা। কিন্তু সেগুলো কে লুকালো, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কোনও ধারণাই আমাদের নেই। গুহায় থাকা লোকগুলো কারা? কেন ককেশিয়ান বলে মনে হচ্ছিল ওদের? আর যদি ককেশিয়ানই হবে, তাহলে তাদের পরনে নেটিভ আমেরিকান পোশাকআশাক, অলংকার কেন?"

জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে ফেললেন হ্যাঙ্ক।

কিন্তু পেইন্টার ছাড়ার পাত্র না। "আমি জানি আপনি কিছু একটা লুকাচ্ছেন, প্রফেসর। ল্যাবে ড. ডেন্টনের সাথে আপনাকে তর্ক করতে শুনেছি আমি। যা জানেন তা বলুন আমাকে, হয়তো সেই জ্ঞানটুকুই এই বিপদে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন হ্যাঙ্ক। ব্যাপারটা তার সংস্কৃতি আর বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। তাই যথাযথ নিশ্চিত না হয়ে কথাটা তুলতে চাইছিলেন না তিনি। কিন্তু মনে হয়, সময় হয়ে গেছে।

"এটা শুধুই একটা থিউরি," অবশেষে মুখ খুললেন প্রফেসর। "পদার্থবিদ হওয়ার পাশাপাশি, আমার মতোই একজন মরমন ছিল ডেন্টন। ওর কল্পনার সাথে আমার যুক্তির মিশেলে ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করার উপযুক্ত ছিল না।"

মাথা নাড়লেন পেইন্টার। "আর এখন?"

"আপনার বলা আইসল্যান্ডের ব্যাপারটা ম্যাটের থিউরিকে সমর্থন করছে।"

"থিউরি? কীসের থিউরি?"

"উত্তরটা শোনার আগে, দ্য বুক অফ মরমন- এর একটা অধ্যায়ের ব্যাপারে জানতে হবে আপনাকে। আমাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী, নেটিভ আমেরিকানরা হচ্ছে ইসরায়েলের একটা গোত্রের বংশধর, যারা খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শো সালে জেরুজালেমের পতনের পর এখানে বসতি গেড়েছিল।"

"তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, নেটিভ আমেরিকানরা হচ্ছে এখানে নির্বাসিত হওয়া একটা ইহুদী গোত্রের বংশধর?"

"বুক অফ মরমন- এর একটা অধ্যায় তাই বলে। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে, গোত্রটার নাম ছিল মানাসেহ।"

প্রফেসরের কথায় বাগড়া দিলেন পেইন্টার। "এটা কীভাবে সম্ভব? ঐতিহাসিক অনেক রিপোর্টে এটা প্রমাণিত যে, খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শো সালের আরও অনেক আগে থেকেই আমেরিকায় মানুষজনের বসবাস ছিল।"

"হ্যাঁ। আমিও জানি ব্যাপারটা। কথাটা পরস্পরবিরোধী মনে হচ্ছে। কিন্তু বুক অফ মরমন- এ ইসরায়েলীদের আসার আগে থেকেই এখানে বাস করা লোকজন সম্পর্কেও লেখা আছে।"

পেইন্টার কিছু একটা বলতে উদ্যত হলে হাত তুলে তাকে থামালেন প্রফেসর। "বলতে দিন, ব্যাপারটা পরিষ্কার করছি আমি।"

"ঠিক আছে। বলে যান।"

"বুক অফ মরমন- এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ইজরায়েলীরা আমেরিকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর তাদের ভেতর দুটো শাখা তৈরি হয়ঃ নেফাইটস আর ল্যামানাইটস। আমি বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছি না, প্রায় এক সহস্রাব্দ পর ল্যামানাইটরা নেফাইটদের বিতাড়িত করে আজকের নেটিভ আমেরিকানে পরিণত হয়।"

অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে পেইন্টারকে। "বর্ণবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা। আমি যতদূর জানি, নেটিভ আমেরিকানদের সাথে কখনও ইউরোপিয়ান কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের লোকজনের ডিএনএ-গত মিল পাওয়া যায়নি।"

"আমি জানি। জেনেটিক অনুসন্ধানে বের হয়েছে, নেটিভ আমেরিকানদের শিকড়ের উৎপত্তি এশিয়ায়। মরমন বিজ্ঞানীরাও বেশ অনেকদিন ধরে স্থানীয়দের সাথে ইহুদীদের জেনেটিক মিল খোজার চেষ্টায় রত আছেন। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে এখনও কোনও ধারণা পৌছাতে পারেননি তারা।"

মাথা নাড়লেন পেইন্টার। "তাহলে?"

"বুক অফ মরমন- এর আরেকটা অসম্পূর্ণ অংশে এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নবাগত ইজরায়েলীরা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এখানে বসবাস করা শুরু করে। কিন্তু নেফাইটদের আমেরিকানদের মূল দলে না ঢুকিয়ে আলাদা একটা গোত্র হিসেবেই বিবেচনা করা হত। এজন্যই মূলত ইহুদীদের সাথে আধুনিক আমেরিকানদের সুনির্দিষ্ট কোনও জেনেটিক ট্রেইল আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। আর তাছাড়া, সুদূর অতীত পর্যন্ত বিস্তৃত আমেরিকানদের ইতিহাসের সাথে ইহুদীদের ডিএনএ-গত সাদৃশ্য খুঁজে বের করার কাজটা আদৌ খুব একটা সহজ না।"

এবার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকেছে পেইন্টারের। "বুঝতে পেরেছি, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন। গুহায় পাওয়া মমিগুলো সেই বিতাড়িত ইহুদী গোত্রের লোকগুলোর, তাই তো?"

"হ্যাঁ," সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। "সেই বিতাড়িত নেফাইটরা। বুক অফ মরমন-এ তাদের সাদা চামড়ার, ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট, বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কথাগুলো কী সেই মমিগুলোর সাথে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন সিগমা ডিরেক্টর। "কিন্তু ওই খুনে ল্যামানাইটদের কী হলো?"

"খুব সম্ভবত, তারা একসাথেই বসবাস করত। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পর কিছু একটা গোলমাল হয়েছিল। নেফাইটদের কোনও ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ল্যামানাইটসহ সংশ্লিষ্ট নেটিভ আমেরিকানরা। তারপর সবাই একজোট হয়ে সমূলে উৎপাটন করে হতভাগা নেফাইটদের। আরেকটা ব্যাপার এই থিউরিটাকে সমর্থন করে।"

"কী সেটা?" জানতে চাইলেন পেইন্টার।

"নেটিভ আমেরিকানদের অনেক গোত্রের ভাষার সাথে ইহুদীদের হিব্রু ভাষার অনেক মিল আছে। একাধিক রিসার্চেও এটা প্রমাণিত হয়েছে।"

"বুঝতে পেরেছি," মন্তব্য করলেন পেইন্টার। "কিন্তু গুহার মমিগুলোর সাথে এই ভাষার সম্পর্কটা কী?"

"দাঁড়ান, দেখাচ্ছি," বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজের ব্যাকপ্যাকের দিকে এগোলেন হ্যাঙ্ক। এক মুহূর্ত পর কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা বের করে আবারও ফিরে এলেন। গুহা থেকে পাওয়া সোনার ট্যাবলেট দুটো টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলেন তিনি। "বুক অফ মরমন, জোসেফ স্মিথ নামে এক সায়েন্টের লেখা। কথিত আছে, মরোনি নামের এক দেবদূত তাকে কতগুলো সোনার প্লেট দিয়েছিলেন। অদ্ভুত হিজিবিজি কিছু লেখা খোদাই করা ছিল সেই প্লেটগুলোতে। লেখাগুলো অনুবাদ করার জ্ঞান স্মিথকে দিয়েছিলেন দেবদূত। সেই জ্ঞান ব্যবহার করে, প্লেটের লেখাগুলোকে অনুবাদ করে আজকের বুক অফ মরমন তৈরি করেন স্মিথ। ঐতিহাসিকদের মতে, সোনার প্লেটে খোদাই করা সেই হরফগুলো ছিল হিব্রুরই একটা প্রাচীন রূপ।"

টেবিলের উপর থেকে একটা ট্যাবলেট নিজের দিকে টেনে নিলেন পেইন্টার। "আর এগুলো?"

"সেদিন রাতে আপনারা পৌঁছানোর আগে, কয়েক লাইন লেখা কপি করে আমার এক ভাষাবিদ বন্ধুকে পাঠিয়েছিলাম আমি," জবাব দিলেন হ্যাঙ্ক। "আজ সকালে তার মেইলের জবাব পেয়েছি। অক্ষরগুলোকে প্রাচীন হিব্রু বলে শনাক্ত করতে পেরেছে সে।"

কথাটা শুনে টেবিলের উপর আরেকটু ঝুঁকে এলেন পেইন্টার।

"প্যারাসেলসাস নামের ষোড়শ শতকের এক স্কলার প্রাচীন ভাষার এই রূপটাকে অ্যালফাবেট অফ দ্য ম্যাজাই নামে অবহিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন, এক দেবদূত তাকে এই ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছেন। সব মিলিয়ে আমার ধারণা, জোসেফ স্মিথ আসলে কোনওভাবে ওই ইজরায়েলীদের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। তারপরই বুক অফ মরমনে তাদের কথা উল্লেখ করেন তিনি। এবার আসি আইসল্যান্ডের ব্যাপারে।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন পেইন্টার। অবশেষে মিলতে শুরু করেছে পাজলের টুকরোগুলো। "ন্যানোটেকনোলজির সেই প্রাচীন আবিষ্কারকরা- স্কলার, ম্যাজাই- ইত্যাদি ছাতামাথা যাই বলুন না কেন, প্রাচীন ইহুদী ছিল লোকগুলো। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় আসার সময় যদি তারা কিছু একটা লুকাতে চান-"

তার মুখের কথা কেড়ে নিলেন হ্যাঙ্ক। "সেই জিনিসটা নিরাপদে রাখার জন্য উত্তাপের প্রয়োজন ছিল। তাই আইসল্যান্ডের আগ্নেয় শিলায় তৈরি একটা দ্বীপের দিকে তাদের নজর পড়া খুবই স্বাভাবিক। আমেরিকায় আসার আগে সেই রহস্যময় জিনিসটার একটা অংশ সেখানে লুকিয়ে রেখে এসেছিল তারা।"

"হ্যাঙ্ক, আমার মনে হয়-"

একটা গাড়ির ব্রেক কষার শব্দে কথা থামিয়ে দিলেন পেইন্টার। আস্তে আস্তে এগোতে লাগলেন খোলা জানালার দিকে। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে হাতে।

টায়ারের আওয়াজ শুনে উঠে বসল কোয়ালস্কি। "কিছু মিস করে ফেললাম মনে হয়..."

কয়েক মহূর্ত নিশ্চুপ দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে থাকার পর মুখ খুললেন পেইন্টার। "আপনার বন্ধুরা এসেছে, আলভিন আর আইরিস। মনে হয়, আমাদের সর্বশেষ অতিথিকে খুঁজে পেয়েছে তারা।"

সকাল ৮:৪৪

রুক্ষ ট্রেইলে ধুলোর ঝড় তৈরি করতে করতে অবশেষে কেবিনগুলোর সামনে এসে থামল টয়োটা এসইউভি-টা। বড় কেবিনটার দরজা পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন পেইন্টার। সূর্য ওঠার পর মাত্র তিন ঘন্টা সময় পেরিয়েছে। কড়া রোদ সরাসরি চোখে এসে আঘাত করছে। এক হাত উঁচিয়ে সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করলেন তিনি।

সামনের দুই সিট থেকে দু'পাশ দিয়ে নেমে দাঁড়ালেন আলভিন আর আইরিস। দু'জনের বয়সই প্রায় সত্তর ছুঁই ছুঁই করছে। ডাই করা শার্ট আর জিন্সের প্যান্টে তাদের বুড়ো হিপ্পিদের মতো দেখাচ্ছে। তবে গায়ে আধুনিক পোশাক চড়ালেও, হোপি ইন্ডিয়ান ঐতিহ্যকে অবহেলা করেননি দু'জনের একজনও। নিজের লম্বা, ধূসর চুলগুলোকে ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে রেখেছেন আইরিস, ব্যান্ডের মাথায় রং-বেরঙের পালক

গোঁজা। আলভিনও প্রথাগতভাবে লম্বা চুল রেখেছেন, তবে এই মুহূর্তে সেগুলো খোলাই আছে। তার দুই হাতেই হোপি ডিজাইনের রিস্টব্যান্ড। বিভিন্ন জাতের ঝিনুক আর ছোট আকৃতির কচ্ছপের খোল আটকানো আছে ব্যান্ডগুলোতে। দু'জনের পায়েই শক্তপোক্ত হাইকিং বুট।

"দেখা যাচ্ছে, পুরো জায়গাটা পুড়িয়ে ফেলেননি আপনি," পেইন্টারকে বেরিয়ে আসতে দেখে কৌতুকস্বরে বলে উঠলেন আইরিস।

জবাবে চোখ টিপলেন পেইন্টারও। "শুধু কফি বানিয়েছি।"

বিশেষ অতিথিকে নামিয়ে আনার জন্য এসইউভির দিকে এগোলেন সিগমা ডিরেক্টর। গত রাতে, উটে গোত্রের কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছার ব্যাপারে আলভিনকে জানিয়েছিলেন পেইন্টার। গুহায় অনুপ্রবেশের পর মারা যাওয়া ছেলেটা আর তার বুড়ো দাদা ওই গোত্রেরই সদস্য ছিল। হয়তো গুহাটার ব্যাপারে ওই লোকটা আরও অনেক কিছু জানত। সেক্ষেত্রে তার সমসাময়িক লোকেরাও যে একেবারে কিছু জানবে না, এটা ভাবা বোকামি। এমনই একজনকে আনতে বেরিয়েছিলেন আলভিন আর আইরিস।

গাড়িটার সামনে পৌঁছে প্যাসেঞ্জার সিটের দরজাটা খুলে ধরলেন পেইন্টার। সাথে সাথে হাস্যোজ্জ্বল এক তরুণ বেরিয়ে এল। অবাক হয়ে গাড়িটার ভেতর উঁকি দিলেন পেইন্টার...খালি।

হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল নেভি স্যুট পরা ছেলেটা। অন্যহাতে শোভা পাচ্ছে ভাঁজ করে রাখা জ্যাকেট। গলার টাই ঢিলে করে বাঁধা। স্যুটের ফাঁক দিয়ে ভেতরের সাদা শার্ট দেখা যাচ্ছে। "আমি জর্ডান আপ্পাওয়ারা, উত্তরের উটে গোত্রের একজন জনপ্রতিনিধি।"

কতই বা বয়স হবে ওর? সবেমাত্র বিশের কোঠা পেরিয়েছে মনে হয়। বাড়িয়ে ধরা হাতটা গ্রহণ করলেন পেইন্টার। লক্ষ্য করলেন, নিজেকে জনপ্রতিনিধি পরিচয় দেয়ার সময় লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল ছেলেটা। তার মানে, সচরাচর কাজটা করতে অভ্যস্ত নয় ও। তবে হ্যান্ডশেক করার সময় বোঝা গেল, হালকাপাতলা শরীরটা বেশ ভালোই শক্তি ধরে।

হাত মেলানোর পর কেবিনগুলোর দিকে তাকাল নতুন অতিথি। "বলে রাখা ভালো, উটে কাউন্সিলের একজন সদস্য হিসেবে আমার দাদার প্রতিনিধিত্ব করি আমি। প্রায় অন্ধ আর বধির হওয়া সত্ত্বেও উনি এখনও ইস্পাতের মতো দৃঢ়। আমিই এখন তার হয়ে মিটিং করি, নোট নেই, এমনকি তার সম্মতিক্রমে ভোটও দেই।"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন পেইন্টার। বয়স্ক কাউকে আশা করেছিলেন তিনি। এই বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে তার উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার নয়।

"ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে-," পেইন্টারের মুখ দেখে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে জর্ডান, "-আমাকে দেখে হতাশ হয়েছেন আপনি। কিন্তু দাদার পক্ষে এখানে আসা সম্ভব ছিল না," বলে নিজের কোমরে হাত বুলাল ছেলেটা। "এই এবড়োখেবড়ো পথ পাড়ি দিতে হলে দ্বিতীয়বারের মতো কোমরে অপারেশন করাতে

হতো উনাকে। আর শেষ এক মাইল আসার পর থেকে মনে হচ্ছে, আমারও প্রথম অপারেশনের সময় ঘনিয়ে এসেছে।"

"তাহলে চল, হাত-পা একটু খেলিয়ে নেয়া যাক," প্রস্তাব করলেন আলভিন।

কিন্তু ভেটো দিলেন আইরিস। "আপনারা বরং কথা বলুন, আমি আর আলভিন দেখি কিছু নাস্তার ব্যবস্থা করা যায় কি না।"

পেইন্টার বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটার সাথে নিজেদের জড়াতে চাচ্ছেন না বৃদ্ধ দম্পতি। কথা না বাড়িয়ে জর্ডানকে নিয়ে বারান্দায় উঠে এলে তিনি। একটা টেবিল সাজানো আছে সেখানে। রেলিং-এ পা তুলে দিয়ে একটা চেয়ারে বসে আছে কোয়ালস্কি। ছেলেটাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকাল বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট। পেইন্টারের মতো সে ও বয়স্ক কাউকে আশা করেছিল।

কাই-কে সাথে নিয়ে এগিয়ে এলেন হ্যাঙ্ক। তার কুকুরটাও পেছনেই আছে। জর্ডানের পায়ের সামনে এসে জুতো শুঁকতে শুরু করল সে।

আবারও বাকিদেরকে নিজের পরিচয় দিল ছেলেটা। কাই-এর সাথে হ্যান্ডশেক করার সময় তার লজ্জিত হাসি যেন আরেকটু বিস্তৃত হলো। শুরুতে আগ্রহী মনে না হলেও কথার মাঝখানে প্রায়ই চোখের কোণা দিয়ে ছেলেটার দিকে কাই-কে তাকাতে দেখলেন পেইন্টার।

"কাজের কথায় আসি," সবাই চেয়ার বসার পর মুখ খুললেন সিগমা ডিরেক্টর। "জর্ডান, মনে হয় এখানে আসার কারণ সম্পর্কে ইতিমধ্যে তোমাকে জানানো হয়েছে।"

"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল ছেলেটা। "গুহায় আত্মহত্যা করা বুড়ো জিমি রীডকে বেশ ভালো করেই চিনতাম আমি আর আমার দাদা। বন্ধু ছিলেন তারা দু'জন। খুন হওয়া তার নাতি- চার্লিকেও চিনতাম আমি। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। দাদা আমাকে আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য কিংবা প্রশ্নের জবাব দিতে বলে দিয়েছেন।"

ঝানু রাজনীতিবিদদের মতো জবাব দিয়েছে ছেলেটা। তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে পেইন্টার আন্দাজ করলেন, সম্ভবত কোনও ল' স্কুলে পড়াশোনা করেছে সে। সাহায্য করবে ঠিক আছে, কিন্তু নিজের গোত্রকে কোনও ঝামেলায় জড়ানোর ইচ্ছা তার নেই।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন পেইন্টার। "আসার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা আসলে আরও বয়স্ক কাউকে আশা করছিলাম। বুঝতেই পারছ... আমাদের দরকার জিমি রীডের মতো কাউকে, যে ঐ গুহাটার ইতিহাস সম্পর্কে আরও বিস্তারিত কিছু বলতে পারবে।"

অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে জর্ডানকে। "তা জানি। কিন্তু উটে গোত্র থেকে আপনাদের সাহায্য করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে। কথাটা জানতে পেরে দাদা ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন আমাকে।"

ছেলেটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন পেইন্টার। তাহলে মনে হয় ঠিকই আছে। নাই মামার চাইতে কানা মামা ঢের ভালো।

বলে চলেছে জর্ডান। "একটা প্রাচীন মানচিত্রে চিহ্নিত করা গুহাটার অস্তিত্বের ব্যাপারে শুধুমাত্র দু'জন মানুষ জানতেন, বুড়ো জিমি আর আমার দাদা। বুড়োর মৃত্যুর পর সেটা কমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র একজনে। কিন্তু গতকাল রাতে দাদা আমাকে বিস্তারিত সবকিছু বলেছেন।"

বাক্যটা শেষ করার সাথে সাথে ভয়ের একটা ছাপ দেখা গেল জর্ডানের চোখে-মুখে। ঘাড় ঘুরিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকাল সে। "...অদ্ভুত সব কাহিনী।"

"মমি হয়ে যাওয়া লোকগুলো সম্পর্কে বল আমাদের," জোর দিলেন পেইন্টার।

আস্তে করে মাথা নাড়ল ছেলেটা। "দাদার বক্তব্য অনুযায়ী, গুহায় থাকা লোকগুলো বিশেষ এক শামান গোত্রের। অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে এই দেশে এসেছিল উজ্জ্বল চামড়াধারী লোকগুলো। তাদেরকে টটসি'আন্টসউ পুটসিভ নামে ডাকা হত।"

কথাটা অনুবাদ করে দিলেন হ্যাঙ্ক। "শুকতারার দেশের লোক।"

এই প্রথম মুখ খুলল কোয়ালস্কি। "রোজ সকালে পূর্ব দিকে ওঠে না ওই জিনিসটা?"

মাথা নেড়ে সায় দিল জর্ডান। "প্রাচীন অধিবাসীদের মতে, রকি পর্বতের আরও অনেক পূর্ব দিক থেকে এসেছিল তারা।"

হ্যাঙ্কের সাথে দৃষ্টিবিনিময় করলেন পেইন্টার। এই ব্যাপারে কিছুক্ষণ আগেই তাদের কথা হয়েছিল।

ইজরায়েল থেকে আসা ইহুদী...মরমনদের নেফাইটস।

এখানে বসবাস শুরু করার পর, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে শামান নির্বাচন করে তাদের নিজস্ব কিছু বিদ্যা শেখাল পুটসিভরা। তাদের কাহিনী লোকমুখে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক আসতে লাগল এদিকে। এক সময় নিজেরাই একটা গোত্র গঠন করে ফেলল তারা।

"ল্যামানাইটস," বিড়বিড় করে উঠলেন পেইন্টার।

"শ্রদ্ধা করার পাশাপাশি বিশেষ জ্ঞানের জন্য পুটসিভদের স্থানীয় লোকজন বেশ ভয়ও পেত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজেদের জ্ঞান নিজেদের ভেতরই সংরক্ষণ করল তারা। এদিকে আরও জ্ঞানের জন্য নিজেদের ভেতর হানাহানি করতে লাগল আমাদের শামানরা। একদিন লোভ সামলাতে না পেরে, দক্ষিণের পুয়েবলো গোত্রের কিছু লোক পুটসিভদের বিশেষ একটা জিনিস চুরি করল। কিন্তু চুরি করা জিনিসটার ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণাই ছিল না। এই ব্যাপারটাই পুরো গোত্রের জন্য ধ্বংস ডেকে আনল। এরপর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অন্যান্য গোত্রের লোকেরা সেই পুয়েবলো গোত্রের বেঁচে যাওয়া মানুষগুলোর উপর হামলা করে বসল। খুঁজে খুঁজে খুন করা হলো প্রতিটা পুরুষকে। মহিলা আর বাচ্চারাও রেহাই পেল না।"

"গণহত্যা," আঁতকে উঠলেন হ্যাঙ্ক।

মাথা নাড়ল জর্ডান। "এতে ভয় পেয়ে গেল পুটসিভরা। গোত্রের সবাইকে একত্রিত করে পশ্চিমদিকে যাত্রা করল তারা, নিজেদের অমুল্য সম্পদগুলোও লুকিয়ে ফেলল

গোপন জায়গায়। স্থানীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা চালাল তাদের উপর। পালিয়ে গেল কেউ কেউ, তবে অধিকাংশদেরকেই তাদের গোপন জ্ঞান গোপন রাখার উদ্দেশ্যে প্রাণ দিতে হলো।"

আড়চোখে হ্যাঙ্কের দিকে তাকালেন পেইন্টার। এটাই কি মরমনদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত সেই নেফাইট আর ল্যামানাইটদের মধ্যকার যুদ্ধ?

তবে জর্ডানের কথা এখনও শেষ হয়নি। "মাত্র হাতেগোনা দুয়েকজন বিশ্বস্ত লোককেই সেই গুপ্ত জায়গাগুলোর ব্যাপারে জানিয়ে গিয়েছিল পুটসিভরা।"

এতোক্ষণ দম আটকে গল্পটা শুনছিলেন হ্যাঙ্ক। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেদের অতীত ইতিহাসের কথা মনে করলেন তিনি।

কিন্তু পেইন্টারকে অবিচল দেখাচ্ছে। "এই গল্পের কোনও প্রমাণ আছে কি?"

"জানি না," জবাব দিল জর্ডান। "তবে দাদা বলেছেন, পুটসিভদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে, তাদের শেষের শুরু হওয়ার জায়গাটায় যেতে হবে আপনাদের।"

"শেষের শুরু? মানে কী?" প্রশ্ন করল কোয়ালস্কি।

তার দিকে ঘুরে তাকাল জর্ডান। "তাদের সম্পদ চোরেরা কোথায় নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছিল তা জানা আছে আমার দাদার। তাদের গোত্রের নামও জানেন তিনি।"

"আনাসাযি বলা হত ওদের," বাকি সবার দিকে তাকিয়ে যোগ করল ছেলেটা।

কথাটা শোনার পর মুখের অভিব্যক্তির পরিবর্তন আটকাতে পারলেন না পেইন্টার। আমেরিকার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাস করত আনাসাযি গোত্রের লোকজন। পাহাড়ের গায়ে পুয়েবলো নামের পাথুড়ে বাড়ি নির্মাণ আর নিজেদের রহস্যময় অন্তর্ধানের ব্যাপারে বিখ্যাত এরা।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পেইন্টারের দিকে তাকালেন হ্যাঙ্ক। "নাভাজো ভাষায় আনাসাযি শব্দটার মানে হচ্ছে পুরনো শত্রু। দশম থেকে একাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে পুরোপুরি গায়েব হয়ে গিয়েছিল এই গোত্রের লোকেরা। তাদের রহস্যময় অন্তর্ধান নিয়ে এযাবৎ অনেক বিতর্ক হয়েছে। তবে নেটিভ আমেরিকানদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যকার হানাহানিকেই এর পেছনে কারণ হিসেবে অভিহিত করেন বেশিরভাগ ঐতিহাসিকরা।"

কিন্তু জর্ডানের দাদার বক্তব্য এই যুক্তিটাকে নাকচ করে দিচ্ছে। ছেলেটা দিকে ঘুরে তাকালেন পেইন্টার। "তোমার দাদা জানতেন কোথায় নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছিল আনাসাযিরা? কোথায় এটা?"

"দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার, বিশেষ কর অ্যারিজোনার মানচিত্র আছে আপনাদের কাছে?" পাল্টা প্রশ্ন করল জর্ডান। "তাহলে জায়গাটা দেখাতে পারব আমি।"

পেইন্টারের পিছু নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল পুরো দলটা। বাইরে বেশ রোদ থাকলেও পাথরের কেবিনের ভেতর জমাট বেঁধে আছে অন্ধকার। দেয়ালে আটকানো

কয়েকটা মশাল জ্বালিয়ে দিল কাই। একটা মানচিত্র বের করে টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিলেন পেইন্টার। "দেখাও।"

কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে মানচিত্রটার দিকে তাকিয়ে রইল জর্ডান। "এখান থেকে প্রায় তিনশো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জায়গাটা। ফ্ল্যাগস্টাফের বাইরেই...আহ, এই যে এটা।"

মানচিত্রের একটা অংশে আঙুল দিয়ে ইশারা করল সে। সাথে সাথে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল সবাই।

"সানসেট ক্রেটার ন্যাশনাল পার্ক।"

"মনে হচ্ছে, এক আগ্নেয়গিরি থেকে আরেকটায় লাফিয়ে নামতে চলেছি আমরা," বিড়বিড় করে উঠল কোয়ালস্কি।

মনে মনে হিসাব কষতে শুরু করে দিয়েছেন পেইন্টার।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুখ খুললেন হ্যাঙ্ক। "আপনাদের সাথে আমিও যাচ্ছি।"

তর্ক করতে যাচ্ছিলেন পেইন্টার। কাই-এর দেখাশোনার জন্য প্রফেসরকে এখানে রেখে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন তিনি। কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন হ্যাঙ্ক। "গোপন জিনিসটা গোপন রাখার জন্য প্রাণ দিয়েছে আমাদের বন্ধুরা। আমাকে যেতেই হবে। আর তাছাড়া, কে জানে অ্যারিজোনায় কী অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্য? আমার মতো বিশেষজ্ঞ দরকার আছে ওখানে।"

আর কথা বাড়ালেন না সিগমা ডিরেক্টর। অকাট্য যুক্তি দিয়েছেন প্রফেসর।

"ঠিক আছে, চলুন তাহলে। দেখা যাক, আপনার বুড়ো হাড় কতটুকু শক্তি ধরে।" বিড়বিড় করে উঠল কোয়ালস্কি।

কিছু একটা বলার জন্য এগিয়ে এল কাই। কিন্তু কথাটা আগেই আন্দাজ করতে পেরেছেন পেইন্টার। "আলভিন আর আইরিসের সাথে থাকছ তুমি," বলে জর্ডানের দিকে তাকালেন তিনি, "তুমিও।"

তর্ক করে লাভ হবে না বুঝতে পেরে চুপ হয়ে গেল মেয়েটা।

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন পেইন্টার। কিন্তু সাথে সাথে আবারও নড়ে উঠল জর্ডান। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে ধরল তার দিকে। "যাওয়ার আগে আপনাদের আরেকটা জিনিস দেখাতে বলেছেন আমার দাদা।"

"কী?"

"এতোক্ষণ যা বললাম, এগুলো আসলে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মুখে মুখে সঞ্চারিত হওয়া লোকগাঁথা। হয়তো এই বয়সেই আমাকে দাদা এগুলো বলতে যেতেন না। কিন্তু তিনি মনে করে, ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

ঘাড় বেঁকিয়ে তার দিকে তাকাল কোয়ালস্কিও। "দেরি হয়ে গেছে মানে?"

"দাদা মনে করেন, গুহায় লুকানো শক্তিটা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা পৃথিবীতে। সবকিছু ধ্বংস করে দেবে ওটা।"

শিনের মুখে শোনা দৃশ্যটা কল্পনা করলেন পেইন্টার। বিদ্ধংসী ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছিল লক্ষ-কোটি ন্যানোবট। বিপুল বেগে ধুলোর মতো চারদিকে ক্রমাগত ছড়িয়ে
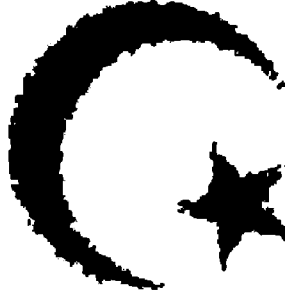
পড়ছিল জিনিসগুলো। "কিন্তু ওটা তো থেমে গেছে। লাভা উদ্গীরণের তাপ দৈত্যটাকে আবার বোতলবন্দী করে ফেলেছে।"

মাথা নাড়ল জর্ডান। "এটা সবেমাত্র শুরু। দাদা বলেছেন, এখান থেকে আস্তে আস্তে পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে সেই রহস্যময় শক্তি। পুরো সৃষ্টিকে ধুলায় পরিণত করার আগে থামবে না ওটা।"

কথাটা শুনে যেন পেইন্টারের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। জাপানি বিজ্ঞানীদের পাঠানো নিউট্রিনো রিপোর্টের কথা মনে করলেন তিনি। তাদের ধারণা, উটাহ- এর বিস্ফোরণের ফলেই আইসল্যান্ডের আলোড়নের উৎপত্তি। খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে বুড়ো উটে ইন্ডিয়ানের ভবিষ্যৎবাণী।

হাতের কাগজটার দিকে ইঙ্গিত করল জর্ডান। "এটা পুটসিভদের চিহ্ন। দাদার মতে, এটাই আপনাদেরকে কাঙ্ক্ষিত স্থানে নিয়ে যেতে পারবে।"

কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুললেন পেইন্টার। হিজিবিজি কিছু লেখা আছে ওটায়। কিন্তু একেবারে মাঝখানে কালো কালিতে আঁকা ছবিটা দেখে তার হাঁটু কেঁপে উঠল। অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন সিগমা ডিরেক্টর।

পুটসিভদের চিহ্ন... চাঁদের ভেতর ছোট একটা পাচকোণা তারা।
গিল্ডের চিহ্নের মাঝখানেও এই একই জিনিস থাকে।
এটা কীভাবে সম্ভব?

অধ্যায় ২০

৩১ মে, দুপুর ২:৪৫
এলিরেই দ্বীপ, আইসল্যান্ড

বত্রিশ মিনিট...

ফোনের গায়ে আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল গ্রে-র হাতের আঙুলগুলো। কলটা কেটে দিয়েছে ক্যাট। এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে কোনও সাহায্য করা সম্ভব তো না ই, মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে আরেকটা খবরও দিয়েছে সে। আধঘন্টা পর বিস্ফোরিত হতে চলেছে এই হতচ্ছাড়া দ্বীপটা। তাঁর আগেই যেভাবে হোক, এখান থেকে পালাত হবে।

লজের খানিকটা সামনে, পাথরের বোল্ডারগুলোর আড়ালে পজিশন নিয়েছে আটজন কমান্ডোর সশস্ত্র দলটা। একটু আগে অবশ্য তারা জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরই আবার পিছিয়ে গিয়েছে। মনে হয়েছে যেন পেছন থেকে কেউ ডেকেছে ওদের।

"শালারা আসছে না কেন?" হাতের শটগানটা বাগিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল বুড়ো ওলি। মার খেয়ে চুপসে গেলেও, কথা শুনে মনে হচ্ছে, এখনও তার তেজ বিন্দুমাত্র কমেনি।

উত্তরটা শেইচানের মুখ থেকে বের হলো। "আমাদের মতো, তারাও হয়তো দ্বীপটার বিস্ফোরিত হওয়ার খবর জানতে পেরেছে। যতদূর বুঝতে পারছি, নিজেদের পালানোর একটা ব্যবস্থা হওয়ার আগপর্যন্ত আমাদের এখানেই আটকে রাখার প্ল্যান করেছে ব্যাটারা।"

তার কথা সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই যেন মাথার উপর থেকে হুম্প হুম্প আওয়াজ ভেসে এল। জানালা দিয়ে ঝুঁকে তাকাতেই দেখা গেল, লজ পেরিয়ে সামনের ঘেসো জমিটুকুর উপর দিয়ে একটা মাঝাই সাইজের ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে লোকগুলোর দিকে। পাথরের বোল্ডারগুলোর ফাঁকে ল্যান্ড করার মতো খোলা জায়গা খুঁজছে পাইলট।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুখ খুলল মঙ্ক। "হেলিকপ্টারটা খাসা কিন্তু, আমরা ওটাতে চড়তে পারলে মন্দ হয় না।"

গ্রে-র ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, সে ও এটাই ভাবছে।

"দেখ," চেঁচিয়ে উঠল শেইচান। "বোল্ডারগুলোর পাশে, আরও কিছু বন্ধু জুটেছে আমাদের।"

ঘাড় ঘোরাতেই দেখা গেল, টিএনটি বিস্ফোরণের জায়গাটা থেকে আরও কয়েকজন অস্ত্রধারী বেরিয়ে এসেছে। একজন ছাড়া সবার পরনেই আগের কমান্ডোদের মতো পোশাক। কিন্তু হাইকিং বুট, খাকি প্যান্ট আর জিপারখোলা জ্যাকেট পরে সবার আগে আগে হাঁটতে থাকা মধ্যবয়স্ক লোকটাকে দেখে সিভিলিয়ান বলেই মনে হচ্ছে। বুকে একটা ব্যাগপ্যাক জড়িয়ে ধরে রেখেছে সে। তার পেছন পেছন একটা স্ট্রেচার বয়ে আনছে চারজন সৈনিক। স্ট্রেচারে কয়েকটা ছোট ছোট পাথরের বাক্স সাজানো। একটা বাক্সের উপরদিক থেকে সোনালি রঙ ঝিলিক দিতে দেখল গ্রে। বোমা ফাটিয়ে অবশেষে জিনিসগুলো উদ্ধার করতে পেরেছে ওরা।

সামনের একজনের হাতের ইশারায় হেলিকপ্টারটা মাটিতে নামিয়ে আনল পাইলট।

"যা করার, তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। পালাচ্ছে ওরা।"

মাথা নাড়ল মঙ্ক। "চল, শুইয়ে দেয়া যাক ব্যাটাদের।"

পরিকল্পনা মোতাবেক লজের সামনের দুই জানালার ধারে পজিশন নিল ওলি আর মঙ্ক। গ্রে আর শেইচান দৌড় শুরু করল পেছনের দরজার উদ্দেশ্যে।

"প্রার্থনা কর, যেন বুড়োর কথাগুলো সত্যি হয়," দৌড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে বলে উঠল শেইচান।

ষাট বছর ধরে এখানে বাস করছে ওলি। ওর চেয়ে ভালোভাবে এই দ্বীপকে আর কেউ চেনে না। এমন একজনের কথার উপর ভরসা রাখাই যায়, ভাবল গ্রে।

একযোগে দরজা খুলে লজের পেছনদিকের খোলা জমিতে বেরিয়ে এল দু'জন। লজের কাঠামো কমান্ডোদের চোখ থেকে আড়াল করেছে ওদের। একদৌড়ে ঘেসো জমিটুকু পেরিয়ে সামনের উঁচু পাথরের বোল্ডারগুলোর আড়ালে এসে থামল গ্রে, শেইচানও সাথেই আছে।

একটু খুঁজতেই কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পাওয়া গেল- একটা গুহা। বোল্ডারের পেছনে থাকায়, দুপুরের রোদেও বেশ অন্ধকার দেখাচ্ছে গুহামুখ। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে সামনে এগোল গ্রে। একজন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত, তবে মাথা নিচু করে ঢুকতে হবে।

হাতে সময় খুব কম। শেইচানকে পেছনে থাকতে বলে গুহায় ঢুকে পড়ল গ্রে।

ওলির বক্তব্য অনুযায়ী, লজের নিচ দিয়ে গিয়ে, দ্বীপের উল্টোদিকের বোল্ডারগুলো পেরিয়ে উপরদিকে উন্মুক্ত হয়েছে সরু টানেলটা। জিনিসটা আসলে একটা লাভা টিউব, সমুদ্রের নিচ থেকে হাজার হাজার বছর আগে লাভা উদ্গীরিত হয়ে দ্বীপটা গঠনের সময়ই তৈরি হয়েছিল প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গটা। এটা ধরে এগোলে, হেলিকপ্টারটা এখন যেখানে আছে, তার একটু সামনে মাটি ফুঁড়ে বেরোনো যাবে। চটজলদি একটা মানচিত্রও এঁকে দেখিয়েছে বুড়ো। ভুল হওয়ার কোনও অবকাশ নেই।

মাথা নিচু করে যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে চলেছে দু'জন। বাতাসে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। জায়গায় জায়গায় বৃষ্টির পানি জমে আছে। গ্রে-র মনে হতে লাগল, অনন্তকাল ধরে হেঁটে চলেছে তারা। এ পথ যেন আর ফুরোবে না।

একটু পরেই থমকে দাঁড়াতে হলো ওদের। এখান থেকে চারভাগে ভাগ হয়ে সামনে এগিয়েছে টানেলটা। ক্যাপ্টেন হান্ডের বলা কথাটা মনে পড়ল গ্রে-র। দ্বীপটা নাকি ক্ষয়ে যাওয়া এক টুকরো পনিরের দলা। অবশ্য এরপর কোন পথে এগোতে হবে মানচিত্র এঁকে দেখিয়ে দিয়েছে বুড়ো ওলি- হাতের ডানদিক থেকে দ্বিতীয়টা। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বুড়ো কেয়ারটেকারের বাতলে দেয়া পথ অনুসরণ করল গ্রে।

কিন্তু কিছুদূর এগোনোর পর ঢালু হয়ে আসতে লাগল টানেলটা। দ্বিধা প্রকাশ পেল শেইচানের কণ্ঠে। "তুমি নিশ্চিত, এটাই আসল রাস্তা?"

জবাব না দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মনঃস্থির করল গ্রে। একটু পরই আবার উপরের দিকে উঠতে শুরু করল প্রাচীন সুড়ঙ্গ।

আরও কয়েক মিনিট পর হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। "মনে হয়, সারফেসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা," বলে উঠল শেইচান। এক মুহূর্ত পর অবশেষে টানেলের শেষ মাথায় সূর্যের আলো নজরে এল।

ফ্ল্যাশলাইটটা বন্ধ করে পিস্তল হাতে নিল গ্রে। বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গের খোলা মুখ দিয়ে।

প্রবেশপথের মতোই এদিকের গুহামুখটাও উঁচু উঁচু পাথরের বোল্ডারে আড়ালে ঢাকা। এজন্যই হয়তো কমান্ডোদের নজরে পড়েনি জায়গাটা। আর পড়লেও টানেলটার ব্যাপ্তি সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারেনি লোকগুলো। এবার সেই ভুলের খেসারত দেয়ার পালা।

মাত্র দশ গজ সামনেই মাটির উপর স্থির হয়ে আছে হেলিকপ্টারটা। ইঞ্জিন অবশ্য চালুই আছে। বোঝা গেল, ফড়িংটা ল্যান্ড করার পর খুব বেশি সময় পেরোয়নি। দুই পাশের দরজা খুলে ধরেছে দু'জন সৈন্য। ভেতরে ঢোকার জন্য বাকিরাও সামনেই অপেক্ষা করছে। সব মিলিয়ে বিশ জন।

স্ট্রেচারটা মাটিতে রাখা। একটা পাথরের বাক্স ভেঙে ভেতরের মহামূল্যবান জিনিসটা উন্মুক্ত করে দিয়েছে- সোনার ট্যাবলেট।

উটাহ- এর গুহাতেও নিশ্চয়ই এগুলোই ছিল, ভাবল গ্রে।

স্ট্রেচারের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সিভিলিয়ান লোকটা। কাছ থেকে এবার আরও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে তার চেহারা। লালচে চুল আর খোঁচা খোচা দাঁড়িতে কেমন যেন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। হেলিকপ্টারের দরজা পুরোপুরি খুলে যেতেই সামনে বাড়ল সে।

হেলিকপ্টারের পেছনে নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো লজটা। জানালায় চোখ রেখে গ্রে-র সিগনালের জন্য অপেক্ষা করছে মঙ্ক আর ওলি।

সময় নিয়ে সবার সামনে থাকা এক কমান্ডোর দিকে হাতের সিগ সাওয়ার পি২২৬ মডেলের পিস্তলটা তাক করল গ্রে। ম্যাগাজিনে .৩৫৭ ক্যালিবারের বারোটা বুলেট আছে। শেইচানেরও তাই। প্রতিটা বুলেট গুনে গুনে খরচ করতে হবে।

দম আটকে ট্রিগার টিপে দিল গ্রে... অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। আধপাক ঘুরে মাটিতে আছড়ে পড়ল তার শিকার। তবে সেটা দেখার জন্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে নেই সে, লোকটা মাটিতে পড়ার আগেই ট্রিগারের চাপে উড়ে গেছে পাশের আরেকজনের গলা। পাশ থেকে শেইচানের পিস্তলও গর্জে উঠেছে। একসাথে দু'জনকে শুইয়ে দিয়েছে সেও।

আঁতকে উঠেছে বাকি কমান্ডোরা। বুঝতে পারছে না, আচমকা এ কোন গজব নাজিল হলো তাদের উপর। গুলি কোন দিক থেকে আসছে সেটাও ঠাহর করতে পারছে না কেউ।

সাথে সাথে লজের জানালা থেকে অভ্যর্থনা জানাল বুড়ো ওলির শুটগান। রেঞ্জের বাইরে থাকলেও গুলির আওয়াজে কমান্ডোরা বুঝতে পারল, তাদের মৃত্যুদূত ওই লজেই ঘাঁটি গেড়েছে। সেদিকে মুখ করে পজিশন নিল সবাই। ভীত পাখির বাচ্চার মতো মাটিতে বসে মুখ লুকাল সিভিলিয়ান লোকটা।

পেছন থেকে গুলি করে আরও দু'জনকে শুইয়ে ফেলল গ্রে। কিন্তু শেইচানের রিফ্লেক্স তার থেকে অনেক বেশি। নিজের আট নাম্বার শিকারকে ধরাশায়ী করে ম্যাগাজিন খালি করল সে। সাথে সাথে ইজেক্ট বাটন টিপে ঢিকে নিল আরেকটা, তাক করল আরেক হতভাগার দিকে।

মঙ্ক আর ওলির মুহুর্মুহু গুলির সাথে হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ মিলে তাদের পিস্তলের শব্দকে আড়াল করছে।পায়ে পায়ে পেছনদিকে এগোতে থাকা দুই সৈন্যর খুলি উড়িয়ে দিল গ্রে। তারও ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেছে। এগিয়ে গিয়ে মৃত কমান্ডোদের একজনের রাইফেলটা তুলে নিল সে, তারপর সিলেক্টর ফুল অটোমেটিকে দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করল সামনের দিকে। পেছনদিকের বিপদ টের পেয়ে ছুটে গিয়ে পাথরের আড়াল নেয়া দু'তিনজন বাদে অক্কা পেল বাকিরাও। অন্য একটা রাইফেল তুলে নিয়েছে শেইচান। তবে পাথরের ছাল ওঠানো ছাড়া আর কিছু করতে পারল না তার বুলেটগুলো।

এখন প্রতিপক্ষ বলতে শুধু পাংশু চেহারার সেই সিভিলিয়ান। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আনাড়ি হাতে কোমরে আটকানো একটা পিস্তল খুলে আনার চেষ্টা করছ সে। এক সেকেন্ড পর শেইচানের রাইফেলের বাটের আঘাতে থেতলে যাওয়া মুখ নিয়ে হেলিকপ্টারের ভেতর উল্টে পড়ল লোকটা।

বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে পড়া কোমান্ডোদের উদ্দেশ্যে গুলি করলে থাকল গ্রে আর শেইচান। সেই সুযোগে লজ থেকে বেরিয়ে এল মঙ্ক আর বুড়ো কেয়ারটেকার। একযোগে হেলিকপ্টারে উঠে পড়ল সবাই।

এতোক্ষণ গুলির মুখে থাকলেও ইঞ্জিন যথেষ্ট পাওয়ার না পাওয়ায় উড়াল দিতে পারেনি পাইলট, এখন অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। শেইচানের রাইফেলের মুখে কন্ট্রোল স্টিকে থাবা বসাল সে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল গ্রে। বিপদসীমার আরও চার মিনিট বাকি।

কিন্তু জাপানি গবেষকদের ধারণা ভুল প্রমাণ করে আচমকা কেঁপে উঠল গোটা দ্বীপটা। গোঁত্তা খেয়ে খানিকটা উপরে উঠে গেল কপ্টারটা। সেই অবস্থাতেই ইঞ্জিনে ফুল পাওয়ার দিল পাইলট। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে নাক নিচু করে উপরে উঠতে লাগল যান্ত্রিক ফড়িং। খাবি খেতে খেতে বাতাসে কামড় বসাচ্ছে রোটরগুলো।

"গ্রে!" মঙ্কের চিৎকারে সম্বিত ফিরল গ্রে-র। জ্ঞান ফিরে পেয়ে খোলা দরজা দিয়ে লাফিয়ে পড়ছে সিভিলিয়ান লোকটা। ব্যাগপ্যাকটা এখনও বুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে সে।

কিন্তু গ্রে ও এতো সহজে ছাড়ার পাত্র না। এক হাতে ব্যাগের একটা স্ট্র্যাপ আঁকড়ে ধরল সে। লোকটার শরীরের টান সামলাতে না পেরে দরজা দিয়ে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে এল তার শরীর। ব্যাগের অন্য স্ট্র্যাপ ধরে জিনিসটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে সিভিলিয়ান।

হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে কয়েক ফুট নেমে এল ফড়িংটা। তাল সামলাতে না পেরে দরজা থেকে ছুটে গেল গ্রে-র হাত। শ্বাসরুদ্ধকর আধ সেকেন্ড পেরুনোর পর পায়ে টান অনুভব করল সে। এক পা আঁকড়ে ধরে ব্যাগসহ দু'জনের পতন রোধ করেছে মঙ্ক।

সাথে সাথে গ্রে-র কান ঘেঁষে একটা ফুলি বেরিয়ে গেল। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে নিচে তাকাতে সে দেখতে পেল, কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা খুলে নিতে সমর্থ হয়েছে জ্যাকেটপরা লোকটা। একহাতে ব্যাগ ধরে ঝুলতে ঝুলতে অন্যহাতে টিপে দিয়েছে সে। ফ্যাকাসে মুখটায় হিংস্র হাসি ফুটে আছে। আস্তে আস্তে সময় নিয়ে আবারও নিশানা ঠিক করল লোকটা। প্রমাদ গুনল গ্রে। এতো কাছ থেকে মিস করার প্রশ্নই আসে না। আগেরবার ঝাঁকিটা তার প্রাণ বাঁচালেও এবার আর শেষ রক্ষা হবে বলে মনে হয় না। দল আটকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলো সিগমা কমান্ডার।

বুম...

কান ফাটানো আওয়াজটা পেছনদিক থেকে এল।

চমকে উঠে ঘাড় ঘোরাতেই বুড়ো ওলিকে কেবিন থেকে ঝুঁকে থাকতে দেখল গ্রে। হাতে শোভা পাচ্ছে সেই শটগানটা। গুলি খেয়ে বেমালুম উড়ে গেছে ঝুলতে থাকা লোকটার মাথা। আস্তে আস্তে ব্যাগের স্ট্র্যাপ থেকে খসে গেল হাত, পাথুড়ে দ্বীপে আছড়ে পড়ল সে।

নিচে ততোক্ষণে বেশ জোরেশোরে কাঁপতে শুরু করেছে গোটা দ্বীপ। কড়াৎ আওয়াজে সাগরে হারিয়ে গেল দক্ষিণ দিকের একটা অংশ। বাকিটুকুও যে কোন মুহূর্তে উধাও হয়ে যাবে।

মঙ্কের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে হাচড়েপাচড়ে কপ্টারে উঠে এল গ্রে।

"প্রেশার হারাচ্ছি আমরা," সামনে থেকে চেঁচিয়ে উঠল শেইচান।

তবে সেদিকে খেয়াল নেই গ্রে-র। ওলির কাঁধ চাপড়াতে ব্যস্ত সে। এই মাত্র তার জীবন বাঁচিয়েছে বুড়ো। "ধন্যবাদ।"

লোকটা যেখানে আছড়ে পড়েছে, সেদিকে ইঙ্গিত করে কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো কেয়ারটেকার। "আমার গায়ে আঘাত করে কেউ আজ পর্যন্ত অক্ষত দেহে ফিরতে পারেনি।"

হঠাৎ ভুমিকম্পের গুড়গুড় আওয়াজ ছাপিয়ে নিচ থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। নিজেরাও বাঁচবে না বুঝতে পেরে শত্রুকে পালাতে বাধা দিচ্ছে পাথরের আড়ালে লুকানো কমান্ডোরা।

আবারও কেঁপে উঠল হেলিকপ্টারটা, এবং ক্রমাগত বাড়তে থাকল কাঁপুনি। এমনিতেই ঠিকমত উঠতে পারছিল না ফড়িংটা। গুলি খেয়ে সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে এবার।

ককপিটের হোল্ড থেকে মাথা বের করে চেঁচিয়ে উঠল শেইচান। অবশ্য বলার কোনও দরকার ছিল না। কথাটা আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে সবাই।

"টেইল রোটরে গুলি লেগেছে। ক্র্যাশ করতে চলেছি আমরা।"

অধ্যায় ২১

৩১ মে, সকাল ৯:০৫
সান রাফায়েল উচ্চভূমি, উটাহ

একমুঠো পিনন বাদাম হাতে নিয়ে বারান্দার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে কাই। হাঁ করে দাঁতের ফাঁকে চালান করে দিল একটা। নোনতা, মচমচে স্বাদ। পিনন নামের এক জাতের পাইন গাছের বীজ এগুলো। এখনও ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে একটা ট্রে হাতে নিয়ে বাদাম ভাজছে আইরিস।

কীভাবে বাদামগুলোকে না পুড়িয়ে ভাজা যায়, কাই-কে ডেকে তা দেখিয়েছেন মহিলা। কিন্তু সে জানে, আসলে তার মনোযোগ অন্যদিকে টেনে নিতে চাইছেন তিনি। তবে পুরোটা সময় ধুলো ওঠা ট্রেইলের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে সে। জর্ডানের সাথে কথা শেষ করার পর খুব একটা দেরি করেননি পেইন্টার। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন সাথে সাথে।

এসইউভি-তে হ্যাঙ্কের কুকুরটারও জায়গা হয়েছে, কিন্তু কাই-কে সাথে নেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি তিনি।

সে বুঝতে পারছে, এখানে থাকাটাই তার জন্য ভালো হবে। কিন্তু তবুও মন মানতে চাইছে না। সবাই বলে, সে বড় হয়ে গিয়েছে। তবে এখনও তার সাথে বাচ্চাদের মতো আচরণই করা হয়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরেকটা বাদাম মুখে পুরল কাই। সবসময় তো তার সাথে এমনটাই হয়ে এসেছে। বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব, তাকে পেছনে ফেলে চলে গিয়েছে সবাই। তাহলে পেইন্টারই বা এর ব্যতিক্রম হবেন কেন! রাগ দলা পাকিয়ে উঠতে লাগল তার বুকে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জর্ডান আপ্পাওয়ারা। পরনের স্যুট খুলে রেখেছে সে। এখন গায়ে শুধু একটা নীল টি শার্ট আর কালো জিন্স, পায়ে কাউবয় বুট। কোমরের বেল্টের বাকলটা বেশ বড়, মহিষের মাথা আকৃতির।

"তো, পেইন্টার ক্রো তোমার চাচা?" জানতে চাইল ছেলেটা।

"দূর সম্পর্কের।"

দরজা ছেড়ে বারান্দায় নেমে এল জর্ডান। তার হাতেও একমুঠো বাদাম। বারবার ফুঁ দিয়ে সেগুলোকে ঠান্ডা করছে ও। সরাসরি আইরিসের গরম ট্রে থেকে এগুলো নিয়ে এসেছে ছেলেটা, ভাবল কাই।

"কী করবে এখন?" আবারও প্রশ্ন করল জর্ডান। "এখানে বসে না থেকে থ্রি ফিংগার ক্যানিয়নে হাঁটতে যেতে পারি আমরা। অথবা ব্ল্যাক ড্রাগন ওয়াশেও যেতে

পারি। আইরিসের নাতিনাতনিরা তাদের মাউন্টেন বাইকগুলো রেখে গিয়েছে। ওগুলো চালাতে অবশ্য আমার বেশ ভালই লাগে।"

ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটার দিকে তাকাল কাই। তাকে বেশ সুদর্শনই বলা যায়। উঁচু গালের হাড়ের উপর নিষ্কম্প কালো চোখদুটোতে অবিরাম সারল্য খেলা করছে। জর্ডানও তার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে, বুঝতে পেরে লালচে ছোপ দেখা গেল কাই-এর গালে।

কিন্তু এটা কি ঠিক হবে?

ওয়াহইয়া-র তরুণ আইনজীবী শেইটন শ-এর কথা মনে করল সে। বেশ কাছাকাছি চলে এসেছিল ওরা দু'জন। এখন জর্ডানের সাথে মেলামেশ করলে কি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না?

ওয়াহইয়া-র কথা ভাবতেই জন হকস-এর ই মেইলটার কথা মনে পড়ল কাই-এর। ইতিমধ্যেই অনেক সমস্যায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সে। এখন তার পক্ষে নতুন করে কোথাও যাওয়া বা কিছু করা ঠিক হবে না।

"আমি বরং এখানেই থাকি," জবাব দিল সে। "যদি আঙ্কেল ক্রো ফোন করেন তাহলে..." অজুহাতটা তার নিজের কাছেই ফালতু বলে মনে হলো। তবে কথা না বাড়িয়ে বারান্দা ছেড়ে নেমে দাঁড়াল জর্ডান, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূর পাহাড়ের দিকে। সকালের আলতো রোদে মাটিতে তার ছায়া পড়ছে।

শেইটন বিপ্লবী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সবসময় নেটিভদের অধিকার আর মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকে সে। অপরদিকে জর্ডান শান্ত, সুস্থির। নিজের লোকজনের দেখভালের পাশাপাশি এই বয়সেই দাদার দায়িত্বকে নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। মনের অজান্তেই জর্ডানের সাথে শেইটনের তুলনা করতে শুরু করল কাই। পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। এসব কী ভাবছে সে! তাছাড়া জর্ডানের সাথে তার সাক্ষাতের এখনও একঘন্টাও পুরো হয়নি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকে গেল কাই।

এসব কী ভাবছি আমি!

অন্ধকার ঘরে, ল্যাপটপের পাওয়ার বাটনটা বিড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার জন্য স্যাটেলাইট সংযোগের পাশাপাশি ল্যাপটপটা আর একটা স্যাটেলাইট ফোন রেখে গিয়েছেন পেইন্টার।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ল্যাপটপ অন করে নিজের জিমেইল অ্যাকাউন্টে ঢুকে পড়ল কাই। ভয় হলো, জন হকস নতুন কোন বার্তা পাঠিয়েছে কি না। না, পাঠায়নি। আবারও আগের মেইলটা খুলে পড়া শুরু করল সে। বিবেকের তাড়নাই তাকে কাজটা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

পুরোটা মেইল আরেকবার পড়ার পর কষ্টের বদলে রাগ অনুভূত হলো তার। পেইন্টারের অবহেলা, জন হকস-এর ভুল বোঝাবুঝি...সব কেন তাকেই সহ্য করতে হবে? কী দোষ তার?

কোনও কিছু না ভেবেই রিপ্লাই বাটন টিপে দিল কাই। মনের ভার লাঘব করার জন্য একটা মাধ্যম চাই তার। দ্রুতবেগে কীবোর্ডে নেচে বেড়াতে লাগল দশটা আঙুল। মনের সব আকুতি, সব ক্ষোভ, সব হতাশা অক্ষর হয়ে ফুটে উঠতে লাগল ল্যাপটপের স্ক্রিনে। নিজের ছেলেবেলা, দুঃখকষ্ট, ওয়াহইয়া-র প্রতি আনুগত্য, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি সম্পর্কে বিশাল এক মেসেজ টাইপ করল সে। লেখা শেষ হওয়ার পর উপলব্ধি করল, দুই গাল চুইয়ে পড়ছে চোখের পানি।

মেইলটা পাঠানোর আগে আরেকবার ভাবল কাই। পেইন্টার তো বলেছিলেন কানেকশনটা নিরাপদ। কেউ এটা ট্রেস করতে পারবে না। আর সে তো তেমন কিছু করছে না। শুধু একটা ই-মেইল পাঠাচ্ছে, কী আর হবে!

আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলতে দুলতে সেন্ড বাটনটা টিপে দিল কাই।

সকাল ৯:১৮
সল্ট লেক সিটি, উটাহ

ই-মেইলটা আসার শব্দ শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন রেফ। হাতঘড়ির দিকে চোখ বুলাতেই বুঝতে পারলেন, কাঙ্ক্ষিত সময়ের আগেই পাখি খাঁচায় ধরা পড়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সবেমাত্র শাওয়ার নিয়েছেন, ভেজা চুল থেকে পানি চুইয়ে পড়ছে মেঝেতে। পরনে হোটেল রোব, পায়ে হালকা স্লিপার।

গোটা দলটাকে নিয়ে আগে থেকেই বুক করে রাখা গ্র্যান্ড আমেরিকা হোটেলের একটা প্রেসিডেনশিয়াল স্যুইটে এসে উঠেছেন রেফ। সল্ট লেক সিটির একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত বিলাশবহুল এই হোটেলটা। প্রতিবার এখানে আসার পরই নিজ বাড়িতে আছেন বলে মনে হয় তার। মার্বেল পাথরের বাথরুম, সতেরো শতকের আসবাবপত্র, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশস্ত জানালা...সব মিলিয়ে ইউরোপিয়ান ধাঁচে সাজানো স্যুইটটা তার জন্যই সবসময় বরাদ্দ থাকে।

মেইন রুমের একেবারে মাঝখানে, চেয়ারে বেঁধে রাখা লোকটার দিকে এগোলেন রেফ। পুরোপুরি উলঙ্গ সে, মুখে স্কচটেপ আটকানো। নাকের ফুটো বেয়ে সর্দি গড়িয়ে পুরো থুতনি লেপ্টে আছে। প্রতি মুহূর্ত বাতাসের জন্য খাবি খাচ্ছে হতভাগা লোকটা। ফাঁদে পড়া শেয়ালের মতো দেখাচ্ছে তাকে।

কিন্তু সে কোনও শেয়াল নয়। ভীত চড়ুইগুলোকে বাগে আনার জন্য বাজপাখি হিসেবে তাকেই ব্যবহার করেছেন রেফ।

ওয়াহইয়া-র সাথে কাই-এর সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে আগেই জানা ছিল তার। লোক লাগিয়ে সংগঠনটার প্রতিষ্ঠাতার অবস্থান খুঁজে বের করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। প্রায় একঘন্টা আগে, এয়ারপোর্টের পাশের একটা স্ট্রিপ ক্লাব থেকে হকস-কে ধরে এনেছে বার্ন। বোঝা গেল, নিজে মানবতাবাদী সংগঠন চালালেও, বিকিনি পরা সাদা চামড়ার মেয়েদের প্রতি খুব একটা অরুচি নেই লিডারের।

আবারও গুঙিয়ে উঠল লোকটা।

এক হাত তুলে তাকে তাকে থামতে ইশারা করলেন রেফ। "আহহা, মি. হকস! এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? বিশ্বস্ত বাজপাখির মতোই আমাদের সাহায্য করেছেন আপনি। তবে আগে শিকার পুরোপুরি সফল হোক। তারপর না আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা উঠবে।"

খব সহজেই ওয়াহইয়া লিডারের মুখ খোলানো গেছে। হাতের দুটো আঙুল মুচড়ে ভেঙে দেয়া ছাড়া আশান্দাকে বিশেষ কোনও ঝামেলা পোহাতে হয়নি। নিজের শরীরের হাড় খুব একটা শক্তপোক্ত না হওয়ায়, বেশ কয়েকবারই হাত-পায়ের আঙুল ভাঙার কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে রেফকে। ব্যথাটা জানা আছে তার।

কাই-এর ব্যাপারে সব তথ্য জেনে নেয়ার পর হকস-এর পার্সোনাল ইমেইল অ্যাকাউন্ট থেকে তাকে একটা মেইল পাঠিয়েছেন রেফ। আর তাতে কাজও হয়েছে। বেশ দ্রুত সাড়া দিয়েছে ভীত চড়ুই।

দুপুর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কাই তাদের ততোক্ষণ অপেক্ষা করায়নি।

"স্যার, মেইলটার পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি আমরা," রেফের উদ্দেশ্যে বলে উঠল এক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ।

ঘাড় ঘুরিয়ে আমেরিকান লোকটার দিকে তাকালেন রেফ। নিজ নামের আদ্যোক্ষর- টি.জে. বলে সম্বোধন করা হয় তাকে। অক্ষরদুটোর পুরো অর্থ কখনও জানার প্রয়োজন মনে করেননি তিনি। নাম যাই হোক, কাজ কেমন করে সেটাই আসল বিষয়।

একটা মিনি মেইনফ্রেম সার্ভারের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সে। ক্যাট-৬ কেবলের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড লাইনের সাথে সংযুক্ত আছে কম্পিউটারটা। তারা যা খুশি তাই করুক, রেফের দরকার ফলাফল।

"আপনার পার্সোনাল স্ক্রিনে লেখাগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি," আমারও বলে উঠল লোকটা।

"মেইলটা কোথা থেকে এসেছে, তা খুঁজে বের কর।"

"দেখছি আমরা, স্যার।"

'আমরা' শব্দটাতে রেফের নজর আটকে গেল। টি.জে. শুধুমাত্র একজন অ্যাসিস্টেন্ট। আসল যাদুকর যন্ত্রপাতির দঙ্গলের ভেতর বসে আছে। চঞ্চল প্রজাপতির মতো কীবোর্ডে নেচে বেড়াচ্ছে আশান্দার কালো হাতের আঙুলগুলো। স্ক্রিনে একের পর এক মানচিত্র, কোড, এলগরিদম উঠানামা করছে। বলা হয়ে থাকে, সাইবার জগতে আশান্দাকে আটকে রাখতে পারে, এমন কোন বাধা নেই।

নিজের মনিটরে ফুটে ওঠা কাই-এর মেসেজটা পড়া শুরু করলেন রেফ। বাচ্চা মেয়েটার আবেগ অনুধাবন করতে পেরে অজান্তেই কপালের একপাশ ডলতে লাগলেন তিনি। এক মুহূর্তের জন্য মনে কিছুটা সহানুভূতিও অনুভব করলেন। জন হকস-এর প্রতি বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেল মন। ছেলেমেয়েদের আবেগ নিয়ে খেলা করছে লোকটা। তাদেরকে ব্যবহার করে নিজের কাজ হাসিল করছে সে।

টি.জে.-র ডাকে সম্বিত ফিরল রেফের। "হয়ে গেছে প্রায়। আর অল্প একটু বাকি।"

মনিটর ছেড়ে আশান্দার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠলেন রেফ। "দেখাও...দেখাও তোমার ক্ষমতা।"

তবে আশান্দার ভঙ্গিতে কোনও পরিবর্তন এল না। নিজের কাজে ডুবে আছে সে।

"প্রায় পৌঁছে গেছে," উল্লসিত ভঙ্গিতে বলে উঠল টি.জে.।

একদৃষ্টে আশান্দার কাজ দেখছেন রেফ। তাদের মধ্যকার সম্পর্কটা আজ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি। কোনও নাম নেই এই সম্পর্কের। রেফের ন্যানি হিসেবে কাজ করেছে আশান্দা, প্রয়োজনের সময় নার্সও ছিল, স্নেহময়ী বোন, সফলতার অবলম্বন...ইত্যাদি নানা ভূমিকায় রেফের জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে সে। সবসময়ের বিশ্বস্ত সঙ্গী। নিজের মনের আশা, ভরসা, ভয়, কল্পনা, নিরাপত্তা...সকল বিষয় তার সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছে রেফ। এমনকি ভাগাভাগির বিষয়টা শুধু মনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দৈহিক দিক থেকেও ঘটেছিল। তবে মাত্র হাতেগোনা কয়েকবার। প্রতিবন্ধিতা আস্তে আস্তে রেফের পৌরুষকেও গ্রাস করে নিয়েছে। নপুংশক বানিয়ে দিয়েছে তাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কীবোর্ড টেপা বন্ধ করল আশান্দা।

উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল টি.জে.। "ও পেরেছে!"

জবাবে মুচকি হাসলেন রেফ। আবারও আশান্দার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠলেন তিনি। "খুব ভালো।"

ততোক্ষণে মনিটরে ভেসে থাকা গ্লোবটা ঘুরতে শুরু করেছে। কয়েক মুহূর্ত পর উটাহ- এর একটা জায়গাকে চিহ্নিত করল লাল একটা বিন্দু। স্ক্রিনে নিজের নাম দেখে আরও চওড়া হলো রেফের হাসি।

"সান রাফায়েল," বিড়বিড় করে বলে উঠলেন তিনি। "বাহ!"

পরমুহূর্তেই জন হকস-এর দিকে ঘুরে গেল তার দৃষ্টি।

চড়ুইকে পাওয়া গেছে। এবার বাজের পালা।

পায়ে পায়ে উলঙ্গ লোকটার দিকে এগিয়ে গেলেন রেফ। তাকে সামনে আসতে দেখে দূর্বল চোখজোড়ার দৃষ্টি যেন আরও ভীত হয়ে এল।

"মনে হয়, আমাদের বাজপাখির কাজ ফুরিয়েছে," বলে নিজের সরু হাতজোড়া দিয়ে হকস-এর গলাটা পেঁচিয়ে ধরলেন রেফ। সিনেমায় দেখে যতটা সহজ মনে হয়, কাজটা আসলে তার চেয়ে অনেক কঠিন। আর এরকম সরু হাড় নিয়ে তো...

গোঙাতে গোঙাতে ক্রমাগত ঝাঁকি খেতে লাগল হকস, তবে চেয়ারে শক্তভাবে বাঁধা থাকায় কাজের কাজ কিছুই হলো না। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে এল ওয়াহইয়া লিডারের শরীরটা।

হাত ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রেফ। অধীনস্থদের চোখে সম্ভ্রম দেখার জন্য কখনও কখনও নাটের গুরুকেও ঘাম ঝরাতে হয়, ভাবলেন তিনি।

"চলো আশান্দা, কাজে নামা যাক।"

অধ্যায় ২২
৩১ মে, দুপুর ৩:১৯
এলিরেই দ্বীপ, আইসল্যান্ড

ককপিটের পেছনে উবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে। শেইচানও তার পাশেই আছে। আতঙ্কের আতিশয্যে তার হাত আঁকড়ে ধরে আছে মেয়েটা।

চড়কির মতো ক্রমাগত ঘুরছে হেলিকপ্টারটা। নিচে, ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া দ্বীপের ফাঁকফোকর থেকে অনবরত ধোঁয়া উঠছে। দাঁতে দাঁত চেপে কন্ট্রোল স্টিকটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে পাইলট। সে ও শত্রুদের একজনই ছিল, কিন্তু এখন বাকি সবার সাথে তার ভাগ্যও জড়িয়ে আছে।

"মরতে চলেছি আমরা!" হতাশায় চেঁচিয়ে উঠল পাইলট। "আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব না!"

আবারও গর্জে উঠল দ্বীপটা। মাঝখানের পাথরের চাঁই উধাও হয়ে একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ উঁকি দিচ্ছে এখন। যার মানে দাঁড়ায়, সী-বেড পেরিয়ে ভূগর্ভস্থ লাভা টিউবে ছিদ্র করে ফেলেছে দ্বীপে লুকানো রহস্যময় জিনিসটা। ভক করে একদলা গলিত পাথর উঠে এল নতুন জন্ম নেয়া আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে। সাগরের ঠান্ডা পানিতে গরম পাথরের স্পর্শে গলগল করে ধোঁয়া উঠতে লাগল। সেই সাথে পোড়া ছাইয়ের স্তুপ তো আছেই।

মনে হচ্ছে যেন নরক নেমে এসেছে পৃথিবীতে।

এখন আপাতত সাগরই একমাত্র যাওয়ার মতো জায়গা। কিন্তু সেখানেও ওত পেতে আছে মৃত্যু। বরফ শীতল পানিতে কোন মানুষই কয়েক মিনিটের বেশি বেঁচে থাকতে পারবে না। ধোঁয়ায় ঘিরে রেখেছে ফড়িংটাকে। এর মাঝেই চোখ সরু করে ককপিটের কাঁচ ভেদ করে সামনের দিকে তাকাল গ্রে, কিছু একটা অবলম্বন চাই তাদের।

"ওই যে, ওখানে!" আঙুল তুলে ডানদিকে ইশারা করল গ্রে। "দ্বীপের দক্ষিণ দিকে।"

ইশারা অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল পাইলট। নীল সাগরে ছোট্ট একটা সাদা আকৃতি দেখা যাচ্ছে। "কী ওটা?"

"একটা বোট! এটা সম্ভবত ক্যাপ্টেন হান্ডের সেই মাছধরা ট্রলারটা। ওটার যথাসম্ভব কাছে ক্র্যাশ করুন আপনি," পাইলটকে নির্দেশনা দিল গ্রে।

"দেখতে পেয়েছি," জবাব দিল লোকটা। "কিন্তু কাজটা করা যাবে বলে মনে হয় না। এখন যে উচ্চতায় আছি তাতে দ্বীপটা অতিক্রম করতে পারব কি না তাই বুঝতে পারছি না।"

একহাতে কন্ট্রোল স্টিক ধরে অন্যহাতে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের উপর ঝুঁকে পড়ল পাইলট। খুব ভালো করেই জানে, গ্রে-র কথামতো বোটটার কাছে পৌছানো যাবে না। বাতাসে কামড় বসাতে পারছে না রোটরগুলো। ক্রমাগত নিচে নামছে হেলিকপ্টারটা।

"নাহ...পারব না।" ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বলে উঠল সে।

আবারও বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল দ্বীপের ধ্বংসাবশেষ থেকে। গলগল করে কালো ধোঁয়া উঠে এসে আচ্ছন্ন করে ফেলল ককপিটের সামনের জানালা। নিচ থেকে পানির ফোয়ারা ছিটকে উঠে হেলিকপ্টারের তলায় আঘাত করল।

এগিয়ে গিয়ে কো পাইলটের সিটে বসে পড়ল গ্রে। আর কিছু না হোক, অন্তত কন্ট্রোল স্টিক ধরে খানিকটা ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা যাক।

"আবারও পাওয়ার হারাচ্ছি আমরা," চেঁচিয়ে উঠল পাইলট।

এক কদম পিছিয়ে এল গ্রে। "যা করা যায়, করুন।"

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে উপরে উঠতে লাগল ফড়িংটা। সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল মঙ্ক। "উপরে উঠছি আমরা!"

কিন্তু এক মুহূর্ত পরই তার ভুল ভাঙল। হেলিকপ্টারটা উপরে উঠছে না, বরং দ্বীপটাই তলিয়ে যাচ্ছে।

বিরাট আকারের একটা পাথরখন্ড লাফিয়ে উঠল আকাশে। সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য হেলিকপ্টারটাকে কাত করে ফেলল পাইলট। আঁতকে উঠে সিট খামচে ধরল শেইচান। দ্বীপের সাথে পাল্লা দিয়ে নিচে নামছে ফড়িংটা। খোলা সাগরে পৌছাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।

আর একটু...আর একটু... নাক নিচু করে একটা গোত্তা খেল কপ্টারটা, এক সেকেন্ড পর আছড়ে পড়ল হিমশীতল সাগরে।

দুপুর ৩:২২

কালো সাগরকে তীরবেগে উপরে উঠে আসতে দেখছে শেইচান।

বুম...

দ্বীপের দিক থেকে আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দে হেলিকপ্টারটার পানিতে আছড়ে পড়ার আওয়াজটা চাপা পড়ে গেল। লোনা পানি কাটতে কাটতে মন্থর হয়ে এল ঘুরন্ত রোটরের গতি। পানির সাথে সংঘর্ষের সময় সিটবেল্ট ছিঁড়ে উইন্ডশিল্ডে বাড়ি খেয়েছে গ্রে। তার কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখা গেল।

"বেরিয়ে যান," এটাই ছিল পাইলটের মুখ দিয়ে বেরোনো শেষ চিৎকার। ভাঙা উইন্ডশিল্ডের লম্বা একটা কাঁচ ঢুকে গেল তার গলায়। খাবি খেতে খেতে পানিতে মখ গুঁজল হতভাগ্য লোকটা।

আস্তে আস্তে হিমশীতল পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টারটা। ওলিকে সিটবেল্ট থেকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করছে মঙ্ক। সংঘর্ষের ধাক্কা সামলাতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেছে বুড়ো কেয়ারটেকার। বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

কোনওমতে নিজের সিটবেল্টটা খুলল শেইচান। ইতিমধ্যে পানির বেশ কয়েক ফুট নিচে চলে এসেছে কপ্টারটা। ককপিটের সিলিং-এ বাঁধা একটা জালের সাথে জড়িয়ে গেছে গ্রে। এক হাত বাড়িয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করল মেয়েটা। কিন্তু ফসকে গেল হাত।

ঠান্ডা পানির স্রোত তাকে ঠেলে কপ্টারের অন্যপ্রান্তে নিয়ে এল। খোলা দরজাটা একেবারে সামনেই। মরিয়া হয়ে আরেকবার গ্রে-কে আঁকড়ে ধরতে চাইল সে। কিন্তু এবারও চেষ্টাটা বিফলে গেল।

গ্রে...

দম আটকে আসছে। তার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে খোলা দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল শেইচান। বেশ নিচে নেমে এসেছে কপ্টারটা। জানে না, দম বাকি থাকতে থাকতে উপরে পৌছাতে পারবে কি না। দরজার একটা ধাতব পাতে আটকে গেল শেইচানের পা। জোরে ঝাঁকি দিতেই ধারালো কিছু একটাকে নিজের উরুতে গভীরভাবে আঁচড় কাটতে অনুভব করল সে। মনের পুরো শক্তি কাজে লাগিয়ে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করলে শেইচান, উঠতে শুরু করল উপরের দিকে।

এক মুহূর্ত পর নিচের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, অতলে হারিয়ে যাচ্ছে কপ্টারটা। গ্রে, মঙ্ক, বুড়ো ওলি...কাউকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল না। ঠান্ডায় অসাড় হয়ে আসছে হাত-পা। অসীম দূরত্ব বলে মনে হচ্ছে সারফেসটাকে। বুঝতে পারছে, আর বেশিক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে না সে। শীঘ্রই হার মানতে হবে হিমশীতল পানির কাছে।

হঠাৎ কালো একটা আকৃতি মাথার উপরে থাকা সূর্যটাকে ঢেকে দিল। কোমরেও ঘসা খেল ভারী কিছু একটা। সম্বিত ফিরতেই চোখের সামনে দিয়ে ত্রিকোণাকার কালো একটা পাখাকে অতিক্রম করে যেতে দেখল শেইচান।

অর্কা...

পায়ের ক্ষত থেকে বেরিয়ে আসা রক্তই প্রাণীগুলোকে আকৃষ্ট করেছে।

এগিয়ে এসে পায়ে কামড় বসালো একটা কিলার হোয়েল। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তেই চেঁচিয়ে উঠল শেইচান। ফাঁক পেয়ে পেটে ঢুকে গেল কিছু পানি।

জ্ঞান হারানোর ঠিক আগমুহূর্তে, উরুর চামড়া পেরিয়ে দুই সারি ধারালো দাঁত মাংসে প্রবেশ করার অনুভূতি পেল সে।

দুপুর ৩:২৪

দম আটকে গায়ে জড়িয়ে যাওয়া জাল ছাড়ানোর চেষ্টা করছে গ্রে। প্রায় অসাড় হয়ে আসা হাতের আঙুলগুলো বলতে গেলে কোন কাজেই আসছে না। অবশেষে পায়ের একটা জোরালো লাথিতে জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সফল হলো সিগমা কমান্ডার।

ককপিট থেকে বেরিয়ে পেছনের প্যাসেঞ্জার কেবিনে চলে এল গ্রে। বুড়ো ওলিকে ইতিমধ্যে সিট থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে মঙ্ক, এখন দেয়ালে আটকানো একটা প্যাকেট খোলার চেষ্টা করছে সে।

হাত বাড়িয়ে সিভিলিয়ান লোকটার কাছ থেকে পাওয়া ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল গ্রে। তারপর মঙ্ক আর বুড়ো ওলিকে নিয়ে দরজা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। মঙ্কের হাত থেকে রাবারের প্যাকেটটা নিয়ে নিল সে। ইতিমধ্যে কপ্টারের সাথে অনেক .নিচে চলে এসেছে ওরা। এমন ঠান্ডা পানিতে নিজে থেকে সাঁতরে উপরে ওঠা সম্ভব না। সেই সাথে বাড়তি বোঝা হিসেবে ওলি তো আছেই।

কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই তার জীবন বাঁচিয়েছে বুড়ো। এখন সেই উপকারের প্রতিদান দেয়ার সময়। মঙ্ককে একহাতে বুড়োকে ধরতে ইশারা করল গ্রে, প্রস্থেটিক হাতে ধরিয়ে দিল প্যাকেট থেকে বেরিয়ে আসা দড়িটা।

রাবারের প্যাকেটের একদিকের কর্ডটা টান দিয়েই সাথে সাথে মঙ্কের কোমরের বেল্ট আঁকড়ে ধরল গ্রে।

জিনিসটা আসলে একটা ইনফ্লেটেবল রাবারের নৌকা। ইমারজেন্সি লাইফ সাপোর্ট হিসেবে প্রতিটা ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টারের ভেতরই থাকে এগুলো। ভেতরের ক্যানে উচ্চচাপে সংরক্ষিত বাতাসে ফুলে উঠতে শুরু করেছে বোটটা। সেই সাথে ওদের সবাইকে নিয়ে উঠতে শুরু করেছে উপরদিকে।

ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে শরীর। অক্সিজেনের অভাবে অন্ধকার হয়ে আসছে দৃষ্টি। গ্রে বুঝতে পারছে না, কতক্ষণ এভাবে টিকে থাকতে পারবে তারা।

শ্বাসরুদ্ধকর কয়েক মুহূর্ত পর, কর্কের মতো সারফেস পেরিয়ে লাফিয়ে উঠল সবাই। পরক্ষণেই রাবারের বোটটা সমেত আছড়ে পড়ল পানিতে। সম্বিত ফিরে পেয়ে বুড়োর অচেতন শরীরটা বোটে তুলে দিল মঙ্ক, নিজেও উঠে পড়ে গ্রে-র উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিল।

বোটে উঠতে উঠতে কয়েকশো গজ দূরে দ্বীপের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাল গ্রে। বেশিরভাগ অংশই এখন পানির নিচে হারিয়ে গেছে। বাকি অংশটুকুর উপরিভাগে জ্বলন্ত লাভা দেখা যাচ্ছে। ঠান্ডা পানির স্পর্শে হিসশিস শব্দে ধোঁয়া উড়াচ্ছে তপ্ত লাভার স্রোত। ক্রমাগত ছাই বেরিয়ে আসছে সদ্যোজাত আগ্নেয়গিরিটার জ্বালামুখ দিয়ে।

নিজেদের বোটের দিকে নজর ফেরাল গ্রে। একপাশে একটা ইলেকট্রনিক ব্লিপার মিটমিট করছে। ক্ষীণ হৃৎস্পন্দন ছাড়া জীবনের-কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওলির শরীরে। মনে হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়িই সবকিছুর উর্ধ্বে চলে যাবে বুড়ো।

কিন্তু গ্রে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। এ সংক্রান্ত মেডিকেল ট্রেনিং নেয়া আছে তার। কিছুক্ষণ বুকে-পেটে চাপ দেয়ার পরও কাজ না হওয়ায়, বুড়োর মুখে মুখ রেখে বাতাস ঢোকাতে শুরু করল সে।

একপাশে উদ্ধার করে আনার ব্যাগপ্যাকটা পড়ে আছে। কী আছে এটার ভেতর? গুরুত্বপুর্ণ কিছু না হলে নিশ্চয়ই সিভিলিয়ান লোকটা এটা তাদের হাত থেকে দূরে রাখার জন্য জীবন দিতে চাইত না।

শেইচানকে নিজেদের আগেই কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল সে। কোথায় গেল মেয়েটা? ঠান্ডা পানি ওকে কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচতে দেবে না। একটা দ্বীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজের কাজে মন দিল গ্রে।

বুম শব্দ করে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে গলিত পাথরের দলা ছিটকে বেরিয়ে এল। দ্বীপ আর বোটের মাঝামাঝি অংশের পানিতে মুখ গুঁজল জ্বলন্ত লাভা।

পরক্ষণেই মৃদু কাশির আওয়াজে সম্বিত ফিরল গ্রে-র। পানি বেরিয়ে আসছে ওলির নাকমুখ দিয়ে। জ্ঞান ফিরে পেয়েই চোখের সামনে ওই অগ্নুৎপাতের দৃশ্য দেখতে পেয়েছে বুড়ো।

"জানতাম, নরকে যাব আমি," কাঁপা কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল সে।

হেসে উঠে তার পিঠ চাপড়ে দিল মঙ্ক। "তোমার সেই আশা এখনও পূরণ হয়নি হে বুড়ো।"

ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল ওলি। "তাই নাকি?"

কিন্তু জবাবে মঙ্ক কিছু বলার আগেই আবারও কেশে উঠল পেছনের আগ্নেয়গিরি। গরম পাথরের টুকরো আর ছাইয়ের দলা ঝরে পড়তে লাগল পানিতে। এক টুকরো গরম পাথর বোটে একপ্রান্তে পড়তেই ফুটো হয়ে গেল রাবারের প্যাড। হিসহিস শব্দে বেরোতে লাগল বাতাস।

আঁতকে উঠল গ্রে। "দ্বীপ থেকে আরও দূরে সরে যেতে হবে আমাদের। চল, হাত দিয়ে বৈঠা বাওয়া যাক।"

"অথবা আরও বড় একটা বাহন পেলে কেমন হয়?" তার পেছনদিকে ইঙ্গিত করে বলে উঠল মঙ্ক।

আগ্নেয়গিরির হিসিহিস ছাপিয়ে একটা সাইরেনের আওয়াজ ঢুকল গ্রে-র কানে।

ক্যাপ্টেন হান্ডের সেই মাছধরা ট্রলারটা।

রাবারের ডিঙির প্রান্ত ঘেঁষে ব্রেক কষল এগ। ডেক থেকে হাস্যজ্জ্বল মুখে উঁকি দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন হান্ড। "আপনারা দেখি পুরো দ্বীপটাকেই উড়িয়ে দিয়েছেন!"

"আমাদের খুঁজে পেলেন কীভাবে?" ডেকে উঠে আসতে আসতে জানতে চাইল গ্রে।

"ওই যে," রাবারের ডিঙিটার ব্লিপারের দিকে ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন। "তাছাড়া আপনাদের পাওয়া আগে জায়গাটা ছেড়ে যেতে রাজি হচ্ছিল না সে।"

কে?

প্রশ্নটা মুখে উচ্চারণ করার আগেই হুইলহাউজ থেকে কম্বলমোড়া একটা অবয়বকে বেরিয়ে আসতে দেখল গ্রে, তার এক পায়ের হাঁটু থেকে উরু পর্যন্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা।

শেইচান!

মেয়েটাকে দেখে গ্রে-র চোখেমুখে উল্লাস যেন ফেটে পড়তে লাগল। মঙ্ককেও বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

"আশ্চর্যজনক ব্যাপার," ব্যাখ্যা করতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। "এখানে আসার সময় দেখা সেই কিলার হোয়েলের গ্রুপটার কথা মনে আছে? মাছ ধরার সময়, বোটের পাশ ঘেঁসেই খেলছিল ওগুলো। কিন্তু দ্বীপটা বিস্ফোরিত হওয়ার পরপরই ডুব দেই সবাই, কিছুক্ষণ পর আপনাদের ওই সঙ্গীকে নিয়ে ভেসে ওঠে।"

গ্রে-র আগেই জানা ছিল, প্রাণীগুলোর কিলার হোয়েল নামের 'কিলার' অংশটা আসলে অতিরঞ্জন ছাড়া কিছু না। কখনও কোনও মানুষের উপর হামলা করতে শোনা যায়নি অর্কাদের। প্রজাতিগত দিক দিয়ে ডলফিনদের স্বগোত্রীয় ওগুলো। ডলফিনদের মতোই মানুষদের সাথে খেলতে পছন্দ করে অর্কারা। তাছাড়া এই বোটটাকে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল গ্রুপটা।

হয়তো আজ শেইচানকে ফিরিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন হান্ডের কাছ থেকে পাওয়া খাবারের ঋণ পরিশোধ করল প্রাণীগুলো।

পায়ে পায়ে তাদের দিকে এগিয়ে এল শেইচান। "নিজে থেকেই উপরে উঠে আসতে পারতাম আমি," কপট রাগ ফুটে উঠেছে তার গলায়।

শ্রাগ করলেন হান্ড। "তোমাকে ডুবতে দেখে তিমিগুলোর অন্তত ওটা মনে হয়নি, ডার্লিং।"

জবাবে নাক দিয়ে ঘোঁত করে উঠল মেয়েটা।

"আপনাদের এই বুড়োর অবস্থা খুব একটা সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না। সবার জন্য গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করছি আমি," বলে ছেলেকে নিয়ে হুইলহাউজের দিকে এগোলেন ক্যাপ্টেন হান্ড।

রেলিং- এ ভর দিয়ে দ্বীপের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাল গ্রে। শেইচানও যোগ দিল তার সাথে।

"ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ," বলে উঠল এয়েটা। "কিন্তু হাল ছাড়তে মন সায় দেয়নি।"

"ধন্যবাদ," মুচকি হাসল গ্রে। "ক্যাপ্টেনকে আটকে রেখে আমাদের সবার প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি।"

গ্রে-র চোখে চোখ রাখল শেইচান। অসীম কৃতজ্ঞতা খেলা করছে গভীর মণি দুটোতে। কয়েক মুহূর্ত চুপ কথা থাকল দু'জনেই।

"ওই ব্যাগটা খুলেছ?" প্রশ্নটা শুনে সম্বিত ফিরল গ্রে-র।

ঢেকে রাখা ব্যাগপ্যাকটার দিকে ঘুরে গেল তার নজর। "না তো। সময়ই পাইনি।"

এগিয়ে গিয়ে ব্যাগের চেইনটা ফাঁক করল গ্রে। ভেতরে তেমন কিছু নেই। কয়েকটা ভেজা টি শার্ট, কলম, ভিজে চুপসে যাওয়া একটা নোটপ্যাড...কিন্তু সবকিছুর নিচে, একটা প্লাস্টিকের পানিরোধক ব্যাগ দেখতে পেয়ে ঝুঁকে পড়ল দু'জনই।

"কী এটা?"

"মনে হচ্ছে, একটা...ডায়েরী," বলতে বলতে সাবধানে ব্যাগটা বের করে আনল গ্রে।

লেদারের কভারটা ফাঁক করতেই দেখা গেল, কালের আঁচড়ে মলিন হয়ে গেছে ভেতরের পৃষ্ঠাগুলো। লেখার পাশাপাশি কিছু ছবিও নজরে পড়ল। বোঝা গেল, জিনিসটা কারও ব্যক্তিগত ডায়েরী।

"ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা," পৃষ্ঠা উল্টানোর ফাঁকে মন্তব্য করল গ্রে।

প্রথম পৃষ্ঠায় ক্যালিগ্রাফির মতো দুটো হরফ আঁকা।
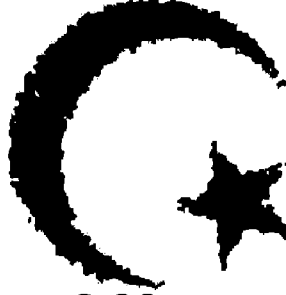
"এ.এফ." বলে শেইচানের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল গ্রে।

ডায়েরীটার মালিককে চিনতে পেরেছে দু'জনেই।

আরচার্ড ফোরটেস্কু।

অধ্যায় ২৩
৩১ মে, সকাল ১০:১২
ফ্ল্যাগস্টাফ, অ্যারিজোনা

একদৃষ্টে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে আছেন পেইন্টার। মধ্যদুপুরের রোদে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চারদিকের উসর প্রকৃতি। জায়গায় জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেজ ঝোপ আর ক্যাকটাস।

হাইওয়ে-৮৯ ধরে গাড়ি ছোটাচ্ছে কোয়ালস্কি। ফ্ল্যাগস্টাফ ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে গোটা দলটা। পনেরো মিনিট আগে একটা চার্টার করা বিমানে অ্যারিজোনায় পৌঁছেছে সবাই। শহর থেকে তাদের গন্তব্য- সানসেট ক্রেটার ন্যাশনাল পার্কে পৌঁছাতে চল্লিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে।

"ফায়ার রোড-৫৪৫ ধরে এগোতে হবে এখন। পার্কের গেটে ন্যান্সি টিসো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে," বলে উঠলেন হ্যাঙ্ক। কাউচকে নিয়ে পেছনের সিটে বসে আছেন প্রফেসর।

তাদের কন্ট্যাক্ট- ন্যান্সি টিসো একজন নাভাজো মহিলা। অবশ্য তার আরও একটা পরিচয় আছে। সানসেট ক্রেটার ন্যাশনাল পার্কে কর্মরত একজন রেঞ্জার সে। এখানে আসার আগে পরিচিত কয়েকজনকে ফোন করেছেন হ্যাঙ্ক। তাদের মধ্যে একজন ন্যান্সির সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে তাকে। এই এলাকাটা ভালো করে চেনা লোকজনের ভেতর সে অন্যতম।

বিমানে আসতে আসতে পুরো অঞ্চল সম্বন্ধে বেশ পড়াশোনা করেছেন পেইন্টার। বলার সাথে সাথে ক্যাট ওয়াশিংটন থেকে একগাদা তথ্য পাঠিয়ে দিয়েছিল। তবে গান্ডেপিন্ডে সব গেলার পরিবর্তে শুধু প্রধান বিষয়গুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন সিগমা ডিরেক্টর।

আইসল্যান্ডের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কেও তাকে জানিয়েছে ক্যাট। বিস্ফোরণের ফলে সাগরতলের দুটো সুপ্ত আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফুটো হয়ে গেছে ভূগর্ভস্থ ম্যাগমা চেম্বার। ক্রমাগত সীবেডে লাভার স্তর উগরে চলেছে সদ্যোজাত আগ্নেয়গিরি দুটো। বাতাসে ভেসে ভেসে ইউরোপের দিকে এগোচ্ছে ছাইয়ের স্তূপ। আকাশ পরিষ্কার না থাকায় কয়েকটা এয়ারপোর্টও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে এতোকিছুর মধ্যে একমাত্র ভালো খবর হলো, ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী আরচার্ড ফোরটেস্কুর একটা পুরনো ডায়েরী খুঁজে পেয়েছে গ্রে। জিনিসটা নিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে সে।

"ওই যে," আঙুল দিয়ে সামনের দিকে ইশারা করলেন হ্যাঙ্ক। "ফায়ার রোড-৫৪৫ এর বাঁক।"

"দেখতে পাচ্ছি," তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল কোয়ালস্কি। "অন্ধ নই আমি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিটে হেলান দিয়ে বসলেন প্রফেসর। ঘুমের স্বল্পতায় তাদের সবার ব্যবহারেই কমবেশি পরিবর্তন এসেছে। নীরবতা নেমে এল গোটা গাড়িতে। হাইওয়ে ছেড়ে একটা দুই লেনের সড়কে বেরিয়ে এসেছে তাদের এসইউভি। আর খুব বেশি দূরে নেই গন্তব্য।

সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সানসেট ক্রেটার। পাইন আর অ্যাসপেন গাছে ভরা উপত্যকা ছাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে হাজার ফুট লম্বা মোচাকৃতির মৃত আগ্নেয়গিরিটার জ্বালামুখ। এক সময় এই গোটা অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন আকারের ছয় শতাধিক আগ্নেয়গিরি সক্রিয় ছিল। প্রায় সবগুলোই এখন মৃত। তবে জ্বালামুখগুলোর নিচে, ভূপৃষ্ঠের খুব কাছেই ম্যাগমা টিউবগুলো বহাল তবিয়তে অবস্থান করছে।

হাজার বছর আগে এখানে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্প আর লাভাস্রোতের বীভৎসতা কল্পনা করলেন পেইন্টার। মনের চোখে দেখতে লাগলেন, গলগল করে জ্বলন্ত গলিত পাথর আর ধোঁয়ার সারি উঠে আসছে প্রধান জ্বালামুখটা দিয়ে। আসলেই একসময় এখানে হয়েছিল এসব। আশেপাশের আটশো মাইল আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তপ্ত ছাই।

ক্রমাগত কাছে চলে আসায় চোখের সামনে আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল উঁচু পাহাড়টা। একটা কুসংস্কার প্রচলিত আছে এই মৃত আগ্নেয়গিরিটাকে ঘিরে। সূর্যোদয়ের সময় চূড়ার মোচাকৃতি অংশে নীল, হলুদ, বেগুনি ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের ছোপ দেখা যায়। বেলা গড়ানোর সাথে সাথে আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসে এই রঙের খেলা। পড়ন্ত বিকেলে মনে হয়, বরফে ঢেকে গেছে পুরো পাহাড়চূড়া। এজন্যই মূলত পাহাড়টার নাম সানসেট ক্রেটার রাখা হয়েছে। কিন্তু পেইন্টার খুব ভালো করেই জানেন, এগুলো কোনও জাদুকরের জাদু না। শেষবার অগ্নুৎপাতের সময় আগ্নেয়গিরির মৃত জ্বালামুখে জমে থাকা জারিত লোহা আর সালফারই এই রঙের পেছনের কারণ।

"এই জায়গাটা সম্পর্কে হোপিদের মাঝে একটা কথা প্রচলিত আছে," ব্যাকসিট থেকে বলে উঠলেন হ্যাঙ্ক। "বলা হয়ে থাকে, অনেক অনেক কাল আগে এখানে আগুন আর গলিত পাথর বর্ষিত করে একদল খারাপ লোককে শাস্তি দিয়েছিলেন দেবতারা।"

"জর্ডানের দাদার বক্তব্যকেই সমর্থন করে কথাটা," জবাব দিলেন পেইন্টার। "তাছাড়া এখানে শেষ অগ্নুৎপাত ঘটেছিল এক হাজার চৌষট্টি সালে, আনাসাযিদের উধাও হওয়ার আমলেই।"

"তা ঠিক," সায় দিলেন প্রফেসর। "তবে লোকজনকে আরও একটা কথা বলতে শুনেছি আমি। এখানে যারা মারা গিয়েছিল, তারা নাকি এখনও এখানেই আছে। গোটা এলাকাটা নাকি পাহারা দেয় সেই দুষ্ট আত্মাগুলো।"

লালচে পাহাড়চূড়াটার দিকে তাকালেন পেইন্টার। জর্ডানের দাদার মতে, পুটসিভদের দিকে আলোকপাত করতে পারবে, এমন কিছু একটা লুকানো আছে এখানে।

পার্কের গেটের কাছে পৌছে গেছে তাদের এসইউভি। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মহিলার দিকে আঙুল তুলল কোয়ালস্কি। না, ভুল হলো। মহিলার চাইতে মেয়ে বললেই তাকে ভালো মানাবে। "ওটাই কি আমাদের গাইড নাকি?"

সোজা হয়ে বসলেন পেইন্টার। সাদা রঙের একটা চেরোকি জীপের পাশে এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনের ধূসর রঙের শার্টে রেঞ্জারদের ব্যাজ আটকানো। সেই সাথে নিম্নাঙ্গে সবুজ ঢোলা প্যান্ট, আর পায়ে কালো বুট। কোমরের বেল্ট থেকে একটা হোলস্টারও ঝুলতে দেখা গেল।

হু...হুউউ... মেয়েটাকে দেখে শিষ দিয়ে উঠল কোয়ালস্কি।

কাজ হবে না বুঝতে পেরেও তাকে শাসানোর চেষ্টা করলেন পেইন্টার। "তোমার গার্লফ্রেন্ড মনে হয় ব্যাপারটা পছন্দ করবে না।"

কথাটা শুনে কোয়ালস্কির মুখের হাসি আরও চওড়া হলো। "আমাদের মাঝে একটা চুক্তি হয়েছে। সবকিছু দেখার অনুমতি আছে আমার, কিন্তু কিছুই স্পর্শ করা যাবে না।"

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ডিরেক্টর। তবে বিশালদেহী লোকটাকে খুব একটা দোষ দিতে পারলেন না তিনি। তামাটে গায়ের রঙ, বাদামী চোখ আর ঘন কালো চুল...সব মিলিয়ে মেয়েটা বেশ সুন্দরী। কিন্তু তারপরও লিসার সাথে তার তুলনা চলে না। একটু আগেই গার্লফ্রেন্ডের সাথে ফোনে কথা বলেছেন পেইন্টার। তাদের নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তা করছে মেয়েটা।

গাড়িটা থামতেই তাদের দিকে এগিয়ে এল রেঞ্জার। দরজার গ্লাসটা নামিয়ে নিলেন পেইন্টার। "রেঞ্জার টিসো?"

মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটা। ঝুঁকে গাড়ির ভেতরে একবার নজর বুলালো সে। "আপনারাই সেই গবেষক?" কিন্তু কোয়ালস্কির শারীরিক গঠন দেখার পর তাদের পরিচয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হলো না তাকে।

হাতের ইশারায় একটা জায়গা দেখাল সে। "ওখানে পার্ক করুন। তারপর বলুন, কী কারণে এখানে এসেছেন আপনারা।"

"ওয়াও!" গাড়িটা ঘুরিয়ে নিতে নিতে আবারও মুখ খুলল কোয়ালস্কি।

এবারও তাকে দোষ দিতে পারলেন না পেইন্টার।

কিছুক্ষণ পর সবাইকে প্রধান জ্বালামুখের দিকে এগোনো একটা ট্রেইল ধরে হাঁটতে দেখা গেল। চড়া রোদের কারণে আরও বন্ধুর রূপ নিয়েছে পথটা। যাত্রাপথে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট টিবি নজর পড়ল তাদের। অনেক অনেক বছর আগে লাভা জমে তৈরি হয়েছে এগুলো। স্প্যানিশ ভাষায় 'লিটল ওভেন' নামে ডাকা হয় লাভার ছোট ছোট স্তূপগুলোকে। জায়গায় জায়গায় বুনো ফুল ফুটে আছে। কিন্তু আসল

সৌন্দর্য হলো প্রধান জ্বালামুখটা। নানা ধরণের খনিজ জমে ক্রমেই উপরদিকে এগিয়েছে ওটা।

"ট্রেইলটা প্রায় এক মাইলের মতো লম্বা," বলে উঠল ন্যান্সি। "আমি দুঃখিত, কিন্তু শুধুমাত্র ওই সময়টুকুই আপনাদের দিতে পারব আমি।"

পেইন্টার বুঝতে পারলেন, হয়তো নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আসতে হয়েছে মেয়েটাকে। ওর আগ্রহ একটু বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। "হারানো গুপ্তধন খুঁজছি আমরা।"

পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল মেয়েটা। "ওমা! তাই?" বিদ্রুপ ফুটে উঠল তার কণ্ঠে।

"বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা কেমন যেন শোনায়। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে, শেষবার অগ্ন্যুৎপাতের সময় বা তার কিছু পরে ঐতিহাসিক কিছু একটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এখানে। সেই জিনিসটারই খোঁজ করছি আমরা।"

ব্যাখ্যাটা শোনার পরও রেঞ্জারের হাবভাবে কোনও পরিবর্তন এল না। "বছরের পর বছর ধরে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে পুরো পার্কটা। একবার, বারবার...দশকের পর দশক জুড়ে। এখন যা আছে, তা আমাদের চোখের সামনেই আছে। আপনাদের কথামতো যদি আসলেই কিছু লুকিয়ে রাখা হয়, তা মাটির অনেক অনেক গভীরে। আমাদের পায়ের নিচে শুধুমাত্র বরফে ভরা কতোগুলো পুরনো লাভা টিউব ছাড়া আর কিছু নেই। সেগুলোও হয়তো এখন বুজে গেছে।"

"বরফ?" হাঁটতে হাঁটতে ইতিমধ্যে ঘেমে উঠেছে কোয়ালস্কি। এমন পরিবেশে কথাটা হজম করতে এক মুহূর্ত সময় লাগল তার।

"লাভা টিউবগুলোর ভেতর দিয়ে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হতো। শীতকালে জমে গিয়ে বরফে পরিণত হয় এসব পানির ধারা। কিন্তু মাটির নিচে বাতাস চলাচলের পথ না থাকায়, আর বিভিন্ন খনিজসহ আগ্নেয় ছাইয়ের প্রাকৃতিক অন্তরনের ফলে গলতে পারেনি বরফগুলো। কিন্তু অনেক আগেই রাডারের মাধ্যমে এসব টিউবে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, কিছুই পাওয়া যায়নি।" ব্যাখ্যা করল মেয়েটা। "যদি আমার সময় নষ্ট করা শেষ হয়ে থাকে তাহলে... "

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন হ্যাঙ্ক। নাক উঁচু করে আশেপাশে কিছু একটা শুঁকতে শুরু করেছে কাউচ, হয়তো বুনো খরগোশের গন্ধ পেয়েছে। সেদিকে নজর না দিয়ে রেঞ্জারের দিকে তাকালেন প্রফেসর।

"আনাসাযিদের অন্তর্ধান নিয়ে গবেষণা করছি আমরা। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে, এখানকার সর্বশেষ অগ্ন্যুৎপাত হয়তো..."

এবার থামার পালা হ্যাঙ্কের। তার চোখে চোখ রেখে আবারও কথা শুরু করেছে তরুণী রেঞ্জার।

"ড. কানোশ, আপনাকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনি। আপনার যোগ্যতা সম্পর্কেই বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। কিন্তু আনাসাযিদের উধাও হওয়া সম্পর্কে প্রচলিত সব গালগল্পও আমি শুনেছি...আবহাওয়া পরিবর্তন, যুদ্ধ, রোগবালাই,

এমনকি এলিয়েনদের সাথেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে ব্যাপারটাকে। হ্যাঁ, এখানে আনাসাযিদের বাস ছিল। উইনস্লো আনাসাযি আর কায়েন্ত্রা আনাসাযি, দুটো গোত্রের লোকেরাই এখানে থাকত। কিন্তু সমসাময়িক সিনাগুয়া, কোহোনিনা ইত্যাদি আরও অনেক পুয়েবলো গোত্রের ইন্ডিয়ানরাও এখানে ছিল। তাদের সম্পর্কে কী বলার আছে আপনার?"

বড় করে নিঃশ্বাস নিলেন হ্যাঙ্ক। বিতর্কে তাকে হারাতে পারে, আজ পর্যন্ত এমন কারও সাথে মোকাবেলা করেননি তিনি। "হ্যাঁ, আমি জানি, ইয়াং লেডি," পেশাগত সুর শোনা গেল তার কণ্ঠে। "নিজ পূর্বপুরুষদের ইতিহাস সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানা আছে আমার। তাই বলব, আমার কথাকে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না আপনি। হঠাৎ করেই এই অঞ্চল থেকে হারিয়ে গিয়েছিল আনাসাযিরা। পাহাড় খোদাই করে তৈরি করা তাদের ঘরবাড়িগুলোতেও কেউ কব্জা করেনি। আসলে ওখানে যেতে ভয় পেত স্থানীয় অন্যান্য গোত্রের লোকরা। রহস্যজনক কিছু একটা ঘটেছিল হতভাগ্য লোকগুলোর সাথে। আশা করি, আমরা সঠিক ট্রেইলেই আছি। আর একদিন না একদিন সত্য উন্মোচন করে আমেরিকার ইতিহাস আবার নতুনভাবে লিখব আমরা।"

দু'জনের কথা কাটাকাটিতে বেশ মজে পাচ্ছেন পেইন্টার। হ্যাঙ্কের কথা শেষ হতেই দেখা গেল, রাগ আর লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে ন্যান্সির গালদুটো।

কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে শ্রাগ করল সে। "খারাপ ব্যবহারের জন্য দুঃখিত। আসলে বুঝতে পারছিলাম না, আপনাদের কোন কাজে আসব আমি। আনাসাযিদের সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চাইলে, এই জায়গার বদলে উপাতকি-তে যাওয়া উচিত ছিল আপনাদের।"

"উপাতকি?" প্রশ্ন করলেন পেইন্টার। "ওটা কোথায়?"

"আঠারো মাইল উত্তরে, আরেকটা ন্যাশনাল পার্ক ওটা।"

আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন হ্যাঙ্কঃ "উপাতকি হচ্ছে শত শত একর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পুয়েবলো, অর্থাৎ প্রাচীন ইন্ডিয়ান অধিবাসীদের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। জায়গাটার প্রধান আকর্ষণ হলো প্রায় তিনতলা সমান উঁচু একশোরও বেশি ঘর বিশিষ্ট একটা বিশালাকায় বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। হোপি ভাষায় উপাতকি শব্দটার অর্থ হচ্ছে 'লম্বা বাড়ি'। ওই নামেই পুরো পার্কটার নামকরণ করা হয়েছে।"

"আমরা, অর্থাৎ নাভাজোরা এখনও 'আনাসাযি ঘাঁটিকিন' বলে ডাকি জায়গাটাকে," যোগ করল ন্যান্সি।

"শত্রুশিবির," অনুবাদ করে দিলেন প্রফেসর। "ঐতিহাসিকদের মতে, রহস্যজনক অন্তর্ধানের আগে জায়গাটা আনাসাযিদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হত।"

সামনে উঁচু হয়ে থাকা পাহাড়চূড়াটার দিকে তাকালেন পেইন্টার। জর্ডানের দাদার ভাষ্য অনুযায়ী, আনাসাযিদের একটা কুকর্মের ফলেই এই আগ্নেয়গিরির জন্ম। পুটসিভদের কাছ থেকে রহস্যময় ও বিপজ্জনক কিছু একটা চুরি করেছিল হতভাগা

লোকগুলো। চূড়ার গহ্বরের দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি। হতে পারে, এখানে এককালে কোন একটা স্থাপনা ছিল। হয়তো লাভার স্রোতের সাথে ভূগর্ভে হারিয়ে গেছে ওটা। আর লোকগুলোরই বা কী হলো? তাদের কি হত্যা করা হয়েছিল?

হ্যাঙ্কের বলা একটা কথা মনে পড়ল তার।

গণহত্যা।

হয়তো আসলেই ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন তারা। শার্টের পকেট থেকে জর্ডানের দেয়া কাগজটা বের করলেন পেইন্টার। ছেলেটার বুড়ো দাদা বলেছিলেন, তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে এটা। ভাঁজ খুলে ন্যান্সির চোখের সামনে কাগজটা মেলে ধরলেন তিনি।

"আমাদের লক্ষ্যের সাথে এই চিহ্নটা কোনও না কোনওভাবে সম্পর্কিত। আপনি কি কখনো এগুলো দেখেছেন?"

উঁকি দিয়ে কাগজে আঁকা চাঁদ আর পাঁচকোনা তারাটা দেখল ন্যান্সি। সাথে সাথে দ্বিধায় ছেয়ে গেল তার চেহারা।

"হ্যাঁ," জবাব দিল সে। "এগুলো কোথায় পাওয়া যাবে, সেই জায়গাটাও আপনাদের দেখাতে পারব আমি।"

দুপুর ১২:২৩
সান রাফায়েল উচ্চভূমি

গিয়ার পাল্টে এক্সেলারেটর মুচড়ে ধরল কাই, বাকহর্ন ওয়াশ ধরে জর্ডানের পেছন পেছন ছুটে চলেছে সে। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টার পরও ছেলেটার কালো রঙের বাইকটাকে পেছনে ফেলতে পারছে না সে। অনবরত ডানে-বামে সরে তাকে সামনে এগোনোর কোনও সুযোগ দিচ্ছে না জর্ডান। রুক্ষ ট্রেইলে ধুলোর ঝড় বইয়ে দিয়েছে চারচাকাওয়ালা এটিভি দুটো।

অনেক আগেই সান রাফায়েল উচ্চভূমির দু'হাজার মাইল বর্গাকার এলাকাজুড়ে এসব যান চলাচলের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এগুলো সরকারি জমি। কাই জানে, নিয়ম ভাঙা উচিত হচ্ছে না। কিন্তু একজন কর্তব্যপরায়ণ নেটিভ আমেরিকান হওয়ার পাশাপাশি সে একজন টিনএজারও বটে। আর এই বয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে নিষিদ্ধ কাজের মজাটাই অন্যরকম।

জন হকস-কে ইমেইল পাঠানোর পর, উত্তরের আশায় প্রায় আধা ঘন্টা ল্যাপটপ সামনে নিয়ে বসেছিল সে। কিন্তু অপেক্ষাটুকুই সার হয়েছে। ওয়াহইয়া লিডার তার মেসেজের কোন জবাব দেয়নি।

অন্ধকার ঘরে একা একা বসে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল কাই-এর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পায়, জর্ডান তখনও বারান্দাতেই বসে আছে। চোখের ইশারায় একটা কেবিনের বাইরে ছাউনির আড়ালে

থাকা মাউন্টেন বাইকগুলো তাকে দেখায় ছেলেটা। চাবি চাওয়ার পর আলভিন বা আইরিসও কোনও আপত্তি করেননি। শুধু বলে দিয়েছেন তাড়াতাড়ি ফিরতে।

জর্ডানের বাইকের গর্জনে সম্বিত ফিরল তার। একটু সামনে একটা বাঁক দেখা যাচ্ছে। বাঁক পেরিয়েই ফুরিয়ে গেছে এই ট্রেইলটা। মাথায় নতুন একটা প্ল্যান এসেছে। ওটা ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে, বিশ মিনিট ধরে চলতে থাকা এই রেস জিতে যাবে সে।

বাঁকটা ঘোরার জন্য জর্ডান তার গতি খানিকটা কমিয়ে দিল। ঠিক এই সুযোগটার অপেক্ষাতেই ছিল কাই। গর্জে উঠে সামনে বাড়লে তার এটিভি। ক্লিফের একেবারে কিনার ঘেঁষে জর্ডানকে অতিক্রম করল সে। তারপর আরেকটু এগিয়ে ব্রেক কষল। শেষ হয়ে এসেছে ট্রেইলটা।

পেছনে থেমে গেছে জর্ডানও। "খেলা কিন্তু শেষ হয়নি," তার কণ্ঠে কপট রাগের সুর।

মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে নিল কাই, মুখের হাসি এক কান থেকে আরেক কান ছড়িয়েছে।

হাসতে হাসতে তার পাশে এসে থামল ছেলেটা। হেলমেট আর গগলস খুলতেই দেখা গেল, চোখের চারপাশে গোল ছোপ তৈরি করেছে ধুলোর স্তর। মাটি খুঁড়তে থাকা র‍্যাকুনের মতো লাগছে ছেলেটাকে।

তাকেও হয়তো খুব একটা সুন্দর দেখাচ্ছে না, মনে মনে ভাবল কাই।

পানির ফ্লাস্কটা খুলে মুখের উপর উপুড় করে ধরল জর্ডান। কয়েক ঢোক গেলার পর নিজের মুখটাও ধুয়ে নিল সে। "পরের ট্রেইলটার ব্যাপারে কী ভাবছ?"

লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে ফেলল কাই। বলতে সংকোচ বোধ হচ্ছে, এভাবে ঘুরতে পেরে খুব ভালো লাগছে তার।

"মনে হয়, এবার আমাদের ফিরে যাওয়া দরকার," বলে পকেট থেকে সেলফোন বের করে সময় দেখল মেয়েটা। "প্রায় দুই ঘন্টা হয়ে গেছে আমরা বেরিয়েছি।"

বাইক নিয়ে বের হওয়ার পর সময় কোন দিক দিয়ে গড়িয়েছে তা দু'জনের কেউই টের পায়নি।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর জর্ডানও তার কথায় সায় দিল। "হ্যাঁ। আর কিছুক্ষণ দেরি হলে হয়তো আইরিস আর আলভিন সার্চ পার্টি নিয়ে আমাদের খুঁজতে বেরুবে। তাছাড়া... আমার বেশ খিদেও পেয়েছে। একমুঠো বাদামে পেট আর কতক্ষণ ঠান্ডা থাকে বল।"

"পিনন গাছের বীজ ওগুলো," যোগ করল কাই।

"অসাধারণ, মিস কৌশিট! তোমার জ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করেছে! অভিনন্দন!"

ছেলেটার কথা বলার ভঙ্গিতে ফিক করে হেসে দিল কাই। কপট রাগের ভান করে হাতের হেলমেটটা উঁচু করে ধরল, যেন ওর মুখে ছুঁড়ে মারবে জিনিসটা।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে...হার স্বীকার করে নিচ্ছি আমি," পাল্টা হাসল জর্ডান। "চল, এখন ফেরা যাক।"

এটিভি চালিয়ে কেবিনগুলোর উদ্দেশ্যে রওনা হলো দু'জন। হাসিঠাট্টায় বেশ দ্রুত ফুরিয়ে গেল পথটুকু। কেবিনের সারির পেছনে পৌঁছে বাইকদুটো পার্ক করে রাখল ওরা।

আশেপাশের পরিবেশ সাধারণের তুলনায় একটু বেশি সুনসান বলে মনে হচ্ছে। বাতাসে অশুভ কিছু একটার গন্ধ পেল কাই। জর্ডানের কাঁধে চেপে বসল তার এক হাতের আঙুলগুলো।

জর্ডানও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। কাই-এর হাত ধরে টেনে তাকে ছাউনির একপাশে নিয়ে এল সে। "কিছু একটা গোলমাল হয়েছে," বলে কেবিনের সামনের দিকের মাটিতে ইশারা করল ছেলেটা। "টায়ারের ছাপ!"

আঁতকে উঠল কাই। গাড়ি করে কেউ এসেছে এখানে। এজন্যই মনে হচ্ছিল, কিছু একটা যেন তাদের ধরবে বলে চুপচাপ ঘাপটি মেরে বসে আছে।

"এখান থেকে পালাতে হবে..." হঠাৎ কেবিনের ছায়ার ভেতর থেকে একটা অবয়ব নড়ে ওঠায় জর্ডানের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। খাকি রঙের মরুভূমির ক্যামোফ্লেজ পোশাক পরে থাকায় এতোক্ষণ দেখা যায়নি লোকটাকে। পেছন দিক থেকে রাইফেল হাতে এগিয়ে এল আরেকজন।

কাই বুঝতে পারল, এসবের জন্য সে ই দায়ী।

ইমেইলটা...

এগিয়ে এসে রাইফেলের বাঁট দিয়ে জর্ডানের মুখে আঘাত করল এক অস্ত্রধারী। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল ছেলেটা।

"জর্ডান!"

সোজাসুজি কাই-এর বুকে রাইফেল তাক করেছে আরেকজন। বরফের মতো শীতল তার কণ্ঠ।

"আমার সাথে এসো। কেউ একজন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

সকাল ১১:৩৩
ফ্ল্যাগস্টাফ, অ্যারিজোনা

লম্বা কাঠামোটার সামনে দাঁড়িয়ে জায়গাটার নামের যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারছেন প্রফেসর হ্যাঙ্ক কানোশ। উপাতকি...আসলেই বাড়িটা বেশ লম্বা।

স্যান্ডস্টোনের ব্লকনির্মিত বাড়িটার ধ্বংসাবশেষ প্রায় তিনতলা সমান উঁচু। ধাপে ধাপে দাঁড়িয়ে আছে একটার পর একটা ঘর, সব মিলিয়ে একশোরও বেশি হবে হয়তো। নিঃসন্দেহে, স্থাপত্যবিদ্যার অসাধারণ এক নিদর্শন এটা। নিচতলার একেবারে মাঝখানের একটা ঘর অন্যগুলোর চেয়ে তুলনামূলক বড়। খুব সম্ভবত, সভাকক্ষ বা এই ধরণের কোনও কাজে ব্যবহৃত হত ওটা।

জায়গাটা একসময় কেমন দেখাত, সেটা মনে মনে আন্দাজ করতে লাগলেন প্রফেসর। কল্পনায় বাড়িটার ধ্বংসাবশেষের উপর ছাদ চড়িয়ে দিলেন তিনি, ক্ষয়ে

যাওয়া দেয়ালগুলোকে মজবুত করে দিলেন, আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গম আর ভুট্টার চারা রোপন করলেন। সবার শেষে সিনাগুয়া, কোহোনিনা, আনাসাযি ইত্যাদি বিভিন্ন গোত্রের লোকজন দিয়ে ভরিয়ে তুললেন জায়গাটাকে। পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রেখে একসাথে এখানে বাস করত মানুষগুলো।

ধ্বংসাবশেষটার পাশে দাঁড়িয়ে সামনে দৃশ্যের দিকে তাকালেন হ্যাঙ্ক। দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি সামনে রেখে, টেবিলের মতো উঁচু একটা জায়গায় নির্মাণ করা হয়েছিল এই উপাতকি। পূর্বদিকে ধু-ধু মরুভূমির ধূসর রং আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এসেছে, সবুজ হতে হতে ক্রমে এগিয়ে গিয়েছে কলোরাডো নদীর দিকে।

অসাধারণ সুন্দর জায়গাটা।

সাথে সাথে আরেকটা চিন্তা খেলে গেল প্রফেসরের মাথায়। এতো সুন্দর জায়গাটা কেন ছেড়ে গিয়েছিল আনাসাযিরা? তাদের কি বিতাড়িত করা হয়েছিল? খুন করা হয়েছিল? মনের পর্দায় ফুটে ওঠা উপাতকির দেয়ালে রক্তের লাল ছোপ দেখতে পেলেন তিনি। শুনতে পেলেন মহিলা আর বাচ্চাদের করুণ আর্তনাদ। অনেক কষ্টে চিন্তাটা মাথা থেকে সরালেন হ্যাঙ্ক।

পেইন্টার আর কোয়লস্কিও অবাক চোখে বিশালাকায় বাড়িটার ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে আছেন। সানসেট ক্রেটার ন্যাশনাল পার্ক থেকে রেঞ্জার ন্যান্সি টিসোও তাদের সাথে এসেছে। কিন্তু এখন হাইকিং-এর জন্য অনুমতি আদায় করতে গিয়েছে মেয়েটা। বিনা অনুমতিতে এদিকের এলাকায় আসাও নিষেধ, স্থাপনাগুলোর ভেতরে ঢোকা তো আরও সাংঘাতিক ব্যাপার।

অনুমতি আনতে পারলে পেইন্টারের দেখানো সেই পুটসিভদের চিহ্নটা কোথায় আছে, সেখানে তাদের নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছে ন্যান্সি। হারানো গোত্রটার কথা মনে পড়তেই আবারও উত্তেজিত বোধ করলেন পেইন্টার। তারা কি আসলেই বুক অফ মরমন-এ উল্লেখ করা সেই প্রাচীন ইজরায়েলি? সময়ই উত্তরটা দেবে।

একটু পর ভিজিটরস সেন্টার থেকে ন্যান্সিকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। এগিয়ে এসে কোয়ালস্কির সামনে দাঁড়াল সে। উপাতকির বিশেষ একটা স্থাপনার দিকে ঝুঁকে পড়েছে বিশালদেহী লোকটা। দেখতে সাধারণ গর্তের মতো মনে হলেও জিনিসটার একটা বিশেষত্ব আছে। ছিদ্রটা বেয়ে মৃদু হাওয়া বেরিয়ে আসছে।

"বাহ!" কোয়ালস্কির কণ্ঠে মুগ্ধতার ছাপ। "ঠিক যেন এয়ার কন্ডিশনার!"

"এটা একটা ব্লোহোল," একটু সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সাইনবোর্ডে লেখা তথ্যের সূত্র ধরে বলে উঠলেন পেইন্টার।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। "এজন্যই এই গুহাগুলোকে 'শ্বসনক্ষম' বলা হয়ে থাকে। আসলে পুরো ব্যাপারটাই বাতাসের চাপের উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া এখনকার মতো গরম থাকলে অপেক্ষাকৃত শীতল বাতাস নিচের গুহাগুলোতে আটকা পড়ে যায়। ভেতরে বাতাসের বেগ সর্বোচ্চ ত্রিশ মাইল পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে। প্রাকৃতিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মতো কাজ করে ব্যাপারটা। ঐতিহাসিকদের মতে, নেটিভ আমেরিকানদের এখানে বাড়ি বানানোর পেছনে এটাও একটা বিশেষ

কারণ। তাছাড়া গুজব প্রচলিত ছিল, এই ধরণের ব্লোহোলগুলো নাকি পৃথিবীর ভেতরে প্রবেশ করার রাস্তা। তৎকালীন অধিবাসীরা জায়গাগুলোর বেশ কদর করত।"

এখনও সাইনবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পেইন্টার। "এখানে লেখা আছে, উনিশশো বাষট্টি সালে একটা অভিযানে নিচের গুহা থেকে বেশ কিছু মাটির তৈজসপত্র, স্যান্ডস্টোনের জিনিস এমনকি পেট্রোগ্লিফও পাওয়া গিয়েছিল।"

সিগমা ডিরেক্টরের চোখেমুখে ফুটে ওঠা উচ্ছ্বাস উপলব্ধি করতে পারেন হ্যাঙ্ক। এখানে আসতে আসতে ন্যান্সি তাদের জানিয়েছে, জর্ডানের দাদার পাঠানো চিহ্নটা নাকি মরুভূমির গভীরে লুকানো কোনও একটা পেট্রোগ্লিফের অংশবিশেষ।

"এখানে আরও লেখা আছে-" যোগ করলেন পেইন্টার, "-নিচের গুহাগুলোর প্রকৃত গভীরতা এবং বিস্তৃতি এখনও পুরোপুরিভাবে চিহ্নিত করা যায়নি।"

"না...কথাটা পুরোপুরি ঠিক না," বাগড়া দিল ন্যান্সি। "গত কয়েক বছরের গবেষণায় দেখা গেছে, নিচের লাইমস্টোনের গুহাগুলোর বিস্তৃতি প্রায় সাত বিলিয়ন ঘনফুট, গভীরতা মাটির নিচে কয়েক মাইল পর্যন্ত।"

ব্লোহোলটার দিকে তাকালেন পেইন্টার, গুহামুখটা তালা দিয়ে বন্ধ করা। "অর্থাৎ কেউ যদি ভেতরে কিছু লুকিয়ে রাখতে চায়..."

শ্রাগ করল ন্যান্সি। "আবারও পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে শুরু করলেন আপনি। আমি শুধুমাত্র আপনাদের ওই চিহ্নটা দেখাতে রাজি হয়েছি। এর বেশি কিছু আশা করবেন না।" বলে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল মেয়েটা। "বিকেল পাঁচটায় পার্ক বন্ধ হয়ে যাবে। তার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।"

ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেয়েছেন?" জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঙ্ক।

জবাবে সায় দিয়ে নিজের পকেটের দিকে ইঙ্গিত করল ন্যান্সি। "কাজটা সারতে ঘন্টা দুয়েক সময় লাগবে।"

সোজা হয়ে দাঁড়াল কোয়ালস্কি। "আপনার জীপটা নিয়ে গেলে কেমন হয়? দুই ঘন্টার পায়ে হাঁটা রাস্তা দশ মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ...গাড়িটা আমি চালালে অবশ্য আরও কম।"

প্রস্তাবটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল পার্ক রেঞ্জার। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন পেইন্টার। কখনোই কথাবার্তায় লাগাম রাখে না এই লোক।

"ঠিক আছে, অনেক হয়েছে ঠাট্টা তামাশা," বলে উঠল ন্যান্সি। "রওনা হওয়ার আগে কয়েকটা কথা জানিয়ে রাখছি আপনাদের। প্রথম, নিজেদের উপস্থিতির কোনও চিহ্ন ফেলে আসা যাবে না। খাবার আর পানির ব্যবস্থা করেছি আমি। আসার পর সবকিছু আবার চেক করে দেখা হবে। বুঝতে পেরেছেন?"

মাথা নাড়ল সবাই। পেইন্টারের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করল কোয়ালস্কি। "রেগে গেলে ওকে আরও সুন্দরী লাগে।"

ভাগ্য ভালো, কথাটা ন্যান্সি শুনতে পায়নি। অথবা শুনতে পেলেও কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। "দ্বিতীয়, সাবধানে পা ফেলতে হবে আমাদের। আশেপাশের কোনওকিছুর কোনও ক্ষতি যেন না হয়। আর সবার শেষে, কোনও জিপিএস ইউনিট

সাথে নেয়া যাবেনা। পার্ক কর্তৃপক্ষ এই জিনিসটা ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। ঠিক আছে?"

আবারও মাথা নেড়ে সায় দিল সবাই।

"চলুন তাহলে, যাওয়া যাক।"

"আচ্ছা...আমারা এখন যাচ্ছি কোথায়?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

"একটু সামনে, মেসার উপর অবস্থিত পাথরের ফাটল- নামের একটা পুয়েবলো বাড়ির ধ্বংসাবশেষে।"

"আরিব্বাস! এ আবার কেমন নাম?" এবার কোয়ালস্কি প্রশ্নটা করল।

"চলুন। গেলেই দেখতে পাবেন।"

তাদের সাপ্লাই রাখা ব্যাগপ্যাকগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল ন্যান্সি। এগিয়ে গিয়ে একটা ব্যাগ তুলে নিলেন হ্যাঙ্ক। ভেতরে একটা পানির বোতল আর খাওয়ার জন্য কিছু কলা এবং পাওয়ার-বার রাখা।

সবাই যার যার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়ার পর যাত্রা শুরু হলো। মরুভূমির ভেতর দিয়ে লাইন ধরে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো সবাই। সবার আগে পথ দেখিয়ে চলেছে ন্যান্সি। ট্রেইলটা সেজ ঝোপ, সল্টবুশ আর ক্যাকটাসের সারির ফাঁক দিয়ে সামনে এগিয়েছে। ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে কাঁকড়াবিছে, গিরগিটিসহ মরুভূমির অন্যান্য কীটপতঙ্গ। কিছু বুনো খরগোশও চোখে পড়ল। একবার একটা র‍্যাটলস্নেকের ঝুনঝুনি শব্দশুনতে পেলেন হ্যাঙ্ক। কাউচের গলায় বাঁধা ফিতেটা টেনে কুকুরটাকে আরও কাছে কাছে চলার ইঙ্গিত করলেন তিনি। সাপ সম্বন্ধে জানা আছে প্রানিটার। কিন্তু অযথা ঝুঁকি নেয়ার কোনও মানে হয় না।

পথের পাশে কিছুক্ষণ পরপরই পুরনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাদের গন্তব্য আরও অনেক সামনে।

পথচলার ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে পেইন্টারের পাশে চলে এলেন হ্যাঙ্ক। "চাঁদ এবং তারা...চিহ্নে আঁকা জিনিস দুটো আর গোত্রটার নামের কথা ভাবছিলাম আমি। টটসি'আন্টসউ পুটসিভ।

"শুকতারার দেশের লোকজন।"

সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। "সকালের আকাশে জ্বলজ্বল করতে থাকা তারাটা আসলে শুক্রগ্রহ। কিন্তু শুকতারার পাশাপাশি ওটাকে সন্ধ্যাতারাও ডাকা হয়। কারণ সন্ধ্যাবেলায়ও তারাটা বেশ উজ্জ্বল দেখায়। প্রাচীন জোতির্বিদরা এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই বিভিন্ন প্রাচীন চিহ্নে চাঁদের সাথে তারাটাকে দেখা যায়।" বলে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে, হাত দিয়ে একটা ধনুকের মতো আকার দেখালেন তিনি। "চাঁদের দুই চিকন প্রান্ত আসলে তারাটার পূর্ব-পশ্চিম দুই দিকেই উঠাকে ইঙ্গিত করে।"

"বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি আরও কিছু বলতে চান।"

"চাঁদ আর তারার সম্মিলিত রূপ আসলে অনেক পুরনো একটা চিহ্ন। মহাবিশ্ব সম্পর্কিত মানুষের জ্ঞানের দিকে আলোকপাত করে জিনিসটা। কিছু কিছু ধর্মবিষয়ক

জোতির্বিদরা স্টার অফ বেথেলহেম আর শুকতারাকে একই জিনিস বলে মত দিয়েছেন।"

শ্রাগ করলেন পেইন্টার। "অনেক ইসলামী দেশের পতাকাতেও চিহ্নটা দেখা যায়।"

সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। "হ্যাঁ। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কিত গবেষকরা তাদের ধর্মের কোনও বিশ্বাস বা মতবাদের সাথে এই চিহ্নটাকে মেলাতে পারেননি। তুর্কিরাই মূলত এই ব্যাপারটা তাদের ভেতর ঢুকিয়েছিল। কিন্তু চিহ্নটার অস্তিত্ব আসলে তারও অনেক আগে সৃষ্টি হয়েছে। বুক অফ জেনেসিস অনুযায়ী, প্রাচীন ইজরায়েলী এবং মিশরীয়দের সাথে সম্পর্কযুক্ত মোহাবাইটদের সময় পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই চিহ্নের ইতিহাস।"

আরও গভীরে যাওয়ার আগেই হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন পেইন্টার। "বুঝতে পেরেছি। ওই প্রাচীন লোকগুলো যে ইজরায়েল থেকে এসেছিল, এই চিহ্নটা আপনার সেই মতবাদকে সমর্থন করছে।"

"হ্যা, কিন্তু..."

প্রফেসরের কথা শেষ হওয়ার আগেই, হাত তুলে দূরে তাদের গন্তব্য- মেসাটার দিকে ইশারা করলেন পেইন্টার। "আশা করি ওখানে আমাদের সব প্রশ্নের জবাব মিলবে।"

দুপুর ১২:৪৬
সান রাফায়েল উচ্চভূমি

এ আমি কি করলাম?

হুমেতেওয়াদের বড় ঘরটায় দাঁড়িয়ে আছে কাই, চোখের সামনে থাকা দৃশ্যটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। একটা চেয়ারে বসে আছেন আইরিস, বৃদ্ধার গাল বেয়ে নামতে থাকা পানির ধারা আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছে। চেয়ারের হাতলে শক্ত হয়ে চেপে বসেছে হাত দুটো। বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। পাইন টেবিলটায় চিত করে শুইয়ে রাখা হয়েছে আলভিনকে। পরনে শুধু একটা বক্সার শর্টস। নিঃশ্বাসের তালে তালে তার বুকটা মৃদু উঠছে-নামছে। খোলা পেটের একপাশে, পাঁজরের উপর দগদগে পোড়া ক্ষত। মাংস পোড়া গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে ঘরের ভেতরের পরিবেশ।

ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে বিশালদেহী একজন মহিলা একটা লোহার রড গরম করছে। কাই-কে ঘরে টেনে আনার পর থেকে একবারের জন্যও তার দিকে তাকায়নি সে। নিজের শিকারকে নিয়েই ব্যস্ত আছে হিংস্র নিগ্রো মহিলা।

ঘরের এক কোণায় জর্ডানকে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে, হাত দুটো মুচড়ে পিঠের উপর ধরে রেখেছে লালচুলো এক সৈনিক। এই অবস্থাতেও ঘাড় ঘুরিয়ে কাই-এর দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেটা।

এদের ছাড়া ঘরে থাকা একমাত্র লোকটা টেবিলের অন্য প্রান্তে বসে আছেন। কাই-কে ঘরে ঢুকতে দেখে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। হাতের লাঠি আর শরীরের গড়ন দেখে বয়স্ক লোক বলে মনে হলেও, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুলের সাথে মিলিয়ে ছাঁটা দাঁড়ি আর পোশাক আশাক দেখে কাই বুঝতে পারল, লোকটার বয়স চল্লিশের বেশি হবে না।

"এই তো আপনি এসে পড়েছেন, মিস কৌশিট। আমি রাফায়েল সেইন্ট জার্মেইন।" বলে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। "তবে দেরি করে ফেলেছেন। আপনাকে ছাড়াই শুরু করে দিতে হলো এসব।"

লাঠি উঁচিয়ে টেবিলে শুয়ে থাকা আলভিনের দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা। বুড়ো মানুষটার মৃদু গোঙানির শব্দ যেন কাই-এর বুকটা চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে।

"আপনার চাচার ব্যাপারে কিছু কথা জানতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু আশান্দার মধুর ছোঁয়া পেয়েও আলভিন কিংবা আইরিস, কেউই কিছু বলেনি।"

নিজের নাম শুনেই মনে হয় আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কালো মুখটা দেখে কাই-এর গলা শুকিয়ে গেল। বিশাল দেহ কিংবা গায়ের রং এর চেয়েও অদ্ভুত মহিলার চোখদুটো। পুরোপুরি ফাঁকা, ঠিক যেন গভীর একটা আয়না।

মেঝেতে লাঠি ঠোকার আওয়াজে তার সম্বিত ফিরল।

"কাজে ফেরা যাক," বলে টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল নিজেকে রাফায়েল বলে পরিচয় দেয়া লোকটা। "উত্তরটা এখনও পাইনি আমি।"

টেবিলের দিকে এক পা এগিয়ে গেল কাই। "না! চাচার ব্যাপারে তারা কিছু জানেন না।"

ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকালেন রাফায়েল। "বুড়োবুড়িও এতোক্ষণ এটাই বলছিল। কিন্তু তাদের কথা কীভাবে বিশ্বাস করতাম আমি, বলুন।"

"দয়া করুন...চাচা আসলেই তাদেরকে কিছু বলেননি। আমি সব জানি।"

"বলো না ওদের," চেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে উঠলেন আইরিস, কণ্ঠে কষ্টের পাশাপাশি রাগের ছাপ।

শ্রাগ করলেন রাফায়েল। "বুড়ির ঢং কত!"

আইরিসের কথাগুলো পাত্তা দিল না কাই। "বলব, সব বলব। কিন্তু তার আগে বাকি সবাইকে চলে যেতে দিতে হবে। তারপরই চাচা কোথায় গেছে, সেই ব্যাপারে আপনাদের বলব আমি।"

কিন্তু রাফায়েলের প্রস্তাবটা পছন্দ হয়নি। "আমি জানি, আপনি খুবই সত্যবাদী, মিস কৌশিট। কিন্তু সেই ঝুঁকিটা আমি এখন নিতে পারছি না...দুঃখিত।" আশান্দাকে আলভিনের দিকে এগোতে ইশারা করলেন তিনি। "পেছনে চাপ দেয়ার মতো কোনও লিভার থাকলে মানুষের মুখ খুলতে চায় না। বুঝলেন কি না? এটা আসলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত পদার্থবিদ্যারই একটা তত্ত্ব।"

আলভিনের গালের দিকে রডটা বাড়িয়ে ধরল আশান্দা। আগুনে পুড়ে গরম হয়ে লাল রং ধারণ করেছে ওটা।

লাঠিতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকলেন রাফায়েল। "মুখের এই দাগটা লুকানো বেশ কষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য এরপর বুড়ো যদি বেঁচে থাকে আর কি।"

কাই কিছু বলার আগেই চেঁচিয়ে উঠল জর্ডান। "কাই-এর সহযোগিতা দরকার হলে আপনি আমাকে আটকে রাখতে পারেন। কিন্তু দয়া করে হুমেতেওয়াদের এখান থেকে যেতে দিন।"

সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল কাই। "জর্ডান ঠিকই বলেছে। যেতে দিন ওদের।"

"আপনি এমনিতেও মুখ খুলবেন, মিস কৌশিট। আইরিস আর আলভিনকে যেতে দেই বা না দেই, তাতে কোনও প্রভাব পড়বে না।"

হাল ছাড়ল না কাই। "কিন্তু, ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে।"

একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন রাফায়েল। অবশেষে হার মানলেন তিনি। "ঠিক আছে, মিস কৌশিট। আপনি আমাকে তুষ্ট করতে পেরেছেন।" জর্ডানকে ধরে রাখা সৈনিকের উদ্দেশ্যে ইশারা করলেন তিনি। "এটিভিগুলোর একটাতে বসিয়ে দাও দু'জনকে। তারপর গিরিখাত ধরে চলে যেতে দাও।"

"ব্যাপারটা দেখতে চাই আমি," যোগ করল কাই। "ওরা যেন নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারেন।"

"ঠিক আছে।"

কয়েক মিনিট পর সাদা রঙের এটিভি-টায় চড়ে বসতে দেখা গেল আইরিস আর আলভিনকে। বাইক চালানোর পক্ষে আলভিন বেশ দুর্বল, তাই স্ত্রীর পেছনে বসলেন তিনি। বাইক ছাড়ার আগে কাই-এর দিকে তাকালেন আইরিস। বৃদ্ধার চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ লক্ষ্য করল সে।

ধন্যবাদ...

বাইকটা চালিয়ে পথের বাঁকে হারিয়ে গেলেন তারা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন রাফায়েল। "আশা করি, আপনি এবার সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

তার পেছনেই আশান্দা নামের বিশালদেহী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কাই। জানে, বেফাঁস কিছু বললে তার উপরও আলভিনের মতো অত্যাচারের খড়গ নেমে আসবে। আর তাছাড়া, অত্যাচারের জন্য আরও একজন রয়ে গেছে- জর্ডান। এখন শুধুমাত্র সহযোগিতা করাই পারে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে।

পেইন্টারের খবর বের করার জন্য লিভার হিসেবে ব্যবহার করা হবে ওদের।

"ফ্ল্যাগস্টাফ," স্বীকার করল কাই। "সানসেট ক্রেটার ন্যাশনাল পার্কে গেছেন তারা সবাই।"

তারপর বিস্তারিত বাকি কথাগুলো সংক্ষেপে রাফায়েলকে ব্যাখ্যা করল সে।

কথাগুলো শোনার পর বেশ চিন্তিত দেখাল লোকটাকে। "মনে হচ্ছে, আমি যতটুকু আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি জানে ওরা..." কিন্তু পরক্ষণেই মাথা নাড়লেন তিনি। "ব্যাপার না, সামলে নেয়া যাবে।"

লাঠিতে ভর দিয়ে খোলা দরজার দিকে এগোলেন রাফায়েল। "বার্ন, স্নাইপারকে কল কর। কাজ সেরে হেলিকপ্টারে ফিরতে বলে দাও।"

আঁতকে উঠে আগে বাড়ল কাই।

স্নাইপার?

আইরিস আর আলভিন!

মেয়েটার দিকে ঘুরে তাকালেন রাফায়েল। "আমি তো শুধু বলেছিলাম, ওদেরকে যেতে দেব। কতদূর পর্যন্ত যেতে দেব, তা তো বলিনি।"

একটু পর পাহাড়ের গায়ে একটা গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো।

পরমুহূর্তেই আরেকটা।

দুপুর ১:৪৪
ফ্ল্যাগস্টাফ, অ্যারিজোনা

ঘাড় বাঁকা করে মেসার উপরদিকে তাকিয়ে আছেন পেইন্টার। হাঁপাতে হাঁপাতে পানির বোতলে একটা চুমুক দিলেন তিনি। দুই ঘন্টা চড়া রোদে হাঁটতে হাঁটতে কখনও কখনও তো এমনও মনে হচ্ছিল যে, তাদের পক্ষে আর গন্তব্যে পৌছানো সম্ভব হবে না। মরুভূমির শ্রী-বৃদ্ধি করবে তাদের শুকিয়ে মমি হয়ে যাওয়া দেহাবশেষ।

কিন্তু অবশেষে হতচ্ছাড়া পথটা ফুরিয়েছে।

"এখন কোনদিকে?" জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি। ঘেমে নেয়ে তার অবস্থাও বেশ করুণ।

"বাড়ির ধ্বংসাবশেষটা একেবারে উপরে," জবাব দিল ন্যান্সি।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন পেইন্টার। উপরে ওঠার মতো কোনও রাস্তা চোখে পড়ছে না তার।

"এই যে এদিকে," মেসার একপাশের ঢালের দিকে ইঙ্গিত করল পার্ক রেঞ্জার। একটু এগোতেই দেখা গেল, ওদিক থেকে একটা সরু ট্রেইল উপরে উঠে গেছে।

পথের শুরুতে পাথরের চাঁইয়ের উপর বেশ কয়েক ধরণের দেয়ালচিত্র দেখতে পেলেন পেইন্টার- সাপ, সরীসৃপ, হরিণ, ভেড়াসহ বিভিন্ন আকৃতির মানুষজন ইত্যাদি। ছবিগুলো দুই ভাবে আঁকা- একটা পদ্ধতি হচ্ছে, উপরের ফিকে হয়ে আসা পাথর খোদাই করে ভেতরের হালকা রঙের পাথর বের করে ফেলা। আরেকটা হলো, আকৃতি অনুযায়ী নরম স্যান্ডস্টোনের গায়ে অগণিত ছোট ছোট ফুটো করা।

কিছুদূর ওঠার পর ঢালের গায়ে পাথরে একটা ফাটল চোখে পড়ল। বাড়িটার নাম সম্ভবত এই কারণেই 'পাথরের ফাটল' রাখা হয়েছে। উপরে উঠতে হলে এই ফাটলের ভেতর দিয়েই যেতে হবে।

"আর অল্প একটু," সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠল ন্যান্সি।

গজগজ করতে করতে মুচড়ে ফাটলে ভেতর দিয়ে শরীর গলিয়ে দিল কোয়ালস্কি। তার বিশালাকায় শরীরের পক্ষে পথটা বেশ সরু। সামনে পাথরের বোল্ডারে ছাওয়া একটা পথ একেবারে মেসার উপর পর্যন্ত উঠে গেছে।

ফাটলটা একেবারে বাড়ির একটা ঘরে এসে উন্মুক্ত হয়েছে। সরু জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কোয়ালস্কি। এই বাড়িটাও অনেকটা উপাতকির মতোই, কিন্তু আকারে বেশ ছোট। সামনে অবারিত খোলা প্রান্তর পেরিয়ে কলোরাডো নদীর একাংশ নজরে পড়ল তাদের।

"বলা হয়ে থাকে, এটা নেটিভ আমেরিকানদের একটা দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হত," বলে উঠল ন্যান্সি। "ভালো করে তাকালে পাথরের প্রাচীরের গায়ে ছোট ছোট ফুটো দেখতে পাবেন আপনারা। তীর ছোঁড়ার জন্য ব্যবহৃত হত এগুলো।"

কিন্তু এসব গালগল্প শোনার জন্য এতোটা পথ পাড়ি দেয়নি বাকিরা।

"ওই ছবিটা কোথায় আঁকা?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

"আমাকে অনুসরণ করুন। পথটা বেশ দুর্গম। সচরাচর কাউকে এদিকে যেতে দেয়া হয় না। একটা ভুল পদক্ষেপে পা ফসকালেই বড়সড় আঘাত পেতে হবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন পেইন্টার। "চলুন।"

একটা উঁচু দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল ন্যান্সি। "জায়গাটা এই দেয়ালের উল্টোদিকে, নিচে। কিন্তু ওখানে যেতে হলে মেসার কিনারা ঘেঁষে ঘুরে এগোতে হবে। পা রাখার জন্য ফাটলের বাইরে অল্প একটু জায়গা ছাড়া আর কিছুই নেই।"

পায়ে পায়ে একজনের পর একজন এগিয়ে চললেন তারা। পায়ের নিচ থেকে ছোট ছোট নুড়িপাথর সরে যেতেই আঁতকে উঠলেন পেইন্টার। হ্যাঙ্কের কুকুরটার লাফঝাঁপ পথটাকে আরও কঠিন করে দিচ্ছে।

"কাউচ," চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। "চুপ থাকো।"

আস্তে আস্তে বাকি পথটুকু নেমে এলেন সবাই। সামনের দেয়ালে আরেকটা ফাটল চোখে পড়ল। আগের ফাটলের চেয়ে এটা একটু চওড়া, তবে বেশ দীর্ঘ। সরু গলি ধরে নামতে নামতে মেসার মাঝখানে, একেবারে নিচে নেমে এলেন তারা। পাথরের সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে। মাথার উপর এখন শুধু খোলা আকাশ।

"চমৎকার!" হ্যাঙ্কের কণ্ঠে উচ্ছ্বাসের ছাপ।

অবশ্য আশেপাশের দৃশ্য দেখে তার মতো ঐতিহাসিকের উচ্ছ্বসিত হওয়ারই কথা। চারদিকের দেয়ালজুড়ে অগণিত পেট্রোগ্লিফ আঁকা রয়েছে।

কিন্তু তাদের গাইড- ন্যান্সির কাছে এসব নতুন কিছু না। "আপনারা যা দেখার জন্য এসেছেন, এই যে এপাশে এগুলো," বলে গহ্বরের একদিকের মেঝের দিকে

ইঙ্গিত করল মেয়েটা। "এজন্যই মূলত কাউকে এখানে আসতে দেয়া হয় না। কর্তৃপক্ষ চায় না, কেউ এগুলোর উপর হেঁটে বেড়াক।"

তার ইশারা লক্ষ্য করে মেঝের দিকে তাকালেন পেইন্টার। প্রাচীন চিত্রকররা তাদের আঁকিবুঁকির ক্যানভাস হিসেবে এখানে দেয়ালের বদলে মেঝেকে বেছে নিয়েছেন। বড় একটা গোল বৃত্তের ভেতর সেই চাঁদ আর তারার ছবিটা আঁকা আছে।

ছবিটার কাছে গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লেন পেইন্টার। কাউচের গলার ফিতা হাতে নিয়ে হ্যাঙ্কও তাকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু কোয়ালস্কি ন্যান্সির পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। এসব আদ্যিকালের ছবি দেখার চেয়ে সুন্দরী রেঞ্জারকে সঙ্গ দেয়াই তার মতে ভালো।

পাশাপাশি বসে ছবিটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন পেইন্টার আর হ্যাঙ্ক। বৃত্তের ভেতরের চাঁদ আর তারার সম্মিলিত আকৃতি প্রায় ফুট তিনেকের মতো লম্বা, চওড়াতেও তাই। প্রাচীন চিত্রকররা ছবি আঁকার দুটো পদ্ধতিই এখানে ব্যবহার করেছেন। চাঁদ আর তারা পাথর খোদাই করে আঁকা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোকে ঘিরে রাখা বৃত্তটা অগনিত ছোট ছোট ফুটোর সম্মিলিত রূপ।

হঠাৎ বৃত্তটার দিকে এগিয়ে গেল কাউচ। নাক উঁচু করে কিছু একটা শুঁকতে শুরু করল।

পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলেন হ্যাঙ্ক আর পেইন্টার। বৃত্তটার উপর ঝুঁকে পড়লেন সিগমা ডিরেক্টর। হ্যাঙ্কও তাকে অনুসরণ করলেন।

"কিছু গন্ধ পাচ্ছেন?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

"না তো," জবাব দিলেন প্রফেসর, কিন্তু তার কণ্ঠে উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট।

এক মুহূর্ত পর পেইন্টারও ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারলেন। ফুটো বেয়ে বাতাসের মৃদু প্রবাহ যেন তার গালের পশমগুলোকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, অনুভূতিটা অনেকটা নরম পালক ছুঁইয়ে দেয়ার মতো।

"বুঝতে পেরেছেন?" এবার পেইন্টারের কণ্ঠেও উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেল।

"একটা বায়ুপ্রবাহ," জবাব দিলেন হ্যাঙ্ক। "বৃত্তের ভেতর থেকে আসছে।"

"তার মানে, এখানেও নিশ্চয়ই উপাতকির মতো একটা ব্লোহোল আছে!"

নিচু হয়ে বৃত্তের রেখায় হাত বুলালেন পেইন্টার। ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিলেন উপরে লেগে থাকা ধুলাবালি। পরক্ষণেই হ্যাঙ্কের এক হাত ধরে টান দিলেন তিনি, বৃত্তের রেখার উপর বসিয়ে দিলেন প্রফেসরের আঙুলগুলো। "দেখুন, কিছু অনুভব করতে পারেন কিনা।"

হতভম্ব দেখাল প্রফেসরকে। "সিমেন্টের মতো কিছু দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে পাথরটা!"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন পেইন্টার। "এই পাথরটা মেঝে থেকে আলগা। ফুটোর উপর আলাদা করে বসানো হয়েছে এটাকে, অনেকটা ম্যানহোলের ঢাকনার মতো কাজ কছে জিনিসটা।"

"কিন্তু বৃত্তটাকে ঘিরে ফুটো রাখা হয়েছে, যেন ভেতরের বাতাস বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে।"

"হ্যাঁ," জবাব দিয়ে সরাসরি হ্যাঙ্কের চোখের দিকে তাকালেন পেইন্টার। "নিচে যেতে হবে আমাদের।"

অধ্যায় ২৪
৩১ মে, বিকেল ৪:৫০
ওয়াশিংটন ডি.সি.

ওয়াশিংটন মনুমেন্টের ছায়া থেকে বেরিয়ে ন্যাশনাল মলের দিকে এগোচ্ছে গ্রে। পড়ন্ত বেলায়ও সূর্যের এমন তেজ দেখে মনে হচ্ছে ব্যাটা যেন আজ ডুববে না। রেইকজাভিক থেকে পাঁচ ঘন্টার ফ্লাইটে এখানে এসে পৌছেছে সবাই। মজার ব্যাপার হলো, দুই জায়গার টাইম জোনের পার্থক্যের কারণে আইসল্যান্ড থেকে রওনা হওয়ার সময়ের এক ঘন্টা আগেই ওয়াশিংটনে এসে পড়েছে ওরা। গত দুই ঘন্টা সিগমার হেডকোয়ার্টারে ডিব্রিফিং চলাকালীন সময়ে তার বিতৃষ্ণা যেন আরও বেড়েছে।

অবশ্য ওটারও দরকার ছিল। আরচার্ড ফোরটেস্কুর ডায়েরীটা আনার জন্য কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি ওদের। আইসল্যান্ডের হামলার ঘটনাটার কথা মনে পড়তেই আলতো করে নিজের বাম কান স্পর্শ করল গ্রে। ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করার সময় আর একটু হলেই প্রাণটা যেতে বসেছিল। কানে ছ্যাকা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে হেলিকপ্টারের নিচে ঝুলতে থাকা লোকটার গুলি। ছোট ক্ষতটায় লিকুইড ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে সিগমার ডাক্তার।

"আস্তে!" পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল শেইচান।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। ডাক্তাররা তার পা-টাই বেশ ভালোভাবে পরীক্ষা করেছে। কপাল ভালো, অর্কারা তাদের সর্বশক্তিতে কামড় বসায়নি। নাহলে হয়তো তাকে আর কখনও দুই পায়ে দাঁড়াতে হত না। তবে ক্ষতটা মারাত্মক কিছু না বলে সায় দিয়েছেন ডাক্তাররা। সাময়িক কিছু অ্যান্টিবায়োটিক আর পেইন কিলার ইঞ্জেকশন দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে শেইচানকে।

"ট্যাক্সি নিই?" জানতে চাইল গ্রে।

"না, ডাক্তারের আদেশ- যত বেশি হাটাচলা করব, তত তাড়াতাড়ি পায়ে জোর ফিরে পাব আমি।"

কিন্তু গ্রে জানে, ব্যাপারটা পুরোপুরি সত্যি না। আঘাতটা হালকাভাবে না নেয়ার জন্য সাবধান করে দিয়েছেন ডাক্তাররা। কিন্তু জবাবে মুচকি হেসেছে শেইচান। আসলে চুপচাপ বসে থাকা ওর ধাতে নেই। বলা হয়ে থাকে, সাঁতার কাটতে না থাকলে নাকি হাঙররা শ্বাস নিতে পারে না। ওর স্বভাবও ঠিক তেমন।

একসাথে হাঁটতে হাঁটতে ম্যাডিসন ড্রাইভ অতিক্রম করল ওরা। হঠাৎ হোঁচট খেল শেইচান। গ্রে তার কোমর জড়িয়ে না ধরলে হয়তো পড়েই যেত।

"ছাড়।"

গ্রে-র হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার প্রয়াস পেল মেয়েটা। কিন্তু মাথা নেড়ে তার ইচ্ছাটা নাকচ করে দিল সিগমা কমান্ডার। পিঠের পেছন দিকে একহাতে আলতো করে ওকে জড়িয়ে ধরে হাঁটা শুরু করল সে।

"পরের বার...ট্যাক্সি নেয়াটাই ভালো হবে," হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল শেইচান।

তবে কাঁধে ঝামেলা চাপার পরও গ্রে-কে খুশিই দেখাচ্ছে। নিজের উপর কোনও মেয়েকে নির্ভর করতে দেখলে যে কোনও পুরুষেরই ভালো লাগে। অর্ধেক শরীরের ভর তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে মেয়েটা। খোলা চুলগুলোর গন্ধ বেশ আকর্ষণীয় লাগছে গ্রে-র কাছে।

শেইচানের কোমরে তার হাত আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল। মেয়েটার শরীরের উত্তাপ পুরোপুরি অনুভব করতে পারছে সে। কিন্তু এই অনুভূতিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

"উফফ...এসে গেছি প্রায়," বলে তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল শেইচান। কিন্তু ভারসাম্য রাখার জন্য কাঁধ থেকে হাত সরাল না।

অল্প একটু সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাশনাল আর্কাইভ ভবন। রিসার্চ রুমে কিউরেটর আর তার সহকারী তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সিগমা হেডকোয়ার্টারে পৌঁছানোর পর ডায়েরীটার একটা ফটোকপি করিয়ে নিয়ে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল গ্রে। আসল ডায়েরীটা একটা ভল্টে রেখে দেয়া হয়েছে।

ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পাহারারত দু'জন এজেন্টকে চিনতে পেরেছে গ্রে। এমনকি ডায়েরীর ফটোকপিটার নিরাপত্তার ব্যাপারেও কোনও ঝুঁকি নেয়া হচ্ছে না। তবে জিনিসটা অন্য দু'জন এজেন্টকে দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তারা হয়তো ভেতরে আছে।

শেইচানকে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করার ফাঁকে, গ্রে-র পকেটে থাকা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। হয়তো ক্যাট ফোন করেছে, ভাবল সে। ক্যাটকে সঙ্গ দেয়ার জন্য মঙ্ককে সিগমা হেডকোয়ার্টারে রেখে আসা হয়েছে। অবশ্য ওদের হাতে রোমান্স করার মতো সময় নেই। আইসল্যান্ডের অগ্নুৎপাতের উপর কড়া নজর রাখছে দু'জন। কিন্তু উটাহ- এর মতোই, লাভার তাপ ওখানকার ন্যানবটগুলোকেও নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে। কিন্তু ব্যাপারটা পরবর্তীতে আরও ঝামেলার সৃষ্টি করবে না তো? উত্তরটা সময়ই দেবে।

পকেট থেকে ফোন বের করে কলার আইডি চেক করল গ্রে। না, মঙ্ক কিংবা ক্যাট ফোন করেনি। এটা তার বাড়ির নাম্বার। ওয়াশিংটনে ফেরার পর অবশ্য একবার মায়ের সাথে কথা হয়েছে তার। বাড়ির সবকিছু ঠিকঠাকই আছে। সেদিনের রাতের পর বাবা আর বড় কোনও ঝামেলা পাকাননি।

কলটা রিসিভ করে ফোনটা কানে ঠেকাল সে। "হ্যাঁ, মা।"

"না, আমি তোমার বাবা," ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল। "কণ্ঠ শুনেও বুঝতে পারছ না?"

গ্রে একবার বলতে চাইল, ফোনে এটাই তার প্রথম কথা। এর আগে কিছুই বলেননি তিনি, সুতরাং কণ্ঠ শুনে চেনার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল সে। "কী হয়েছে, বাবা?"

"আমি তোমাকে ফোন করলাম...কারণ... " তারপর শুধুই নীরবতা।

"বাবা?"

"কারণ... ধুশশালা..." চেঁচিয়ে উঠে স্ত্রীকে ডাকলেন ভদ্রলোক। "হ্যারিয়েট, আমি যেন কেনি-কে কী বলতে চাইছিলাম?"

আবছাভাবে তার মায়ের কণ্ঠ ভেসে এল। "কী বললে?"

"গ্রে... মানে, গ্রে। আমি যেন গ্রে-কে কী বলতে চাইছিলাম?"

যাক, অন্তত নামের ভুলটা ধরতে পেরেছেন তিনি, ভাবল গ্রে।

কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না হ্যারিয়েট। রেগে উঠে গজগজ করতে লাগলেন ভদ্রলোক। প্রমোদ গুনল গ্রে। বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে যাওয়ার আগেই ব্যাপারটা সামলে নিতে হবে।

"বাবা?" চেঁচিয়ে উঠল গ্রে।

"কী হলো?"

"শোন, কথাটা মনে পড়লে না হয় আবার ফোন করো। ঠিক আছে?"

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ভদ্রলোক। "সেটাই বোধহয় ভালো হবে। বুঝতে পারছি না আমার কী হয়েছে! ইদানিং খালি ভুলে যাচ্ছি সবকিছু।"

"ও কিছু না, বাবা। ঠিক হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, রাখছি।"

কলটা কেটে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল গ্রে।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে শেইচান।

"এই পারিবারিক কথাবার্তা...তেমন কিছু না," বলে ভবনের প্রবেশপথের দিকে ইঙ্গিত করল সিগমা কমান্ডার। "চল, দেখা যাক ফোরটেস্কু ডায়েরীটাতে কী এমন লিখেছেন যে জিনিসটাকে একেবারে আইসল্যান্ডে লুকিয়ে রেখে আসতে হলো।"

বিকেল ৫:০১

চেয়ারে বসে জখমী পা-টা লম্বা করে মেলে দিল শেইচান। এটুকু আসতেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। এখন বসতে পেরে চোখদুটো আরামে বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে গ্রে। বাবার সাথে কথা বলার পর তার চোখেমুখে যে উদ্বিগ্নতার ছাপ ছিল, তার বিন্দুমাত্রও এখন অবশিষ্ট নেই। ভয় ছাপিয়ে কৌতুহল নিজের জায়গা দখল করে নিয়েছে।

"তো, ফোরটেস্কুর ডায়েরী থেকে কী জানতে পারলেন?" জিজ্ঞেস করল সিগমা কমান্ডার।

পায়চারি করার ফাঁকে থমকে দাঁড়ালেন ড. এরিক হেইসম্যান। ঘরটাকে আগের চাইতেও অনেক বেশি ঘিঞ্জি দেখাচ্ছে। টেবিলে স্তূপ হয়ে আছে বিভিন্ন কাগজপত্র। দরজা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র গার্ড। এই ঘরে কী হচ্ছে, এটা ভেবে হয়তো জাদুঘরের অন্যান্য লোকজন বিস্মিত হচ্ছে।

বেশভুষায় হেইসম্যানকে কিউরেটর না, বরং একজন পাগল বিজ্ঞানীর মতো দেখাচ্ছে। কুঁচকানো শার্ট, কনুই পর্যন্ত গোটানো হাতা, উষ্কখুষ্ক চুল...সব মিলিয়ে পুরোপুরি বিধ্বস্ত অবস্থা। গোটা শরীরে একমাত্র শান্ত অঙ্গ বলতে শুধু চোখদুটো। উৎসাহ আর কৌতুহলে জ্বলজ্বল করছে সেগুলো।

"সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে এখানে," বলে উঠলেন হেইসম্যান। "বুঝতে পারছি না কোত্থেকে শুরু করব। আপনারা এটা পেলেন কোথায়?"

মাথা নাড়ল গ্রে। "ওটা আপনাদের জানার দরকার নেই ডক্টর। আমাদের এই মিটিং-এর মতোই ওই বিষয়টাও বেশ গোপনীয়।"

সায় দিলেন কিউরেটর। "বুঝতে পেরেছি...বুঝতে পেরেছি।"

শেরিন নামের মেয়েটা টেবিলের একপ্রান্তে বসে আছে। গ্রে-রা আসার পর এখনও পর্যন্ত একবারের জন্যও মুখ খোলেনি সে। তার দৃষ্টি নিচে রাখা ডায়েরীর ফটোকপির উপর নিবদ্ধ। কিন্তু হেইসম্যানের তুলনায় তাকে বেশ সপ্রতিভ দেখাচ্ছে। আগের কালো পোশাকটা পাল্টে একটা ব্লাউজ আর ঢিলেঢালা অফিস স্কার্ট পরে আছে মেয়েটা।

এখনও পর্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণের মতো কিছু করেনি সে। কিন্তু শেইচান সবসময় তাকে চোখে চোখে রাখছে। সে ভেবে পাচ্ছে না, এরকম চেহারার আর ফিগারের অধিকারী একটা মেয়ে জাদুঘরের কিউরেটরের সহকারীর কাজ বেছে নিল কেন? অনায়াসেই মডেলিং- এ নাম কামাতে পারে সে।

তাছাড়া, গ্রে-কে বারবার মেয়েটার দিকে আড়চোখে তাকাতে দেখে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে শেইচান।

"শুরু থেকেই বলুন না হয়," কিউরেটরের উদ্দেশ্যে বলে উঠল গ্রে।

"সেটাই ভালো হবে," বলে গ্রে-কে একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন হেইসম্যান। "বসুন, বলছি। ব্যাপারগুলো বেশ আশ্চর্যজনক। কিন্তু আমাদের মতবাদের বেশ অনেকগুলো শূন্যস্থান পুরণ করে দিয়েছে ডায়েরীটা।"

বসে পড়ল গ্রে।

কিন্তু হেইসম্যান দাঁড়িয়েই রইলেন। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, যেন কোনও স্কুলমাস্টার তার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লেকচার শুরু করতে চলেছে। "ফ্রাঙ্কলিনের সাথে আরচার্ডের কথা হওয়ার পর থেকেই এই ডায়েরীর ঘটনাপ্রবাহ শুরু হয়েছে।"

আরচার্ড?

গ্রে বুঝতে পারল, লোকটা ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীর চরিত্রে এতটাই মজে গিয়েছে, যে এখন আর তাকে নামের প্রথম অংশ ধরে ডাকতেও দ্বিধাবোধ করছে না।

"কেনটাকিতে একটা ইন্ডিয়ান ঢিবি আবিষ্কারের পরপরই ঘটনার সূত্রপাত," বলে নিজের সহকারীর দিকে ইঙ্গিত করলেন কিউরেটর।

"সাপ আকৃতির ঢিবি," যোগ করল শেরিন। তবে কাগজ থেকে এখনও চোখ সরায়নি মেয়েটা।

"হ্যাঁ, বেশ আশ্চর্যজনক ঘটনা। তারা একটা বিশালাকায় ম্যাস্টোডনের খুলির ভেতর সংরক্ষিত সোনার পিন্ডে আঁকা একটা প্রাচীন মানচিত্র খুঁজে পায়। খুলিটাও একটা মহিষের চামড়ায় মোড়া ছিল। জেফারসনকে ইন্ডিয়ান শামান এই মানচিত্রের কথাই বলে গিয়েছিল।"

ইতিহাসে ডুবে গেছে গ্রে আর শেইচান। তাদের মুখ থেকে কোনও প্রশ্ন শুনতে না পেয়ে আবারও বলা শুরু করলেন হেইসম্যান। "কিন্তু জেফারসন এবং ফ্রাঙ্কলিনের সাথে নেটিভ আমেরিকান শামানের সম্পৃক্ততার ঘটনা ওটাই প্রথম ছিল না। চিফ ক্যানাসাটিগো অন্য একটা গোত্রের আরেকজন শামানকে জেফারসনের সাথে দেখা করানোর জন্য নিয়ে এসেছিলেন। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে নতুন জাতির পিতার সাথে দেখা করতে এসেছিল লোকটা। তার কাছ থেকেই জেফারসন পূর্ববর্তী 'বিবর্ণ ইন্ডিয়ান' সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন জেফারসন। লোকগুলো নাকি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিল। পূর্ব দিক থেকে এসেছিল এসব অতিমানবরা। এই ব্যাপারটাই ফ্রাঙ্কলিন আর জেফারসনের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।"

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে।

"শামান লোকটা সাথে করে প্রমানও নিয়ে এসেছিল। তার আনা জিনিসগুলো দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন জেফারসন আর ফ্রাঙ্কলিন," এই পর্যন্ত বলে সহকারীর দিকে তাকালেন কিউরেটর। "শেরিন, লাইনগুলো পড়ে শোনাও।"

"এক সেকেন্ড," নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাটা খুঁজে বের করল সে। "লোকটা এমন এক ধরণের সোনা এনেছিল, যেগুলোকে গলানো সম্ভব না। অভঙ্গুর এক ধরণের ধাতুতে তৈরি অস্ত্রও এনেছিল সে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, রূপালি রঙের শুষ্ক এলিক্সারগুলো। জিনিসটার শক্তি কল্পনারও অতীত।"

শেইচানের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল গ্রে। তার চুরি করা সোনার ট্যাবলেটগুলো খুব সম্ভবত ডায়েরীতে উল্লেখিত ওই পদার্থেই তৈরি। সাধারণ সোনার চেয়ে ধাতুটার ঘনত্ব অস্বাভাবিক রকমের বেশি। আর রূপালি রঙের শুষ্ক এলিক্সার... হতে পারে, উটাহ এবং আইসল্যান্ডের বিস্ফোরণের জন্য এই জিনিসটাই দায়ী।

আবারও বলা শুরু করেছেন হেইসম্যান, "ইরোকি ঐক্যজোট আসলে জেফারসনদের নতুন গঠিত জাতির একটা অংশ হতে চেয়েছিল। তাই তারা তার সাথে একটা চুক্তি করতে চায়।"

"চোদ্দতম কলোনী," যোগ করল গ্রে।

"হ্যাঁ, দ্য ডেভিল কলোনী। চুক্তিটা সম্পর্কিত কথাবার্তা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। এমনকি ইরোকিরা নিজেদের এলাকা ছাড়তেও রাজি ছিল," বলে শেরিনের দিকে ফিরলেন হেইসম্যান।

"ওরা ফ্রেঞ্চ এলাকাগুলোর ভেতর থেকে একটা বিশেষ অনাবিষ্কৃত অঞ্চল দখল করতে চায়। সেই সাথে এটাও বলছে, ওরা ভবিষ্যতে অন্যান্য কলোনীগুলোর সাথে কোনও রকম ঝামেলা পাকাবে না। একটা নতুন কলোনী গঠন এবং নতুন জাতিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার বদলে ইরোকিরা নিজেদের বর্তমান বাসস্থান পরিত্যাগের পাশাপাশি সেই অত্যাশ্চর্য জ্ঞানও আমাদেরকে দান করবে। চিফ ক্যানাসাটিগোর সাথে কথা বলে জানা গেছে ওই প্রস্তাবিত ইন্ডিয়ান কলোনীটার মধ্যভাগে হারানো একটা শহর আছে। ওটাই সেই আজব জিনিসগুলোর প্রাপ্তিস্থান। কিন্তু জায়গাটার অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানায়নি ইরোকিরা।"

সহকারীর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে টেবিলে একটা পুরনো আমেরিকার মানচিত্র ছড়িয়ে দিলেন হেইসম্যান। নিউ অর্লিয়েন্স থেকে ক্রমান্বয়ে উত্তরদিকে এগোনো ছায়াঘেরা একটা । আকৃতির অংশের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। জায়গাটা পরবর্তীতে দেশের মধ্যভাগে রূপ নেয়া বেশিরভাগ অংশগুলোকে চিহ্নিত করেছে। "জেফারসন ফ্রেঞ্চদের কাছ থেকে এই অঞ্চলটাই কিনে নিয়েছিলেন।"

"সেই বিখ্যাত লুইজিয়ানা চুক্তি," মন্তব্য করল গ্রে।

"ডায়েরীটার বক্তব্য থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে, ইন্ডিয়ানদের প্রস্তাবিত ওই চোদ্দতম কলোনীটা এই অঞ্চলের পশ্চিমদিকের কোথাও হবে। কিন্তু জায়গাটার নির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে কিছু লেখেননি আরচার্ড। কিন্তু এগুলোর ভেতর আরেকটা স্পর্শকাতর ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে।"

"কী?" প্রশ্ন করল শেইচান।

"সাপের আকৃতির ঢিবি থেকে খুলিটা উদ্ধার করার পর, ভেতরের সোনার মতো দেখতে সেই ধাতুতে আঁকা মানচিত্রে দুটো বিশেষ জায়গা চিহ্নিত করা ছিল।"

"একটা নিশ্চয়ই আইসল্যান্ড?" বলে উঠল গ্রে।

"হ্যাঁ। দ্বিতীয় জায়গাটা পশ্চিমদিকের কোথাও হবে। আরচার্ডের মতে, ওই জায়গাটাই হচ্ছে প্রস্তাবিত চোদ্দতম কলোনীর রহস্যময় কেন্দ্রস্থল। কিন্তু সমস্যা হলো, তৎকালীন মানচিত্রের পশ্চিম দিকের অংশ ততটা বিস্তৃত ছিল না। তাই জায়গাটা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। সেজন্যই মূলত আরচার্ড আগে আইসল্যান্ডে যেতে মনঃস্থির করেন।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল গ্রে। "বুঝতে পারছি না, ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক ওই মানচিত্রটার একটা কপি ডায়েরীতে যুক্ত করলেন না কেন!"

"আরচার্ডের বক্তব্য অনুযায়ী, জেফারসন ওই মানচিত্রটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলেন। কাছের লোকেরা ছাড়া কাউকে জিনিসটা দেখাননি তিনি। কোনও কপিও তৈরি করা হয়নি।"

ব্যাপারটার গোপনীয়তা অনুধাবন করতে পারছে শেইচান। "প্রেসিডেন্ট হয়তো তার সেই রহস্যময় শত্রুদের জন্য ভয় পাচ্ছিলেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। "কিন্তু সেই মানচিত্রটার কী হলো?"

জবাবের আশায় নিজের সহকারীর দিকে তাকালেন হেইসম্যান।

আবারও পড়া শুরু করল শেরিন। "রহস্যময় শত্রুদের হাত থেকে মানচিত্রটা নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে জেফারসন একটা অনন্য উপায় খুঁজে বের করেন। সোনার ভেতরেই জিনিসটা লুকিয়ে রাখেন তিনি। কেউ বুঝতেই পারবে না, সীলের ভেতর নিরাপদে লুকানো আছে বহুমূল্য মানচিত্রটা।"

সামনের দিকে ঝুঁকে এল গ্রে। "মানে?"

শ্রাগ করলেন কিউরেটর। "সেই ব্যাখ্যা তো তিনি দেননি। মুলত এটুকুই ছিল ডায়েরীর প্রথম অংশের সারমর্ম। এখনও পরের অংশটুকু অনুবাদ করছি আমরা। নৌপথে আইসল্যান্ডের উদ্দেশ্যে আরচার্ডের অভিযান দিয়ে শুরু হয়েছে ওই অংশের কাহিনী।"

এমন সময় গ্রে-র ফোনটা বেজে উঠল। পকেট থেকে জিনিসটা বের করে কলার আইডি চেক করল সে। "মাফ করবেন। মঙ্ক ফোন করেছে। আমি বরং বাইরে থেকে কথা বলে আসছি।"

সায় দিলেন কিউরেটর। পরক্ষণেই সহকারীর সাথে ডায়েরীর ফটোকপির উপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি। "তাদেরকে এটা দেখানো উচিত..." বাকি কথাটুকু ফিসফিসের আড়ালে চাপা পড়ে গেল।

শেইচানকে সাথে আসতে ইশারা করে ঘর থেকে হলওয়েতে বেরিয়ে এল গ্রে। কল রিসিভ করে ফোনটা কানে ঠেকিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে।

"আবারও কোনও ঝামেলা?" উঠে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

হাত তুলে তাকে চুপ করার জন্য ইশারা করল সিগমা কমান্ডার। ওপ্রান্তের কথা শোনা শেষ হলে কেটে দিল কলটা। "জাপানি পদার্থবিদদের সাথে কথা বলেছে মঙ্ক। বিস্ফোরণের পর আইসল্যান্ড থেকে বেশ বড় ধরণের নিউট্রিনো অ্যাক্টিভিটি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু আরেকটা সমস্যা হয়েছে। অন্য একটা জায়গা থেকে নিউট্রিনোর আলোড়ন লক্ষ্য করেছে জাপানি গবেষকরা।"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিস্ফোরনগুলোর কথা চিন্তা করল শেইচান।

প্রথমে উটাহ...তারপর আইসল্যান্ড...এখন আবার আরেকটা! এর শেষ কোথায়?

বলে চলেছে গ্রে, "গবেষকদের বক্তব্য অনুযায়ী, এবারের আলোড়নের বিস্তৃতি আরও মারাত্মক। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ, যে জায়গাটার অবস্থান চিহ্নিত করতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, জায়গাটা আমেরিকার পশ্চিমদিকের কোথাও হবে।"

"বিশাল এলাকা!"

সায় দিল গ্রে। "বিশ্বের অন্যান্য নিউট্রিনো ল্যাবের সাথে কথা বলে জায়গাটার অবস্থান নিশ্চিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন জাপানি বিজ্ঞানীরা।"

"সেক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে," বলে উঠল শেইচান।

"কী?"

"আইসল্যান্ডে গিল্ডের এজেন্টরা আমাদের উপর হামলা করেছিল। তার মানে, আমাদের মতো ওরাও কোনও একটা উৎস হতে তথ্যগুলো জানতে পারছে। আইসল্যান্ডে আমাদের পৌঁছে যেতে দেখে নিশ্চয়ই এখন আরও সতর্ক হয়ে উঠবে ওরা। ওদের কাজের ধারা সম্পর্কে বেশ ভালো করেই জানি আমি, গ্রে।"

আঁতকে উঠল গ্রে। "তাহলে, এখন?"

"এখন ওরা জাপানে আমাদের তথ্য পাওয়ার মাধ্যমটা বন্ধ করে দিতে চাইবে। কে জানে, এতক্ষণে হয়তো কাজও শুরু করে দিয়েছে।"

১ জুন, সকাল ৬:১৪
গিফু গবেষণাকেন্দ্র, জাপান

তাকে কেউ স্পর্শ করুক, এটা একদমই সহ্য করতে পারে না রিকু তানাকা। বিশেষ করে এমন উত্তেজিত অবস্থায় বোধটা আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আশেপাশের আওয়াজ থেকে বাঁচার জন্য কানে একজোড়া ইয়ারবাড গুঁজে রেখেছে সে, একমনে মনিটরে ভাসতে থাকা তথ্যগুলো সম্পর্কে ভাবছে। সেই সাথে হাতে থাকা পেনসিলটা দিয়ে টেবিলে মৃদু টোকা দিচ্ছে। ব্যাপারটা তাকে শান্ত থাকতে সাহায্য করে।

এই সাতসকালেও লোকজনের চাপে সরগরম হয়ে আছে তার কর্মক্ষেত্র। নতুন নিউট্রিনো আলোড়নটা চিহ্নিত করার পর জুন ইয়োশিদা আরও কিছু লোককে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। একটা ওয়ার্ক স্টেশনে ইয়োশিদাকে ঘিরে বসে আছে তারা সবাই, ছয়টা নিউট্রিনো ল্যাব থেকে আসতে থাকা নিউট্রিনোর রিপোর্ট সংগ্রহ করছে চারজন নতুন পদার্থবিদ এবং দুইজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। বেশি লোকজন পছন্দ না হওয়ার বাকিদের কাছ থেকে সরে এসেছে রিকু।

বাকিরা বড় সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামানোর ফাঁকে ছোট ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে সে। তার সামনে থাকা স্ক্রিনে একটা গ্লোব ভাসছে। বেশ কিছু ছোট ছোট বিন্দু চিহ্নিত করা আছে মানচিত্রটাতে। প্রতিটা বিন্দু আলাদা আলাদা ছোট ছোট নিউট্রিনো আলোড়ন বোঝাচ্ছে।

ইয়োশিদাকে দেখাতেই "কোনও কাজের না," বলে ব্যাপারটা নাকচ করে দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু রিকু তার সাথে একমত হতে পারেনি। সে জানে, এত হাঙ্গামা করেও তিনি কাজের কাজ কিছু করতে পারবেন না। আইসল্যাণ্ডের আলোড়নের মতো আমেরিকার পশ্চিম অংশের নতুন আলোড়নটাও হার্টবিটের মতো ক্রমাগত স্পন্দিত হচ্ছে। কিন্তু পার্থক্য হলো, এবারেরটা আগেরটার চাইতে প্রায় ১২৩.৪ গুণ বেশি শক্তিশালী।

সংখ্যার ক্রমগুলো তাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছে।

১,২,৩,৪...

ব্যাপারটা নিতান্তই কালতালীয়। কিন্তু ক্রমের ভেতর নিহিত সৌন্দর্য রিকুকে এক ধরণের প্রশান্তি এনে দিচ্ছে। তার মনে হয়, সংখ্যাগুলোর ভেতরের স্বচ্ছন্দতা তার চেয়ে ভালো করে কেউ অনুভব করতে পারে না।

আবারও গ্লোবের দিকে ঝুঁকে পড়ল রিকু। উটাহ এর বিস্ফোরণের পরপরই এই ছোট ছোট আলোড়নগুলো তৈরি হয়েছিল। আইসল্যান্ডের অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে ওঠার পর সে ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছে।

কোনও কাজের না...

ইয়োশিদার তিক্ত কণ্ঠটা জোর করে মাথা থেকে বের করে দিয়ে আলোড়নগুলোর ভেতর কোনও প্যাটার্ন আছে কি না যাচাই করতে লাগল সে। দুয়েকটা বিন্দু অবশ্য আমেরিকার পশ্চিমদিকেও আছে। এরকম নিউট্রিনো বন্যার কারণেই মূলত বড় আলোড়নটার অবস্থান নির্ণয় করতে হিমশিম খাচ্ছেন ইয়োশিদা।

"রিকু?"

কাঁধে কারও হাতের স্পর্শ পেল তরুণ বিজ্ঞানী। ঘাড় ঘুরিয়ে ড. জেনিস কুপারকে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে।

"দুঃখিত," তার অস্বস্তি অনুভব করতে পেরে কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল মেয়েটা।

চোখ সরু করে জেনিসের মুখের পেশিগুলোর নড়াচড়া লক্ষ্য করল রিকু। মুখভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, মেয়েটার খিদে পেয়েছে। অ্যাসপারগার্স সিনড্রোম ধরা পড়ার পর থেকে আরও জোরদার হয়েছে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি।

একটা চেয়ার টেনে পাশে বসে পড়ল জেনিস, গ্রীন টি ভরা একটা কাপ নামিয়ে রাখল তার সামনে। "মনে হলো, এটা তুমি পছন্দ করবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল রিকু। কিন্তু সে বুঝতে পারছে না, মেয়েটা তার এত কাছে ঘেঁষে বসছে কেন?

"রিকু, নতুন আলোড়ন তৈরি হওয়ার কারণ নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছি আমরা।"

"আইসল্যান্ডের নিউট্রিনোর স্রোতই নতুন একটা উৎসকে সক্রিয় করে তুলেছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এখনই কেন? উটাহ বিস্ফোরণের পরপরই আইসল্যান্ডে আলোড়ন তৈরি হলো, কিন্তু তখন এটা সক্রিয় হলো না! এই ব্যাপারটাই পদার্থবিদদের ভাবাচ্ছে।"

"উৎপত্তিগত শক্তি," স্ক্রিন থেকে চোখ না সরিয়েই জবাব দিল রিকু।

মাথা নাড়ল জেনিস, কথাটা বুঝতে পারেনি।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রিকু। "নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মতো বেশ কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়া আছে, যেগুলো উপযুক্ত শক্তি না পেলে আরম্ভ হয় না।"

"উৎপত্তিগত শক্তি?"

"হ্যাঁ। তবে জানোই তো, শক্তির ব্যাপারটা আসলে পদার্থের ভরের উপর নির্ভরশীল। আইসল্যান্ডের নিউট্রিনোর উৎসটা হয়তো ছোট ছিল। তাই উটাহ- এর বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট নিউট্রিনোর স্রোত ওটাকে সক্রিয় করে তুলেছে।"

মাথা নাড়ল জেনিস, এবার ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢুকেছে। "কিন্তু আইসল্যান্ডের নিউট্রিনোর স্রোতের বিস্তৃতি উটাহ- এর চেয়ে বড় ছিল। তাই নতুন উৎসটা এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। যদি তোমার ধারণা সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে তো নতুন ক্ষেত্রটাও আগেরগুলোর তুলনায় অনেক বড় হবে!"

"১২৩.৪ গুণ বড়," যোগ করল রিকু। সংখ্যাগুলো উচ্চারণ করতে পেরে মনে মনে শান্তি অনুভব করল সে।

ফ্যাকাসে হয়ে এল মেয়েটার মুখ। "কিন্তু এই ছোট ছোট স্পাইকগুলো সম্পর্কে কি ভাবছ তুমি?"

জবাব না দিয়ে চোখদুটো বন্ধ করে ফেলল রিকু, নতুন এই পাজলটা বেশ উপভোগ করছে সে। "ওগুলোও ওই বিস্ফোরিত হওয়া পদার্থগুলোর মতোই কোনও জিনিস হতে পারে। খুব সম্ভবত, পুরোপুরি ওই জিনিস না হলেও, কাছাকাছি পর্যায়ের কিছু।"

ঝুঁকে পড়ে স্ক্রিনের দিকে তাকাল সে। "এই যে, বেলজিয়ামে একটা। আমেরিকার পশ্চিমের বিন্দু দুটো বড় স্পাইকটার তলায় প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। তবে আমেরিকার ওই অঞ্চলটা থেকে বেশ ভালো মাপের আলোড়ন তৈরি হচ্ছে কিন্তু।"

জেনিসও মানচিত্রটার দিকে ঝুঁকে তাকাল। "কেনটাকি..."

জবাবে রিকু কিছু বলার আগেই বিকট শব্দে সাইরেন বেজে উঠল। ইমারজেন্সি লাল বাতির আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল পুরো ল্যাব। কানের ইয়ারবাড ছাপিয়ে রিকুর মাথায় যেন ছুরির ফলার মতো আঘাত করতে লাগল আওয়াজটা। আঁতকে উঠে কানে হাত চাপা দিল সে, জেনিসের টান সামলাতে না পেরে বসে পড়ল মেঝেতে।

কী হচ্ছে এসব?

ঘরের অন্যপ্রান্তে এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কালো পোশাক পরা কিছু অবয়ব। সাথে সাথে অগ্নিবর্ষণ শুরু করল তাদের হাতে থাকা অস্ত্রগুলো। গুলির আওয়াজ, সাইরেন, সেই সাথে মানুষজনের সম্মিলিত চিৎকারে মুহূর্তের ভেতর ভয়াবহ রূপ ধারণ করল পরিস্থিতি।

ডেস্কের তলায় নিচু হয়ে বসে ইয়োশিদাকে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে দেখল রিকু। গুলি খেয়ে লোকটার মুখের একপাশ উড়ে গেছে। বীভৎস দেখাচ্ছে দৃশ্যটা। হতভম্ব হয়ে মেঝেতে তৈরি হওয়া রক্তের পুকুরের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

সাথে সাথে কেউ তাকে টেনে ধরল। হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য ঝটকা মারতেই দেখা গেল, ওটা জেনিস। মুখে এক আঙুল চেপে তাকে চুপ থাকতে ইশারা করে অন্য হাতে একটা এক্সিটের দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। ওই রাস্তাটা একটা পুরনো আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনে ঢোকার প্রবেশপথ। কিন্তু বর্তমানে জায়গাটা ফ্যাসিলিটির সুপার-ক্যামিওকান্ডে ডিটেক্টরের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জেনিসের আইডিয়াটা ধরতে পেরেছে রিকু। ল্যাব ছেড়ে পালাতে হবে ওদের। হামলাকারীরা যাকে সামনে পাচ্ছে, তাকেই খুন করছে।

নিচু হয়ে ডেস্কের সারির আড়াল নিয়ে জেনিসের পিছু পিছু এগোতে লাগল সে। এক্সিট পর্যন্ত পৌঁছাতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। হলওয়েতে বের হওয়ার পর আবারও দরজাটা বন্ধ করে দিল মেয়েটা।

টানেলের সামনের দিক থেকেও গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। টানেলের ওই দিকে বের হওয়ার একটা পথ আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, জায়গাটা গার্ড দিয়ে রেখেছে হামলাকারীরা।

"এই দিকে এসো," রিকুর এক হাত ধরে টান দিল জেনিস।

একসাথে দৌড়ে অন্য আরেকটা শাখা টানেলে বেরিয়ে এল ওরা। কিন্তু রিকু বুঝতে পারছে না, তারা কোথায় যাচ্ছে। এটা তো একটা কানাগলি। এই পথ ধরে তাদেরকে খুঁজে পেতে সৈনিকদের খুব একটা বেগ পেতে হবে না।

দৌড়ে চলল ওরা। ত্রিশ মিটার সামনে একটা গুহায় এসে শেষ হয়েছে টানেলটা। মাথার উপর থাকা ডোমের মত সিলিং- এর দিকে তাকাল রিকু। পায়ের নিচে ঘুমিয়ে আছে সুপার-ক্যামিওকান্ডে ডিটেক্টর। স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি বিশালাকায় ট্যাঙ্কটা পঞ্চাশ হাজার টন বিশুদ্ধ পানিতে পরিপূর্ণ, সেই সাথে ভেতরের দেয়ালে সার বেঁধে আটকানো আছে তেরো হাজার ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব।

"চল," বলে সামনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি রাখা সেকশনের দিকে ইঙ্গিত করল জেনিস। ডিটেক্টর মেরামতের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রাখা আছে ওখানে।

পেছনের টানেলে একটা চিৎকার শোনা গেল। ধাওয়াকারীরা প্রায় পৌঁছে গেছে।

লুকানোর মতো জায়গার খোঁজে আশেপাশে তাকাল রিকু। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।

কিন্তু জেনিস আগে থেকেই প্ল্যান করেই রেখেছে। একটা ফর্কলিফটের পেছনে রাখা ডাইভিং গিয়ারের দিকে ইশারা করল সে। এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল জাপানি বিজ্ঞানী। কিন্তু পানিতে নামতে যে তার ঘোর অনীহা!

"এটাই বাঁচার একমাত্র উপায়," ফিসফিস করে কথাটা বলে তার হাতে একটা এয়ার ট্যাংক ধরিয়ে দিল জেনিস। ট্যাংকটার সাথে রেগুলেটর লাগানোই আছে। আর কোনও পথ নেই বুঝতে পেরে ট্যাংকটা জড়িয়ে ধরল রিকু। ভালভ খুলে মাউথপিসটা কামড়ে ধরল। সাথে সাথে আরেকটা ট্যাংক তুলে নিয়েছে মেয়েটা।

প্রস্তুতি নেয়া শেষ হতেই সামনে থাকা হ্যাচটা খুলে ফেলল জেনিস, তারপর রিকুকে নেমে যেতে ইশারা করল। দম আটকে ধরে, আস্তে করে ফাঁক গলে ঠান্ডা পানিতে নেমে গেল সে। পানির স্পর্শে যেন তার সারা শরীর শিরশির করে উঠল, মাউথপিসের সিলিকনে চেপে বসল দুই সারি দাঁত। ট্যাংকের ভারে দ্রুত নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল জাপানি বিজ্ঞানী। উপর দিকে মাথা তুলতেই দেখতে পেল, হ্যাচটা বন্ধ করে জেনিসও তাকে অনুসরণ করছে।

কাঁপতে কাঁপতে ডিটেক্টরের মেঝেতে বসে পড়ল রিকু। ক্রমাগত বাতাসের বুদবুদ উঠে যাচ্ছে উপরে। চারপাশে নিকষ আঁধার আতঙ্কিত করে তুলল তাকে। মন থেকে ভয় সরিয়ে ঠান্ডা ক্রমাগত সেই স্থান দখল করে নিচ্ছে।

এক মুহূর্ত পর আঁধার থেকে বেরিয়ে উষ্ণ একজোড়া হাত তাকে জড়িয়ে ধরল।
জেনিস...
জীবনে প্রথমবারের মতো নিজের গায়ে কারও স্পর্শে ভালো অনুভব করল জাপানি বিজ্ঞানী রিকু তানাকা।

৩১ মে, বিকেল ৫:৩২
ওয়াশিংটন ডি.সি.

"আরচার্ডের আইসল্যাণ্ডে পৌঁছতে পুরো একমাস লেগেছিল," বলে উঠলেন ড. হেইসম্যান। "সাগর খুব রুক্ষ ছিল।"
শেইচানের পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে গ্রে। উল্টোদিকে নিজের সহকারীর সাথে বসে ডায়েরীর বাকি অংশের সারাংশ ব্যাখ্যা করছেন কিউরেটর।
গ্রে জাপানি ফ্যাসিলিটির ব্যাপারে ক্যাটকে সতর্ক করার ফাঁকে ডায়েরীটার বাকি অংশের অনুবাদ শেষ করেছে শেরিন।
শেইচানের দিকে ঘুরে তাকাল সিগমা কমান্ডার।
ব্যাপারটা অলীক কল্পনা হয়ে যাচ্ছে না?
না।
নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিল গ্রে। অন্তত গিল্ডের ব্যাপারে মেয়েটার সিদ্ধান্তের উপর ভরসা করা যায়। অনেকদিন রহস্যময় সংগঠনটার সাথে কাজ করেছে সে। ওদের প্রতিটা পদক্ষেপ সম্পর্কে আন্দাজ করা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব। তাই জাপানি কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য ক্যাটকে জানিয়ে দিয়েছে গ্রে। কথা শেষ করে আবার ফোন করবে বলেছে সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড।
"ওই অভিযানে-" বলে চলেছেন হেইসম্যান। "-আরচার্ড ডায়েরীতে বিবর্ণ ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে বেশ কিছু মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। ওই রহস্যময় কিন্তু শক্তিশালী জিনিসগুলো ইরোকিরা ওদের কাছ থেকেই পেয়েছিল। বিভিন্ন গোত্রের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া গল্পগুলো একত্রিত করেছেন আরচার্ড। তবে সর্বোপরি, লোকগুলোকে প্রাচীন ইহুদি বলে সম্মত হয়েছে তিনি।"
"ইহুদি?" সোজা হয়ে বসল গ্রে। "কেন?"
"কারণ, সেই অদ্ভুত সোনার তৈরি মানচিত্রে খোদাই করা কিছু লেখার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। ভাষাটার সাথে হিব্রুর বেশ মিল ছিল।"
ডায়েরী থেকে পড়া শুরু করল শেরিন, "মানচিত্রে অজানা ভাষায় কিছু কথা লেখা ছিল। ওগুলো কি সেই বিবর্ণ ইন্ডিয়ানদের লেখা? ব্যাপারটা নিয়ে আমি কয়েকজন ভাষাবিদের সাথে কথা বলেছি। তারা সায় দিয়েছেন, ভাষাটা হিব্রুরই আরেকটা প্রাচীন রূপ হলেও পুরোপুরি হিব্রু না।"
শেরিন কথাগুলো পড়তে পড়তে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন হেইসম্যান। "মজার কথা হলো, শেরিনের অনুবাদ শেষ হওয়ার পর আপনি যখন ফোনে

জাপানের ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করছিলেন, তখন আমেরিকার সীলের ওই স্কেচটা সম্পর্কে আরেকটা খবর পেয়েছি আমি।"

কাগজের স্তূপ ঘেঁটে একটা পৃষ্ঠা বের করলেন কিউরেটর। "সীলের নিচে দেখুন, কয়েকটা অক্ষর লেখা আছে।"

ছবিটা আগেও দেখেছিল গ্রে। "তো?"

"প্রখ্যাত একজন ভাষাবিদকে লেখাটা দেখিয়েছিলাম আমি। এটা প্রাচীন হিব্রুরই আরেকটা রূপ, ঠিক যেমনটা আরচার্ড বলেছেন। সিলের বৃত্তের নিচে ওই হরফে 'মানাসেহ' শব্দটা লেখা আছে, ইজরায়েলের দশটা প্রাচীন গোত্রের ভেতর ওটাও একটা।"
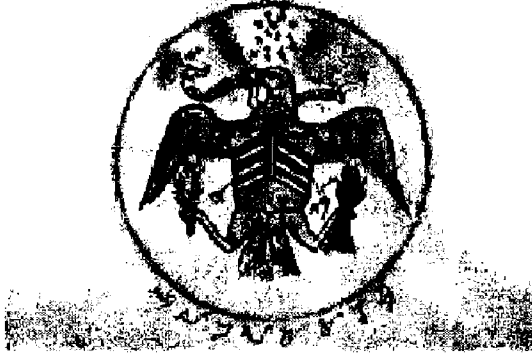
কথাটা গ্রে-র মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো। এখানে আসার কিছুক্ষণ আগে পেইন্টারের সাথে কথা হয়েছে তার। টটসি আন্টসউ পুটসিভ নামে ইজরায়েলী প্রাচীন একটা গোত্রের কথা বলেছেন ডিরেক্টর। বুক অফ মরমনেও নাকি উল্লেখিত আছে, ইজরায়েল থেকে মানাসেহ নামের একটা গোত্রের অধিবাসীরা আমেরিকায় এসে আস্তানা গেড়েছিল।

বলে চলেছেন হেইসম্যান। "আমেরিকার সীলের খসড়া করার সময় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন দ্য বুক অফ এক্সোডাসের একটা দৃশ্য অনুযায়ী ইজরায়েলীদের নির্বাসনের একটা নকশার কথা প্রস্তাব করেছিলেন। বনে দাঁড়িয়ে থাকা ইজরায়েলী শিশুদের কথাও বলেছিলেন জেফারসন।"

সীলের স্কেচটার দিকে তাকাল গ্রে। আসলেই কি ইহুদীদের আমেরিকায় পদার্পণের কথাটা তারা জানতে পেরেছিলেন? তারা কি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিবর্ণ ইন্ডিয়ানরা আসলে সেই দেশত্যাগী ইজরায়েলী গোত্র?

আপাতদৃষ্টিতে অন্তত সেটাই মনে হচ্ছে। নয়তো আমেরিকার জাতীয় সীলে ইজরায়েলীদের কোনও একটা চিহ্ন কেন যুক্ত করতে চেয়েছিলেন তারা?

হেইসম্যানের পরের কথাগুলোও গ্রে-র বক্তব্যকে সমর্থন করল। "অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পেরেছি, ইজরায়েলের প্রতিটা গোত্রের নিজস্ব কিছু চিহ্ন ছিল। জলপাইয়ের ডাল আর তীরের গোছা ছিল মানাসেহ-দের বিশেষ প্রতীক।" বলে গ্রে-র দিকে ফিরে তাকালেন কিউরেটর। "জাতির পিতারা মানাসেহ-দের প্রতীকগুলোকে কেন আমাদের সীলে অন্তর্ভুক্ত করলেন?"

গ্রে একবার ভাবল, উত্তরটা ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু আরেকটা চিন্তা চলে এসেছে তার মাথায়। "সবই তো বুঝলাম, কিন্তু চলুন এখন ফোরটেস্কুর আইসল্যান্ড অভিযানে ফিরে যাওয়া যাক।"

কথাটা শোনার পর হতাশ দেখাল কিউরেটরকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সীলের স্কেচটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন তিনি। "ঠিক আছে, বেশ। যা বলছিলাম, রওনা হওয়ার প্রায় একমাস পর আইসল্যান্ডে পৌঁছেছিলেন আরচার্ড। সঠিক দ্বীপটা খুঁজে বের করার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকলেও, টানা বাইশ দিন অনুসন্ধান চালানোর পরও তার লোকেরা তেমন কিছু খুঁজে পায়নি। তারপরই একজন সহকারী লুকানো গুহাটা আবিষ্কার করে।"

"বিবর্ণ ইন্ডিয়ানদের লুকানো গুহা," যোগ করল শেইচান।

সায় দিলেন কিউরেটর। "গুহাটার ব্যাপারে ডায়েরীতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন আরচার্ড। ওখানে শত শত পাথরের বাক্স খুঁজে পান তিনি। বাক্সগুলোর ভেতর সেই প্রাচীন হিব্রু হরফ খোদাই করা প্রচুর পরিমাণ সোনার প্লেট ছিল। সেই সাথে রহস্যময় রূপালি রঙের শুষ্ক এলিক্সার ভরা চারটা পাত্রও খুঁজে পান আরচার্ড। এই যে, ওগুলোর ছবি।"

কণ্ঠ শুনে কিউরেটরকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে। গ্রে আর শেইচানের দিকে একটা পৃষ্ঠা এগিয়ে দিলেন তিনি। "এলিক্সার ভরা সোনার পাত্র।"

চোখ সরু করে কাগজটার দিকে তাকাল গ্রে। ছবিটাতে লম্বাটে আকারের চারটা ঢাকনাওয়ালা পাত্র দেখা যাচ্ছে। জিনিসগুলোর উপরের দিকে আলাদা আলাদা অবয়ব খোদাই করাঃ একটা বাজপাখি, একটা বেবুন, একটা নেকড়ে, একটা হুডপরা মানুষের মাথা।
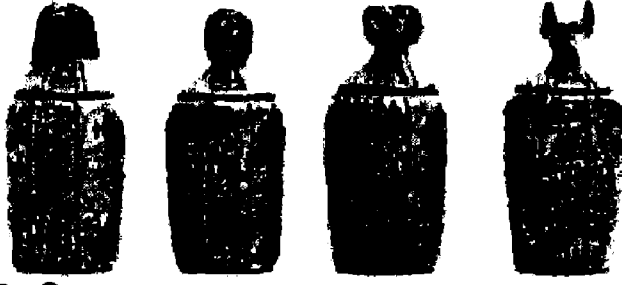
"এগুলোকে তো মিশরীয় বোতলের মতো দেখাচ্ছে," মন্তব্য করল গ্রে।

"হ্যাঁ," সায় দিলেন হেইসম্যান। "আরচার্ডও তাই ভেবেছিলেন। এই থেকে অবশ্য লোকগুলোর মিশরীয় শেকড়ের কথা আঁচ করা যায়। তিনি এটাও আন্দাজ করেছিলেন যে, বিবর্ণ ইন্ডিয়ানরা আসলে হলি ল্যান্ড থেকে নির্বাসিত ম্যাজাইদের কোনও সম্প্রদায়, যাদের গায়ে ইহুদী এবং মিশরীয়- দুই ধরণের রক্তই বইছে। কিন্তু এর পর কোনও সিদ্ধান্ত না দিয়েই অন্য দিকে ঘুরে গিয়েছে তার লেখনী। মনে হয়েছে, যেন ভীত হয়ে পড়েছিলেন আরচার্ড।"

"কেন?"

হেইসম্যানের ইঙ্গিতে ডায়েরী পড়া শুরু করল শেরিন। "শুনলাম, দ্বীপে একটা জাহাজ ভিড়েছে। তার মানে, শত্রুরা আমাদের হদিস পেয়ে গেছে। কিন্তু এই অমূল্য সম্পদগুলো কিছুতেই ওদের হাতে পড়তে দেয়া যাবে না। আমি এবং আমার লোকেরা ধাওয়াকারীদের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব, উপকূলের দিকে এগিয়ে যাব আমরা। আমি এই মহামূল্যবান জিনিসগুলোর কিছুটা নমুনা সাথে নিচ্ছি। আশা করা যায়, নিরাপদেই আমেরিকায় পৌঁছতে পারব। কিন্তু, কোনও কারণে যদি সেটা না পারি, সেজন্য এই ডায়েরীটা এখানে গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি আমি।"

"এখানেই এসেই শেষ হয়ে গেছে ডায়েরী," ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন হেইসম্যান। "কিন্তু পরবর্তীতে কী হয়েছে তা তো আমরা জানিই।"

"ল্যাকি অগ্ন্যুৎপাত," বলল গ্রে।

"আগ্নেয়গিরিটার অবস্থান উপকূলরেখা থেকে বেশ কাছেই। ঘটনাটা ঘটার আগেই দূরে সরে যেতে পেরেছিলেন আরচার্ড। তারপরই ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়।"

আকারে ছোট হলেও এরকম একটা ঘটনা নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখেছে গ্রে। মনে মনে দৃশ্যটা কল্পনা করল সে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন হেইসম্যান। "তারপর, জেফারসনের চিঠি থেকে জানতে পারি, নিজের পদক্ষেপের জন্য আফসোস শুরু করেন আমাদের এই ফ্রেঞ্চ অভিযাত্রী। অগ্নুৎপাতের পেছনে নিজেকে দায়ী করেন তিনি।"

"বিশ বছর পর জেফারসনের কাছ থেকে আরেকটা অভিযানের প্রস্তাব পাওয়ার আগ পর্যন্ত। তারপর লুইস আর ক্লার্কের সাথে পশ্চিমের অভিযানে যোগ দেন তিনি।" পাজলের টুকরোগুলো খাপে খাপে বসাতে শুরু করেছে গ্রে। "একটু আগে আপনার দেখানো মানচিত্রে উল্লেখিত তারিখ অনুযায়ী, আঠারোশো তিন সালে লুইজিয়ানা চুক্তি সাক্ষর করেন জেফারসন। এর পরপরই বিশ্বস্ত বন্ধু ক্যাপ্টেন মেরিওয়েদার লুইসকে ক্লার্কের সাথে, উক্ত ফ্রেঞ্চ অধ্যুষিত অঞ্চলে বিশেষ একটা অভিযানে পাঠান তিনি।"

গ্রে-কে নিজের কথাতেই বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছে। "ফোরটেস্কুও তাদের সাথে গিয়েছিলেন। আসলে ইন্ডিয়ান ম্যাপে চিহ্নিত সেই প্রস্তাবিত ডেভিল কলোনীর কেন্দ্রস্থল খুঁজে বের করার জন্যই পাঠানো হয়েছিল তাকে।"

"হয়তো জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি," যোগ করল শেইচান। "ভুলে গেলে চলবে না, অভিযানের পর ফোরটেস্কুর আর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। আর লুইসকেও খুন করা হয়েছিল।"

হেইসম্যানের দিকে ফিরে তাকাল গ্রে। "লুইস আর ক্লার্কের অভিযানের ট্রেইল উল্লেখিত এমন কোনও মানচিত্র আছে আপনার কাছে?"

"হ্যাঁ, এক সেকেন্ড।" সায় দিয়ে কাগজপত্রের স্তূপ ঘাঁটতে লাগলেন কিউরেটর। "এই যে।"

কাগজটার উপর ঝুঁকে পড়ল গ্রে। সেইন্ট চার্লস থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্প উড, তারপর মিসৌরি হয়ে প্যাসিফিক সাগরের উপকূলে ক্ল্যাটসোপ আমের একটা দুর্গে এসে শেষ হয়েছে ট্রেইলটা।

"এই রুটেরই কোনও একটা জায়গায়, কিংবা তার আশেপাশেই কোথাও লুকানো আছে সেই রহস্যময় ডেভিল কলোনী।"

কিন্তু কোথায়?

এমন সময় আবার গ্রে-র ফোনটা বেজে উঠল। কলার আইডি চেক করতেই দেখা গেল, সিগমার ইমারজেন্সি নাম্বার থেকে কল এসেছে। শেইচানও নাম্বারটা দেখতে পেয়েছে।

"আসছি," বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল গ্রে। শেইচানও তাকে অনুসরণ করল।

কল রিসিভ করে ফোনটা কানে ঠেকাল সিগমা কমান্ডার। "মঙ্ক?"

"গ্রে, ক্যাট বলছি। মঙ্ক তোমার কাছে যাচ্ছে।"

"কী হয়েছে? জাপান থেকে কোনও খবর এসেছে?"

"খারাপ খবর। ফ্যাসিলিটিতে হামলা হয়েছে। একটা অ্যাসল্ট টিম ল্যাবের প্রায় সবাইকে মেরে রেখে গেছে।"

গ্রে-র মনটা খারাপ হয়ে গেল। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে বেশ দেরি হয়ে গেছে ওদের।

বলে চলেছে ক্যাট, "কিন্তু দু'জন কোনওমতে পালিয়ে বেঁচেছে। ফ্যাসিলিটির নিউট্রিনো ডিটেক্টরের পানির টাংকি থেকে ওদের উদ্ধার করেছে নিরাপত্তাকর্মীরা। আমাদের অনুরোধে জাপানি ইন্টেলিজেন্সের কাস্টডিতে রাখা হয়েছে ওদের।"

অন্তত একটা কাজের কাজ হয়েছে, ভাবল গ্রে। ওই দু'জনের বেঁচে যাওয়ার খবর বাইরে প্রকাশ না পেলে গিল্ডের চেয়ে এক কদম এগিয়ে থাকতে পারবে ওরা। ক্যাটও নিশ্চয়ই এটা আন্দাজ করতে পেরেই জাপানি ইন্টেলিজেন্সের সাথে যোগাযোগ করেছিল।

ক্যাটের কথা এখনও শেষ হয়নি। "ওদের একজনের সাথে কথা বলেছি আমি। মেয়েটা আমেরিকান পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট। ও জানিয়েছে, হামলার আগপর্যন্ত নতুন নিউট্রিনো আলোড়নের উৎসটার অবস্থানের ব্যাপারে কোনও কূলকিনারা বের করতে পারেনি গবেষকরা। কিন্তু বেঁচে যাওয়া আরেক জাপানি বিজ্ঞানীর আবিষ্কার, অন্য আরেকটা ব্যাপারের কথা উল্লেখ করেছে মেয়েটা। সে নাকি আরও বেশকিছু ছোট ছোট আলোড়ন চিহ্নিত করতে পেরেছিল। বিস্তারিত খবর না পেলেও কয়েকটা বিন্দুর অবস্থান শনাক্ত করা গিয়েছে।"

"কোথায়?"

"আমেরিকার পশ্চিমদিকে দুয়েকটা আছে, কিন্তু বড় আলোড়নের আড়ালে এই জায়গাগুলোর স্পাইক চাপা পড়ে গিয়েছে। অন্য বিন্দুগুলোর একটা বেলজিয়ামে অবস্থিত।"

সাথে সাথে আরেকটা কথা মনে করতে পারল গ্রে। এলিরেই দ্বীপে যাওয়ার সময় ক্যাপ্টেন হান্ড বলেছিলেন, দ্বীপে আসা শিকারীদের দলটা বেলজিয়ামের অধিবাসী। মঙ্কও হয়তো ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। এটা কি নিতান্তই কাকতালীয়? মনে তো হয় না।

ক্যাটকে কথাটা বুঝিয়ে বলল গ্রে। "আইসল্যান্ডের হামলাকারীরা বেলজিয়াম থেকে এসেছিল। হয়তো দুটো ঘটনার ভেতর কোনও সম্পর্ক আছে। কিন্তু অন্য উৎসটার ব্যাপারে পদার্থবিদদের অভিমত কী? কোথায় ওটা?"

"কেনটাকি-তে।"

কেনটাকি!

বলে চলেছে ক্যাট, "তোমাদের তুলে নিতে আসছে মঙ্ক। পনেরো মিনিটের ভেতর রওনা হয়ে যাবে সবাই। এই তথ্যগুলোর ব্যাপারে আমাদের যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকতে হবে।"

"ডিরেক্টর ক্রো কী বললেন?"

"তার সাথে কথা হয়নি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, মরুভূমির দিকে যাচ্ছিলেন তারা। নতুন কোনও খবর পেলে যাত্রাপথে তোমাদের জানিয়ে দেব আমি। কিন্তু এখন দেরি করা মোটেও ঠিক হবে না। ইতিমধ্যে আমি প্রেসিডেন্টের চিফ অফ স্টাফের সাথেও কথা বলে নিয়েছি।"

কথাটা শুনে বিস্মিত হলো গ্রে। "এসবের ভেতর আবার প্রেসিডেন্ট গ্যান্ট-কে টেনে আনার কী দরকার?"

"কারণ এখন যেখানে যাচ্ছ, সেখানে ঢোকার জন্য প্রেসিডেন্টের অনুমতি লাগবে তোমাদের।"

"কোথায় যাব আমরা?"

উত্তরটা শুনে আবারও স্তম্ভিত হয়ে গেল সিগমা কমান্ডার। আরও কিছু পরামর্শ দেয়ার পর কল কেটে দিল ক্যাট।

ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে ঘাড় ঘোরাতেই গ্রে দেখতে পেল, শেইচান সরাসরি তার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। "আবার কোথায় যেতে হবে আমাদের?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গ্রে।

"ফোর্ট নক্স।"

তৃতীয় অংশ

গোল্ড রাশ

অধ্যায় ২৫
৩১ মে, দুপুর ২:৫৫
অ্যারিজোনা মরুভূমি

"আপনারা যা করছেন, সেটা কিন্তু স্টেট আর ফেডারেল আইন- দুটোরই পরিপন্থী," বলে উঠল ন্যান্সি টিসো।

মেয়েটার কথায় কান দিলেন না পেইন্টার, একটা ছুরি দিয়ে ব্লোহোল আর ঢাকনাটার মাঝে থাকা সিমেন্টের মতো জিনিসগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলছেন তিনি।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরপরই তাকে সতর্ক করার চেষ্টা করছে পার্ক রেঞ্জার। কোয়ালস্কি তাকে পাহারা দিচ্ছে। কাজ শুরু করার আগে ন্যান্সির কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়েছিল সে। ব্যাপারটা আরও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে মেয়েটাকে।

"দুঃখিত, ন্যান্সি," বলে উঠলে হ্যাঙ্ক কানোশ। "যথাসম্ভব সাবধানে কাজ করছি আমরা।"

কথাটার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই যেন আস্তে করে কিছুটা সিমেন্টের মতো পদার্থ তুলে ফেললেন তিনি। পাশে দাঁড়িয়ে একমনে তাদের কাজ দেখছে কাউচ। কুকুরটা মনে হচ্ছে বেশ মজা পাচ্ছে।

চড়া রোদের ভেতর একমনে কাজ করছেন পেইন্টার। পাঁচ মিনিট পর, সবটুকু সিমেন্ট তুলে ফেলতেই ঢাকনাটা কাঁপতে শুরু করল।

"ঢিলে হয়ে এসেছে," মন্তব্য করলেন হ্যাঙ্ক। "ভেতর থেকে আসা বাতাসের চাপে প্লেটটা নড়তে আরম্ভ করেছে।"

সায় দিলেন পেইন্টার। একটু ফাঁক খুঁজে পেতেই, ছুরিটার চ্যাপ্টা ফলা ভেতরে ঢুকিয়ে চাপ দিতে লাগলেন তিনি। ঢাকনাটার ভেতরে দিকে বোতলের কর্কের মতো ভেতরদিকে সরু হয়ে এসেছে। জোরে চাপ দিতেই একদিকের অংশ খানিকটা উপরে উঠে এল।

ঢাকনাটা প্রায় চার ইঞ্চি সমান পুরু। টান দিয়ে পুরো পাথরের খন্ডটা একবারে তুলে ফেলতে চাইলেন হ্যাঙ্ক। কিন্তু তার একার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব না।

কোয়ালস্কির দিকে ফিরে তাকালেন প্রফেসর "এদিকে এসো। হাত লাগাও আমার সাথে।"

রেঞ্জারের দিকে ইশারা করল বিশালদেহী লোকটা। "তাহলে ওকে কে দেখবে?"

ছুরি হাতে খানিকটা পিছিয়ে এলেন পেইন্টার। এখন তারা যেটা করতে চলেছেন, তার জন্য ন্যান্সির সহযোগিতা দরকার হবে। মেয়েটাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে মনঃস্থির করলেন তিনি।

"রেঞ্জার টিসো, আশা করি আপনি উটাহ আর আইসল্যান্ডে সাম্প্রতিক অগ্ন্যুৎপাতের ব্যাপারে শুনেছেন।"

রাগী চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেও, মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটা।

"আমরা যা করতে চলেছি, সেই কাজটা ওই দুটো ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। একটু বোঝার চেষ্টা করুন। ইতিমধ্যে অনেক মানুষ মারা গেছে। আমরা ব্যর্থ হলে আরও অনেকে মরবে। সমস্যাগুলোর সমাধান নিচে পাব বলে আশা করছি আমরা।"

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পার্ক রেঞ্জার। "মানে?"

এবার হ্যাঙ্ক মুখ খুললেন। "আনাসাযি। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, সাম্প্রতিক অগ্ন্যুৎপাতগুলোর সাথে সানসেট ক্রেটার পার্কের আগ্নেয়গিরির জন্ম এবং আনাসাযিদের অন্তর্ধানের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আপাতত এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে পারছি না। তবে জেনে রাখুন, ঢাকনাটার উপরে খোদাই করা এই চাঁদ আর তারা ওই বিপর্যয়গুলোকেই ইঙ্গিত করছে।"

"সাধারণ মানুষের প্রাণ রক্ষা করতে হলে-" জোর দিলেন পেইন্টার, "-নিচে যেতেই হবে আমাদের।"

বিহ্বল দৃষ্টিতে পালাক্রমে হ্যাঙ্ক আর পেইন্টারের মুখের দিকে তাকাল ন্যান্সি। এক মুহূর্ত নীরবতার পর অবশেষে মুখ খুলল সে। "ঠিক আছে। একটা সুযোগ দিচ্ছি আপনাদের। তবে যা করার, সাবধানে করবেন।"

কোয়ালস্কির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রেঞ্জার। "আমি কি আমার অস্ত্রটা ফেরত পেতে পারি?"

মেয়েটার অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করলেন পেইন্টার। অস্ত্রটা হাত করার জন্য এটা একটা চাল না তো? মনে তো হচ্ছে না। কোয়ালস্কিকে পিস্তলটা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ইশারা করলেন তিনি।

প্রতিবাদ জানাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল বিশালদেহী লোকটা। পিস্তলটা বাড়িয়ে দিল ন্যান্সির দিকে। অস্ত্রটা হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল মেয়েটা, তারপর কোমরের হোলস্টারে রেখে দিল। "চলুন, আমিও হাত লাগাই," কোয়ালস্কিকে ইশারায় ঢাকনাটা দেখাল সে।

ছুরি দিয়ে আবারও পাথরটার নিচে চাপ দিতে লাগলেন পেইন্টার। হ্যাঙ্ক, কোয়ালস্কি আর ন্যান্সি তিনজনের সম্মিলিত টানে আস্তে আস্তে উঠে এল চাঁদ-তারা আঁকা ঢাকনাটা। জিনিসটা গড়িয়ে নিয়ে গহ্বরের একপাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল কোয়ালস্কি।

ব্যাগ থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করে সদ্য উন্মুক্ত গর্তের দিকে তাক করলেন পেইন্টার।

"সিঁড়ি আছে এখানে," বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল ন্যান্সি।

সাথে সাথে গর্তের দিকে উঁকি দিলেন হ্যাঙ্ক। সিঁড়ি বলা হলেও আদতে ওগুলো পা রাখার জন্য সামান্য গর্ত ছাড়া আর কিছুই না। তারপরও, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। অন্তত পক্ষে ভেতরে নামার জন্য দড়ির প্রয়োজন পড়বে না।

সামনে এগিয়ে এসেই নাক সিঁটকাল কোয়ালস্কি। "ধুরো...কি বাজে গন্ধ!"

মাথা নাড়লেন হ্যাঙ্ক। তিনিও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন। "সালফার। আর বেশ গরমও মনে হচ্ছে। তবে ব্লোহোল সাধারণত এরকম হয় না।"

ন্যান্সির দিকে ফিরে তাকালেন পেইন্টার। "আপনি কি এখানে অপেক্ষা করতে পারবেন? অন্তত ঘন্টা দুয়েক। তার ভেতর আমরা না ফিরলে না হয় সাহায্যের জন্য কল করবেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটা।

"কিন্তু দয়া করে দুই ঘন্টা সময় আমাদের দিন," যোগ করলেন সিগমা ডিরেক্টর। ভয় পাচ্ছেন, তারা নিচে নামার সাথে সাথেই না রেঞ্জার আবার কিছু করে বসে।

"কথা যখন দিয়েছি, তখন সেটা রক্ষা করব।"

গর্তের দিকে এগিয়েই সাথে সাথে লাফিয়ে সরে এল কাউচ। সালফারের গন্ধে কুকুরটার কাছ থেকে এর থেকে ভালো ব্যবহার আশা করা যায় না।

কাউচের ফিতাটা ন্যান্সির দিকে এগিয়ে দিলেন হ্যাঙ্ক। "ওকে একটু দেখে রাখবেন।"

সায় দিল রেঞ্জার। "আর কি ই বা করার আছে? কুকুরটার বুদ্ধি আপনাদের থেকে বেশি। নিশ্চয়ই ওখানে নামতে যাবে না ও।"

সব ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পর সিগমা কমান্ডে ফোন করলেন পেইন্টার। লিসা আর ক্যাটকে বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানালেন। কথা শেষ হয়ে গেলে আস্তে আস্তে নামতে শুরু করলেন টানেল বেয়ে।

একটা ফ্ল্যাশলাইট হাতে আগে আগে নামছেন তিনি, তারপর হ্যাঙ্ক, সবার শেষে আরেকটা লাইট নিয়ে কোয়ালস্কি।

একটু পরই হাঁপিয়ে উঠল সবাই। পথ যেন ফুরাবে না বলে পণ করেছে। নিচে নামার সাথে সাথে আরও গরম হয়ে আসছে বাতাস। সালফারের ঝাঁজ আরও তীব্র হয়েছে। পেইন্টারের চোখমুখ জ্বলতে শুরু করল।

"মনে হচ্ছে, মেসার বেশ গভীরে চলে এসেছি আমরা," বলে উঠলেন হ্যাঙ্ক। বাতাসের ঝাঁজের কারণে একটু পরপর কেশে উঠছেন তিনি। "অন্তত একশো গজ তো হবেই। টানেলের পাথর দেখুন, স্যান্ডস্টোন ফুরিয়ে গিয়ে চুনাপাথরের স্তর চলে এসেছে।"

কথা না বলে চুপচাপ নেমে চললেন পেইন্টার। খানিকক্ষণ পর কানে হিসহিস আওয়াজ আসার পাশাপাশি ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় নিচে মেঝে দেখা গেল।

অবশেষে...

আস্তে আস্তে শেষ কয়েকটা ধাপ পার হলেন তিনি, তারপর গুহার দেয়াল ছেড়ে দিয়ে একপাশে নেমে দাঁড়ালেন। পেছন পেছন বাকি দু'জনও নেমে এল।

আশাপাশের দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল কোয়ালস্কি। "হে ইশ্বর!"

পেইন্টার আর হ্যাঙ্কও কম অবাক হননি।

বিশালাকায় একটা গুহার প্রবেশপথে এসে উন্মুক্ত হয়েছে টানেলটা। গম্বুজাকৃতির ছাদটা পাঁচতলা বাড়ির সমান উঁচু। মনে হচ্ছে যেন, চুনাপাথরের ভেতরকার বিশাল একটা বুদবুদে এসে উপস্থিত হয়েছেন তারা।

গুহার বামদিকের মেঝেতে চওড়া ফাটল বেয়ে একটা নদী বইছে। কিন্তু নদীটা পানির না, গলিত গরম পাথর আর কাদার। সালফারের ঝাঁজে ভারি হয়ে আছে আশেপাশের বাতাস। গুহার প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে থাকা একটা বিশালাকায় লেকে গিয়ে শেষ হয়েছে নদীটা। উল্টোদিকের দেয়ালের ফাটল বেয়ে আরও কয়েকটা কাদার ধারা চুইয়ে এসে লেকে পড়ছে। লেকের অপর প্রান্তে একটা ঘাটের মতো জায়গা থেকে আরেকটা নদী তৈরি হয়ে হারিয়ে গেছে সামনের কালো টানেল ধরে।

"চমৎকার," হ্যাঙ্কের কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়। "ভূগর্ভস্থ কাদার নদী। এটা নিশ্চয়ই কলোরাডো মালভূমির নিচ দিয়ে বয়ে চলা সানফ্রান্সিসকো রেঞ্জের ভূ-তাপীয় ধমনীগুলোর একটা।"

কিন্তু তাদের আগেও কেউ এই জায়গা আবিষ্কার করেছে।

একটা ব্রিজ উপর দিয়ে কাদার নদীটাকে অতিক্রম করেছে। সিমেন্টের মতো বস্তুর সাহায্যে একের পর এক স্যান্ডস্টোনের ব্লক জুড়ে বানানো হয়েছে ব্রিজটা। গঠন এবং নির্মাণশৈলী দেখে বোঝা যাচ্ছে, এটা পুয়েবলো ইন্ডিয়ানদের হাতের কাজ।

"প্রাচীন লোকেরা জিনিসটা বানাল কীভাবে?" জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি।

জবাবটা হ্যাঙ্ক দিলেন, "এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীরা নির্মানকাজে বেশ দক্ষ ছিল। উপরের বাড়িগুলো দেখেই কিন্তু সে সম্পর্কে ধারণা করা যায়। খুব সম্ভবত, হাতে হাতে পাথরের ব্লকগুলো নিচে নামিয়ে এনেছিল তারা।"

সামনে দিকে এগোলেন প্রফেসর। মেঝেতে পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও, গুহামুখ থেকে ব্রিজের গোড়া পর্যন্ত একটা ট্রেইল আছে। তার পিছু নিলেন পেইন্টার। ব্রিজের অপর প্রান্তে, একটা টানেলের প্রবেশপথ যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মনে হচ্ছে, তাদের মাটির নিচের অভিযান এখনও শেষ হয়নি।

ব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছাতেই আরও গরম হয়ে এল পরিবেশ। সালফারের ঝাঁজের কারণে শ্বাস নেয়াই দুরূহ হয়ে পড়েছে। উল্টোদিকের টানেল থেকে বাতাসের প্রবাহ না থাকলে হয়তো এতক্ষণে দম আটকে পড়ে থাকতে হত সবাইকে।

"কী মনে হয়, ব্রিজটা নিরাপদ?" জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি।

"শত শত বছরেও যখন কিছু হয়নি, তাহলে আমাদের ভারে এটা ভেঙে পড়বে বলে মনে হয় না।" জবাব দিলেন পেইন্টার। "কিন্তু সবার আগে আমি যাচ্ছি। যদি সহি সালামতে ওপাশে পৌঁছাতে পারি, তাহলে আপনারা একজন একজন করে উঠবেন।"

"সাবধানে যাবেন," সতর্ক করলেন হ্যাঙ্ক।

আস্তে আস্তে ব্রিজের উপর একটা পা তুলে দিলেন সিগমা ডিরেক্টর। বেশ শক্তপোক্তই মনে হলো। তারপর আরেক পা এগিয়ে, শরীরের পুরো ভর পাথরের উপর চাপিয়ে দিলেন তিনি। এবার যেন একটু কেঁপে উঠল কাঠামোটা। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন পেইন্টার। নিচে গরম কাদা থেকে বুদবুদ উঠছে। পড়ে গেলে পুরোপুরি ভাজা ভাজা হয়ে যেতে হবে।

"ঠিক আছেন?" চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল কোয়ালস্কি।

বুড়ো আঙুল উঁচু করে তাকে সব ঠিকঠাক আছে বলে ইশারা করলেন পেইন্টার। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে পেরিয়ে গেলেন ব্রিজটা। ওপাশের মাটিতে পা রেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচালেন সিগমা ডিরেক্টর।

"আমরা কি আসব?" জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঙ্ক।

হাত তুলে তাদের আগে বাড়তে ইশারা করলেন পেইন্টার।

কয়েক মুহূর্ত পরই হ্যাঙ্ক আর কোয়ালস্কিকে ব্রিজের এপারে পেইন্টারের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। একসাথে সামনের টানেলের দিকে যাত্রা করলেন সবাই।

টানেলের মুখের সামনে পৌছতেই এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া তাদের গা জুড়িয়ে দিল।

হাত সামনে দিয়ে ঠান্ডা ভাবটা পুরোপুরি উপভোগ করল কোয়ালস্কি। "কোত্থেকে আসছে এটা?"

"চল, দেখা যাক," বলে সামনের দিকে এগোতে ইশারা করলেন পেইন্টার।

"মনে হচ্ছে, গুহাটা সামনে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত," হাঁটার ফাঁকে ফাঁকে বলে উঠলেন হ্যাঙ্ক। "এরকম ঠান্ডা প্রবাহের জন্য অনেক বাতাস প্রয়োজন। পেছনের গুহার পরিবেশ অনেক গরম, সেজন্যই নিচের অপেক্ষাকৃত শীতল বাতাস ক্রমাগত উপরে উঠে যাচ্ছে।"

উপাতকির ব্লোহোলের কথা মনে করতে পারলেন পেইন্টার। গুহাগুলোর বিস্তৃতি নাকি প্রায় সাত বিলিয়ন ঘনফুট। কিন্তু কথা হচ্ছে, তাদের গন্তব্যটা কোথায়?

ক্রমেই নিচু হয়ে আসতে লাগল টানেলটা, আস্তে আস্তে ঠান্ডার পরিমাণও বাড়ছে। আরও দশ মিনিট পর, পাথরের গায়ে জায়গায় জাগায় বরফের প্রলেপ চোখে পড়ল।

ন্যান্সি অনেক আগেই তাদেরকে ভূগর্ভস্থ বরফাবৃত লাভা টিউবের কথা বলেছিল। খুব সম্ভবত, এটাও তেমনি একটা বরফে ঢাকা লাভা টিউব।

আস্তে আস্তে পথটা আরও ঢালু হয়ে আসতে লাগল। হঠাৎ বরফে পা পিছলে পড়ে গেল কোয়ালস্কি। গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার ফাঁকে খিস্তি বেরিয়ে এল বিশালদেহী লোকটার মুখ দিয়ে।

"ধুশশালা!"

কিছু না বলে চুপচাপ এগিয়ে চললেন পেইন্টার। কয়েক মুহূর্ত পর অবশেষে ফ্লাশলাইটের আলোয় টানেলের শেষপ্রান্ত নজরে এল।

বরফে ঢাকা মেঝেতে পা টেনে টেনে কোনওরকমে টানেল থেকে বেরিয়ে এলেন তারা। পরক্ষণেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, টানেল বেয়ে আরেকটা গুহায় এসে হাজির হয়েছেন সবাই।

কিন্তু আসল চমক এখনও বাকি।

সামনের দৃশ্য দেখে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি।

"অবশেষে ওদের খুঁজে পেয়েছি আমরা," হ্যাঙ্কের কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়।

কী খুঁজে পেয়েছেন, কথাটা তাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করলেন না পেইন্টার। উত্তরটা চোখের সামনেই আছে।

আনাসাযি...

আনাসাযিদের খুঁজে পেয়েছেন তারা।

বিকেল ৪:১৪

"পুরো ভিডিও গেমের মতো, তাই না?" অনেকটা আপন মনেই বলে উঠলেন রাফায়েল।

একটা প্রাইভেট মিলিশিয়া গ্রুপের কাছ থেকে দুটো হেলিকপ্টার ভাড়া করে এনেছেন তার লোকেরা। সেগুলোরই মধ্যেই একটার পেছনের কেবিনে এখন বসে আছেন তিনি।

নিয়মিত মেক্সিকো সীমান্তে নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হলেও, এখন মেসার এক মাইল দূরে, অ্যারিজোনা মরুভূমিতে শান্ত হয়ে বসে আছে বুলেটপ্রুফ আস্তরণ দেয়া কপ্টারদুটো।

কেবিনে থাকা দুটো সুইভেল চেয়ারের একটায় বসে আছেন রেফ। সামনে বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে ভরা একটা দেয়াল। নানারকম কনসোলের পাশাপাশি সেখানে ডিজিটাল রেকর্ডার, ডিভিডি প্লেয়ারসহ তিনটা এলসিডি মনিটরও আছে।

মাঝখানের মনিটরে মেসার একপাশের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বার্নের হেলমেটে আটকানো ক্যামেরা থেকে লাইভ ফিড আসছে। কমান্ডো টিম সাথে নিয়ে পদে পদে মেসার দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে রেফের সেকেন্ড ইন কমান্ড।

পেছনে বসে থাকা কাই-এর দিকে নিজের চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিলেন রেফ। চুপচাপ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। রেফের বিশ্বাসঘাতকতায় বেশ হতভম্ব হয়ে পড়েছে সে। আইরিস আর আলভিনকে গুলি করার পর থেকে আর একটা কথাও বলেনি। অবশ্য শুধু শুধু হাতে রক্ত লাগানো রেফের নিজেরও পছন্দ না। কিন্তু হোপি ইন্ডিয়ানদের কেবিনে পৌছানোর ধকল, সেই সাথে ক্রমাগত বুড়োবুড়ির "জানি না...জানি না" কথায় বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

শুধু শুধু প্রাণ দিল নিরীহ মানুষদুটো।

চেয়ার ঘুরিয়ে আবারও স্ক্রিনের দিকে নজর দিলেন রেফ। বার্নের দলটা ইতিমধ্যে মেসার উপরে পৌছে গেছে। স্যাটেলাইটের ঝাপসা ক্যামেরায় এখান থেকেই পেইন্টারদের আরেকটা ফাটলের ভেতর হারিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

সিগমা ডিরেক্টরকে ট্র্যাক করে এই পর্যন্ত আসতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। শুধু কয়েকটা ফোনকলই কাজটার জন্য যথেষ্ট ছিল। মরুভূমিতে ট্রেইলে নামার জন্য নেয়া পারমিটগুলোতে কোনও নাম উল্লেখ করা না থাকলেও, ব্যাপারটা খুব সহজেই আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলেন রেফ। প্রতিদিন তো আর তিনজন পুরুষমানুষ সাথে একটা কুকুর নিয়ে এদিকে আসে না। সেইন্ট জার্মেইন পরিবারের সাথে একটা সায়েন্টিফিক সোসাইটির বেশ ভালো সম্পর্ক আছে। গোটা দলটার চেহারার বর্ণনা মিলিয়ে নেয়ার পর, স্যাটেলাইটই তাদের হয়ে এই 'পাথরের ফাটল' নামের ধ্বংসাবশেষটা চিহ্নিত করে দিয়েছে।

সাথে সাথে এদিকে রওনা হয়ে গেছেন রেফ। মেসার এক মাইল দূরে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করানোর পর, পায়ে হেঁটে সামনে এগিয়েছে বার্নের দল।

দৃঢ় পদক্ষেপে বার্নকে সামনে এগিয়ে যেত দেখছেন রেফ। এভাবে প্রতিবার কোনও অভিযানের দৃশ্য দেখার সময় তার মনে হয়, তিনি নিজেই যেন কাজগুলো করছেন।

সামনে একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে। নিজের লোকেদের একসাথে জড়ো করল বার্ন। তারপর একযোগে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

চোখের কোণা দিয়ে কাই-এর দিকে তাকালের রেফ। পেছন থেকে উঁকি দিয়ে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। চাচার চিন্তায় ওকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।

তাদের আরেক বন্দি- জর্ডান আপ্লাওয়ারাকে অন্য একটা হেলিকপ্টারে রাখা হয়েছে। কাই কোনওরকম ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করলে ছেলেটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

উদ্যত রাইফেল হাতে ফাটল ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বার্ন। কিছুক্ষণ পর সংকীর্ণ পথটুকু শেষ হয়ে আসতেই, সামনে একটা গহ্বর নজরে এল। গহ্বরের চারপাশের দেয়ালে হরেক রকম ছবি খোদাই করা। মেঝের একদিকে একটা ম্যানহোলের মতো ছিদ্র।

তাহলে এই পথেই গিয়েছে পেইন্টাররা...

ছিদ্রটার পাশে কুকুরের ফিতা হাতে নিয়ে একটা মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এটাই তাহলে দলটাকে গাইড করে এই পর্যন্ত নিয়ে আসা সেই পার্ক রেঞ্জার।

মুখের সামনে রেডিও তুলে নিলেন রেফ। "বার্ন, মেয়েটার কোমরে অস্ত্র আছে। আমাদের বন্ধুদেরকে বাইরে বের করে আনার কাজটা খুব একটা সহজ হবে বলে হয় না।"

বার্নের সাথে কথা বলার সময় আড়চোখে কাই-এর চিন্তিত মুখভঙ্গি লক্ষ্য করলেন রেফ।

"মেয়েটাকে মেরে ফেল। আমরা আসছি।"

সাথে সাথে বার্নকে অস্ত্র তাক করতে দেখা গেল। মৃদু পপ-পপ শব্দের সাথে ঝাঁকি খেয়ে উঠল রেঞ্জারের শরীর।

দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠল কাই।

এগিয়ে গিয়ে ককপিটে বসে থাকা আশান্দার এক হাত স্পর্শ করলেন রেফ। এতক্ষণ যাবত দূরে বসে থাকলেও, তাঁকে কখনোই মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি তিনি।

আশান্দার হাতে মৃদু চাপ দিলেন রেফ।

"তোমার সাহায্য চাই আমি।"

বিকেল ৪:২০

গুহামুখে দাঁড়িয়ে, বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে আনাসাযিদের হিমায়িত কবরস্থানের দিকে তাকিয়ে আছেন পেইন্টার। চোখের সামনে দেখার পরও যেন দৃশ্যটা বিশ্বাস হতে চাইছে না।

এ হতে পারে না...

গুহার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত নীলচে বরফের আস্তরণ পড়েছে। ছাদ থেকে ঝুলে আছে সরু, চোখা বরফের বর্শা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বরফের নিচে ডুবে আছে আস্ত একটা গ্রাম।

পাথরের ব্লক দিয়ে নির্মিত বিশালাকায় পুয়েবলো বাড়িটা প্রায় চারতলা সমান উঁচু, দেখতে অবিকল পুরোপুরি উপাতকির মতো। কিন্তু আকারে আরও বড়। সেই সাথে এখানে বাড়ির সাথে বাসিন্দারাও আছে। গুহার উল্টোদিকেও বেশকিছু ছোটবড় টানেল দেখা যাচ্ছে।

বরফের ভেতর জমাট বাঁধা দেহগুলো দেখে মনে হচ্ছে, পানিতে ডুবে মরেছিল মানুষগুলো। মাটির তৈজসপত্র, কাপড়, বিভিন্ন আকৃতির বাক্স, ঝুড়ি ইত্যাদি এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কিন্তু সবই বরফের নিচে।

"মনে হচ্ছে, বন্যা হয়েছিল এখানে," বলে উঠলেন পেইন্টার। "সবাইকে ভাসিয়ে নেয়ার পর জমে বরফ হয়ে গেছে পানির স্রোত।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। " প্রথমে আগুন, আর তারপর পানিতে ডুবে মরতে হলো এদের।"

"মনে হয়, কোনও অভিশাপ লেগেছিল," বিড়বিড় করল কোয়ালস্কি।

হয়তো তাই...

"এরা কি সেই আনাসাযিরা? আপনি নিশ্চিত?" হ্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন পেইন্টার।

"কাপড়চোপড়, তৈজসপত্র, বাড়ি বানানোর পদ্ধতি ইত্যাদি অনুসারে...হ্যাঁ, এরা আনাসাযিই।"

কয়েক পা সামনে এগোলেন পেইন্টার। "খুব সম্ভবত, এরাই অগ্ন্যুৎপাত এবং গনহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া গোত্রটার সর্বশেষ বংশধর।"

"উপাতকি থেকে পালিয়ে এসে এখানে, মাটির নিচে বসত গেড়েছিল হতভাগ্য লোকগুলো," যোগ করলেন হ্যাঙ্ক।

কিন্তু পেইন্টারের মাথায় আরেকটা প্রশ্ন এসেছে। "তাহলে টানেলের প্রবেশপথটা সিল করেছিল কারা? আর ঢাকনার উপরে পুটসিভদের চিহ্নই বা খোদাই করে রেখেছিল কেন?"

"হয়তো কোনও প্রতিবেশী গোত্রের লোকজন এদের লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করছিল। গুহার উপরে পাথরের স্ল্যাব দিয়ে ঢাকনা লাগিয়ে দিয়েছিল তারা, সেই সাথে সতর্কবার্তা হিসেবে পাথর খোদাই করে এই গোত্রটার ধ্বংস ডেকে আনা সেই পুটসিভদের চিহ্নও এঁকে দিয়েছিল, যাতে কেউ চিহ্নটা দেখে এই পথে পা না বাড়ায়।"

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন পেইন্টার। "দেখা যাক আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা। তারপর ফেরার পথ ধরতে হবে।"

সিগমা ডিরেক্টরের কণ্ঠে হতাশা আঁচ করতে পারলেন হ্যাঙ্ক। হয়তো এখানে বরফের নিচে চাপা পড়ে যাওয়া মমিগুলো ছাড়াও আরও কিছু পাবেন বলে ধারণা করেছিলেন তিনি।

অনুসন্ধানের সুবিধার্থে আলাদা হয়ে গেলেন তিনজন। সাবধানে পা ফেলে এগোতে লাগলেন সামনের দিকে। ফ্ল্যাশলাইট হাতে নিয়ে বাড়িটার নিচতলায় ঢোকার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন হ্যাঙ্ক।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই, বরফের নিচে পড়ে মমি হয়ে যাওয়া একটা বাচ্চা ছেলের মৃতদেহ দেখতে পেলেন তিনি। কিন্তু বরফের মেঝে ফুঁড়ে ছেলেটা একটা হাত বাইরে বেরিয়ে এসেছে। যেন তার কাছে সাহায্য চাইছে।

"দুঃখিত..." অনেকটা আপন মনেই কথাটা বিড়বিড় করতে করতে অন্য একটা ঘরে ঢুকে গেলেন প্রফেসর। বরফে আবৃত দেয়ালে ফ্ল্যাশলাইটের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। এই ঘরের মেঝেতে আরেকটা মৃতদেহ দেখা গেল। মনটা খারাপ হয়ে গেল হ্যাঙ্কের। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে পুয়েবলোর আরও ভেতরের দিকে চলে এলেন তিনি।

ছাদ থেকে নেমে আসা সূচালো বরফের বর্শা দেখতে দেখতে হঠাৎ হ্যাঙ্কের পা হড়কাল। হুড়মুড় করে একটা ম্যানহোলের মতো চওড়া গর্তে পড়ে গেলেন তিনি। গর্তটা প্রায় তার শরীরের সমান গভীর। পড়ার সময় হাত থেকে ছুটে গেছে ফ্ল্যাশলাইট।

শব্দ শুনে এদিকে এগিয়ে এলেন পেইন্টার। "হ্যাঙ্ক?"

"আমি ঠিক আছি," চেঁচিয়ে জবাব দিলেন প্রফেসর। "একটা গর্তে পড়ে গেছি। আপনাদের সাহায্য ছাড়া উঠে আসতে পারব না।"

সাহায্য আসার অপেক্ষা করতে করতে পায়ের সামনে থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে আলো জ্বালালেন হ্যাঙ্ক। চেম্বারটার একপাশের দেয়ালে কয়েকটা ছোট ছোট কুঠুরি। সামনের দিকের একটা কুঠুরির ভেতর আলো পড়তেই আবারও চমকে উঠলেন প্রফেসর।

এটা কীভাবে সম্ভব?

মাথার উপরদিকে একটা ছায়া এগিয়ে এল। পৌঁছে গেছেন পেইন্টার।

"ব্যথা পেয়েছেন?"

"না," জবাব দিলেন হ্যাঙ্ক। "এখানে কিছু একটা আছে। হাত দেয়া উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। আপনাকে নিচে নেমে এসে দেখতে হবে।"

গুহার ভেতর ঝুঁকে পড়লেন পেইন্টার। কিন্তু তাকে একেবারে নিচে নেমে আসতে ইশারা করলেন প্রফেসর।

"ঠিক আছে," অবশেষে সায় দিলেন সিগমা ডিরেক্টর। "কোয়ালস্কি, ব্যাগ থেকে একটা দড়ি নিয়ে এসো," বলে হ্যাঙ্কের পাশে নেমে দাঁড়ালেন তিনি।

আশেপাশের বরফাবৃত দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করলেন হ্যাঙ্ক। "এটা একটা 'কিভা', এরকম জায়গাকে বেশ সম্মান করত আনাসাযিরা। প্রার্থনাকক্ষও বলতে পারেন। আমরা এখন যেখানে আছি, এই ছিদ্রটাকে বলা হয় 'সিপাপা'। প্রাচীন লোকগুলোর বিশ্বাস ছিল, এরকম একটা জায়গা থেকেই মহাবিশ্বে মানুষের আগমন হয়েছিল।"

"বুঝলাম, কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে আমরা ধর্মীয় ব্যাপারস্যাপার নিয়ে আলোচনা করছি কেন?"

"বলছি," মাথা নাড়লেন প্রফেসর। "নিজেদের গোপনীয় জিনিসপত্রগুলো এরকম জায়গাতেই লুকিয়ে রাখত আনাসাযিরা," বলে নিচের কুঠুরির দিকে ফ্ল্যাশলাইট তাক করলেন তিনি। "আমার মনে হয়, পুটসিভদের কাছ থেকে এই জিনিসটাই চুরি করেছিল হতভাগ্য লোকগুলো। এটাই ওদের ধ্বংস ডেকে এনেছে।"

বিকেল ৫:০৬

হ্যাঙ্ককে অনুসরণ করে নিজের ফ্ল্যাশলাইটটাও চেম্বারের নিচে দিকে তাক করলেন পেইন্টার।

চমৎকার...

কুঠুরিটার ভেতর প্রায় দেড় ফুট লম্বা একটা সোনালী রঙের পাত্র দেখা যাচ্ছে। পাত্রটার ঢাকনার উপরে একটা নেকড়ের মাথা খোদাই করা। লাইটের আলোয় পাত্রটার সামনের দিকে কিছু লেখা দেখতে পেলেন পেইন্টার।

"ট্যাবলেটে থাকা সেই লেখাগুলোর মতোই," বলে উঠলেন তিনি।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। "এই জিনিসটা যে পুটসিভদের, লেখাগুলো তারই সত্যতা প্রমাণ করছে।"

"হতে পারে," বিড়বিড় করলেন পেইন্টার। "কিন্তু পাত্রটা তো মিশরীয় বলে মনে হচ্ছে। প্রাচীন মিশরীয়রা মমি করা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রাখতে এরকম ঢাকনাওয়ালা পাত্র ব্যবহার করত।"

সায় দিলেন প্রফেসর। "ওগুলোকে ক্যানোপিক জার বলা হয়।"

"হ্যাঁ, শুধু এটার ঢাকনায় একটা নেকড়ের মাথা বসানো আছে।"

"মিশরীয়রাও তাদের জিনিসপত্রে বিভিন্ন প্রাণীর আদল দিতে পছন্দ করত। যদি এই জিনিসটা উত্তর আমেরিকাতেও বানানো হয়ে থাকে, তাহলেও নেকড়ের মাথা নিয়ে কথা থেকে যায়। ওই এলাকার লোকজন নেকড়েজাতীয় প্রাণীদের বেশ সম্মান করে।"

"কিন্তু তাহলে তো পুটসিভদের ব্যাপারে আপনার ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে," মন্তব্য করলেন পেইন্টার। "বুক অফ মরমনে তো বলা হয়েছে, পুটসিভরা ইজরায়েলের একটা প্রাচীন গোত্র।"

"না," উত্তেজিত কণ্ঠে পেইন্টারের কথার বিরোধিতা করলেন হ্যাঙ্ক। "বরং এটা আমার মতবাদকে আরও সমর্থন দিচ্ছে।"

"কীভাবে?"

"ঐতিহাসিকদের বক্তব্য অনুযায়ী, জোসেফ স্মিথ সেই সোনার প্লেটগুলো অনুবাদ করে বুক অফ মরমন রচনা করেছিলেন, সেই প্লেটে লেখা অক্ষরগুলো ছিল মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ। বুক অফ মরমনের নবম অধ্যায়ের বত্রিশ নাম্বার অনুচ্ছেদে এই ব্যাপারটা উল্লেখ করা আছে। 'এখন, আমাকে দেয়া জ্ঞান অনুসারে, মিশরীয় ভাষার একটা পরিবর্তীত রূপ থেকে আমি এই বাণীগুলো আমাদের ভাষায় রূপান্তর করছি।"

সরাসরি পেইন্টারের চোখের দিকে তাকালেন হ্যাঙ্ক। "তবে কেউ কিন্তু সেই অক্ষরগুলো নিজ চোখে দেখতে পায়নি। কারণ, বলা হয়ে থাকে, জোসেফ স্মিথের অনুবাদ শেষ হওয়ার পরপরই অ্যাঞ্জেল মরোনী সেই সোনার প্লেটগুলো ফিরিয়ে নেন। সর্বোপরি আমরা যা জানতে পারি তা হলো, ওই ভাষাটা ছিল মিশরীয় হায়ারোগ্লিফের একটা পরিবর্তীত রূপ, যা থেকে পরবর্তীতে হিব্রু ভাষার উৎপত্তি ঘটে।"

ব্যাপারটা মাথায় ঢোকাতে একটু কষ্ট হচ্ছে পেইন্টারের। "তাহলে হিব্রু হোক কিংবা পরিবর্তীত হোক, ছাতামাথা যাই হোক না কেন, এগুলোকে আমরা মিশরীয় বলছি কেন?"

হ্যাঙ্কের গলা বেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। "উত্তরটা তো চোখের সামনেই আছে। আমরা জানতে পারছি, ইজরায়েলের সেই গোত্রটার উৎপত্তি মিশরে। আগে আমি আপনাকে যেমনটা বলেছিলাম, চাঁদ এবং তারার ওই প্রতীকটা প্রাচীন মোহাবাইটদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেই গোত্রের লোকেদের গায়ে ইজরায়েলী এবং মিশরীয়, দুই ধরণের রক্তই বইছে। তো যখন গোত্রটা মিশর থেকে ইজরায়েল, তারপর এই আমেরিকায় এল, অর্থাৎ প্রায় পুরো বিশ্বেই পায়ের চিহ্ন রাখল, তাই তারা নিজেদের জিনিসপত্রে মিশরীয় এবং হিব্রু, দুই জাতের চিহ্নই সংরক্ষণ করতে শুরু করল।"

পাত্রটার দিকে হাত বাড়ালেন পেইন্টার। "বুঝতে পেরেছি। তবে বেশ কষ্ট হয়েছে।"

"সাবধানে," বলে উঠলেন প্রফেসর।

পাত্রটার নিচের দিকের কয়েক ইঞ্চি বরফের ভেতর ঢুকে আছে। কিন্তু এটা হ্যাঙ্কের ভাবনার বিষয় নয়। তার চিন্তা পাত্রের ভেতরে থাকা বিপজ্জনক

জিনিসগুলোকে নিয়ে। পুটসিভদের জিনিস নিয়ে অসতর্কভাবে ঘাটাঘাটির পরিণাম তো তারা আগেই দেখেছেন।

"মনে হয়, কোনও সমস্যা নেই," বলে উঠলেন পেইন্টার। "অনেক বছর ধরে বরফের ভেতর আটকে আছে এটা।"

রোনাল্ড শিনের বলা কথাগুলো মনে করলেন তিনি। জিনিসগুলোকে নিষ্ক্রিয় রাখার জন্য উষ্ণতার প্রয়োজন। ঠান্ডার স্পর্শ পেলেই সক্রিয় হয়ে ওঠে এগুলোর ভেতরে লুকিয়ে থাকা বিদ্ধংসী ক্ষমতা।

দম আটকে রেখে, আস্তে করে টান দিয়ে নেকড়ের মাথা আকৃতির ঢাকনাটা খুলে আনলেন পেইন্টার। বরফের পাতলা স্তরে মৃদু চিড়বিড় আওয়াজের পর আলগা হয়ে এল জিনিসটা।

পাত্রটার ভেতর আলো ফেললেন সিগমা ডিরেক্টর। "যা ভেবেছিলাম তাই... খালি।"

ঢাকনাটা হ্যাঙ্কের হাতে দিয়ে বাকি পাত্রটা ধরে টানতে শুরু করলেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত পর, পুরো জিনিসটাই বরফের আলিঙ্গন ছেড়ে উঠে এল।

"বেশ ভারি," ঢাকনাটা যথাস্থানে বসাতে বসাতে মন্তব্য করলেন পেইন্টার। "এই জিনিসটাও প্লেটের মতো ওই বিশেষ ধরণের সোনা দিয়ে তৈরি। খুব সম্ভবত, প্রাচীন লোকগুলো তাদের সেই বিদ্ধংসী পদার্থকে নিষ্ক্রিয় রাখার জন্যই এই ধাতু বানিয়েছিল।"

"বুঝলাম না," মাথা নাড়লেন হ্যাঙ্ক।

"ধাতুর ঘনত্ব যত বেশি হবে, তার তাপধারন ক্ষমতা তত বাড়বে। হ্যাঁ, এতে করে পাত্রটা গরম হতে বেশ সময় লাগবে। কিন্তু একবার গরম হয়ে যাওয়ার পর সেটা অনেকক্ষণ যাবত গরমই থাকবে। অর্থাৎ হঠাৎ করে উষ্ণ জায়গা থেকে ঠান্ডা জায়গায় নিয়ে আসা হলেও সাথে সাথে ভেতরের বিপজ্জনক জিনিসগুলো সক্রিয় হয়ে উঠবে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। এবার বুঝতে পেরেছেন।

"আমার মনে হয়, এই পাত্রটা পুটসিভদের অব্যবহৃত পাত্রগুলোর মধ্যে একটা। কিন্তু সানসেট ক্রেটারের অবস্থা প্রমাণ করছে, নিশ্চয়ই আরেকটা ভরা পাত্রও চুরি করেছিল আনাসাযিরা।" বলে হাতে ধরা পাত্রটা উল্টোদিকে ঘোরালেন পেইন্টার। "এদিকে দেখুন।"

ভালো করে দেখার জন্য তার একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন হ্যাঙ্ক।

পাত্রের পেছনের দিকে, খাঁড়ির পাশে গাছপালাওয়ালা একটা পাহাড়ের দৃশ্য আঁকা রয়েছে। আর সবার মাঝখানে একটা সক্রিয় আগ্নেয়গিরি।

"এগুলোর মানে কী?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

"জানি না।"

এমন সময় উপর থেকে একটা দড়ি নেমে এল। কোয়ালস্কি এসে পড়েছে।

তার হাতে পাত্রটা ধরিয়ে দিলেন পেইন্টার। "এটা নাও।"

জিনিসটা হাতে নিয়ে উচ্ছাসে শিষ দিয়ে উঠল বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট। "শেষ পর্যন্ত একটা গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছি আমরা।"

কয়েক মুহূর্ত পর তিনজনকেই পুয়েবলো থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। পাত্রটা ব্যাগের ভেতর আগে থেকেই রাখা সোনার প্লেটগুলোর পাশে রেখে দিলেন পেইন্টার। পরক্ষণেই উপলব্ধি করলেন, তার ব্যাগটা বেশ ভারি হয়ে গেছে। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ফেরার সময় বেশ ধকল যাবে। কিন্তু এছাড়া আর কোনও উপায়ও তো নেই।

"ন্যান্সি পুরো সেনাবাহিনী ডাকার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।"

কিন্তু সাথে সাথে টানেল ধরে একটা ছায়ার মতো নিচু অবয়বকে ছুটে আসতে দেখা গেল। ভয় পেয়ে আঁতকে উঠলেন পেইন্টার। এগিয়ে এসে হ্যাঙ্কের পায়ে গা ঘসতে লাগল অবয়বটা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচালেন সিগমা ডিরেক্টর। হ্যাঙ্কের কুকুর ওটা।

প্রাণীটার নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়। "কাউচ!"

"হয়তো ন্যান্সির কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে," মন্তব্য করল কোয়ালস্কি।

"না," কুকুরটার গলার ফিতায় লেগে থাকা লালচে ছোপ লক্ষ্য করলেন পেইন্টার। রক্ত...

"মনে হচ্ছে, উপরে খারাপ কিছু ঘটেছে।"

অধ্যায় ২৬
৩১ মে, রাত ৮:০৭
লুইভিল, কেনটাকি

লুইভিল এয়ারপোর্টের প্রাইভেট টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লিয়ারজেটে বসে আছে মঙ্ক। গ্রে আর শেইচানও তার সাথেই আছে। বিমানের মডেলটা বেশ পুরনো হলেও, তাদেরকে আস্তই গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পেরেছে।

ফোর্ট নক্সের মিলিটারি শিবির থেকে ইউ এস আর্মির একটা দল এসে তাদের এসকর্ট করে স্বর্ণভান্ডারের ভেতরে নিয়ে যাবে। সেজন্যই দশ মিনিট ধরে অপেক্ষা করে আছে তিন সদস্যের ছোট দলটা। বেশ অধৈর্য অনুভব করছে মঙ্ক। হাঁটু নাচাতে নাচাতে সিগমা হেডকোয়ার্টারে রেখে আসা ক্যাটের কথা ভাবতে লাগল সে। আট মাসের গর্ভাবস্থায়, যে কোনও সময় একটা না একটা সমস্যা হয়ে যেতে পারে।

মঙ্ক তাকে একা ছেড়ে আসতে চায়নি, কিন্তু ক্যাট অনেকটা জোর করেই তাকে এই অভিযানে পাঠিয়েছে। আইসল্যান্ডের হামলাটার ব্যাপারে শোনার সময় মেয়েটার চোখেমুখে ফুটে ওঠা ভয় লক্ষ্য করেছিল মঙ্ক। তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এখানকার কাজটা শেষ করে ক্যাটের কাছে ফিরতে হবে তাকে। এমন না যে মঙ্কের মিশনে আসা পছন্দ না। প্রকৃতপক্ষে, মিশনে গেলেই তার মধ্যকার স্বরূপ বের হতে আসে। কিন্তু একজন দায়িত্ববান স্বামী হিসেবে স্ত্রীর এমন অবস্থায়, যে কোনও কাজের চেয়ে তার পেটে হাত রেখে বসে থাকাই মঙ্কের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জানালার কাঁচে মাথা ঠেকিয়ে প্রশ্ন করল সে, "ব্যাটারা আসছে না কেন?"

"এসে যাবে," জবাব দিল গ্রে।

সিটে হেলান দিয়ে বসে, উল্টোদিকে বসা সিগমা কমান্ডারের দিকে সোজাসুজি তাকাল মঙ্ক। লিয়ারেজেটের ভেতর মাত্র চারটা সিট। এক সারিতে দুটো করে, পরস্পর মুখোমুখি। গ্রে-র পাশের সিটে শেইচান বসে আছে। আহত পা-টা সোজা করে মঙ্কের পাশের সিটে তুলে রেখেছে সে।

"এখানে কী খুঁজতে হবে, তা কি আমরা কেউ জানি?" আবারও প্রশ্ন করল মঙ্ক, তবে এবার উত্তরের আশা করেনি। শুধু নিজেকে ব্যস্ত রাখতেই কথাটা বলা।

কিন্তু জানালার দিকে তাকিয়ে থেকেই জবাব দিল গ্রে। "আন্দাজ করতে পারছি।"

কথাটা শুনে মঙ্কের হাঁটু নাচানো বন্ধ হয়ে গেল। শেইচানও ঘুরে তাকাল সিগমা কমান্ডারের মুখের দিকে। ওয়াশিংটন থেকে রওনা হওয়ার আগে প্ল্যান ছিল, শুধু ফোর্ট নক্সে ঢুকে একটু ঘোরাঘুরি করা, সন্দেহজনক কিছু আছে কিনা দেখা। খুব একটা পরিকল্পিত মিশন বলা যায় না এটাকে। জাপানি পদার্থবিদের শনাক্ত করা

নিউট্রিনো রিডিং বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তারপরও গোটা ব্যাপারটা দেখে মনে হচ্ছে যেন, ছিপ ছাড়াই মাছ ধরতে পানিতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে ওদের।

"কি ভাবছ তুমি?" জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

নিজের সিটের একপাশ থেকে একতাড়া কাগজ তুলে ধরল গ্রে। এখানে আসার পথে ফোর্ট নক্স সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ পড়াশোনা করেছে সে। আসলে, এরকম জগাখিচুড়ি পরিস্থিতিতে যদি কোনও সমাধান বের করা যায়, তাহলে সেটা শুধুমাত্র গ্রে-র পক্ষেই সম্ভব। মাঝে মাঝে মঙ্ক ভাবে, তার নিজের মাথাও যদি ওর মতো কাজ করত! কিন্তু বন্ধুর ঘাড়ে চাপা দায়িত্বের ভারটা বেশ ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারে সে।

না বাবা... আমার জন্য সাহায্যকারীর ভূমিকাই ঠিক আছে।

"জাপানি পদার্থবিদের পাঠানো রিপোর্টটা আবার পড়েছি আমি," জবাব দিল গ্রে। "লোকটার নাকি অ্যাসপারগার্স সিনড্রোম আছে।"

শ্রাগ করল মঙ্ক।

"এই রোগে আক্রান্তদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বেশ তীক্ষ্ণ হয়। তাছাড়া লোকটা এমনিতেও বেশ জিনিয়াস। তার মতে, আমেরিকার পশ্চিমদিক সহ ইউরোপের ছোট ছোট নিউট্রিনো আলোড়নগুলো হচ্ছে, উটাহ এবং আইসল্যান্ডে বিস্ফোরিত হওয়া রহস্যময় ন্যানো মেটেরিয়ালগুলোর আরেকটা রূপ, অবিকল সেই পদার্থটা না হলেও একই প্রকৃতির।"

"তাহলে কী পেলাম আমরা?" বলে উঠল শেইচান।

"বলছি। ইন্ডিয়ান গুহায় পাওয়া ন্যানোটেকনোলজি সংক্রান্ত আর্টিফ্যাক্টগুলো হচ্ছে দামাস্কাস ইস্পাতের একটা ছুরি আর কয়েকটা বিশেষ সোনার তৈরি প্লেট।" বলে সরাসরি মঙ্কের চোখের দিকে তাকাল গ্রে। "পশ্চিমের মরুভূমিতে যাওয়ার সময় পেইন্টারও ওই প্লেটগুলোর কয়েকটা নিজের সাথে নিয়েছেন।"

এবার ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে মঙ্ক। "ওদিকেই কয়েকটা ছোট আলোড়ন শনাক্ত করা গিয়েছে।"

"হ্যাঁ। বেলজিয়ামেও একটা বিন্দু শনাক্ত করা হয়েছে। আইসল্যান্ডে হামলাকারী গিল্ডের দলটা ওখান থেকেই এসেছিল। হতে পারে, গিল্ডের কাছেও ওরকম একটা সোনার প্লেট আছে, যেটা বেলজিয়ামে রাখা হয়েছে।"

আহত পা-টা সিট থেকে নামিয়ে নিল শেইচান। "আর এখন আমরাও একটা স্বর্ণ ভান্ডারের উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছি।"

মাথা নাড়ল মঙ্ক। "অর্থাৎ তুমি ভাবছ, ফোর্ট নক্সেও একটা সোনার প্লেট লুকানো আছে।"

"না," জবাব দিয়ে হাতের কাগজগুলোর দিকে ইশারা করল গ্রে। "এখানে আসার পথে ফোর্ট নক্সের ইতিহাস এবং প্রাচীন আমেরিকার টাকশাল সম্পর্কে পড়েছি আমি। ফিলাডেলফিয়ার টাকশালে বেশকিছু সোনাও সংরক্ষিত ছিল।"

মাথা নাড়ল মঙ্ক, কথাটা পুরোপুরি বুঝতে পারেনি।

"তৎকালীন ফিলাডেলফিয়া টাকশালের ডিরেক্টর ছিলেন ডেভিড রিটেনহাউজ নামে এক ব্যক্তি। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এবং জেফারসনের মতো, তিনিও একাধারে অনেক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। যেমন ঘড়িনির্মাতা, গণিতবিদ, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি। এছাড়াও আমেরিকান ফিলোসফিকাল সোসাইটির সদস্যও ছিলেন তিনি।"

সংগঠনের নামটা চিনতে পেরেছে মঙ্ক। "ফোরটেস্কুও তো ওটার সদস্য ছিলেন, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। "জেফারসনের বিশ্বস্ত এবং কাছের বন্ধুদের মাঝে রিটেনহাউজও একজন। আর ফোরটেস্কুর ডায়েরী অনুযায়ী, জেফারসনই সেই ইন্ডিয়ান মানচিত্রটা লুকিয়ে রেখেছিলেন।" বিশেষ লাইনগুলো মনে আছে তার। "রহস্যময় শত্রুদের হাত থেকে মানচিত্রটা নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে জেফারসন একটা অনন্য উপায় খুঁজে বের করেন। সোনার ভেতরেই জিনিসটা লুকিয়ে রাখেন তিনি। কেউ বুঝতেই পারবে না, সীলের ভেতর নিরাপদে লুকানো আছে বহুমূল্য মানচিত্রটা।"

মঙ্কের আগেই নড়ে উঠল শেইচান। "অর্থাৎ তুমি ভাবছ, রিটেনহাউজের মাধ্যমে ফিলাডেলফিয়া টাকশালের সোনায় মানচিত্রটা লুকিয়ে রেখেছিলেন জেফারসন।"

"হ্যাঁ," সায় দিল গ্রে। "তারপর উনিশশো সাইত্রিশ সালে, ফিলাডেলফিয়া টাকশালের সমস্ত সোনা একটা বক্সকারে করে ফোর্ট নক্সে পাঠিয়ে দেয়া হয়।"

"তার মানে, সবকিছুর সাথে মানচিত্রটাও ফোর্ট নক্সে চলে আসে।" বলে উঠল মঙ্ক। "কিন্তু আমরা নিশ্চিত হব কীভাবে?"

"জানি না," জবাব দিল গ্রে। "ওটা আমাদের নিজেদেরই খুঁজে বের করতে হবে। তবে আরেকটা ব্যাপার আছে, ফোরটেস্কু বলে গিয়েছেন- ট্যাবলেটগুলোর মতো মানচিত্রটাও ওই বিশেষ ঘনত্বের সোনা দিয়ে তৈরি। এমন সোনা, যেগুলোকে গলানো যায় না।"

মাথা নাড়ল মঙ্ক। "অর্থাৎ, প্লেটগুলো যদি নিউট্রিনোর আলোড়নের উৎস হতে পারে, তাহলে ম্যাপটাও একই কাজ করছে।"

সায় দিল গ্রে।

বন্ধুর বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না মঙ্ক। কয়েক মুহূর্ত পর জানালার ওপাশে নড়াচড়া লক্ষ্য করে তার সম্বিত ফিরল। তাদের বিমানের পাশে একটা হামভি এসে থেমেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল সে। "শ্বশুরবাড়ির লোকেরা চলে এসেছে।"

রাত ৮:৩৭

আসলেই কি মানচিত্রটা ফোর্ট নক্সে লুকানো আছে?

হামভির সামনের সিটে বসে এই কথাটাই অনবরত ভেবে চলেছে গ্রে। ডিক্সি হাইওয়ে ধরে স্বর্ণ ভান্ডারের দিকে এগিয়ে চলেছে তাদের গাড়িবহর। তাদের এসকর্ট

করে নেয়ার জন্য চার ব্রিগেড সশস্ত্র সৈন্য পাঠানো হয়েছে। চারটা ট্রাকে করে হামভির পেছন পেছন এগোচ্ছে তারা। বেসের মেইন গেটে পৌছানোর পর পাস দেখাতে হলো, তারপরই ভেতরে ঢোকার অনুমতি মিলল।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু বিল্ডিংটার দিকে তাকাল গ্রে। রাতের আলো আঁধারিতে স্থাপনাটাকে একটা কারাগার বলে ভ্রম হচ্ছে। বেড়ায় ঘেরা একটা খোলা মাঠের মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকায় কাঠামোটা। সামনের দিকে গেটের পাশাপাশি, মাঠের চারকোণায় চারটা সেন্ট্রি পোস্টও আছে। গ্রে খুব ভালো করেই জানে, ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে বহুস্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের স্ক্যান করে দেখা হবে। অ্যালার্ম, ক্যামেরা, সশস্ত্র গার্ড, বায়োমেট্রিক অ্যানালাইজার, চেহারা শনাক্তকারী সফটওয়্যার, এমনকি কম্পন মাপন যন্ত্রও ভেতরে সেট করা আছে। এগুলো তো প্রকাশ্য, অন্যান্য গোপন ব্যবস্থাগুলোর কথা না হয় বাদই দেয়া গেল। বলা হয় থাকে, এক মুহূর্তের নোটিশে পুরো বিল্ডিংটা পানি কিংবা নার্ভ গ্যাসে পরিপূর্ণ করে ফেলা সম্ভব।

তবে ফোর্টের গেটে পৌছাতে হলে আগে ওটা ঘিরে থাকা মিলিটারি বেস পার করে আসতে হবে। আর মিলিটারি বেস বলতে কিন্তু সাধারণ কোনও ক্যাম্পের কথা বলা হয়নি, হেলিকপ্টার গানশিপ, আর্মার্ড ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি, এবং ত্রিশ হাজার সৈন্য সম্বলিত ঘাঁটি ওটা, জায়গার বিস্তৃতির হিসেবে পুরো এক হাজার একর।

কোলের উপর থাকা খামের দিকে তাকাল গ্রে।

এসব দুঃসাধ্য বাধা পার করার টিকেট তার হাতেই আছে।

তাদের নামে প্রেসিডেন্ট জেমস টি. গ্যান্ট- এর সাক্ষর সম্বলিত আদেশনামা বরাদ্দ করা হয়েছে। সীল করা খামের ভেতর রাখা আছে জিনিসটা। এমনিতে এখানে কোনও দর্শনার্থী ঢুকতে দেয়া হয় না। প্রেসিডেন্টের আদেশ ছাড়া একটা কাকপক্ষীরও ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। এমনকি, এযাবৎকাল পর্যন্ত মাত্র দু'জন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ফোর্টের ভেতরের দৃশ্য দেখতে পেরেছেন। গ্রে জানে, খামের ভেতর থাকা কাগজটার একটা কপি ইতিমধ্যে দায়িত্বে থাকা সিকিউরিটি অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কাজে কেউ কোনও ঢিল দিচ্ছে না।

খামের উপরে থাকা সীলটার উপর হাত বুলালো গ্রে। এটা ভেঙে গেলে কী হবে? নিঃসন্দেহে বোকার মতো একটা চিন্তা করছে সে। এত কম সময়ের নোটিশে এখানে আসার অনুমতি যোগাড় করতে সিগমার সমস্ত রিসোর্স কাজে লাগাতে হয়েছে। অবশ্য গত বছর ইউক্রেনে একটা হামলা থেকে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রেসিডেন্ট সিগমার কাছে কৃতজ্ঞ। তাই খবরটা পাওয়ার সাথে সাথে আর দেরি করেননি তিনি। সাইন করে চীফ অফ স্টাফকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন জিনিসটা।

পেছনের সিটে বসে থাকা মঙ্ক আর শেইচানের দিকে তাকাল গ্রে। তাদের দেয়া নির্দেশটা খুবই সাধারণ। ভল্টে ঢুকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে উঠতে পারে, এমন কোনও জিনিসের সন্ধান করা, এবং পাওয়ার সাথে সাথে ওটা বাইরে বের করে আনা।

পাস দেখিয়ে ফোর্টের বেড়ার গেট পেরিয়ে এল তাদের হামভি। পেছনের ট্রাকগুলো অবশ্য অনেক আগেই মিলিটারি বেস পর্যন্ত এসে থেমে গেছে।

"পৌঁছে গেছি শ্বশুরবাড়ি," মঙ্ককে বিড়বিড় করতে শুনল গ্রে।

পথে আসার পুরো সময়টুকু নিজের প্রস্থেটিক হাত নিয়ে মেতে ছিল সিগমা এজেন্ট। বেশ অনেকদিন যাবত জিনিসটা ব্যবহার করলেও, কিছুক্ষণ যাবত আপনাআপনিই মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে স্বয়ংক্রিয় আঙুলগুলো। ব্যাপারটা মঙ্ককে বেশ অবাক করেছে। দৃশ্যটা দেখতে অনেকটা মাকড়শার নড়াচড়ার মতো দেখায়। হাতের তালুটা কব্জির প্রস্থেটিক কাফ থেকে খুলে রাখা অবস্থাতেও ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে হাতটাকে কাজে লাগাতে পারে সে। জিনিসটা আসলে তার কাছে অর্ধেক হাত, অর্ধেক অস্ত্রের মতো।

ফোর্টের গেটের কাছে এসে থেমে গেল তাদের হামভি। সাথে সাথে নেভি ব্লু রঙের স্যুট পরা একজন লম্বা ব্যক্তি এগিয়ে এল।

সম্ভবত সে ই এখানকার অফিসার ইন চার্জ। তবে এই পদে আরও বয়স্ক কাউকে আশা করেছিল গ্রে। লোকটার বয়স কোনওমতেই ত্রিশের বেশি হবে না। গ্রে-র বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে হ্যান্ডশেক করল ক্রু কাট চুলের অধিকারী অফিসার।

"মিচেল ওয়ালডর্ফ," নিজের পরিচয় দিয়ে মুচকি হাসল লোকটা। "ফোর্ট নক্সে স্বাগতম। সচরাচর এই সময়ে কোনও অতিথির দেখা পাই না আমরা।"

পরিচয়পর্ব শেষ করে হাতের খামটা তার হাতে ধরিয়ে দিল গ্রে। কিন্তু কাগজগুলোর প্রতি ওয়ালডর্ফের কোনও আগ্রহ দেখা গেল না। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মঙ্ক আর শেইচানের দিকে এক পলক তাকিয়ে, অন্য একজন সৈন্যের হাতে খামটা ধরিয়ে দিল সে। চুপচাপ খামটা নিয়ে 'ক্যাপ্টেন অফ দ্য গার্ড' লেবেল সাঁটা একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা।

"দয়া করে এদিকে আসুন," ওয়ালডর্ফের কথায় করিডোর ধরে ফোর্টের ভেতরে ঢুকে গেল পুরো দলটা। গ্রে জানে, এখন সবাইকে সার্চ করা হবে। ক্যাট তাদের সবার জন্য ফলস আইডির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি(এন.এস.এ.)-র এজেন্ট হিসেবে এখানে এসেছে তারা।

"বডি স্ক্যানারের ভেতর দিয়ে যেতে হবে আপনাদের," ব্যাখা করল ওয়ালডর্ফ। "মাত্র দু'মাস আগে এই সিকিউরিটি সিস্টেমটা এখানে আনা হয়েছে।"

মেশিনটার দিকে এগিয়ে গেল গ্রে। পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন নিরাপত্তাকর্মী ব্যাপারটা তদারক করছে। বাকিরা একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু রাতের এই সময়ে ফোর্টের ভেতর লোকজনের আনাগোনা বেশ কম। আর এতো লোকের দরকারই বা কী? শারীরিক ব্যবস্থার চাইতে এখানে ডিজিটাল নিরাপত্তাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

স্ক্যান শেষ হয়ে যাওয়ার পর গ্রে-কে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল টেকনিশিয়ান। একপাশে সরে গিয়ে আশেপাশে তাকাতে লাগল সিগমা কমান্ডার। একদিকের দেয়ালে বেশ কয়েকটা ডিজিটাল ওজন মাপার যন্ত্র সাজিয়ে রাখা।

জিনিসগুলো প্রায় বারো ফুট লম্বা, নড়াচড়ার সুবিধার্থে নিচে চাকা লাগানো আছে। মেইন ভল্টের স্টিলের দরজার উপর ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের লোগো সাঁটানো।

"এটা ভেতরে নেয়া যাবে না," টেকনিশিয়ানের গলার আওয়াজে সম্বিত ফিরল গ্রে-র। পেছনে ফিরতেই দেখা গেল, মঙ্কের প্রস্থেটিক হাত নিয়েই গন্ডগোলের সূত্রপাত।

"এটা তো আমার সাথেই আটকানো," আপত্তি জানাল মঙ্ক।

"দুঃখিত, স্ক্যানারের ভেতর দিয়ে যেতে পারবে না, এমন কোনও ধাতব জিনিস নিয়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই। এটা রেখে যেতে না পারলে আপনাকে বাইরেই অপেক্ষা করতে হবে।"

"কিছু করার নেই। এটাই আমাদের পলিসি।" নতুন একটা কণ্ঠ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল গ্রে। গার্ড ক্যাপ্টেনের রুম থেকে নতুন একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

"ঠিক আছে," রাগে গজগজ করতে করতে কবজি থেকে হাতটা খুলে টেকনিশিয়ানের হাতে ধরিয়ে দিল মঙ্ক। কাউন্টারের উপর একটা প্লাস্টিকের ঝুড়িতে জিনিসটা রেখে দিল সে।

এবার আর স্ক্যানার কোনও সমস্যা করল না। মেশিনটা পার হয়ে গ্রে-র পাশে এসে দাঁড়াল মঙ্ক।

"আমি ক্যাপ্টেন লিন্ডেল," শেইচানের স্ক্যান শেষ হতে হতে আবার মুখ খুলল নতুন আসা লোকটা। "এখানকার গার্ডদের দায়িত্বে আছি। কাজ করার সময় আপনাদের সাথে থাকার জন্য বলা হয়েছে আমাকে। দায়িত্বরত অফিসার আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব দেবে।" বলে ওয়ালডর্ফের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "কিন্তু একটা বিষয় বুঝতে পারছি না। জাতীয় নিরাপত্তায় হুমকি হয়ে উঠতে পারে, এমন কী লুকানো আছে এখানে?"

"দুঃখিত, ব্যাপারটা এই মুহূর্তে আপনাকে খুলে বলতে পারছি না, স্যার।" জবাব দিল গ্রে।

ক্যাপ্টেন লিন্ডেলের মুখভঙ্গি দেখে মনে হলো, জবাবটা তাকে খুশি করতে পারেনি।

লোকটার চেহারায় ফুটে ওঠা বিতৃষ্ণা অনুভব করতে পারছে গ্রে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার একটা চেষ্টা করল সে। "আসলে, ব্যাপারটা গুরুতর কিছু না। কিন্তু কী খুঁজছি, সেটাই এখনও নিশ্চিত নই আমরা। তাই আপনার এবং অফিসার ওয়ালডর্ফের সাহায্য পেলে খুব উপকার হবে।"

এবার একটু নরম দেখাল ক্যাপ্টেনকে। "ঠিক আছে। চলুন, কাজ শুরু করা যাক।"

এগিয়ে গিয়ে মেইন ভল্টের দরজার পাশের অ্যানালাইজারে কয়েকটা সংখ্যা প্রবেশ করালেন ক্যাপ্টেন লিন্ডেল। তার কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আরও দু'জন এগিয়ে এল। সংখ্যার ক্রমটা কখনোই একজনকে শেখানো হয় না। তিনজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই শুধুমাত্র ভল্টটা খুলতে সক্ষম।

সবার বাটন টেপা শেষ হতেই অ্যানালাইজারের লাল বাতির রং পাল্টে সবুজ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করল বিশ টন ওজনের ভারী দরজাটা। মানুষ ঢোকার মতো ফাঁক তৈরি হতে পুরো এক মিনিট সময় লাগল।

"চলুন," বলে সামনে এগোনোর ইঙ্গিত করল ওয়ালডর্ফ। তাদের গাইডের ভূমিকা নিয়েছে লোকটা। গ্রে, শেইচান আর মঙ্কের পেছনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সামনে বাড়লেন ক্যাপ্টেন লিন্ডেল।

"বর্তমানে এখানে সব মিলিয়ে প্রায় দেড়শো মিলিয়ন আউন্স সোনা আছে," বলে উঠল ওয়ালডর্ফ। "গোটা স্বর্ণভান্ডারটা দুই তলা সমান উঁচু। প্রতিটা ফ্লোর ছোট ছোট কম্পার্টমেন্টে বিভক্ত। সেই সাথে একটা বেসমেন্ট লেভেলও আছে।"

তাদের ভেতরে ঢোকার জায়গা দিতে একপাশে সরে দাঁড়াল অফিসার ইন চার্জ। "তার মানে, বেশ অনেকটা জায়গা খুঁজতে হবে আপনাদের। অনুসন্ধান ছোট করে আনার কোনও উপায় জানা থাকলে বলতে পারেন।"

স্টিলের দরজাটা পেরিয়ে ভেতরের করিডোরে প্রবেশ করল গ্রে। জায়গাটা ছোট ছোট কম্পার্টমেন্টে ভাগ ভাগ করা। প্রতিটা ভাগের মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত সোনার বার স্তূপ করে রাখা।

সোজা হয়ে ওয়ালডর্ফের দিকে তাকাল সিগমা কমান্ডার। "তার আগে আমাকে বলুন, এখানে সোনার পাশাপাশি অন্য কিছুও রাখা হয় কিনা।"

"গুজব প্রচলিত আছে, এখানে নাকি বিভিন্ন গোপন ভাইরাস, কেমিক্যাল এজেন্ট, নার্ভ গ্যাস ইত্যাদি রাখা হয়। একবার তো এটাও শোনা গিয়েছিল, এলিয়েনদের মৃতদেহও নাকি আছে এখানে। কিন্তু এগুলো নিতান্তই গুজব। তবে হ্যাঁ, কিছু ঐতিহাসিক দলিলপত্র অবশ্য আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আসল কপি সংরক্ষণ করে আসছি আমরা। সেই সাথে ইংল্যান্ডের ম্যাগনা কার্টা সনদ এবং বিভিন্ন ইউরোপিয়ান দেশ থেকে আনা কিছু রত্নপাথরও আছে। তবে গত কয়েক দশক ধরে এখানে বাইরে থেকে কিছু আসেওনি, যায়ওনি। এমনকি কোনও সোনাও সরানো হয়নি।"

"তাহলে সোনার বাপারেই বলুন," বলল গ্রে। "এখানে প্রচুর পরিমাণ সোনার বার দেখতে পাচ্ছি, তবে এগুলোর বাইরে অন্য আকৃতির কিছু খুঁজছি আমরা।"

"হ্যাঁ, ঠিক আছে। সোনার বারের পাশাপাশি বিভিন্ন আকৃতির কয়েনও এখানে আছে।" জবাব দিল ওয়ালডর্ফ। "এছাড়াও মোটা প্লেট, ব্লক ইত্যাদিও আছে।"

"ওগুলোই দেখতে চাই আমরা। বিশেষ করে, ফিলাডেলফিয়া টাকশাল থেকে আসা প্লেটগুলো।"

"তা ঠিক আছে, কিন্তু ওগুলোর সাথে জাতীয় নিরাপত্তার কী সম্পর্ক?"

মাথা নাড়ল গ্রে। "নিশ্চিত নই। খুঁজে দেখতে হবে।"

"হুম," সায় দিল অফিসার। "আপনিই এই কাজের ইনচার্জ। আপনি যা বলবেন তাই হবে। কিন্তু এজন্য আমাদের নিচের বেসমেন্টে যেতে হবে। বক্রকারে করে ফিলাডেলফিয়া থেকে আনা জিনিসগুলো এখনও কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।"

সিঁড়ি বেয়ে সবাইকে নিয়ে বেসমেন্টের দিকে রওনা হলেন ওয়ালডর্ফ। "এদিকে।"

নিচের কম্পার্টমেন্টের সোনাগুলো উপরের মতো সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো না। অবশ্য প্লেট আর ব্লকগুলোর অসমান আকৃতির জন্য সেটা করাও সম্ভব না। একটা কম্পার্টমেন্টে কিছু সরু রডও দেখা গেল।

চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল গ্রে। যদি এটা সঠিক ভল্ট হয়েও থাকে, কীভাবে খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজবে তারা?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনে এগোল মঙ্ক, পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল। "এদিকে দেখ, এই প্লেটগুলোর উপর জাতীয় সীল দেখা যাচ্ছে।"

স্তুপ করে রাখা প্লেটের সারির দিকে এগোল গ্রে। একটা প্লেটের উপর আবছাভাবে এক থাবায় তীরের গোছা আর অন্য থাবায় জলপাইয়ের ডাল ধরা ন্যাড়া মাথার ঈগলের আকৃতি খোদাই করা আছে।

"ফোরটেস্কুর কথাগুলো মনে আছে?" জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

লাইনটা মনে করতে পারল গ্রেঃ "কেউ বুঝতেই পারবে না, সীলের ভেতর নিরাপদে লুকানো আছে বহুমূল্য মানচিত্রটা।"

"হয়তো তিনি আমেরিকার জাতীয় সীলের কথাই বলেছিলেন," যোগ করল মঙ্ক।

উপরের প্লেটটা ভালোভাবে দেখল গ্রে। জিনিসটা আকারে চোদ্দ বাই দশ ইঞ্চি, প্রায় এক ইঞ্চির মতো মোটা। যদিওবা তারা সেই পুরনো ইন্ডিয়ান মানচিত্রের আকৃতি সম্পর্কে জানে না, কিন্তু ম্যাস্টোডনের মতো একটা প্রাণীর খুলির ভেতর ভরা জিনিসটার আকৃতি নিশ্চয়ই অনেক বড় হবে।

ভল্টের আরেকপাশে থাকা মোটা সোনার ব্লকগুলোর মতো।

স্তুপটার দিকে চোখ ফেরাল সে। ব্লকগুলো সংখ্যায় প্রায় একশোর বেশি হবে। এগুলোর যে কোনও একটা ভেতরই ইন্ডিয়ান মানচিত্রটা লুকানো আছে। নিশ্চিত হওয়ার একটাই উপায়। সরাসরি মঙ্কের চোখের দিকে তাকাল গ্রে।

"চল, ব্লকগুলো নামিয়ে দেখা যাক।"

রাত ৯:১০

একপাশে দাঁড়িয়ে গ্রে আর মঙ্ককে কাজ করতে দেখছে শেইচান। একে একে স্তূপাকৃতি সোনার ব্লকগুলো নামিয়ে চেক করার পর, অন্যপাশে নতুন স্তুপ তৈরি করছে দু'জন। পায়ে আঘাত পাওয়ায় শেইচানের পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব না। কিন্তু সুস্থ থাকলেও ভারী ব্লকগুলো নাড়াতে পারত কিনা, তার নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে। ওয়ালডর্ফের মতে, প্রতিটা ব্লকের ওজন প্রায় সত্তর পাউন্ড। শেইচান বুঝতে পারছে না, মঙ্ক একহাতে ভারী জিনিসগুলো কীভাবে তুলছে।

কাজের সুবিধার্থে অনেক আগেই পরনের জ্যাকেট খুলে ফেলেছে দুই বন্ধু, কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়েছে শার্টের হাতা। প্রতিবার নিচু হয়ে ব্লক তোলার সময় তাদের হাতের বাইসেপের পেশী ফুলে ফুলে উঠছে। ওয়ালডর্ফ আর লিন্ডেল অবশ্য সাহায্য

করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গ্রে তাদের মানা করে দিয়েছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভেতর ফিসফাস করছে ফোর্টের দুই স্টাফ।

একে একে অর্ধেক স্তূপ সরিয়ে ফেলেছে ওরা। কিন্তু আসল জিনিসের দেখা পাওয়া যায়নি। প্রতিবার ব্লক তোলার পর, উল্টেপাল্টে দুই পাশে সীল খুঁজতে খুঁজতে হাঁপিয়ে উঠেছে দুই সিগমা এজেন্ট।

সামনে এগিয়ে গেল শেইচান। "আমি একপাশ দেখছি, তোমরা উল্টোদিক দেখ।"

কথাটা গ্রে-র মনে ধরেছে। "ধন্যবাদ।"

বলতে না বলতেই আরেকটা ব্লক তুলে ধরল ওরা। "কিছু আছে ওপাশে?"

"না।"

আবারও ফোরটেস্কুর কথাটা মনে করল গ্রে। "সীলের ভেতর নিরাপদে লুকানো আছে বহুমূল্য মানচিত্রটা।" মানচিত্রটা সেই বিশেষ ঘনত্বের সোনায় তৈরি। অর্থাৎ, সাধারণ সোনার চাইতে ওটার গলনাঙ্কও বেশি। এজন্যই সোনার ব্লকের ভেতর জিনিসটাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন জেফারসন। যাতে প্রয়োজনের সময় আবারও বাইরের সোনা গলিয়ে ফেলে ভেতরের মানচিত্রটা বের করে নেয়া যায়।

"এটা দেখ," মঙ্কের ডাকে তার সম্বিত ফিরল। "সীল।"

পরের ব্লকটার উপরের দিকে, এক থাবায় জলপাইয়ের ডাল আর অন্য থাবায় তীরের গোছা আঁকড়ে ধরে রাখা একটা ঈগলের ছবি খোদাই করা আছে।

"এটাই আসল জিনিস," গ্রে-র কণ্ঠে উচ্ছ্বাস।

কিন্তু মাথা নাড়ল শেইচান। "নিশ্চিত হব কীভাবে?"

"গুনে দেখ, থাবার গোছায় চোদ্দটা তীর আছে।" জবাব দিল গ্রে। "অবশ্য আরেকটা কাজ করা যেতে পারে। ইন্ডিয়ান মানচিত্রটা সেই বিশেষ ঘনত্বের সোনায় তৈরি, তার মানে জিনিসটা ওজনের বেশ ভারী হবে। অন্য একটা ব্লকের সাথে এই ব্লকটার ওজন মিলিয়ে দেখলেই পার্থক্যটা বোঝা যাবে।"

"ভল্টের বাইরে বেশ কিছু ওজন পরিমাপ যন্ত্র দেখেছিলাম," বলে উঠল শেইচান।

ওয়ালডর্ফকে কথাটা বলতেই রাজি হয়ে গেল সে। "চলুন, উপরে যেতে হবে।"

মাথা নাড়ল গ্রে। পরক্ষণেই মঙ্ক আর ক্যাপ্টেনকে নমুনা হিসেবে আরেকটা ব্লক তুলে নেয়ার ইঙ্গিত করল। আসল ব্লকটা নিজের হাতে নিয়েছে।

মঙ্ককে এগোতে মানা করলেন ক্যাপ্টেন। একাই একটা ব্লক তুলে নিলেন। "চলুন, যাওয়া যাক।"

ওয়ালডর্ফের পিছু নিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল গোটা দলটা। কিন্তু ভল্টের মুখে আসতেই আটজন সশস্ত্র সৈন্য উদ্যত অস্ত্র হাতে তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল।

আঁতকে উঠলেন লিন্ডেল। "কী হচ্ছে এসব?"

একজন অফিসার এগিয়ে এসে তার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল। "স্যার, এই মাত্র খবর পেলাম, এই মেয়েটা একজন কুখ্যাত টেরোরিস্ট। সিআইএ-সহ

আরও কয়েকটা এজেন্সির মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় ওর নাম আছে।" বলে শেইচানের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

কথাটা শোনার সাথে সাথে যেন শেইচানের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা একটা স্রোত নেমে গেল। তার কভার ভেঙে গেছে! হয়তো ফোর্টের স্ক্যানারে চেহারা শনাক্তকারী সফটওয়্যার ইনস্টল করা ছিল। কোনও না কোনওভাবে তার ছবিটা গোয়েন্দাদের ডাটাবেসে চলে গেছে।

সবগুলো চোখের দৃষ্টি শেইচানের দিকে ঘুরে গেল। বলা বাহুল্য, সেই সাথে উদ্যত অস্ত্রগুলোও।

কিন্তু অফিসারের কথা এখনও শেষ হয়নি। "দেখামাত্র ওকে গ্রেফতার করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তার সাথে থাকা বাকি সবার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কোনও রকম বাধা দিলে গুলি করতেও বলে দেয়া হয়েছে।"

সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন লিন্ডেল। "আগেই আন্দাজ করেছিলাম, নিশ্চয়ই আপনাদের নিয়ে কোনও একটা ঘাপলা আছে। অফিসার, এখুনি সবগুলো প্লেট ভল্টে রেখে লক করে দাও।" বলে গ্রে-র হাতে থাকা সোনার ব্লকটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে গ্রে-র দিকে তাকাল শেইচান। তার জন্যই সবকিছু ভেস্তে যেতে বসেছে।

সাথে সাথে এগিয়ে এল ওয়ালডর্ফ, কোটের ভেতর থেকে একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে তার হাতে। গ্রে-র হাত থেকে ব্লকটা কেড়ে নিল সে। পরমুহূর্তেই পিস্তলটা ক্যাপ্টেনের মাথার দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় লাফিয়ে উঠল সবাই। কিন্তু চমক এখনও শেষ হয়নি।

ওয়ালডর্ফের ইশারায় নড়ে উঠল সশস্ত্র চার সৈনিক। বাকি চারজনকে গুলি করে ঝাঁজরা করে দিল তারা। এই লোকগুলো এয়ারপোর্ট থেকে ওদের নিয়ে আসা এসকর্ট টিমেও ছিল, মনে করতে পারল গ্রে।

চেঁচিয়ে উঠল সিগমা কমান্ডার, "শূয়োরের বাচ্চা..."

তার কথায় কোনও কান দিল না ওয়ালডর্ফ। বাকি সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ইশারা করল সে। "এদেরকে গাড়িতে তুলে রদেভু পয়েন্টে নিয়ে চল। সেই সাথে সোনার প্লেটটাও।"

সিগন্যাল পেয়েই এক সৈনিক ঘুরে দাঁড়িয়ে ওয়ালডর্ফের উরুতে গুলি করল। উফ করে ওঠে মেঝেতে বসে পড়ল ফোর্টের অফিসার ইন চার্জ।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে শেইচান। তারা সবাই একটা নাটকের অংশ হয়ে গেছে। ওয়ালডর্ফ বোঝাতে চাইছে, গ্রে-র দলটাই সবাইকে আক্রমণ করেছে। এসকর্ট টিমের এয়ারপোর্টে দেরিতে পৌছানোর কারণটাও আন্দাজ করতে পারছে সে। হয়তো আসল এসকর্ট টিমকে মেরে ফেলে হামভিটা দখল করে নিয়েছিল গিল্ডের লোকেরা।

নিজের পা ধরে কাঁপতে থাকা ওয়ালডর্ফের দিকে তাকাল শেইচান। সে জানত, সরকারি বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ে গিল্ড নিজের জাল বিছিয়ে রেখেছে। তাই বলে ফোর্ট নক্সেও? ব্যাপারটা বিস্মিত করল তাকে।

আমাদের ব্যবহার করা হয়েছে, বুঝতে পারল মেয়েটা।

গ্রে-র উপস্থিত বুদ্ধি আর পাজল সমাধানের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করে নিয়েছে গিল্ড।

অস্ত্রের মুখে তাদের গেটের দিকে এগোতে বাধ্য করল সৈনিকরা। বাকিদের কী হবে তা না জানলেও, নিজের ভাগ্যের ব্যাপারে শেইচান পুরোপুরি নিশ্চিত।

সে গিল্ডকে ধোঁকা দিয়েছে।

এখন সেই কাজের মূল্য চুকাতে হবে।

অধ্যায় ২৭
৩১ মে, সন্ধ্যা ৬:১১
অ্যারিজোনা মরুভূমি

দড়ি বেয়ে হেলিকপ্টার থেকে মেসার উপর নেমে এল কাই। রোটরের বাতাসে অনেক আগেই আশেপাশের সব ধুলাবালি পরিষ্কার হয়ে গেছে। দড়ি ছেড়ে দিয়ে নিচের বিস্তৃত প্রকৃতির দিকে তাকাল সে।

"এইতো প্রায় পৌঁছে গেছি," বলে উঠল জর্ডান। তাকেও মেয়েটার সাথে একই দড়ি দিয়ে নামানো হয়েছে। নিজের গায়ে জর্ডানের হাত অনুভব করে বেশ নিরাপদ বোধ করল কাই।

মেসার নিচে খোলা জায়গাটা অস্ত্রধারী কমান্ডো আর বিভিন্ন ইকুইপমেন্টে বোঝাই হয়ে আছে। এক জায়গায় বিরাট একটা ড্রিল মেশিন দিয়ে পাথর খুঁড়তে দেখা গেল।

লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, রাফায়েল সেইন্ট জার্মেইন সবকিছু তদারক করছেন। কাই আর জর্ডানকে পৌঁছাতে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি। "আহ, এইতো এসে পড়েছ তোমরা দুই মানিকজোড়।"

হঠাৎ গর্তের ভেতর থেকে কালো বডি আর্মার পরা একটা অবয়বকে উঠে আসতে দেখা গেল। কাই চিনতে পারল, এই সেই কমান্ডো দলটার নেতা- বার্ন। কাজ করতে করতে ঘামে গোসল হয়ে গিয়েছে লোকটা।

"স্যার," মুখ খুলল সে। "পুরো পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। এবার শুধু টোপ ফেলতে হবে।"

"খুব ভালো, বার্ন। ঠিক আছে, আমরা তৈরি। চল, তুরুপের তাশ দুটোকে নিয়ে নিচে যাওয়া যাক।"

জর্ডানের দিকে ফিরে তাকাল কাই। ছেলেটার চোখেমুখে ভয়ের ছাপ ফুটে আছে। অবশ্য তার নিজের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এখনও চোখ বন্ধ করলে পার্ক রেঞ্জার মেয়েটাকে গুলি করার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে সে।

আলতো করে জর্ডানকে জড়িয়ে ধরল কাই। বার্ন এগিয়ে এসে দু'জনকে আলাদা করার জন্য হাত ধরে টানতেই একটা ঝটকা মারল তরুণ ইন্ডিয়ান। "আমরা নিজেরাই চলতে পারব।"

আস্তে আস্তে কালো গর্তটার দিকে এগোতে লাগল দু'জন।

কে জানে, নিচে ওদের জন্য কী অপেক্ষা করছে!

সন্ধ্যা ৬:২২

টানেল বেয়ে কাদার নদীটার সামনে এসে দাঁড়ালেন পেইন্টার। হ্যাঙ্ককে আনাসাযিদের গ্রামেই রেখে এসেছে। কোয়ালস্কি তার পিস্তল হাতে টানেলের মুখে, একটা বোল্ডারের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে কভার দিচ্ছে।

পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন পেইন্টার। কুকুরের ফিতায় রক্ত দেখার পর থেকে তার মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে। আগেভাগেই নিজের অস্ত্রটা কোয়ালস্কিকে দিয়ে দিয়েছেন। আর তাছাড়া উপরে নিশ্চয়ই হামলাকারীদের গোটা দল থাকবে। একটা পিস্তল দিয়ে তো আর তাদের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব না।

টানেল থেকে বেরিয়ে নদীটার দিকে এগোলেন সিগমা ডিরেক্টর। সালফারের ঝাঁজ আর উত্তাপ এখন যেন আরও বেশি করে গায়ে লাগছে। কাদার স্রোত কী আরও বেড়েছে? না...হয়তো গুহার ঠান্ডাভাব থেকে বেরিয়ে আসার ফলেই এমনটা অনুভূত হচ্ছে।

ব্রিজের ওপারে ল্যাম্পের আলোয়, কমব্যাট গিয়ার পরা কয়েকজন সৈন্যের আনাগোনা চোখে পড়ল। নিজেদের উপস্থিতি লুকানোর কোনও চেষ্টা করছে না লোকগুলো। হয়তো বুঝতে পেরেছে, কুকুরটার পালিয়ে আসায় তাদের অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে।

তাকে বেরিয়ে আসতে দেখে কয়েকটা রাইফেল উঁচু হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মাথার উপর দুই হাত উঁচু করে ধরলেন পেইন্টার। বোঝাতে চাইছেন, তিনি নিরস্ত্র। সাথে শুধু ব্যাগপ্যাক আর ফ্ল্যাশলাইট ছাড়া কিছুই নেই।

একজন সৈন্য এগিয়ে এসে তার পেছনের টানেলে ঢোকার চেষ্টা করতেই, কোয়ালস্কির পিস্তল গর্জে উঠল। তবে লোকটার গায়ে গুলি করেনি সে। শুধুই সতর্কবার্তা ছিল এটা।

"পেছনে একজন লোক রেখেছি আমি," বলে উঠলেন পেইন্টার। "সুবিধাজনক অবস্থানের পাশাপাশি তার কাছে বেশ ভালো পরিমাণ গোলাবারুদও আছে। পিছিয়ে যাও, নয়তো তোমাদের সবাইকে শুইয়ে ফেলতে ওর খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। তোমরা কি চাও, তা জানি আমি। ব্যাপারটা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যেতে পারে।" বলতে বলতে এক পা দু পা করে ব্রিজের দিকে এগোতে লাগলেন তিনি।

উল্টোদিকে সৈন্যদের ঝাঁক থেকে একজন খাটো, চিকন মানুষ বেরিয়ে এল। এতোক্ষণ যাবত তাকে আড়াল করে রাখা কমান্ডোকে চিনতে পারলেন পেইন্টার। ইউনিভার্সিটির ল্যাবে এই লোকটাই প্রফেসর ডেন্টনকে গুলি করেছিল। সাথে সাথে কাউচের ফিতায় লেগে থাকা পার্ক রেঞ্জারের রক্তের কথা মনে পড়ল তার।

আমি দুঃখিত, ন্যান্সি... ব্যাপারটায় তোমাকে জড়ানো উচিত হয়নি।

ভাবতে ভাবতে তার মনে রাগ যেন দলা পাকিয়ে উঠল।

কিন্তু এখন প্রতিশোধের সময় নয়।

কমব্যাট গিয়ার পরা লোকটার পেছনে আরেকটা অবয়ব দেখা গেল- জর্ডার আপ্পাওয়ারা। অবশ্য ছেলেটাকে এখানে দেখে অবাক হলেন না পেইন্টার। এখানে হামলা হয়েছে বুঝতে পেরেই তিনি মনে মনে আন্দাজ করে নিয়েছিলেন, কোনও না কোনওভাবে হুমেতেওয়াদের বাড়িতে পৌছে গিয়েছিল লোকগুলো। সেখান থেকেই তাদের ট্রেইল পেয়েছে গিল্ড।

"আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই," বলে আস্তে আস্তে কাঁধের ব্যাগ থেকে দুটো সোনার প্লেট বের করে আনলেন পেইন্টার। "মনে হয় এগুলোর জন্যই এখানে এসেছ তোমরা, তাই না?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রাগ করল ব্রিজের দিকে এগিয়ে আসা চিকন লোকটা।

"মনসিয়র ক্রো, আমার নাম রাফায়েল সেইন্ট জার্মেইন," তার কণ্ঠে ফ্রেঞ্চ টান শনাক্ত করতে পারলেন সিগমা কমান্ডার। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার তাকে অবাক করল। খাটো লোকটার গোটা শরীর মৃদু কাঁপছে। তাছাড়া শরীরের অস্বাভাবিক আকৃতি আর লাঠি দেখে বোঝা যাচ্ছে, কোনও ধরণের বিকলাঙ্গতার শিকার সে। মৃদু হেসে আবারও মুখ খুলল লোকটা। "মনে হয়, ওগুলো এখান থেকে নিয়ে তবেই ফিরব আমি।"

"অবশ্যই," জবাব দিলেন পেইন্টার। "কিন্তু কোনও ধরনের ঝামেলা ছাড়াই জিনিসগুলো পেতে পারেন আপনি, বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে।"

কিন্তু সাথে সাথে রাফায়েলের সিগন্যাল পেয়ে একজন সৈন্য এগিয়ে এল, পেইন্টারের হাত থেকে প্লেটগুলো কেড়ে নিল সে।

রাফায়েল চোখের দ্যুতি অনুভব করলেন পেইন্টার। আহত পশু সবসময়ই সাধারণের চেয়ে বেশি হিংস্র হয়। আর এই লোক তো জন্ম থেকেই আহত। তাছাড়া, সে এমন একটা দলের সাথে সম্পৃক্ত, যেখানে দুর্বলের কোনও স্থান নেই।

প্লেটগুলো ছুঁয়ে দেখলেন রাফায়েল। "তবে আপনার কাছ থেকে এতোটা সহযোগিতা আশা করিনি আমি, মনসিয়র ক্রো। তো বলুন, এবার আপনাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?"

সাথে সাথে রাইফেল কক করার আওয়াজ পেলেন পেইন্টার।

ওই বাক্যটার পর রাফায়েলের মুখ থেকে ভিলেনের মতো হাসি শুনতে পাবেন বলে আশা করছিলেন সিগমা ডিরেক্টর। কিন্তু সেরকম কোনও আভাস না পেয়ে তিনি নিজেই মৃদু হাসলেন। "যা বলেছিলাম, বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবেই ওগুলো আমি আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম আমি। তাছাড়া, এই গুহায় আমি এমন কিছু পেয়েছি যার কাছে প্লেটগুলোর কোনও দামই নেই।"

রাফায়েলের চোখদুটো চকচক করে উঠল।

ব্যাগের ভেতর থেকে পুটসিভদের পাত্রের নেকড়ের মাথাওয়ালা ঢাকনাটা বের করে আনলেন পেইন্টার।

সাথে সাথে মৃদু কেঁপে উঠলেন রাফায়েল, বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। "এ হতে পারে না!"

"মুখভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছি, আমাদের খুঁজে পাওয়া জিনিসটা সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা আছে আপনার।"

"ওহ, হ্যাঁ..." এক পা এগিয়ে এলেন রাফায়েল।

"আমি এখান থেকে ফিরে না গেলে, পেছনে থাকা আমার লোক পাত্রটা এই উত্তপ্ত নদীতে ফেলে দেবে।"

আবারও কেঁপে উঠল রাফায়েল। দাবার ছক উল্টে গেছে। "বুঝতে পেরেছি। কী চান তা বলুন।"

"ব্রিজের এপাশ থেকে আপনার লোকদের ফিরিয়ে নিন," বলে জর্ডানের দিকে ইঙ্গিত করলেন পেইন্টার। "ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠান। তারপর গুহা থেকে পাত্রটা নিয়ে আসব আমি। আর এসবের শেষে আমাদের সর্বশেষ বিনিময় হবে।"

"সর্বশেষ বিনিময়?"

"আপনি খুব ভালো করেই জানেন, আমি কী চাই," বলে সরাসরি লোকটার চোখের দিকে তাকালেন পেইন্টার। "আমার ভাতিজিকে ফেরত চাই আমি।"

সন্ধ্যা ৬:২৮

ধুশ শালা...

দাবার ছক উল্টে গেছে। দমবন্ধ করে নেকড়ের মাথা আকৃতির ঢাকনাটার দিকে তাকিয়ে আছেন রাফায়েল। খুব ভালো করেই জানেন, জিনিসটা কতখানি দামী। ন্যানোটেকনোলজির হলি গ্রেইল বলা যায় পাত্রটাকে, হারিয়ে যাওয়া প্রযুক্তির এক অপার বিস্ময়, অনন্ত ঐশ্বর্যের চাবিকাঠি। পাত্রটা হাসিল করতে পারলে জার্মেইন পরিবারের সমৃদ্ধি আর বৈভব উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে।

আর রাফায়েল সেইন্ট জার্মেইন, ব্রিটল বোন রোগধারী ছেলেটাই হবে সেই সমৃদ্ধির ধারক ও বাহক। কোনও কিছুই এখন আর তাকে রুখতে পারবে না।

বার্নের দিকে ফিরলেন রাফায়েল। "যা বলা হয়েছে, করো। তোমার লোকদের এপাশে ডেকে নাও। সেই সাথে ছেলেটাকেও ফিরিয়ে দাও।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর, আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে মনঃস্থির করল রেফের সেকেন্ড ইন কমান্ড। হাতের বাঁধন কেটে জর্ডানকে সামনের দিকে ঠেলে দিল সে।

"যাও।"

ব্রিজ ধরে ওপাশে ছুটতে আরম্ভ করল ছেলেটা। উল্টোদিক থেকে বার্নের লোকেরাও ফিরতে শুরু করেছে। রাফায়েলের ইশারা পেয়ে কাই-কে সামনে নিয়ে এল বার্ন। পেইন্টারকে সামনে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেয়েটার মুখ।

জর্ডান ওপাশে পৌঁছে যেতেই সামনে বাড়লেন পেইন্টার। সেই সাথে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছেন ব্যাগপ্যাকের স্ট্র্যাপ। তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন রাফায়েল।

না!

সন্ধ্যা ৬:৩০

রাফায়েলের দৃষ্টি নিজের দিকে ঘুরে যেতে দেখলেন পেইন্টার। জর্ডানের মুখে রাইফেলের বাঁটের আঘাতের দাগগুলো দেখার সাথে সাথে ভাতিজির চিন্তায় তার রক্ত হীম হয়ে এল।

শয়তানগুলো কি মেয়েটার সাথেও এমন ব্যবহার করেছে?

সময়ই উত্তর দেবে।

মাত্র কয়েক কদম সামনে এগিয়েছেন পেইন্টার। কিন্তু এতেই একেবারে ব্রিজের গোড়ায় পৌছে গেছেন তিনি। কাঁধ ঝাঁকা দিতেই ব্যাগপ্যাকটা খুলে উত্তপ্ত কাদার স্রোতের উপর ঝুলতে লাগল।

"সোনার পাত্রটা আপনার সাথেই আছে!" চেঁচিয়ে উঠলেন রাফায়েল। "শুরু থেকেই আপনার কাছেই ছিল জিনিসটা।"

জবাবে পেইন্টার ব্যাগের উপরদিকের জিপার খুলে ধরতেই, ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ভেতর থেকে পাত্রের সোনালি ঝিলিক চোখে পড়ল। "গুলি করুন আমাকে, সাথে সাথে নিচের নদীতে পড়ে যাবে মহামূল্যবান জিনিসটা। যদি আসলেই এটা চান, তাহলে কাই-কে আপনার ছাড়তেই হবে। ও ব্রিজ পেরিয়ে এপাশে আসার পরই আপনার দিকে ব্যাগটা ছুঁড়ে দেব আমি।"

"কথামতো কাজ করবেন, তার গ্যারান্টি কী?"

"আমি কথা দিয়ে কথা রাখি।"

সরাসরি রাফায়েলের চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন পেইন্টার। ব্যাপারটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। নিজের প্রাণের পরোয়া নেই তার। আশা করা যায়, কাই-কে ছেড়ে দিয়ে পাত্রটা নিয়ে চম্পট দেবে রাফায়েল। যদি সে আক্রমণ করেও বসে, তাহলে লুকানো জায়গা থেকে কোয়ালস্কি অন্তত বাকিদের নিরাপত্তা দিতে পারবে।

নিজের প্রাণ জুয়ায় লাগিয়েছেন সিগমা ডিরেক্টর।

এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর অবশেষে মাথা নাড়লেন রাফায়েল। "ঠিক আছে। আপনার কথা বিশ্বাস করলাম, মনসিয়র ক্রো। আশা করি, সভ্য মানুষের মতো চুক্তিটা সফলভাবে শেষ করতে পারব আমরা।"

কাই-কে ছেড়ে দেয়ার জন্য নিজের লোকদের ইশারা করলেন তিনি। সাথে সাথে আদেশ পালন করল বার্ন। ছাড়া পেয়ে পেইন্টারের দিকে এক পা এগিয়ে এল কাই। কিন্তু পরক্ষণেই বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দৃষ্টি। কিন্তু নিজের চাচার দিকে তাকায়নি মেয়েটা।

আরও পেছনে তাকিয়ে আছে সে।

পেছনে ফিরতেই পায়ের নিচে পাথরের কম্পন অনুভব করলেন পেইন্টার। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। অন্ধকার, সেই সাথে ফুটন্ত কাদার বুদবুদ আওয়াজে এতক্ষণ বিপদটা টের পাননি তিনি। ব্রিজের এপাশ থেকে একটা কালো অবয়বকে

ছুটে আসতে দেখা গেল। টান দিয়ে পেইন্টারের কাছ থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে রাফায়েল কাছে পৌঁছে গেল লম্বা আকৃতিটা।

ধাক্কা খেয়ে ব্রিজের গোড়ায় উল্টে পড়লেন পেইন্টার। বার্ন তার মনিবের আদেশ মেনেছিল। নিজের 'লোকদের' ফিরিয়ে নিয়েছিল সে। কিন্তু দলের একমাত্র মহিলা এইপাশেই থেকে গিয়েছিল। ব্যাপারটা লক্ষ্য না করার মুল্য এখন পেইন্টারকে চুকাতে হচ্ছে।

বিশালদেহী মহিলা ব্যাগটা রাফায়েলের দিকে তুলে ধরল।

"খুব ভালো খেল দেখিয়েছ, আশান্দা।"

হতভম্ব দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন পেইন্টার।

"মনে হয়, এখন ব্রিজ থেকে নেমে যাওয়াটাই আপনার জন্য ভালো হবে বন্ধু।"

ইশারা পেয়ে রাফায়েলের এক সৈন্য পকেট থেকে একটা ট্রান্সমিটার বের করল। বাটন টিপতেই ব্রিজের একপাশ থেকে পাথর আর ধুলো ছিটকে উঠতে দেখা গেল। এক সেকেন্ড পরই হুড়মুড় করে নদীতে আছড়ে পড়ল গোটা ব্রিজ। আঁতকে উঠে টানেলের দিকে ছুট লাগালেন পেইন্টার। পাথরের টুকরোর আঘাতে নদী থেকে উত্তপ্ত গলিত পাথর আর কাদা ছিটকে উঠল।

টানেলের মুখের কাছে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে নদীর উল্টোদিকে তাকালেন পেইন্টার। রাফায়েল আর তার দলও গুহার ওপাশের টানেলের দিকে পৌঁছে গেছে। গর্ত বেয়ে উঠে যাওয়ার আগে আবারও চেঁচিয়ে উঠল রাফায়েল। "কাই, আঙ্কেলকে গুডবাই বল।"

অন্তরের গভীর থেকে মেয়েটার ভয়ার্ত কণ্ঠ বেরিয়ে এল। "আঙ্কেল ক্রো, আমি দুঃখিত।"

গর্ত বেয়ে আস্তে আস্তে গোটা দলটাকে হারিয়ে যেতে দেখলেন হতভম্ব, পরাজিত পেইন্টার ক্রো।

এগিয়ে এল কোয়ালস্কি, জর্ডানও তার সাথেই আছে। "ব্রিজটার কী হলো?"

"উড়িয়ে দিয়েছে।"

"কাই?" জর্ডানের কণ্ঠে বিষাদ।

জবাব না দিয়ে শুধু মাথা নাড়লেন পেইন্টার।

"এখন কী করব আমরা?" জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি। "নদী পার হব কী করে?"

মনের সব হতাশাকে একপাশে ঠেলে দিলেন সিগমা কমান্ডার। যে করেই হোক, খুব তাড়াতাড়ি নদিটা পেরিয়ে ওপাশে পৌঁছাতে হবে। রাফায়েলের কাছে কাই-এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এমন অবস্থায় মেয়েটাকে বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবে না ধূর্ত লোকটা। কিন্তু এখন বিনিময়ের জন্য পেইন্টারের তুরুপে আর কোনও তাস নেই। সোনার প্লেট আর পাত্র, দুটোই নিয়ে গেছে রাফায়েল।

এমন সময় পুরা গুহাটা কেঁপে উঠল। উল্টোদিকের টানেলের মুখ থেকে ধুলোর স্তূপ বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

"মনে হচ্ছে, শালারা শুধু ব্রিজেই বোমা বসায়নি," বলে উঠল কোয়ালস্কি।

মনে মনে উপরের গুহামুখের ছিদ্রটা ধ্বসে পড়তে দেখলেন পেইন্টার।

ধুলো সরে যেতেই বাতাসের প্রবাহ থেমে গেল। ছিদ্রটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর ওদিক দিয়ে বাতাস বেরোতে পারছে না।

আঁতকে উঠল জর্ডান। "এখন কী করব আমরা?"

কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগেই বিকট শব্দে গুহার সিলিং থেকে কয়েকটা পাথরের বোল্ডার ধ্বসে পড়ল। পেইন্টার বুঝতে পারলেন, উপর্যুপরি বোমা বিস্ফোরণে ভূগর্ভস্থ বুদবুদের কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। ক্রমাগত পাথর ধ্বসার পরিমাণ বাড়তে লাগল, সেই সাথে ছিটকে উঠতে লাগল কাদার স্রোত।

এক মুহূর্ত পর, জলোচ্ছ্বাসের মতো নদীটার দুই প্রান্ত ছাপিয়ে বইতে লাগল গরম কাদা। টানেল বেয়ে ঢুকে পড়ল স্রোতের রেখা।

অবশেষে জর্ডানের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন পেইন্টার।

"দৌড়াও!"

অধ্যায় ২৮
৩১ মে, রাত ৯:৩৩
ফোর্ট নক্স, কেনটাকি

পুরো পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে...

মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে, মঙ্ক আর শেইচান। অস্ত্রের মুখে তাদের গেটের সামনে নিয়ে এল ওয়ালডর্ফের লোকেরা। সবার পেছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে ফোর্ট নক্সের অফিসার ইন চার্জ, গিল্ড এজেন্ট মিচেল ওয়ালডর্ফ।

"ওদেরকে বের করে নিয়ে যাও। অফিসে ফিরে যাচ্ছি আমি। পাঁচ মিনিট পর অ্যালার্ম বাজিয়ে দেব। ততোক্ষণে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারবে তোমরা।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

গেটের বাইরে হামভিটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল গ্রে, স্টার্ট দেয়াই আছে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। একবারের বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে না।

গাড়ির একপাশের দরজা খুলে ধরল এক সৈন্য। সাথে সাথে মঙ্কের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল গ্রে। আস্তে করে মাথা নাড়ল সিগমা এজেন্ট। নীরবেই আদেশ পেয়ে গেছে সে। কব্জিতে আটকানো প্রস্থেটিক কাফে চেপে বসল তার অন্যহাতের আঙুলগুলো।

"চোখ বন্ধ, হাত কানের উপর," শেইচানের কানে কানে ফিসফিস করল গ্রে।

প্রথমে অর্থ না বুঝলেও গ্রে-র দৃষ্টি অনুসরণ করে ঝুড়িতে রাখা মঙ্কের হাতের দিকে চোখ পড়ল তার।

"এখন," চেঁচিয়ে উঠল গ্রে।

সাথে সাথে কাফ স্পর্শ করল মঙ্ক। অ্যাক্টিভেট করল প্রস্থেটিক হাতে থাকা ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড। কিছুদিন আগেই নতুন প্রযুক্তিটা তার হাতে ফিট করা হয়েছিল।

কানে দুই হাত চেপে চোখ বন্ধ করল গ্রে। মঙ্কের হাতটা বিস্ফোরিত হওয়া মাত্র অত্যুজ্জ্বল আলোর সাথে সাথে বিকট আওয়াজ যেন ছুরির মতো আঘাত করল কানের পর্দায়।

চেঁচিয়ে উঠল কমান্ডোরা। সাময়িক অন্ধ আর কালা হয়ে গেছে সবাই।

গ্রে জানে, হাতে মাত্র এক মুহূর্ত সময় আছে। এগিয়ে গিয়ে কমণ্ডোদের দলনেতার সামনে একপাক ঘুরল সে, নড়ার ফাঁকেই হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে সোনার ব্লক। সজোরে ভারী পিন্ডটা দিয়ে, একযোগে লোকটার দুই হাঁটুতে বাড়ি মেরে ঘূর্ণন সম্পন্ন করল সিগমা কমান্ডার। হাড় ফাটার কর্কশ আওয়াজ ছাপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল সে। পরক্ষণেই মুখ থুবড়ে পড়ল টাইলসের মেঝেতে।

বসে নেই শেইচানও। এক সৈন্যের হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে লোকটার বুকে গুলি করল সে। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি খেয়ে, উড়ে গিয়ে আরেকজনের গায়ের উপর পড়ল লোকটা। চোখের পলকে পরবর্তী টার্গেটের দিকে রাইফেলের নল ঘুরিয়ে নিল শেইচান। মাত্র একবার চেঁচিয়ে উঠেই নিস্তেজ হয়ে গেল দুটো দেহ।

কাছাকাছি থাকা কমান্ডোর মুখে আছড়ে পড়ল মঙ্কের পেশীবহুল হাতের কবজি। নাক ভাঙার ব্যথা উপভোগ করার সুযোগ পেল না সে। এক সেকেন্ডের ব্যবধানে তাঁরই রাইফেল কেড়ে নিয় লোকটার বুক ঝাঁজরা করে দিল টেকোমাথার সিগমা এজেন্ট।

লবি ধরে গুলি করে চলেছে শেইচান। কমান্ডোদের একজনও আর ধরাধামে নেই। সেই ফাঁকে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে নিজের অফিসে ঢুকে পড়েছে ওয়ালডর্ফ। ঘুরে দাঁড়িয়ে সেদিকে গুলি করল মেয়েটা, কিন্তু বন্ধ দরজায় মাথা কুটা ছাড়া কিছু করতে পারল না বুলেটগুলো। ভল্টের মতো ফোর্টের সব দরজাই রিইনফোর্সড স্টিলের তৈরি।

"ধুশশালা..."

এক মুহূর্ত পর কান ফাটিয়ে অ্যালার্ম বেজে উঠল... ওয়ালডর্ফের কাজ।

মেইন এক্সিট ধরে স্টিলের পুরু ব্লাস্ট ডোর নেমে আসতে শুরু করল, আটকে ফেলবে গোটা বিল্ডিং।

"যাবার সময় হয়ে গেছে," চেঁচিয়ে উঠল মঙ্ক।

শেইচানের পেছন পেছন দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল গ্রে, একহাতে করে সোনার ব্লকটা নিয়ে আসতে ভোলেনি।

"আগে ভাবতাম, ফর্ট নক্সে ঢোকা কঠিন," দৌড়ানোর ফাঁকে মুখ খুলল মঙ্ক। "এখন দেখছি বেরিয়ে যাওয়া আরও বেশি কঠিন।"

"গাড়িতে..." হামভিটার দিকে ইশারা করে চেঁচিয়ে উঠল গ্রে।

ছুটে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল সে। পাশের জায়গাটা মঙ্ক দখল করল। শেইচান উঠল পেছনে। একইসাথে বন্ধ হলো তিনটা দরজা।

গিয়ার দিয়ে এক্সেলেটরে পা রাখল গ্রে, উঠে এল রাস্তায়। পেছনে ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেল, গুলি করার জন্য জানালার একপাশের কাঁচ নামাচ্ছে শেইচান।

"গুলি করো না," আদেশ করল সিগমা কমান্ডার। "নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে আসছে নিরীহ মিলিটারিরা।"

"বাহ! কাজ তো দেখছি ক্রমাগত সহজ হচ্ছে," বিড়বিড় করল মঙ্ক।

অবশ্য গাড়িটার জন্য একটা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে ওরা। এখানে আসার সময়ই গ্রে খেয়াল করেছিল, ওদের বহনকারী হামভিতে সামরিক ব্যবহারের জন্য আর্মার লাগানো আছে। অর্থাৎ, বুলেটপ্রুফ কাঁচ, চারদিকের স্টিলের বাড়তি প্লেটিং, রিইনফোর্সড দরজা ইত্যাদি। তার মানে, গুলি চালিয়ে মিলিটারিরা বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না।

তাছাড়া পুরো ব্যাপারটা আচমকা ঘটে গেছে। আশা করা যায়, বাইরের গার্ডরা এখনও প্রকৃত ঘটনা উপলব্ধি করতে পারেনি।

সরাসরি বেড়ার মেইন গেটের দিকে গাড়ির নাক তাক করল গ্রে। দ্বিধাবিভক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পোস্টে থাকা সেন্ট্রিরা। বুঝতে পারছে না, আসলেই কি ডাকাতি হচ্ছে, নাকি এটা একটা মহড়া।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রাইফেল উঁচু করল, গেটের সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা চারজন গার্ড। কিন্তু সামনের কাঁচে আঁচড় কাটা ছাড়া তাদের গুলি গাড়িটার আর কোনও ক্ষতি করতে পারল না।

এককোণার সেন্ট্রির টাওয়ার থেকে একটা রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড উড়ে এল। কিন্তু অতিরিক্ত গতির কারণে, গাড়ির অনেকটা সামনে দিয়ে গিয়ে একপাশের বেড়ায় আঘাত করল ওটা।

কাছে চলে এসেছে মেইন গেট। "ধরে বস!" গাড়ি চালানোর ফাঁকে চেঁচিয়ে উঠল গ্রে, গতি কমানোর বদলে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। জানে, সময় থাকতেই সামনের গার্ডরা সরে যেতে পারবে।

তার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই যেন সংঘর্ষের ঠিক আগমুহূর্তে, রাস্তা থেকে লাফিয়ে সরে দাঁড়াল লোকগুলো। গাড়ির উপর দিয়ে আরও কয়েকটা গুলি বেরিয়ে গেল। গেটটা দুমড়ে মুচড়ে গোল্ড ভল্ট রোডে বেরিয়ে এল তাদের হামভি।

"পাঁচ মিনিটের ভেতর বেস থেকে পাখি উড়িয়ে দেবে ওরা," বলে উঠল মঙ্ক। পাখি বলতে হেলিকপ্টার গানশিপের কথা বুঝিয়েছে সে। "হাতে কিছুটা সময় পাচ্ছি আমরা। কিন্তু আরেকটা ঝামেলা বাকি আছে-"

একটা তীক্ষ্ণ হুইসেলের আওয়াজে তার কণ্ঠ এবং গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ, দুটোই চাপা পড়ে গেল।

"-মর্টার!"

বুম...

একটুর জন্য টার্গেট মিস করল মর্টারের গোলা। পেছনের রাস্তায় বড়সড় একটা গর্ত তৈরি হলো।

রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে বাঁক নিল গ্রে। থর্ন পার্ক হ্রদের উত্তরদিকে রেখে, মিলিটারি বেসের উল্টোদিকের ডিক্সি হাইওয়েতে উঠে এল সে।

আরেকটা মর্টারের গোলার আঘাতে, রাস্তার পাশের একটা ওক গাছ জ্বলন্ত মশালে পরিণত হলো। আগুন আর ধোঁয়ার সারি পেরিয়ে সামনে বাড়ল তাদের হামভি।

"উরিবাবা!" আঁতকে উঠল মঙ্ক। "একটুর জন্য পাছাটা বাঁচল।"

এই বিপদের সময়ও কথাটা শুনে না হেসে পারল না শেইচান। "তাই নাকি?"

"হয়তো ওরা আমাদের টার্গেট করছে না," স্টিয়ারিং হুইল নিয়ে যুঝতে যুঝতে বলল গ্রে। "শুধু দেরি করিয়ে দিতে চাইছে।

কথাটা মনে ধরল মঙ্কের। "হ্যাঁ, গানশিপ আকাশে উঠার আগপর্যন্ত।"

গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল গ্রে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খোলা হাইওয়ে ছেড়ে সিভিলিয়ান এলাকায় ঢুকে যেতে হবে। গাছের সারির ফাঁক দিয়ে সামনে গাড়ির আনাগোনা দেখা যাচ্ছে।

প্রায় পৌঁছে গেছি...

"ওই যে, আসছে হেলিকপ্টার," বলে উঠল শেইচান।

হাইওয়ের বাঁকে পৌঁছে, অন্যান্য গাড়ির সারির ভেতর হামভি ঢুকিয়ে দিল গ্রে। কিন্তু গতি কমায়নি একটুও। সাথে সাথে হর্ণ বাজিয়ে প্রতিবাদ জানাল কয়েকটা গাড়ি। একটা এসইউভি র পেছনের বাম্পারে ঠুকে গেল তাদের হামভির সামনের দিক। কিন্তু এখন এসব দেখার সময় নেই। দেরি হয়ে গেলে মিলিটারি হেলিকপ্টার তাদের শনাক্ত করে ফেলবে। ইতিমধ্যে হয়তো লোকাল পুলিশকেও খবর দেয়া হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই এল বলে।

সামনে রাডক্লিফ শহরের বাতিগুলো যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শহরের মুখ পর্যন্ত এসে হাইওয়ে একটা শাখা রোডে পরিণত হয়েছে। গ্রে-র গন্তব্যও এটাই।

"হেলিকপ্টার এসে পড়েছে," আঁতকে উঠল শেইচান।

এক সেকেন্ড পরই তাদের কয়েক গজ পেছন দিয়ে পেরিয়ে গেল গানশিপের স্পটলাইট। একটুর জন্য গাড়িটাকে নাগালে পায়নি।

"পরের বাঁকে ঢুকে যাও," বলল মঙ্ক।

বন্ধুর কথামতো ডানে মোড় নিল গ্রে। রাস্তার দুইপাশের উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলো তাদের কিছুক্ষণ আড়াল করে রাখবে। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ না।

"ওই যে," সামনের দিকে হাত তুলে ইশারা করল মঙ্ক।

গ্রেও দেখতে পেয়েছে জিনিসটা।

তাদের পরিত্রাণের উপায়।

অটোমেটিক গাড়ি ধোয়ার সুবিধা সম্বলিত একটা গ্যারেজের নিয়ন সাইন ওটা, পঞ্চাশ গজের মতো সামনে। সাইনটার সামনে পৌঁছে প্রথমবারের মতো গাড়ির গতি কমাল গ্রে, মোচড় নিয়ে ঢুকে গেল গ্যারেজের পার্কিং লটে।

"বেরোও," আদেশ করল গ্রে। সামনের দরজা খুলে ফেলেছে নিজেও, সাথে করে সোনার ব্লকটা নিতে ভোলেনি। এক সেকেন্ড পর মঙ্ক আর শেইচানও বেরিয়ে এল। মাথার উপর হুম্প হুম্প শব্দে গোটা এলাকা চষে ফেলছে তিনটা হেলিকপ্টার, সার্চলাইট ফেলে হামভিটাকে খুঁজছে।

কিন্তু আজ শুধু ওরাই গাড়ি ধোয়াতে গ্যারেজে আসেনি। ময়লা টিশার্ট আর কোঁচকানো জিন্স পরা একটা রোগাপটকা ছেলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হঠাৎ ভূতের মতো আবির্ভূত হওয়া দলটার দিকে।

মঙ্ক ছেলেটার দিকে হাতের রাইফেল তাক করল।

"গুলি করো না...গুলি করো না," আঁতকে উঠল রোগাপটকা। ওদের গাড়িচোর ভেবেছে। "দাঁড়াও...দাঁড়াও," বলতে বলতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের পুরনো

পন্টিয়াক ফায়ারবার্ড গাড়িটার দিকে ইশারা করল সে। "ভেতরে চাবি লাগানোই আছে।"

মঙ্কও জবাবে নিজেদের হামভির দিকে ইশারা করল। "আমাদেরটাতেও। মালটাকে একেবারে নিজের মনে করে ব্যবহার করবে, ঠিক আছে?"

জবাবে হতভম্ব ছেলেটা কিছু বলার আগেই নড়ে উঠল গ্রে। এখন মশকরা করার সময় না। সোনার ব্লকটা গাড়ির ট্রাংকে রেখে ড্রাইভিং সিটে চড়ে বসল সে। ইগনিশন থেকে কঙ্কালের মাথাওয়ালা একটা চাবির রিং ঝুলছে। এবার সামনের সিট দখল করল শেইচান। মঙ্ক পেছনের প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসল।

এক মিনিট পর শহর ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল ওদের। সবার ফোন থেকে ব্যাটারি খুলে রাখতে বলল গ্রে। কোনও ট্র্যাক রাখা যাবে না। নিজের ফোনটা বন্ধ করার আগে বাড়ির নাম্বার থেকে আসা একটা ভয়েস মেইল দেখতে পেল সে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে পাওয়ার বাটন টিপে ধরল সিগমা কমান্ডার। এখন অন্য কোনওদিকে মনোযোগ ফেরানো যাবে না। তাছাড়া তার মায়ের কাছে জরুরী প্রয়োজনে ফোন করার জন্য সিগমার ইমারজেন্সি নাম্বার দেয়া আছে।

পরবর্তীতে সিগমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য ডিস্পোজেবল ফোন কিনে নিতে হবে ওদের। কিন্তু তার আগে হেলিকপ্টারগুলো থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব বাড়িয়ে নেয়া চাই।

একটু পর রাস্তার পাশের গ্যাস স্টেশনে থেমে একটা মানচিত্র কিনে নিল গ্রে, তারপর যাত্রা করল সোজা দক্ষিণদিকে। অবশ্য গাড়িটার পুরনো ভি-এইট ইঞ্জিন দিয়ে খুব একটা গতি তোলা যাচ্ছে না, তবুও নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। নিজেদের খুঁজে বের করার সমস্ত ইলেকট্রিক মাধ্যম বন্ধ করে দেয়ার পর, এখন তাদের চিহ্ন বলতে শুধু গাড়ির ফাটা টেইলপাইপ দিয়ে বেরোতে থাকা একসারি ধোঁয়া।

গ্রে প্রার্থনা করল, এটাই যেন তাদের একমাত্র ট্রেইল হয়।

গাড়ি চালাতে চালাতে চাবির রিং-এ ঝুলতে থাকা রূপালি রঙের মাথার খুলিটার দিকে তাকাল সে। মনে হচ্ছে যেন, এদিক সেদিক নড়াচড়া করতে করতে খুলিটা ওকে কোনওকিছু থেকে সাবধান করতে চাইছে।

কিন্তু কীসের থেকে?

অধ্যায় ২৯
৩১ মে, সন্ধ্যা ৬:৪৩
অ্যারিজোনা মরুভূমির গভীরে

সব ঠিক হয়ে যাবে...

হাঁটু গেড়ে বসে কাউচের ঘাড়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন হ্যাঙ্ক কানোশ। একটু আগের বিস্ফোরণে কুকুরটা বেশ ভয় পেয়েছে। ভয় অবশ্য হ্যাঙ্ক নিজেও পেয়েছেন। আনাসাযিদের হিমশীতল কবরের নিঃস্তব্ধতা অনুভূতিটাকে আরও গাঢ় করে তুলছে।

কী হচ্ছে ওদিকে?

হঠাৎ মৃদু গড়গড় করে উঠল কাউচ। এক মুহূর্ত পর প্রফেসর নিজেও টানেল ধরে বুটপরা পায়ের ছুটে আসার আওয়াজ শুনতে পেলেন।

কারা আসছে? বন্ধু নাকি শত্রু?

প্রশ্নটার জবাবেই যেন টানেল থেকে একটা চিকন অবয়ব ছুটে বেরিয়ে এল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চেহারাটা দেখার সাথে সাথে চিনতে পারলেন হ্যাঙ্ক।

"জর্ডান?"

"পিছিয়ে যান," চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা। সেই সাথে হ্যাঙ্কের হাত ধরে টেনে তাকে টানেলের মুখ থেকে খানিকটা পেছনে সরিয়ে দিল।

"কী হচ্ছে এসব... "

কথাটা শেষ করার আগেই টানেল থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন পেইন্টার আর কোয়ালস্কি।

তাদের পেছন পেছন হিসহিস শব্দ এগিয়ে আসতে শুনতে পেলেন প্রফেসর। এক মুহূর্ত পর কালো একটা স্রোত টানেল উপচে বেরিয়ে এল।

কাদা।

পথের বরফ গলাতে গলাতে এগিয়ে আসতে লাগল গরম কাদার প্রবাহ।

"আমাদের এখানে আটকে ফেলেছে শত্রুরা," বলে উঠলেন পেইন্টার। "তাদের বোমা বিস্ফোরণের ফলে কাদার নদীতে বান ডেকেছে।"

ঠান্ডার তীব্রতায় দুই হাতের তালু ঘসতে লাগল জর্ডান।

"সামনে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের," বলে আনাসাযিদের কবরের দিকে ইঙ্গিত করলেন পেইন্টার। "শুধুমাত্র ঠান্ডাই আমাদের রক্ষা করছে। বরফের সংস্পর্শে গরম কাদা জমে গিয়ে নতুন কাদা আসার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। একসময় না একসময় উত্তাপের কাছে বরফকে হার মানতেই হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। অবশেষে এখানকার মৃতদেহগুলোর মাটির নিচে বিশ্রাম নেবার সৌভাগ্য হচ্ছে।

"কিন্তু যাব কোথায় আমরা?" জিজ্ঞেস করল জর্ডান।

উত্তরটা পেইন্টার মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিলেন। গুহার উল্টোদিকের দেয়ালের সবচেয়ে প্রশস্ত টানেলটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "ওদিকে।"

পেছনে কাদার হিসহিস আওয়াজ যেন তাদেরকে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে আবেদন জানাচ্ছে। তাই দেরি না করে রওনা হয়ে গেলেন সবাই। সবার আগে ফ্ল্যাশলাইট হাতে টানেল ধরে এগিয়ে চলেছেন পেইন্টার, তারপর হ্যাঙ্ক আর জর্ডান, সবার শেষে কোয়ালস্কি। সামনের দিকে ক্রমাগত ঢালু হয়ে এসেছে পথ, সেই সাথে ঠান্ডাও। হ্যাঙ্ক অনুমান করলেন, আনাসাযিদের ভাসিয়ে নেয়া বন্যার পানিও এই পথেই গিয়েছিল।

নিচু সিলিং-এ হাত বুলাল জর্ডান। "মনে হচ্ছে, আমরা একটা পুরনো লাভা টিউবে আছি। এটা সম্ভবত ক্রমাগত নিচের দিকেই এগিয়েছে।"

"ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না," সায় দিলেন পেইন্টার। "আমাদের উপরে ওঠার জন্য একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে।"

"আর সেটা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি," যোগ করল কোয়ালস্কি।

পায়ের নিচে পানির ক্ষীণ ধারা বইতে দেখলেন হ্যাঙ্ক। যার অর্থ, কাদার উত্তাপ বরফ গলিয়ে দিচ্ছে। সবাইকে গতি বাড়ানোর জন্য তাড়া দিলেন প্রফেসর।

আরও মিনিট দশেক পর টানেলটা ফুরিয়ে এল।

"না!," আঁতকে উঠলেন পেইন্টার। সামনে একটা নিচু খাদে হারিয়ে গেছে পথের বাকি অংশ। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় বেশ নিচুতে খাদের মেঝের বরফ দেখা গেল। অবশ্য সরাসরি সামনের দিকে কিছুটা দূর থেকে আবারও সামনে এগিয়েছে টানেলটা, কিন্তু দুটো অংশের মাঝখানে আট ফুট একটা ফাঁক আছে। ব্যাপারটা দেখে মনে হচ্ছে যেন, ঈশ্বর নিজ হাতে এক খাবলা মাটি আর পাথর তুলে নিয়ে মাঝখান থেকে দু'ভাগ করে দিয়েছেন লাভা টিউবটাকে।

"লাফাতে হবে," বললেন পেইন্টার। "মাঝখানের দূরত্ব খুব একটা বেশি না। কিছুটা দূর থেকে দৌড়ে এলে অনায়াসেই ফাঁকটা পেরনো যাবে।"

হ্যাঙ্কের কণ্ঠে হতাশা, "পাগল হলেন নাকি?"

"হলেই বোধ হয় ভালো ছিল।"

কোয়ালস্কিও পেইন্টারকে সমর্থন দিল। "ধুর! এটা কোনও সমস্যাই না।"

"পারব আমি," বলে বাকিদের পিছিয়ে যেতে ইশারা করল জর্ডান। "আমি আগে যাচ্ছি।"

"জর্ডান..." সতর্ক করতে চাইলেন হ্যাঙ্ক।

"আর তো কোনও উপায় নেই।"

এবার আর কেউ কথাটায় আপত্তি জানাল না। পিছিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে দৌড়ানোর জন্য জায়গা বের করে দিল সবাই।

"সাবধানে," তরুণ ইন্ডিয়ানের কাঁধে আলতো চাপড় দিলেন পেইন্টার।

একহাতের বুড়ো আঙুল তুলে তাকে আশ্বস্ত করল ছেলেটা। তারপর পিছিয়ে গিয়ে দৌড় শুরু করল।

পুরো ঘটনাটা যেন স্লো মোশনে ঘটে যেতে দেখলেন হ্যাঙ্ক। ছুঁড়ে দেয়া তীরের মতো খাদের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে উড়ে গেল জর্ডান। তারপর বরফাবৃত মেঝেতে পড়ে খানিকটা পিছলে গেল। এক মুহূর্ত পরই আবার খাদের অপরপ্রান্ত ফিরে এল সে, মুখে স্মিত হাসি।

"চলে আসুন।"

"এবার আমি যাচ্ছি," বলে পেছনে বাড়লেন পেইন্টার। "কোয়ালস্কি, আমি ওপারে পৌঁছালে কুকুরটাকে আমার হাতে ছুঁড়ে দিও।"

কথাটা শুনে কাউচের দিকে তাকাল বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট। প্রাণীটাকে খুব একটা খুশি দেখাচ্ছে না।

দৌড়ে এসে জর্ডানের মতোই নিরাপদে ফাঁকটা পেরিয়ে গেলেন সিগমা কমান্ডার।

তিনি উঠে দাঁড়াতেই পা ধরে কাউচকে তুলে ফেলল কোয়ালস্কি। মৃদুস্বরে কুঁইকুঁই করে উঠল ককুরটা।

"সাবধানে," তাকে সতর্ক করলেন হ্যাঙ্ক।

এক পা এগিয়ে কুকুরটাকে পেইন্টারের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিল কোয়ালস্কি। পায়ের নিচে কিছু নেই বুঝতে পেরে গর্জে উঠল কাউচ, বাতাসে পা ছুঁড়তে আরম্ভ করল। সেকেন্ডের ব্যবধানে পেইন্টার লুফে নিলেন প্রাণীটাকে।

হ্যাঙ্কের চোখেমুখে প্রশান্তি দেখতে পেল কোয়ালস্কি। "তার মানে এবার আপনার পালা, ডক্টর।"

আঁতকে উঠে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। "বুঝতে পারছি না, কাজটায় সফল হব কি না।"

"তাহলে আপনাকেও কুকুরটার মতো ছুঁড়ে দেই?"

"হ্যাঁ, দরকার হলে আমি সাহায্য করতে পারি," অপর প্রান্ত থেকে সায় দিলেন পেইন্টার।

না-বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন হ্যাঙ্ক, একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার গলা বেয়ে। "ঠিক আছে। চলুন কাজটা সেরে ফেলে যাক।"

"আপনি চাইলে ধাক্কা দিয়ে আপনার দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিতে পারব আমি," প্রস্তাব করল কোয়ালস্কি।

প্রফেসর উত্তরে কিছু বলার আগেই টানেলের মুখে হিসহিস আওয়াজ শোনা গেল। বরফ গলিয়ে পথ করে নিয়েছে উত্তপ্ত কাদা। পৌঁছে গেছে টানেলের ভেতর।

"শুরু করুন, ডক্টর।"

কিন্তু ইতস্তত করতে লাগলেন হ্যাঙ্ক।

"প্রফেসর, দৌড়ান!" চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি।

তার বাঁজখাই কণ্ঠের চিৎকার শুনেই হয়তো মত পরিবর্তন করলেন প্রফেসর। শুরু করলেন দৌড়। কিন্তু খাদের কিনারায় পৌঁছে লাফ দেয়ার ঠিক আগমুহূর্তে পিছল বরফ তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। বরফের কিনারায় পা হড়কে গেল হ্যাঙ্কের।

আতঙ্কে শিউরে উঠলেন প্রফেসর। কিন্তু পরক্ষণেই পেশীবহুল একটা হাত তার কোমর আঁকড়ে ধরল।

"এইতো ধরেছি..." কোয়ালস্কির গলা।

হ্যাঙ্ককে কোলে নিয়ে খাদটা পেরিয়ে গেল কোয়ালস্কি। কিন্তু বাকি দু'জনের মতো তাদের অবতরণ ততটা মসৃণ হলো না। হুড়মুড় করে পেইন্টারের গায়ে আছড়ে পড়লেন তারা।

এক মুহূর্ত পর উঠে দাঁড়ালেন সবাই। ভালোয় ভালোয় খাদটা পেরনো গেছে, এটুকুই অনেক। পেছনে তাকাতেই দেখা গেল, টানেলের এপ্রান্তে কাদার একটা ঝর্ণা তৈরি হয়েছে। আনাসাযিদের কবর ভাসিয়ে নিয়ে নিচের খাদের দিকে বয়ে চলেছে ফুটন্ত কাদার স্রোত।

মৃতদেহগুলোর আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে ছোট একটা প্রার্থনা করলেন হ্যাঙ্ক। কোয়ালস্কির কথায় তার সম্বিত ফিরল।

"এবার?"

সন্ধ্যা ৭:২৮

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন সবাই।

"এখানে থামা যাক," বলে দাঁড়িয়ে গেলেন পেইন্টার। খাদ পেরনোর পর, গত আধা ঘন্টা যাবত ক্রমাগত হেঁটে চলেছেন তারা। কিন্তু পথ আস্তে আস্তে আরও ঢালু হচ্ছে।

সামনে টানেল তিন দিকে ভাগ হয়ে গেছে।

"এবার কোনদিকে?" জানতে চাইলেন হ্যাঙ্ক।

জবাব না দিয়ে সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকালেন পেইন্টার। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে সবাই। হ্যাঙ্কের বোতলে থাকা পানিটুকু পালাক্রমে পান করছে তারা। কোয়ালস্কিরটা ইতিমধ্যে খালি হয়ে গেছে। আর পেইন্টারের ব্যাগটা রাফায়েলের লোক কেড়ে নিয়ে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে ঠান্ডায় না হোক, পানিশূন্যতায় ভুগে মরতে হবে সবাইকে।

আর কতক্ষণ চলবে এভাবে?

নিজের কুকুরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন হ্যাঙ্ক। রেসের ঘোড়ার মতো ক্রমাগত ঘামছে কোয়ালস্কি। পানিশূন্যতা সবার আগে তাকেই ধরবে বলে হচ্ছে। জর্ডানকে শুরুর দিকে বেশ চটপটে দেখালেও আস্তে আস্তে তার চেহারাও ফিকে হয়ে আসছে।

পেইন্টারের নিজের অবস্থাও খুব একটা ভালো না। চোখ বন্ধ করলেই কাই-কে টেনে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছেন তিনি। তার চেয়েও খারাপ কথা, একটু পরপর পানির ছলছল আওয়াজ কানে এসে ধরা দিচ্ছে। তার মানে, হ্যালুসিনেশন শুরু হয়েছে।

মেয়েটা কী এখনও বেঁচে আছে?

চিন্তাটা পেইন্টারের পাশাপাশি জর্ডানের মনেও ঝড় তুলছে। বেশ কিছুটা সময় একসাথে কাটিয়েছে দু'জন। একে অন্যের বেশ কাছাকাছিও চলে এসেছে। এগিয়ে গিয়ে একটা শাখা টানেলের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ছেলেটা।

অন্যমনস্ক হয়ে কাই-এর কথা ভাবতে ভাবিতে জর্ডানের দিকে তাকালেন পেইন্টার। সাথে সাথে ছেলেটার চুলের মৃদু নড়াচড়া লক্ষ্য করলেন তিনি। সাথে সাথে হ্যাঙ্কের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন সিগমা ডিরেক্টর।

জর্ডানের হেলান দিয়ে দাঁড়ানো টানেলের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "ওদিকে নিশ্চয়ই একটা ব্লোহোল আছে। বাতাসের একটা মৃদু প্রবাহ লক্ষ্য করেছি আমি।"

ভ্রূ কুঁচকাল কোয়ালস্কি। "তো?"

"তো, অবশ্যই কাছাকাছি উপরে ওঠার একটা পথ আছে।"

উঠে দাঁড়ালেন হ্যাঙ্ক। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে তার শরীরে যেন কিছুটা বল ফিরে এসেছে।

নিজের উরুতে একটা চাপড় মারল কোয়ালস্কি। "তাহলে এখানে বসে আছি কেন আমরা? উপরে উঠেই সবার আগে একটা পানির উৎস খুঁজে বের করতে হবে। জীবনে প্রথমবারের মতো পানির এতখানি অভাব বোধ করছি আমি।"

নতুন উদ্যমে হাঁটা শুরু করল সবাই।

হাঁটার ফাঁকে আবারও মুখ খুলল কোয়ালস্কি। "তবে হ্যাঁ, তার মানে কিন্তু এই না যে, কেউ একটা ঠান্ডা বিয়ার অফার করলে তাকে প্রত্যাখ্যান করব আমি।"

পথে আরেকটা শাখা টানেল পড়তেই, নিজের বাগপ্যাক থেকে একটা লাইটার বের করে জ্বাললেন হ্যাঙ্ক। আগুনের শিখার কম্পন অনুসরণ করে সঠিক পথ বেছে নেয়া হলো। কিছুক্ষণ পর অবশেষে উপরের দিকে উঠতে শুরু করল টানেলের মেঝে। বাতাসের প্রবাহও ক্রমাগত আরও জোরদার হচ্ছে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে কমছে পথে থাকা বরফের আস্তরণ।

"সারফেসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি মনে হচ্ছে," বলে পানির বোতলে চুমুক দিলেন হ্যাঙ্ক। খড়খড় আওয়াজে বোঝা গেল খালি হয়ে গেছে ওটা।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন পেইন্টার।

রাত ৯:৪৫।

কিন্তু পরবর্তী এক ঘন্টা হাঁটার পরও সারফেসের দেখা পাওয়া গেল না। আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসছে ফ্ল্যাশলাইটের আলো। এমন সময় পায়ের নিচে কিছু ভাঙার মটমট আওয়াজ শুনতে পেলেন হ্যাঙ্ক।

নিচের দিকে আলো ফেলতেই দেখা গেল, জিনিসগুলো হচ্ছে মাটির তৈরি তৈজসপত্র।

নিচু হয়ে একটা বাটির ভাঙা অংশ হাতে নিলেন তিনি। "আনাসাযিদের হাতের কাজ এগুলো।"

তার কথা শুনে দুইপাশের দেয়ালে ফ্ল্যাশলাইট তাক করলেন পেইন্টার।

"গুহাচিত্র," পেছন থেকে বলে উঠল জর্ডান।

মাথা নাড়লেন হ্যাঙ্ক। "এগুলো পেট্রোগ্লিফ। পেইন্টার, আপনার লাইটটা নিভিয়ে ফেলুন তো।"

প্রফেসরের কথামতো কাজ করলেন সিগমা ডিরেক্টর।

কিন্তু আলো নিভিয়ে ফেলার পরও টানেলে পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এল না। সামনের দিক থেকে আবছা আলো আসতে দেখা গেল।

আবারও লাইট জ্বাললেন পেইন্টার। "মনে হয়, আমরা কোথায় আছি তা আমি আন্দাজ করতে পারছি।"

তার সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলেন হ্যাঙ্ক। "মুক্তির পথ আর খুব একটা দূরে নেই।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন পেইন্টার। নতুন উদ্যমে দ্বিগুণ গতিতে সামনে এগোতে শুরু করল সবাই। কয়েক মুহূর্ত পর মাথার উপর থেকে উঁকি দিল চাঁদের আলো। কিন্তু আলোর পথে বাধা হয়ে বসে আছে একটা স্টিলের গেট। জিনিসটা চিনতে পারলেন পেইন্টার। আগেও এটা দেখেছেন তিনি, তবে উল্টোদিক থেকে।

"উপাতকির ব্লোহোল," বিড়বিড় করলেন সিগমা ডিরেক্টর। উপরে দাঁড়িয়ে বলা ন্যান্সির কথাগুলো মনে করতে পারলেন তিনি।

গুহাগুলোর বিস্তৃতি প্রায় সাত বিলিয়ন ঘনফুট...

এতক্ষণ যাবত ওই কথাটারই সত্যতা প্রমাণ করছিলেন তারা।

ভেতরের উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পারছেন না হ্যাঙ্ক। "আনাসাযিরা কীভাবে গনহত্যা থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তা আন্দাজ করতে পেরেছি আমি। এদিক দিয়ে নেমে টানেল পেরিয়ে ওপাশের গুহায় পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। তারপর, অন্য আরেকটা ব্লোহোলের নিচে আবাস গেড়েছিল। বন্যায় ভেসে মরার আগপর্যন্ত এই গুহাই ওদের নিরাপত্তা দিয়েছিল।"

যাক...অন্তত একটা রহস্যের সমাধান হলো, ভাবলেন পেইন্টার। কিন্তু আরেকটা সমস্যা রয়েই গেছে।

এগিয়ে গিয়ে ব্লোহোলের গ্রিলের দরজায় হাত রাখলেন তিনি। "তালা দেয়া।"

"চিন্তা নেই," বলে মুচকি হেসে পকেট থেকে পিস্তল বের করল কোয়ালস্কি। "আমার কাছে চাবি আছে।"

অধ্যায় ৩০
জুন ১, রাত ২:০৮
ন্যাশভিল, টেনেসি

"ওরা এখনও তোমাদের খুঁজছে," সস্তা ডিস্পোজেবল ফোনে অস্পষ্ট শোনাচ্ছে ক্যাটের কণ্ঠ। "সারা রাত খুঁজবে।"

সাদা একটা ফোর্ডের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে গ্রে। কয়েকঘন্টা আগে একটা পার্কিং লট থেকে পন্টিয়াক ফায়ারবার্ডটা বদলে নিয়েছে ওরা। আশা করা যায়, সকালের আগে গাড়িচুরির ব্যাপারটা ধরা পড়বে না।

তারপরও পালিয়ে বেড়াচ্ছে গোটা দলটা। মেইন রোড ছেড়ে নানা গলিঘুপচি পেরিয়ে, এখন দক্ষিণের ন্যাশভিল শহরে এসে পৌঁছেছে।

"সব ধরণের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাই তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে," বলে চলেছে ক্যাট। "এফবিআই, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, সিভিল ল এনফোর্সমেন্ট ইত্যাদি...রাতারাতি সন্ত্রাসী কুখ্যাতি পেয়ে গেছ তোমরা সবাই।"

সাববারবান ইনডাস্ট্রিয়াল পার্কের মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে মঙ্ক। কথা বলতে বলতে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনদিকে তাকাল গ্রে। চুপচাপ গাড়ির উইন্ডশিল্ডের দিকে তাকিয়ে আছে শেইচান। অন্ধকার অতীতের জন্য ওকে অফিশিয়ালি সিগমার এজেন্ট বানানো যায়নি। ওর ভূমিকা অনেকটা গুপ্তচরের মতো, যার সিগমার সাথে সম্পৃক্ততার ব্যাপারটা মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন জানে। বাকি দুনিয়ার কাছে সে এখনও মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসীই আছে।

"ফোর্ট নক্সের গার্ডরা ধাপ্পাবাজিটা ধরল কী করে?" জানতে চাইল গ্রে। "আমাদের ভুয়া পরিচয়পত্র তো একেবারে আসলের মতোই ছিল। ঢোকার সাথে সাথে অবশ্য আমাদের স্ক্যান করার পাশাপাশি ছবিও তোলা হয়েছিল। শেইচানের ছবিই কি সর্বনাশ ডেকে এনেছে?"

"এখনও জানতে পারিনি," জবাব দিল ক্যাট। "কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চিত, ফোর্টের ভেতর কিছু হয়নি। বাইরে থেকে কেউ ওদের খবর দিয়েছে। উৎসটা বের করার জন্য এখনও কাজ করছি আমি। মনে হচ্ছে যেন গোটা ওয়াশিংটন তোমাদের পেছনে উঠেপড়ে লেগেছে।"

"তার মানে, শুরু থেকেই এটা একটা ফাঁদ ছিল," বলে ফোর্টের অফিসার ইন চার্জের কথা মনে করল গ্রে। "ওয়ালডর্ফের কোনও খবর আছে?"

"না," জবাব দিল সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড। "চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অ্যালার্মের পরপরই লোকটা যেন পুরোপুরি গায়েব হয়ে গেছে। হয়তো বাকিদের মতো সে ও তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"এটা কেন বললে?"

"তোমাকে ফোন করার পেছনের কারণগুলোর মধ্যে এটাও একটা, সতর্ক করার জন্য। ওয়াশিংটন থেকে তোমরা যেই লিয়ারজেটে করে ওখানে গিয়েছিলে, ফেরার পথে পনেরো মিনিট আগে ওটা বিস্ফোরিত হয়েছে। মারা যাওয়ার আগে পাইলট বলে গিয়েছে, বিমানের টেইল সেকশনে বোমা রাখা ছিল। আন্দাজ করা হচ্ছে, বোমাটায় একটা অলটিমিটার টাইমার সেট করা ছিল। একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছার পরপরই সক্রিয় হয়েছে ওটা।"

তরুণ পাইলটের কথা মনে পড়ল গ্রে-র। সাথে সাথে যেন বুকের ভেতর রাগ দলা পাকিয়ে উঠল। "ওয়ালডর্ফের তো জানার কথা, বিমানে আমরা ছিলাম না।" পরক্ষণেই ব্যাপারটা ধরতে পারল সে। গ্রে-র কাছে ঘোল খাওয়ার প্রতিশোধ নিয়েছে ধূর্ত লোকটা।

"এজন্যও তোমাদের কোথাও থামা উচিত হবে না," যোগ করল ক্যাট।

"বুঝতে পেরেছি," সায় দিতেই মেয়েটার দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজ শুনতে পেল গ্রে। "আবার কী হয়েছে?"

"ড. জেনিস কুপারের কাছ থেকে রিপোর্ট এসেছে।"

নামটা মনে করতে এক সেকেন্ড সময় লাগল গ্রে-র। একটু পর ধরতে পারল, বেঁচে যাওয়া জাপানি পদার্থবিদদের মধ্যে এই মেয়েটাও ছিল। "কী হয়েছে? জাপানি নিউট্রিনো ফ্যাসিলিটিতে কাজ করত না ও?"

"হ্যাঁ। দুই পদার্থবিদকেই কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও অন্যান্য নিউট্রিনো ল্যাবের সাথে যোগাযোগ করেছে মেয়েটার সঙ্গী। আমাদের অনুরোধে, নতুন বড় নিউট্রিনো আলোড়নটার ব্যাপারে কাজ করছে সে।"

"জায়গাটা কি শনাক্ত করা গেছে?"

"না। কিন্তু ঘটতে যাওয়া বিস্ফোরণের মাত্রা নির্ণয় করতে পেরেছে সে। আইসল্যান্ডের বিস্ফোরণের চেয়ে একশো গুণ বড় হবে এটা।"

এলিরেই দ্বীপের বিস্ফোরণের দৃশ্যটা ভেসে উঠল গ্রে-র চোখের সামনে।

ওটার চাইতেও একশো গুণ বড়?

ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা তাহলে একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

বলে চলেছে ক্যাট, "এবার আসল কথায় আসি। আইসল্যান্ডের মতো প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করে, আসন্ন বিস্ফোরণের সম্ভাব্য সময়সীমাও শনাক্ত করতে পেরেছেন জাপানি বিজ্ঞানী।"

"কখন?"

"আর পাঁচ ঘন্টা বাকি।"

কথাটা শোনার সাথে সাথে যেন গ্রে-র শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা একটা স্রোত নেমে গেল। এই সময়ের ভেতর কী আর করা যাবে? যদি তাদের মাথার উপর গ্রেফতারি পরোয়ানা নাও থাকত, তাহলেও পাঁচ ঘন্টায় পশ্চিমাঞ্চলে উড়ে গিয়ে কিছু করা কঠিন হয়ে যেত। তবে মন্দের ভালো খবর হচ্ছে, ইতিমধ্যে ওখানে সিগমার কয়েকজন এজেন্ট আছে।

"ডিরেক্টর ক্রো-র কোনও খবর?"

কঠিন হয়ে এল ক্যাটের কণ্ঠ। "না। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, দলবল নিয়ে কোনও একটা ধ্বংসাবশেষের নিচের গুহায় নেমেছিলেন তারা। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে স্থানীয় পুলিশবাহিনী জানিয়েছে, বিস্ফোরণের ফলে গুহামুখটা বন্ধ হয়ে গেছে। একটা মনিটরিং টিম নিয়ে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে লিসা। এছাড়া, রোনাল্ড শিনের সাথে কথা হয়েছে আমার। তার কাছেও পেইন্টারের কোনও খবর নেই।"

গ্রে আশা করল, ডিরেক্টর নিরাপদে আছেন। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় চিন্তা বিস্ফোরণ নিয়ে। "শিনকে সময়সীমার ব্যাপারটা জানিয়েছ?"

"বলেছি। কিন্তু নির্দিষ্ট অবস্থান ছাড়া, তার পক্ষেই বা কী করা সম্ভব? এজন্যই বলছিলাম, তুমি তাড়াতাড়ি সোনার ব্লক থেকে ইন্ডিয়ান মানচিত্রটা বের করার চেষ্টা কর। হয়তো ওটাতে কোনও সূত্র থাকতে পারে।"

"দেখছি কী করা যায়। কিন্তু তাহলে সবার আগে সোনা গলানোর মত একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।"

"বুঝতে পেরেছি," সায় দিল ক্যাট। "ন্যাশভিলের একজন স্বর্ণকারের সাথে যোগাযোগ আছে আমার। ওর ঠিকানাটা লিখে নাও। পনেরো মিনিট পর, দোকানে তোমাদের সাথে দেখা করবে ও।"

গ্রে-রা এখন যেই রাস্তা ধরে যাচ্ছে, ক্যাটের দেয়া ঠিকানাটা ওই রাস্তা ধরেই কয়েক ব্লক সামনে।

"মঙ্ককে ফোনটা দেয়া যাবে?" জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

"দিচ্ছি," বলে ফোনটা ড্রাইভিংরত বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিল গ্রে। "মনে হয়, তোমার কপালে খারাবি আছে।"

কাটা হাতের কবজি দিয়ে স্টিয়ারিং হুইলটা আটকে রেখে অন্যহাতে ফোনটা ধরল মঙ্ক, তারপর চালান করে দিল একপাশের কাঁধ আর কানের ফাঁকে।

"হেই, ডার্লিং!"

অন্যপ্রান্ত থেকে ক্যাটকে কিছু একটা বলতে শুনলেও, কথাটা পুরোপুরি বুঝতে পারল না গ্রে।

"না না, অন্য হাতটাও খুইয়ে ফেলিনি আমি," জবাব দিল মঙ্ক। "ওই... শুধু প্রস্থেটিকটাই হারিয়েছে আর কি।"

যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা স্বামী-স্ত্রীর চিরাচরিত খুনসুটির কথা ভেবে মুচকি হাসল গ্রে।

ক্যাটের কথা শুনে হেসে উঠল মঙ্কও। "উম...ঠিক আছে বাবা...

বন্ধুকে প্রাইভেসি দেয়ার উদ্দেশ্যে গাড়ির কাঁচ ভেদ করে সামনের দিকে নজর দিল গ্রে। এক মুহূর্ত পর, চোখের কোণে রিয়ারভিউ আয়নায় শেইচানের মুখটা ভেসে থাকতে দেখল সে। রাতের আলো আঁধারিতে মেয়েটাকে বেশ শান্ত দেখাচ্ছে।

কিন্তু যতই শান্ত দেখাক, ভেতরে ভেতরে এখনও আগের মতোই হিংস্র আছে ও।

আয়নায় চোখাচোখি হতেই নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল সিগমা কমান্ডার। পরক্ষণেই মঙ্কের উত্তেজিত গলা শোনা গেল। "কী? এই মাত্র?"

সোজা হয়ে বসল গ্রে। "কী হয়েছে?"

"ক্যাটকে ফোন করেছে লিসা। ডিরেক্টরকে পাওয়া গেছে।"

অধ্যায় ৩১
৩১ মে, রাত ১১:৩২
ফ্ল্যাগস্টাফ, অ্যারিজোনা

বিস্ফোরণের আর মাত্র পাঁচ ঘন্টা বাকি?

লিসার পর এখন ক্যাটের সাথে কথা বলছেন পেইন্টার। হাতঘড়ির দিকে তাকালেন সিগমা ডিরেক্টর। তার মানে, এখানে সূর্যোদয়ের আশেপাশেই ঘটনাটা ঘটবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায়?

বলে চলেছে ক্যাট, "আমাদের একমাত্র আশা হচ্ছে গ্রে। দেখা যাক, ও ইন্ডিয়ান মানচিত্রটা থেকে কিছু বের করতে পারে কিনা।"

মুক্তি পাওয়ার পরও নিজের হাতদুটো বাঁধা বলে মনে হচ্ছে পেইন্টারের। ঘন্টাখানেক আগে উপাতকির ব্লোহোলের গেট ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন তারা সবাই। একটা সার্চ পার্টিও তখন তাদের খোঁজে ওখানেই ছিল। আচমকা চারজনের দলটাকে গুহা থেকে বের হতে দেখে আঁতকে উঠেছিল লোকগুলো। তৎক্ষণাৎ একটা রেঞ্জার স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। তারপরই নিজের অনুপস্থিতিতে কী কী ঘটেছে, তা জানার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েন সিগমা কমান্ডার।

"ক্যাট, কাই-এর কোনও খবর পেয়েছ?"

"না," জবাব দিল তার সেকেন্ড ইন কমান্ড। "অ্যারিজোনা আর উটাহ এর সবগুলো কাউন্টিতে চিরুনি অভিযান চালানো হয়েছে। কোনও আইন প্রয়োগকারী এজেন্সিই আপনার ভাতিজির শারীরিক বর্ণনার সাথে মেলানো যায়, এমন কোনও মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার রিপোর্ট করেনি।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল পেইন্টারের গলা বেয়ে। "জর্ডান বলেছে, কমান্ডো টিমের কাছে একাধিক হেলিকপ্টার ছিল। হয়তো দূরে কোথাও চলে গিয়েছে ওরা।"

"খোঁজার পরিধি বাড়িয়ে দিচ্ছি আমি।"

"আমার বেঁচে থাকার খবরটা ভালোভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ," জবাব দিল ক্যাট। "রেডিও, টেলিভিশন, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ইত্যাদি সবগুলো মাধ্যমেই খবরটা ছবিসহ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এগুলোর যে কোনও একটা খুললেই ব্যাপারটা জানতে পাবে হামলাকারীরা।"

"ভালো।"

পেইন্টার জানেন, তার বেঁচে থাকার খবরটাই এখন কাই-কে নিরাপদে রাখার একমাত্র অস্ত্র। এখনও মেয়েটাকে মেরে না ফেললে, খবরটা জানার পর নিশ্চয়ই

তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বাঁচিয়ে রাখবে রাফায়েল নামের লোকটা। কিন্তু কথা হচ্ছে, বিনিময় করার জন্য পেইন্টারের হাতে কী আছে?

পরবর্তী দশ মিনিটে ফোর্ট নক্সে গ্রে-র অভিযান আর নিউট্রিনো রিপোর্ট সম্পর্কে জানানোর পর, কল কেটে দিল ক্যাট।

"স্যার," পেছন থেকে একটা গলা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকালেন পেইন্টার। দরজার মুখে জর্ডান দাঁড়িয়ে আছে। বাকিরা ইতিমধ্যে রেঞ্জার স্টেশনের একটা খালি ঘরে ঘুমিয়ে পড়লেও, ছেলেটার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে, ঘুমায়নি সে। "কোনও খবর পেলেন?"

মাথা নাড়লেন পেইন্টার। "এখনও না। তবে আশার কথা হলো, কোনও খারাপ খবর না পাওয়ার অর্থ হচ্ছে, মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে।"

সায় দিল জর্ডান। "হ্যাঁ। তবে আরেকটা ব্যাপার মনে পড়েছে। ধরা পড়ার পর, সব জিনিসপত্রের সাথে আমার মোবাইল ফোনটাও নিয়ে গিয়েছিল ওরা। আমার নাম্বারে একটা কল করে দেখবেন? হয়তো এখনও ফোনটা ওদের সাথেই আছে।"

কথাটা শুনে পেইন্টারের শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল। এখনও কি জিনিসটা ওরা রেখে দিয়েছে? নাহ, এতটা আশা করা বোকামি হয়ে যায়। তবে হাতে যখন কোনও কাজ নেই, তখন ব্যাপারটা নিয়ে একটু ঘেঁটে দেখা যাক।

বলে চলেছে জর্ডান, "যদি কেউ কলটা রিসিভ করে, তাহলে কাই-কে ছেড়ে দেয়ার জন্য তাকে হুমকি-ধমকি দিতে পারব আমরা।"

সুইচ অন থাকলে হয়তো ফোনটা ট্র্যাকও করা যাবে, ভাবলেন পেইন্টার।

"তোমার নাম্বারটা দাও।"

তাই করল ছেলেটা।

নাম্বারটা মুখস্ত করে নিয়ে একজন রেঞ্জারকে একটা ল্যান্ডলাইনের ব্যবস্থা করতে বললেন সিগমা ডিরেক্টর। কিছুক্ষণ পর একাকী একটা অফিসে বসে নাম্বারটায় ডায়াল করলেন তিনি। এখনও খোলাই আছে।

কয়েকবার রিং হওয়ার পর অবশেষে কলটা রিসিভ করল কেউ একজন। কিন্তু কথা বলার সাথে সাথেই কণ্ঠের মালিককে চিনতে পারলেন পেইন্টার।

"আহ, মনসিয়র ক্রো, মনে হচ্ছে আমাদের সওদা এখনও শেষ হয়নি।"

১ জুন, রাত ১২:৪১
সল্ট লেক সিটি, উটাহ

আবারও সল্ট লেক সিটির গ্র্যান্ড আমেরিকা হোটেলে, তার জন্য রিজার্ভ করে রাখা স্যুইটে এসে উপস্থিত হয়েছেন রাফায়েল। আধঘন্টা আগে ঘুম থেকে উঠে টিভি খোলার সাথে সাথেই, একটা গর্তের পাশে কয়েকটা অবয়ব দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন তিনি।

বেঁচে আছেন পেইন্টার ক্রো।

দৃশ্যটা দেখে পুরো এক মিনিট হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাফায়েল। বলতে লজ্জা নেই, রাগ হওয়ার পাশাপাশি কিছুটা ভয়ও অনুভূত হচ্ছিল তার।

ছবিতে সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ছিলেন সিগমা ডিরেক্টর। তার চোখের তারায় প্রচ্ছন্ন হুমকিটা ধরতে পেরেছেন রাফায়েল।

আমি বেঁচে আছি...আমার ভাতিজিকে ফেরত চাই আমি।

একটা বন্ধ দরজার দিকে তাকালেন রাফায়েল। মনে হচ্ছে, কাই-এর ভাগ্য বেশ সুপ্রসন্ন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আরেকবার মেয়েটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিলেন তিনি। উটাহ-এর গুহার ভেতর ঢুকেছিল সে। মমি আর সোনার প্লেটগুলোর ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে হবে তাকে। কিন্তু রাতেই কাজটা শেষ না করে সকালের জন্য অপেক্ষা করছিলেন রাফায়েল। এখন নিজের সিদ্ধান্তে উপর নিজেই খুশি হলেন তিনি।

রিং বেজে উঠতেই, তারের দঙ্গলের সাথে আটকানো জর্ডানের ফোনটা হাতে তুলে নিলেন রাফায়েল। "আহ, মনসিয়র ক্রো, মনে হচ্ছে আমাদের সওদা এখনও শেষ হয়নি। তবে দয়া করে এই ফোনের সিগন্যাল ট্র্যাক করার চেষ্টা করবেন না। আপনার কষ্টটাই বৃথা যাবে।"

"তা করছি না। খুব ভালো করেই জানি, আপনি বোকা নন।"

মুচকি হাসলেন রাফায়েল। টিভিতে ছবিটা দেখার পরপরই বুঝতে পেরেছিলেন, কোনও না কোনওভাবে তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন পেইন্টার। তাই সাথে সাথে আশান্দা আর টি.জে.-কে জর্ডানের ফোনটা রেডি করার আদেশ দেন তিনি। তার কথামতো যন্ত্রপাতির কারিকুরি ফলিয়ে, ফোনের সিগনাল বিভিন্ন জায়গায় বাউন্স করাচ্ছে দু'জন। এখন আর কারও পক্ষেই তাদের অবস্থান বের করা সম্ভব হবে না।

"ঠিক বলেছেন," বলে উঠলেন পেইন্টার। "সওদা করার জন্যই আবার যোগাযোগ করেছি আমি।"

"ঠিক আছে। আমি আগ্রহী। বলুন কী চান।"

"সবার আগে আমি নিশ্চয়তা চাই, কাই বেঁচে আছে।"

"না...না...না, সেটা তো এখন করা যাবে না," ওপ্রান্তে নেমে আসে নীরবতাটুকু উপভোগ করলেন রাফায়েল। "আগে দেখি, আপনার ঝাঁপিতে কী আছে," বলে টেবিলের উপর রাখা সোনার পাত্রটার দিকে তাকালেন তিনি। পাত্রের গায়ে খোদাই করা প্রতিটা অক্ষর, প্রতিটা সূক্ষ্ম রেখা মাথার ভেতর গেঁথে নিয়েছেন রাফায়েল। সোনালি সারফেসে আঁকা দৃশ্যটার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তার বংশের ঐতিহ্য, বৈভব বহুগুণ বাড়ানোর জন্য এই জিনিসটাই যথেষ্ট। আর কীসের লোভ তাকে দেখাবেন পেইন্টার?

"কাই-কে ফেরত পাবার বিনিময়ে, ডেভিল কলোনীর অবস্থান আপনাকে জানাব আমি।"

কথাটা শোনার সাথে সাথে রাফায়েলের মুখে একটা মুচকি হাসি খেলে গেল।

চমৎকার...

রাত ১২:৪৪

"আঙ্কেল ক্রো, আপনি বেঁচে আছেন!"

কণ্ঠটা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল পেইন্টারের গলা বেয়ে।

"কাই, তুমি ঠিক আছ? ওরা তোমাকে মারধর করেনি তো?"

"না," জবাব দিল মেয়েটা।

ওর মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পারলেন পেইন্টার। গত কয়েকটা দিন ধরে ক্রমাগত খুন, রক্তপাত, হামলা ইত্যাদি দেখতে হচ্ছে ওকে। কিন্তু তবুও মেয়েটার কণ্ঠের দৃঢ়তা অনুভব করলেন তিনি। এমনই তো চাই! ওর গায়ে যে যোদ্ধার রক্ত বইছে।

"খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে নিতে আসব আমি, কথা দিলাম।"

"আমি জানি," আবেগে ধরে এল কাই-এর গলা। "আমি জানি, আপনি আসবেন।"

মেয়েটার হাত থেকে ফোন কেড়ে নিলেন রাফায়েল।

"মনসিয়র ক্রো, তাহলে চুক্তি হয়ে গেল। তাই তো? "

"একঘন্টা পর আপনাকে ফোন করে বিনিময়ের সময় আর জায়গার কথা জানাব আমি।"

মাথা নাড়লেন রাফায়েল। "তবে সেই সাথে আপনার কথার সত্যতার প্রমাণও দেখাতে হবে।"

"ঠিক আছে," জবাব দিলেন পেইন্টার। "পাবেন। কিন্তু মেয়েটাকে অক্ষত চাই আমি।"

"ঠিক আছে। তবে তাই হোক। রাখছি।"

কলটা কেটে যাওয়ার পরও শক্ত করে ফোনটা ধরে রাখলেন পেইন্টার। কাই-এর বেঁচে থাকার প্রমাণ পাওয়ার পর, মনটা বেশ শান্ত লাগছে।

পেছন থেকে একটা কণ্ঠে ভেসে এল। "কাই বেঁচে আছে?"

চেয়ার ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই জর্ডানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তিনি। "হ্যাঁ। তবে বিপদ এখনও কাটেনি।"

সামনে এগিয়ে এল ছেলেটা। "তাহলে ওদের চাহিদামাফিক জায়গাটার অবস্থান জানাতে পারবেন আপনি?"

"চেষ্টা করব।"

এছাড়া এখন আর পেইন্টারের বলার মতো কোনও কথা নেই। পুরোটা সময় ফোনে রাফায়েলকে ধোঁকা দিয়েছেন তিনি। তবে এভাবে কি ফ্রেঞ্চ লোকটাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে?

প্রকৃতপক্ষে, ডেভিল কলোনীর অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানেন না পেইন্টার। যার পক্ষে রহস্যটা সমাধান করা সম্ভব, সেও এখন ক্রমাগত ছোটাছুটির মধ্যে আছে। দেশের প্রতিটা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পেছনে লেগেছে ওর।

পেইন্টারের অক্ষমতা ধরতে পেরে জর্ডানের মুখে অন্ধকার নেমে এল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন সিগমা ডিরেক্টর। "দেখা যাক, কী হয়। আমার সবচেয়ে সেরা এজেন্ট ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল জর্ডান।

আবারও ফোনটার দিকে তাকালেন পেইন্টার। আগামী একঘন্টা তার ফোনের আশায় বসে থাকবে রাফায়েল। যা করার, এই সময়টুকুর ভেতরই করতে হবে।

গ্রে...আমাকে হতাশ করো না।

অধ্যায় ৩২
১ জুন, রাত ২:৫০
ন্যাশভিল, টেনেসি

শেইচানের পাশে দাঁড়িয়ে, ওভেনের খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে আছে গ্রে। চেম্বারের ভেতর একটা সিরামিকের ক্রেটে শুয়ে আছে সোনার প্লেটটা। উপরদিকে আমেরিকার জাতীয় সীল দেখা যাচ্ছে।

নীলচে আগুনের শিখা চারদিক থেকে সোনার পিন্ডটাকে ঘিরে রেখেছে। আস্তে আস্তে বাড়ছে তাপমাত্রা। ডিজিটাল থার্মোমিটারের কাঁটা বলে দিচ্ছে, ইতিমধ্যে ছয়শো ডিগ্রী সেলসিয়াসে পৌঁছে গেছে।

"আর বেশিক্ষণ লাগবে না," বলে উঠল স্বর্ণকার।

কাঁচাপাকা চুলধারী রাশিয়ান লোকটার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। উচ্চতা পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। ন্যাশভিল শহরের বাইরের দিকের ব্যবসায়িক এলাকায় অবস্থিত, তার দোকানের নাম- গোল্ডএক্সচেঞ্জ। টাকার বিনিময়ে কমদামে পুরনো সোনা কিনে, গলিয়ে ফেলে সে। তারপর অন্য ক্রেতাদের কাছে চড়া মূল্যে বিক্রি করে।

ইনকাম ট্যাক্স কমিশনের সাথে লোকটার বেশ কিছু ঝামেলা আছে। সেই সুবাদে, লোকটাকে সহযোগিতা করার জন্য চাপ দিতে পেরেছে ক্যাট। হুমকি দিয়েছে, কথামতো কাজ না করলে ব্যবসা বন্ধ করার পাশাপাশি জেলেও যেতে হতে পারে।

মৃদু কাঁপছে সে। হুমকির জন্য, নাকি তাপের জন্য...সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

"সাধারণত এক হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াসে সোনা গলতে শুরু করে," আবার মুখ খুলল লোকটা। "দেখুন না, এখনই পিন্ডটা কেমন জ্বলজ্বল করছে।"

ওভেনের ভেতর, সিরামিকের ক্রেটে রাখা ব্লকটা গরম হয়ে উজ্জ্বল রং ধারণ করেছে। আস্তে আস্তে সীলের ঈগলের কাঠামোটা ফিকে হয়ে আসতে আরম্ভ করল। কয়েক মুহূর্ত পর, ক্রেটের নিচে রাখা সিরামিকের প্লেটে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়তে শুরু করল গলিত সোনা।

"এটুকুতেই হবে," বলল গ্রে। "তাপমাত্রা এখানেই স্থির করে দিন।"

সে চায় না, অতিরিক্ত তাপের কারণে ব্লকের ভেতর রক্ষিত ইন্ডিয়ান মানচিত্রটার কোনও ক্ষতি হোক। হতে পারে, ওই বিশেষ সোনার ঘনত্ব অনেক বেশি, সেই সাথে গলনাংকও। কিন্তু তাপ খুব বেশি হয়ে গেলে মানচিত্রের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো মুছে যেতে পারে।

তাপমাত্রা সেট করে দেয়ার পর, রাশিয়ান লোকটার দিকে ফিরল গ্রে। "এবার আপনি যান, বাইরে আমার বন্ধুর সাথে গিয়ে দাঁড়ান।"

ওরা দু'জন স্বর্ণকারের সাথে ভেতরে ঢুকলেও, মঙ্ক এখনও বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। কোনও বিপদ আসে কিনা পাহারা দিচ্ছে।

মাথা নেড়ে সায় দিল লোকটা, তারপর খোলা দরজা দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

"উপরের দিকটা দেখ," বলে উঠল শেইচান।

ক্রমাগত ছোট হয়ে আসতে থাকা সোনার পিন্ডটার দিকে তাকাল গ্রে। "দেখতে পাচ্ছি।"

সোনার তাল গলতে গলতে, আস্তে আস্তে ভেতরে লুকানো জিনিসটা বের করে আনছে। ভেতরের ধাতুটাও বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তবে গলিত সোনার মতো অতটা না।

"এটাই সেই মানচিত্র," শেইচানের কণ্ঠে উত্তেজনার ছাপ।

তবে ভেতরের প্লেটের সারফেস সোনার পিন্ডটার মতো মসৃণ না।

"এটাতো একটা টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র!" বলে উঠল গ্রে। ব্যাপারটা বিস্মিত করেছে ওকে।

গলিত সোনা আস্তে আস্তে, ভেতরের খোদাই করা উত্তর আমেরিকার মানচিত্রটা বের করে আনছে। এক মুহূর্ত পর, উঁচু হয়ে থাকা পাহাড়ের সারি চিহ্নিত করা গেল, সেই সাথে নিচু গভীর অংশ কোনও একটা লেকের অবস্থান নির্দেশ করছে। দেখতে দেখতে গলিত সোনার শেষ ফোঁটাটা একটা গভীর, ঢালু খাদ বেয়ে নিচে পড়ে গেল।

ওটা সম্ভবত মিসিসিপি নদী।

একসারি উঁচু জায়গা কিছু পাহাড়কে বোঝাচ্ছে, গর্তের মতো অংশগুলো হচ্ছে জলাশয়, আর সরু একটা ফাটল...যার তুলনা শুধু গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সাথেই হতে পারে, এমনকি উপকূলরেখার আকৃতিও প্রায় নির্ভুলভাবে মানচিত্রটাতে খোদাই করা আছে। উপকূল পেরিয়ে বেশ কিছুটা উত্তর-পূর্বে, সাগরের মাঝখানে কিছু ছোট ছোট পাহাড়ের সারির পর উঁচু মেইনল্যান্ড।

আইসল্যান্ড...

মানচিত্রটার কিনারের প্রান্ত বেশ রুক্ষ। একেবারে মাঝখান বরাবর সরু একটা রেখা চলে গেছে। তবে পরস্পর সমান্তরালে মিলে আছে আলাদা অংশ দুটো। ম্যাস্টোডনের খুলির ভেতর মানচিত্রটা মুড়িয়ে রাখার দৃশ্য কল্পনা করল গ্রে। জেফারসনের লোকেরা হয়তো জিনিসটা হাড়ের ফাঁদ থেকে বের করার জন্য গোটা খুলিটাকে পুড়িয়ে ফেলেছিল।

"ওগুলো কি কোনও লেখা নাকি?" বলে উঠল শেইচান।

"কোথায়?"

"মানচিত্রের কিনারায়।"

চোখ সরু করে ওভেনের ভেতর তাকাল গ্রে, তবে তাপের কারণে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। নিঃসন্দেহে, শেইচানের নজর তার থেকে অনেক তীক্ষ্ণ। খালি চোখে শুধু মানচিত্রের কিনারায় মৃদু কিছু আঁকিবুঁকি চিহ্নিত করতে পারল সে।

"মনে হচ্ছে, ফোরটেস্কুর ডায়েরীতেও এরকম লেখা দেখেছিলাম আমরা। সোনার প্লেটগুলো থেকে কিছু লাইন ডায়েরীতে উল্লেখ করেছিলেন ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক।" বলে শেইচানের দিকে তাকাল গ্রে। "স্বর্ণকারের ডেস্ক থেকে একটা কাগজ নিয়ে এসো, লেখাগুলো টুকে নাও।"

মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটা।

আবারও মানচিত্রে আইসল্যান্ডের অংশটার দিকে নজর ফেরাল গ্রে। মেইনল্যান্ডের আগে, ছোট ছোট কিছু উঁচু জায়গা ওয়েস্টম্যান দ্বীপপুঞ্জকে শনাক্ত করছে। একটা দ্বীপের উপর ছোট একটা ডায়মন্ড চিহ্ন খোদাই করা।

এলিরেই দ্বীপ...

এবার আমেরিকার পশ্চিম অংশের দিকে তাকাল সে। আরেকটা ডায়মন্ড চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এটা আইসল্যান্ডেরটার চাইতে আকারে বড়। হয়তো, চিহ্নের আকৃতির মাধ্যমে বিস্ফোরণের বিস্তৃতি এবং পরিমাণ বোঝানো হয়েছে।

চোখ সরু করে মানচিত্রটার দিকে তাকাল গ্রে, ওই এলাকার শহরের নামগুলো মনে না থাকায় জায়গাটার অবস্থান চিহ্নিত করতে বেশ ঝামেলা হচ্ছে।

একটা কাগজ আর কলম নিয়ে ফিরে এল শেইচান, তারপর মানচিত্রে থাকা লেখাগুলো টুকে নিতে শুরু করল।

সে নিজের কাজ করতে করতে রকি পর্বতের সারির দিকে নজর ফেরাল গ্রে। পরক্ষণেই খুঁজে পেল কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা...আরেকটা ডায়মণ্ড চিহ্ন।

উটাহ এর বিস্ফোরণস্থল...

আমেরিকার উত্তরদিকের চিহ্নটার তুলনায়, এটার আকার বলতে গেলে কিছুই না।

এবার একসাথে তিনটা চিহ্নের দিকেই তাকাল সিগমা কমান্ডার। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির কারণে বিপদের পরিমাণও আন্দাজ করা যাচ্ছে।

সময় ফুরিয়ে আসছে...

নিজের কাজ শেষ করে মাথা উঁচু করল শেইচান। "কিছু বুঝতে পারছ, জায়গাটা কোথায় হতে পারে?"

মাথা নাড়ল গ্রে। মাথার ভেতর আস্তে আস্তে পাজলের টুকরোগুলো মিলিয়ে নিচ্ছে। "একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় এসেছে। তবে তার আগে আমেরিকার একটা মানচিত্র দেখতে পারলে ভালো হত।"

ওভেনের দিকে চোখ ফেরাল মেয়েটা। "কিন্তু এই মানচিত্রটার ব্যাপারে কী করবে?"

এগিয়ে গিয়ে ওভেনের কাঁটাটা ঘোরাতে শুরু করল গ্রে। কয়েক সেকেন্ডের পর তিন হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াসে পৌঁছে গেল আগুনের শিখার উত্তাপ। "জিনিসটা ওয়ালডর্ফের হাতে পড়তে দেয়ার ঝুঁকি নেয়া যাবে না।"

"তো এটা গলিয়ে ফেলার কথা ভাবছ তুমি?"

সায় দিল সিগমা কমান্ডার। "হ্যাঁ। আমি জানি, এই বিশেষ ধাতুটার ঘনত্ব অনেক বেশি, সেই সাথে গলনাঙ্কও। দেখা যাক, কী পরিমাণ তাপ এটাকে গলাতে সক্ষম হয়।" বলতে বলতে ক্রমাগত কাঁটাটা ঘুরিয়েই চলল গ্রে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেল অগ্নিশিখার উত্তাপ।

তাপের কারণে পিছিয়ে আসতে হলো দু'জনকেই। মানচিত্রটা একেবারে উজ্জ্বল সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করতে শুরু করেছে।

পুরো এক মিনিট এভাবে থাকার পর আর সরাসরি ওভেনের দিকে তাকানোর উপায় রইল না।

"কিছু অনুভব করতে পারছ?" জিজ্ঞেস করল শেইচান।

"কী?" পাল্টা প্রশ্ন করার সাথে সাথে গ্রে নিজেও ব্যাপারটা ধরতে পারল।

দাঁড়িয়ে গেছে গায়ের পশম। ঘরের বাতাসে কেমন একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। এক সেকেন্ড পর ওভেনটা মৃদু কাঁপতে শুরু করল।

শেইচানের কনুই ধরে টান দিল গ্রে। "দৌড়াও!"

নিজেও দোকানের দরজা লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে সিগমা কমান্ডার। দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছে, বিশেষ সোনার অণুগুলো ন্যানোটেক পদার্থের মাধ্যমে পরস্পর আটকে ছিল। এখন অতিরিক্ত উত্তাপের ফলে বাঁধনটা আস্তে আস্তে হালকা হয়ে আসছে, সেই সাথে অণুগুলো বিপুল পরিমাণ স্থিতিশক্তি অর্জন করছে। যে কোনও মুহূর্তে বাঁধনটা পুরোপুরি ছিঁড়ে যাবে। আর তারপর...

এই ধাতুটা গলবে না।

এক মুহূর্ত পর বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো ওভেনটা। শকওয়েভের ধাক্কা গ্রে আর শেইচানকে দরজা দিয়ে বাইরে আছড়ে ফেলল। সাথে সাথে আগুন ধরে গেছে দোকানের ভেতরের সব জিনিসপত্রে।

হাচড়েপাচড়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াতেই গ্রে দেখতে পেল, দোকানের একপাশে রাখা কয়েকটা গ্যাসের সিলিন্ডারের নাগাল পেয়ে গেছে আগুনের শিখা। কিন্তু সে নড়ে ওঠার আগেই আরেকটা বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। দোকানের যেটুকু বাকি ছিল, তাতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ল। লকলক করে রাতের আকাশ চিরে দিতে লাগল কমলা রঙের অগ্নিশিখা।

পেছনের পার্কিং লট থেকে এগিয়ে এল মঙ্ক আর সেই স্বর্ণকার। নিজের দোকানের এই অবস্থা দেখে কপাল চাপড়াতে লাগল রাশিয়ান লোকটা। "এ কী করেছেন আপনারা!"

"চিন্তা করো না। ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে।" তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল গ্রে। "তবে এজন্য আমাদের ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখতে হবে।"

"গাড়িতে...তাড়াতাড়ি," চেঁচিয়ে উঠল মঙ্ক।

এক মুহূর্তে ভ্যানে উঠে পড়ল সবাই, মঙ্ক নিজেই ড্রাইভারের সিট দখল করেছে। পার্কিং লট থেকে তীক্ষ্ণ একটা মোচড় নিয়ে রাস্তায় উঠে এল সে, তারপর গিয়ার পাল্টে পা দিয়ে সর্বশক্তিতে এক্সেলেরেটর চেপে ধরল।

গ্রে বুঝতে পারছে, এখন গতিই তাদের একমাত্র চাহিদা। যথাসম্ভব দ্রুত এলাকাটা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, এদিকে রওনা হয়ে যাবে ফায়ার সার্ভিসসহ স্থানীয় পুলিশের বহর। আর রাশিয়ান লোকটাও মুখ বন্ধ রাখবে বলে মনে হচ্ছে না। অর্থাৎ, খুব তাড়াতাড়িই তাদের ট্রেইল পেয়ে যাবে মিচেল ওয়ালডর্ফ।

"কী হলো ওখানে?" জানতে চাইল মঙ্ক।

সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা ওকে জানাল গ্রে।

"তার মানে, ইন্ডিয়ান মানচিত্রটা খুঁজে পেয়েছ তুমি। তবে ডেভিল কলোনীর অবস্থানের ব্যাপারে কী হলো? জায়গাটা কোথায় কিছু বুঝতে পারলে?"

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। "আন্দাজ করতে পারছি।"

"কোথায়?"

"খুবই খারাপ একটা জায়গায়।"

অধ্যায় ৩৩
১ জুন, রাত ১২:২২
ফ্ল্যাগস্টাফ, অ্যারিজোনা

রেঞ্জার স্টেশনের মেইন রুমে, একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লেন পেইন্টার। "গ্রের ধারণা সঠিক হলে আমরা কতখানি বিপদে আছি?"

টেবিলে মেলে রাখা বিভিন্ন রিপোর্ট আর মানচিত্র থেকে মাথা তুলল রোনাল্ড শিন। "প্রচুর।"

আধঘন্টা আগে এখানে পৌঁছেছে সিগমার তরুণ ভূতাত্ত্বিক। সাথে করে অ্যাশলি রায়ান নামের এক ন্যাশনাল গার্ড মেজরকেও নিয়ে এসেছে।

"নির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারছ না?" কথাটা জিজ্ঞেস করে মেলে রাখা মন্টানা আর ইয়োমিং রাজ্যের মানচিত্রের দিকে তাকালেন পেইন্টার। গ্রে-র অনুমান বলছে, টটসি'আন্টসউ পুটসিভদের সেই রহস্যময় শহরটা এই দুটো রাজ্যের মাঝখানের কোনও একটা এলাকায় লুকানো আছে।

মানচিত্রে চিহ্নিত জায়গাটা ভালোভাবে খেয়াল করলেন সিগমা ডিরেক্টর।

ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক।

গোটা আমেরিকা মহাদেশের ভূগর্ভস্থ কর্মকাণ্ডের আখড়া বলা চলে এলাকাটাকে। পুটসিভরা যদি নিজেদের সেই রহস্যময় পদার্থগুলো প্রাকৃতিক কোনও গরম উৎসের কাছাকাছি রাখতে চায়, তাহলে ওই জায়গাই কাজটার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। দশ হাজার গরম পানির ঝর্ণা, প্রাকৃতিক গিজার এবং স্টিম ভেন্ট ছাড়াও পুরো পার্কটাতে অসংখ্য ছোট ছোট আগ্নেয়গিরি রয়েছে। সংখ্যার হিসেবে বলতে গেলে, গোটা বিশ্বের গিজারগুলোর প্রায় অর্ধেক এই বিশাল পার্কটার ভেতর অবস্থিত।

জায়গার বিস্তৃতিও কিন্তু খুব একটা কম না।

দুই মিলিয়ন একরেরও বেশি।

তবে সবার আগে, এটাই যে আসল জায়গা, ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছেন পেইন্টার। পেছনের একটা ঘরে, নেটিভ আমেরিকান ইতিহাস ঘেঁটে পার্কটার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করছেন প্রফেসর হ্যাঙ্ক কানোশ।

সেই ফাঁকে ভূতাত্ত্বিকের মত জেনে নিচ্ছেন সিগমা ডিরেক্টর।

পার্কের একটা টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র সামনে টেনে নিল শিন। মানচিত্রটাতে দেখা যাচ্ছে, এক জায়গায় কয়েকটা পাহাড় একটা মালভূমিকে ঘিরে রেখেছে। এটাই গোটা পার্কের ভূতাত্ত্বিক কেন্দ্রবিন্দু। পাশাপাশি ওটা আরেকটা কারণেও

গুরুত্বপূর্ণ, জায়গাটার নিচে একটা সুপার ভলক্যানো অর্থাৎ বিশালাকৃতি বিশিষ্ট একটা আগ্নেয়গিরি সুপ্তাবস্থায় আছে।

"এটাই তো সমস্যা," জবাব দিয়ে পার্কের মাঝখানে থাকা একটা লেকের দিকে ইঙ্গিত করল শিন। "জায়গাটা একটা জিওলজিক্যাল হটস্পট। সরাসরি পৃথিবীর কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায়, গলিত পাথর ক্রমাগত ওখান দিয়ে উপরে উঠে আসতে চাইছে। মাটি থেকে মাত্র চার কিংবা পাঁচ মাইল গভীরেই একটা বিশালাকায় লাভা চেম্বার আছে ওখানে। এছাড়া অন্যান্য অগনিত ছোটখাটো ম্যাগমাসমৃদ্ধ ফাটলগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম। বৃষ্টির পানি এবং ভূগর্ভস্থ ঝর্ণাধারা মিলে জায়গাটাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাষ্পীয় ইঞ্জিনে পরিণত করছে।"

লেকের উপর উঠে এল শিনের একটা আঙুল। "ক্রমাগত ফটন্ত লাভার স্রোত এখানকার মাটিকে উপরদিকে চাপ দিচ্ছে।"

"বুঝলাম," মাথা নাড়লেন পেইন্টার।

"গত দুই মিলিয়ন বছরে, ইয়েলোস্টোন আগ্নেয়গিরি থেকে মোট তিনবার অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে। সর্বশেষ বিস্ফোরণের সময় পুরো মহাদেশ ছাইয়ে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী, এমন ঘটনা প্রতি ছয়শো হাজার বছর পরপর একবার করে ঘটবে।"

"সর্বশেষ অগ্ন্যুৎপাত কবে হয়েছিল?"

"ছয়শো চল্লিশ হাজার বছর আগে," জবাব দিল শিন। "তার মানে, ইতিমধ্যে সময়সীমা পেরিয়ে এসেছি আমরা। সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মতে, খুব তাড়াতাড়ি আবারও আগুন উগড়াবে ইয়েলোস্টোন আগ্নেয়গিরি। সব তথ্যপ্রমাণও একই সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

"কী রকম তথ্যপ্রমান?" ভ্রূ কুঁচকালেন পেইন্টার।

ভলক্যানো অবজারভেটরী থেকে আসা একটা রিপোর্ট মেলে ধরল শিন। "উনিশশো তেইশ সাল থেকে আগ্নেয়গিরিটার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করছে গবেষকরা। ক্রমাগত নিচ থেকে আসা চাপের কারণে জ্বালামুখের মাটির স্তর উপরে উঠে আসছে। কিন্তু দুই হাজার চার সালের পর থেকে, সাধারণ পরিমাপের চেয়ে এই চাপ তিনগুণ বেড়ে গেছে। অতিরিক্ত উত্তাপের কারণে মরে যাচ্ছে আশেপাশের গাছপালা। বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে কাছাকাছি এলাকার ভূগর্ভস্থ ঝর্ণাগুলো।"

পার্কের ভেতর থেকে চারদিকে নিউট্রিনোর স্রোত ছড়িয়ে পড়ার দৃশ্য কল্পনা করলেন পেইন্টার। "আর পুটসিভরা সেই বোমার সলতেতেই আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে।"

এই পরিস্থিতিতেও ডিরেক্টরের কথাটা শুনে না হেসে পারল না শিন।

কিন্তু পেইন্টারের কৌতূহল এখনও মেটেনি। "আগ্নেয়গিরিটা এখন আবারও বিস্ফোরিত হলে কী হবে?"

"প্রলয়। সবার আগে তো, এটা বিগত সত্তর হাজার বছর যাবৎ মানুষের কানে শোনা সবচেয়ে তীব্র আওয়াজের বিস্ফোরণ হবে। কয়েক মিনিটের ভেতর লক্ষ লক্ষ

মানুষ লাভা আর ছাইয়ের নিচে চাপা পড়বে। লাভার পাঁচ ইঞ্চি স্তরের নিচে ঢেকে যাবে পুরো আমেরিকা। কিন্তু পুরো পৃথিবীর জন্য আসল বিপদ ডেকে আনবে গরম ছাই। মুহূর্তের ব্যবধানে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ অন্ততপক্ষে এক মিটার ছাইতে ঢেকে যাবে। বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে গিয়ে সূর্যের আলো আসতে বাধা দেবে ছাইয়ের স্তর। বৈশ্বিক তাপমাত্রা প্রায় বিশ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যাওয়ায় নেমে আসবে চিরস্থায়ী শীতকাল, যা শতাব্দী না হলেও, অন্তত কয়েক দশক পর্যন্ত তো স্থায়ী হবেই।"

ঘটনাটা কল্পনা করে শিউরে উঠলেন পেইন্টার। ল্যাকি অগ্ন্যুৎপাতে ছয় মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল। সেই তুলনায় এটা আরও অনেক মারাত্মক ব্যাপার। সরাসরি শিনের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। "তুমি বলতে চাইছ, মানবসভ্যতা প্রায় বিলুপ্তির কাছাকাছি পৌঁছে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

কথাটা শুনে পেইন্টারের গলা বেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

মানবসভ্যতাকে কীভাবে এই আশু বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবেন তিনি?

রাত ১২:২৮

পাশের ঘরে বসে পেইন্টার আর শিনের সব কথাই শুনেছেন হ্যাঙ্ক।

একটা কম্পিউটার সামনে নিয়ে বসে আছেন তিনি। পেইন্টারের সর্বশেষ কথাটা শোনার পরপরই, উটে ইন্ডিয়ান বুড়োর করা ভবিষ্যৎবাণীর কথা মনে পড়ল তার।

গুহায় কেউ অনধিকার প্রবেশ করলেই ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী।

কথাটা সত্যি হতে চলেছে।

হাতে একটা স্পর্শ পেয়ে হ্যাঙ্কের সম্বিত ফিরল।

"সব ঠিক হয়ে যাবে, প্রফেসর," বলে উঠল জর্ডান। কম্পিউটার টেবিলের পাশে বসে, একটা প্রিন্টার থেকে বেরিয়ে আসা কাগজ সংগ্রহ করে এতক্ষণ হ্যাঙ্কের সামনে রাখছিল ছেলেটা। "হতে পারে, ওদের কোথাও ভুল হচ্ছে। ইয়েলোস্টোন পার্ক ওই বিস্ফোরণস্থল না।"

"হয়নি ভুল।" বলে গত কয়েকদিনের ভেতর হারানো প্রিয়জনদের কথা মনে করলেন হ্যাঙ্ক।

"আপনি কি কিছু জানতে পেরেছেন?" জিজ্ঞেস করল জর্ডান।

"ইয়েলোস্টোন সম্পর্কে নেটিভ আমেরিকানদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া কথাগুলো পর্যবেক্ষণ করেছি আমি। জানতে চেষ্টা করেছি, ওখানে কোনও লুকানো শহর সম্পরকে কেউ কখনও কিছু বলেছিল কি না। ফলাফল হতাশাজনক। ওই অঞ্চলে দশ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে, নেটিভ আমেরিকানদের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন বাস করে আসছে। চেয়েনে, কিওয়া,

শোশোন, ব্ল্যাকফিট ইত্যাদি... কিন্তু বিশেষ করে ঐ এলাকাটা সম্পর্কে কেউ তেমন কিছুই বলেনি। নীরবতার চাদরে ঢেকে আছে যেন পুরো জায়গাটা।"

"হয়তো কেউ কিছু জানতই না।"

"না। স্থানীয়দের কাছে জায়গাটার বেশ কুখ্যাতি আছে। বিভিন্ন গোত্র আলাদা আলাদা নামে ডাকত ওই এলাকাটাকে। কেউ কিছু জানত না, ব্যাপারটা এই প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয়। যার মানে দাঁড়ায়, তারা ওই এলাকাটা খুব ভালো করেই চিনত।"

হাল ছাড়ল না জর্ডান। "হয়তো কোনও কারণে জায়গাটাকে ভয় করত ওরা।"

মাথা নাড়লেন হ্যাঙ্ক। "আমিও এটাই ভেবেছিলাম। ইন্ডিয়ানরা বিশ্বাস করত, ভূগর্ভস্থ ঝর্ণা আর গিজারের হিসহিস আওয়াজগুলো হচ্ছে শয়তান আত্মার কাজ। কিন্তু ব্যাপারটা পুরোটা সত্যি না। ঐতিহাসিকদের গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাচীন ইন্ডিয়ানরা জায়গাটাকে ভয় পেত না। আসলে এই শয়তান আত্মার ব্যাপারটা পরবর্তীতে এখানে আস্তানা গাড়া লোকগুলোই ছড়িয়েছে। ফলে আস্তে আস্তে ভয় জেঁকে বসেছে পরবর্তী ইন্ডিয়ান প্রজন্মগুলোর মনে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, ইয়েলোস্টোন থেকে স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্যই নবাগতরা কাজটা করেছিল। তৎকালীন কয়েকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের বাণীতেও ব্যাপারটার সত্যতা খুঁজে পেয়েছি আমি।"

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে প্রফেসরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জর্ডান। "অর্থাৎ লোকগুলো ওখানে কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছিল। সেই সাথে এমন একটা ব্যবস্থা করেছিল, যাতে কেউ ওখানে যাওয়ার সাহস না পায়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। "শহরটা ওখানেই কোথাও লুকানো আছে।"

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায়?

নিজের হাতঘড়ি চেক করলেন প্রফেসর। সময় খুবই কম। তবে হাল ছাড়া যাবে না। দেখা যাক, কতদূর কী করা যায়। মাথা তুলতেই দেখলেন, একদৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে জর্ডান। হ্যাঙ্ক বুঝতে পারলেন, এখন গোটা পৃথিবী বাঁচানোর পরিবর্তে অন্য আরেকজনকে বাঁচানোর কথা ভাবছে ছেলেটা। আলতো করে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে ওর হাতটা স্পর্শ করলেন তিনি।

"আমরা ওকে ফিরিয়ে আনব।"

রাত ১:৩৮
সল্ট লেক সিটি, উটাহ

প্রায় একঘন্টা আগে চাচার সাথে কথা বলেছিল কাই। এখন রাফায়েলের স্যুইটে, ডাইনিং রুমের একটা চেয়ারে বসে আছে সে। হাত খোলাই আছে, তবে এত লোকের ভিড়ে কিছু তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

পুরো স্যুইট তোলপাড় করছে রাফায়েল ভাড়াটে লোকজন। বডি আর্মার, অস্ত্রশস্ত্রসহ অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে সবাই। রওনা দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

এমনকি কম্পিউটার ইকুইপমেন্টগুলোও একটা বিশেষ ট্রাঙ্কে ভরে ফেলা হয়েছে। তবে একপ্রান্ত থেকে কয়েকটা তার বেরিয়ে এসে জর্ডানের ফোনের সাথে মিলিত হয়েছে।

ঘরজুড়ে পায়চারি করছে রাফায়েল। আশা করছেন, যে কোনও সময় পেইন্টারের কাছ থেকে ফোন পাবেন।

মাথা নিচু করে কোলের উপর হাত রাখল কাই। পেইন্টারের সাথে কথা হওয়ার আগে তার ধারণা ছিল, তারা সবাই মারা গেছেন। রাগে, কষ্টে, হতাশায় একবার আত্মহত্যা করার কথাও ভেবেছিল সে। কিন্তু আত্মহত্যা করতেও অনেক সাহস দরকার, যা তার নেই।

তারপরই পেইন্টারের পুরো দলটার বেঁচে থাকার খবর আসে। রাফায়েলের মনিটরে তাদের সবার ছবি দেখতে পায় কাই। কিছুক্ষণ পর আঙ্কেলের সাথে ফোনে কথাও হয়।

"আমি তোমাকে নিতে আসব, কথা দিলাম।"

পেইন্টারের বলা কথাটা মনে পড়তেই বেঁচে থাকার উদ্যম ফিরে আসে তার মনে। কিন্তু এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

ভাবতে ভাবতে ঘরের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা বিশালদেহী মহিলার দিকে চোখ ফেরাল কাই। রাফায়েলের কাছ থেকে জানতে পেরেছে, ওর নাম আশান্দা। প্রথম দেখায় তাকে ভয় পেলেও পরে সেই ভয়কে সরিয়ে মনে জায়গা করে নিয়েছে কৌতূহল।

কে এই মহিলা?

সে রাফায়েলের বাকি সব সৈন্যদের মতো না। মহিলাকে গুহার ভেতর পেইন্টারের কাছ থেকে ব্যাগ ছিনিয়ে আনতে দেখেছে কাই, দেখেছে কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করতে। এটা নিশ্চিত, রাফায়েলের সাথে মহিলার বিশেষ কোনও সম্পর্ক আছে।

এখন সরাসরি রাফায়েলের দিকেই তাকিয়ে আছে আশান্দা। কুকুর যেভাবে মনিবের ছুঁয়ে দেয়ার অপেক্ষায় থাকে, তার চোখের তারায় ঠিক সেই দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে কাই।

ফোনের রিং হওয়ার শব্দে সম্বিত ফিরল তার।

অবশেষে কল করেছেন আঙ্কেল ক্রো।

রাত ১:৪৪

সিগমা ডিরেক্টর কথা রেখেছেন। একঘন্টা পুরো হওয়ার আগেই আবার যোগাযোগ করেছেন। কলটা রিসিভ করে ফোনটা কানে ঠেকালেন রাফায়েল। কিন্তু ওপ্রান্তের কথাটা শুনেই বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল তার চোখদুটো।

"সাহায্য? আমার কাছে?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি। "আর এতে আমার লাভটাই বা কী?"

"কথামতো, ডেভিল কলোনীর অবস্থান আপনাকে জানাব আমি," জবাব দিলেন পেইন্টার। "তবে এতে আপনার কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না। জায়গাটা প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা পর বিস্ফোরিত হতে চলেছে।"

"সেক্ষেত্রে, মনসিয়র ক্রো, ভাতিজিকে ফেরত পেতে চাইলে আপনার উচিত ভণিতা না করে জায়গাটার নাম আমাকে সরাসরি বলে দেয়া।"

"আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করুন, রাফায়েল। চোদ্দতম কলোনী অর্থাৎ ডেভিল কলোনী ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের গভীরে কোথাও লুকানো আছে। একটা ইমেইল অ্যাড্রেস দিন, আমি বিস্তারিত ডকুমেন্টগুলো আপনাকে পাঠাচ্ছি। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী, আর মাত্র সাড়ে ঘন্টা পর ওখানে একটা বিস্ফোরণ ঘটবে, আইসল্যান্ডের থেকেও ওটার মাত্রা অনেকগুণ বেশি হবে।"

মাথা নাড়লেন রাফায়েল। "বুঝলাম। আগে বাড়ুন।"

"তবে আপনি হয়তো আন্দাজ করতে পারছেন, আসল বিপদ ওই বিস্ফোরণ না। বিস্ফোরণের পরই জায়গাটাতে গাদা গাদা ন্যানোবট সক্রিয় হয়ে উঠবে। সামনে যা পাবে, তাই গ্রাস করতে করতে চতুর্দিকে অগ্রসর হয়ে থাকবে ওই ন্যানো-নেস্ট। এক সময় ইয়েলোস্টোন পার্কের অভ্যন্তরে সুপ্ত থাকা ম্যাগমা চেম্বারে পৌঁছে যাবে ওগুলো। জীবিত করে তুলবে হাজার হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরিকে। হুমকির মুখে পড়ে যাবে গোটা মানবসভ্যতা।"

ফোনের গায়ে চেপে বসল রাফায়েলের আঙুলগুলো।

এসব কি সত্যি?

"এমনটা হলে আপনার বা আপনি যাদের সাথে কাজ করেন, তাদেরও ধ্বংস অনিবার্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রস্তাব হলো, একসাথে কাজ করে বিপর্যয়টা থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে বের করা।"

"চিন্তা করার জন্য আমার...আমার কিছুটা সময় দরকার," নিজের কণ্ঠকে কাঁপতে শুনতে ঘৃণা করেন রাফায়েল। কিন্তু এখন সেটাই হচ্ছে।

"খুব বেশি দেরি করে ফেলবেন না," সতর্ক করলেন পেইন্টার। "সব তথ্য-উপাত্ত আপনাকে পাঠাচ্ছি আমি। কিন্তু মাথায় রাখবেন, ইয়েলোস্টোন পার্কের বিস্তৃতি দুই

মিলিয়ন একরেরও বেশি। সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার আগেই যা হোক একটা কিছু সমাধান বের করতে হবে আমাদের।"

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন রাফায়েল। ডিরেক্টরের কথা সত্যি হয়ে থাকলে, লুকানো শহরটা খুঁজে বের করা আর ওখানকার পদার্থটা নিষ্ক্রিয় করার জন্য সকাল সোয়া ছয়টা পর্যন্ত সময় হাতে পাবেন তারা।

"পাঠিয়ে দিন সবকিছু," বলে পেইন্টারকে একটা ইমেইল অ্যাড্রেস দিলেন তিনি।

"ঠিক আছে," জবাব দিলেন পেইন্টার। "যোগাযোগের জন্য তো আমার নাম্বার রইলই। রাখছি।"

কান থেকে ফোন নামিয়ে রাখলেন রাফায়েল। ঝিমঝিম করছে মাথার ভেতরটা।

ডিরেক্টরের কথাগুলো কি সত্যি?

কাই-এর দিকে তাকালেন তিনি। কথা বলার সময় একবারের জন্যও ভাতিজির কথা জানতে চাননি পেইন্টার। তার মানে, আসলেই ওই ব্যাপারটা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এটা অবশ্য তার সত্যতাকে সমর্থন করে।

ডাইনিং রুমের টেবিলের উপর থেকে আরেকটা ফোন বেজে ওঠার শব্দে রাফায়েলের সম্বিত ফিরল। ওটা তার ব্যক্তিগত ফোন। সাধারণত পারিবারিক সদস্য এবং দুয়েকজন কাছের লোক ছাড়া ওই নাম্বারটা কারও কাছে নেই। স্ক্রিনে কলার আইডি ব্লকড দেখাচ্ছে। হয়তো রং নাম্বার।

কিন্তু পেইন্টারের কথাগুলো এখনও রাফায়েলের মাথার ভেতর ঝড় বইয়ে চলেছে। অনেকটা অন্যমনস্কভাবেই কলটা রিসিভ করলেন তিনি। "কে বলছেন?

ওপ্রান্তের কণ্ঠস্বরটা আমেরিকান। দক্ষিণাঞ্চলের একটু মৃদু টানও আছে। কিন্তু মানুষটা নিজের নাম বলার সাথে সাথে আঁতকে উঠলেন রাফায়েল। হাত থেকে লাঠিটা পড়ে যেতে টেবিলের কোণা ধরে ভারসাম্য রক্ষা করলেন তিনি। এই নড়বড়ে অবস্থা দেখে আশান্দা এগিয়ে আসতে উদ্যত হতেই, মাথা নেড়ে তাকে ওখানেই থাকতে ইশারা করলেন।

ওপ্রান্ত থেকে নরম সুরে কথা শোনা গেল। "আমরা খবরটা পেয়েছি। সিগমাকে যথাসম্ভব সাহায্য করবেন আপনি। সবার স্বার্থেই বিপর্যয়ের ঝুঁকিটা কাটিয়ে উঠতে হবে। আপনার সামর্থ্যের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে।"

"জে ভউস এন প্রি," অতিরিক্ত উত্তেজনায় রাফায়েল বুঝতে পারলেন না, ইংরেজির বদলে ফ্রেঞ্চ ভাষায় ধন্যবাদ জানিয়ে ফেলেছেন তিনি।

কিন্তু ভাষার বদল ওপ্রান্তের মানুষটার কথায় কোনওরকম প্রভাব ফেলল না। "লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর, যাই আবিষ্কার করে থাকুন না কেন, ওই জ্ঞান আপনার দল ছাড়া অন্য কারও মাথায় থাকা চলবে না। মেরে ফেলবেন বাকি সবাইকে। তবে মাথায় রাখবেন, পেইন্টার ক্রোর ক্ষমতাকে আগেও একবার অবহেলা করেছে আপনি।"

কাই-এর দিকে স্থির হলো রাফায়েল চোখের দৃষ্টি। "পেইন্টারকে নাচানোর সুতো আমার হাতে আছে। তারপরও, সাবধান থাকব আমি।"

"আডিও," ওপ্রান্তের ব্যক্তি এবার নিজেই ফ্রেঞ্চ ভাষা ব্যবহার করলেন। "ঠিক আছে... রাখছি। আরেকটা সমস্যা সমাধান করতে হবে আমাকে।"

কলটা কেটে যেতেই টি.জে.-র দিকে ফিরলেন রাফায়েল। "পেইন্টারকে কল করো।"

পরক্ষণেই বার্নের দিকে তাকালেন তিনি। "তোমার লোকদের তৈরি হতে বল। পনেরো মিনিটের ভেতর রওনা হব আমরা।"

"কোথায় যেতে হবে?" জিজ্ঞেস করল তার সেকেন্ড ইন কমান্ড।

"ইয়েলোস্টোন।"

"রিং হচ্ছে, স্যার," বলে উঠল টি.জে.।

মাথা নেড়ে জর্ডানের ফোনটা হাতে নিলেন রাফায়েল সেইন্ট জার্মেইন। কীভাবে ব্যাপারটা সামলাতে হবে, মনে মনে কল্পনা করে নিচ্ছেন। তাছাড়া উত্তেজনার রেশটা এখনও কাটেনি। কাটবেই বা কীভাবে?

পরিবারের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে, প্রকৃত ব্লাডলাইনের কারও সাথে কথা হলো তার।

অধ্যায় ৩৪
১ জুন, ভোর ৪:৩৪
ন্যাশভিল, টেনেসি

স্বর্ণকারের দোকান থেকে বেশ অনেকদূর চলে এছে ওরা। তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই গ্রে-র কাঁধে নতুন এক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন পেইন্টার ক্রো- ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ডেভিল কলোনীর অবস্থান সম্পর্কে কোনও ধারণা পাওয়া যায় কিনা, সেটা খুঁজে বের করা।

তার মানে গ্রে-কে এখন আরও একজনের ঘুম নষ্ট করতে হবে।

"সকাল সকাল ফোন করা আপনার একটা বদঅভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, মি. পিয়ার্স," জবাব দিলেন ড. এরিক হেইসম্যান। তবে তার কণ্ঠে বিরক্তির বদলে উত্তেজনার ছাপ।

ক্যাট এই কলটার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। গ্রে-র ডিস্পজেবল ফোনের সিগন্যাল সিগমার হেডকোয়ার্টারের সার্ভার হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে কানেকশনটা কেউ ট্রেস করতে পারবে না।

"ফোনটা লাউডস্পিকারে দিচ্ছি আমি," বলল গ্রে। সবারই কথাগুলো শোনা দরকার।

ন্যাশভিলের দক্ষিণপ্রান্তের শেলবিভিল হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালাচ্ছে মঙ্ক। এই সময়ে রাস্তাটা বেশ খালিই আছে। যার ফলে, কিউরেটরের কথায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবে সে। সিগমা কমান্ডে বসে ক্যাটও কথাগুলো শুনছে।

"শেরিন আর আমি, লুইস এবং ক্লার্কের অভিযানের ট্রেইলের সাথে ইয়েলোস্টোন পার্কের অবস্থান মিলিয়ে দেখেছি," বলে উঠলেন হেইসম্যান। "কিছুক্ষণ আগে প্রফেসর হেনরি কানোশের সাথেও কথা হয়েছে আমার। ব্যাপারটা সম্পর্কে নেটিভ আমেরিকান ইতিহাস ঘেঁটে তিনি আমার কাজটা আরও সহজ করে দিয়েছেন।"

ক্যাট ইতিমধ্যে গ্রে-কে জানিয়েছে, গিল্ডের একটা দলকে সাথে নিয়ে ইয়েলোস্টোনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন পেইন্টার। সেখানে সবাই মিলে তারা রহস্যটা সমাধানের চেষ্টা করবেন। সময়সীমা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। গ্রে-কে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সাহায্য করতে হবে।

"অভিযান চলাকালীন লুইস এবং ক্লার্ক কি কখনও ইয়েলোস্টোনে ঢুকেছিলেন?" জিজ্ঞেস করল সিগমা কমান্ডার।

"না। তবে আরেকটা ব্যাপার ধরতে পেরেছি আমি," জবাব দিলেন কিউরেটর। "দুই অভিযাত্রীর ট্রেইল প্রায় চল্লিশ মাইল দূর দিয়ে পার্কটাকে অতিক্রম করেছে।"

"কী মনে হয়, তারা কি জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিলেন?"

"যদি পেয়েও থাকেন, তাহলে নিজেদের ট্রেইল সফলভাবে মুছে ফেলেছিলেন লুইস এবং ক্লার্ক। অন্ততপক্ষে সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বেশ ক্ষুদ্র হলেও, এই কথাটার দিকেই জোর দিতে পারি আমরা। তাছাড়া অভিযানে যোগ দেয়ার পরপরই ইতিহাস থেকে স্রেফ গায়েব হয়ে যায় আরচার্ড ফোরটেস্কুর নাম। লুইসকেও ফিরে আসার কয়েক বছর পর খুন করা হয়।"

"ঠিক আছে," বলে উঠল গ্রে। "চলুন সময়কে কিছুটা পিছিয়ে নেয়া যাক। মেরিওয়েদার লুইসের মৃত্যুর ঘটনা থেকে কাজ শুরু করি আমরা। ধরে নিচ্ছি, তিনি অভিযানে এমন কিছু একটা আবিষ্কার করেছিলেন, যার কারণে পরবর্তীতে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়েছিল তাকে। এবার আমাকে হত্যাকাণ্ডটা সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।"

"হ্যাঁ। ঠিক আছে। আঠারোশো নয় সালের অক্টোবরে, টেনেসির গ্রাইন্ডার'স স্ট্যান্ড নামের এক সরাইখানায় মারা যান ভদ্রলোক। জায়গাটা ন্যাশভিল শহর থেকে খুব একটা দূরে নয়।"

বাকিদের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল গ্রে।

ন্যাশভিল?

বিড়বিড় করে উঠল মঙ্ক, "বাহ...মনে হচ্ছে ইতিহাসের ডালে ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। প্রথমে আইসল্যান্ড, এখন আবার ন্যাশভিল।"

বলে চলছেন হেইসম্যান, "প্রথমে অবশ্য তার মৃত্যুটাকে আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হয়েছিল। গুলির আওয়াজ শুনে সরাইখানার মালিকের স্ত্রী, মিসেস গ্রাইন্ডার সবার আগে লুইসের ঘরে ছুটে যান। রক্তাক্ত একটা চামড়ার টুকরোর উপর লুটিয়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে তার শেষ কথা ছিল, 'সফল হয়েছি আমি'।"

"তারপর?"

"প্রথমে আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হলেও, পরবর্তীতে ঐতিহাসিকরা রায় দেন, খুন করা হয়েছিল লুইসকে। তৎকালীন কুখ্যাত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জেমস উইলকিনসনের দিকে সন্দেহের আঙুল তোলা হয়।"

পাজলের টুকরোগুলো মাথার ভেতর সাজিয়ে নিতে শুরু করল গ্রে। গিল্ডের কাছে রক্ষিত সোনার প্লেটটার কথা মনে করল সে। গিল্ড কি সেই সরাইখানা থেকেই অভিযানে লুইসের পাওয়া প্লেটটা হস্তগত করেছিল? জেনারেল উইলকিনসনই কি জেফারসন আর ফ্র্যাঙ্কলিনের উল্লেখ করা সেই রহস্যময় শত্রুপক্ষে একজন ছিলেন? গিল্ডের তৎকালীন অনুসারী?

দুইশো বছর পর সেই পুরনো যুদ্ধই আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু মাথার ভেতর কোনও একটা ব্যাপার খচখচ করতে অনুভব করছে গ্রে। কথাটা মাথায় এলেও, মুখে আসছে না।

শেইচান তার হয়ে কাজটা করে দিল। "মি. হেইসম্যান, আপনি বললেন মারা যাওয়ার আগে একটা চামড়ার টুকরোড় উপর পড়েছিলেন লুইস।"

"ঠিক তাই।"

"ফোরটেস্কুর ডায়েরীতেও তো উল্লেখিত ছিল, ম্যাস্টোডনের খুলিটা একটা মহিষের চামড়ায় মোড়ানো ছিল।"

"দাঁড়ান দেখছি," বলে চুপ হয়ে গেলেন কিউরেটর। এক মুহূর্ত পরই আবার লাইনে ফিরে এলেন। "হ্যাঁ। পেয়েছি। আপনার ধারণাই সঠিক।"

এবার মুখ খুলল গ্রে, "জেফারসনের কাছে কোনও মহিষের চামড়ার টুকরো রক্ষিত থাকার রেকর্ড আছে কি?"

"হ্যাঁ," উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিলেন হেইসম্যান। "মন্টিসেলো, নিজের বাড়িতে ইন্ডিয়ান আর্টিফ্যাক্টের বেশ বড় একটা সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন জেফারসন। জিনিসগুলোর ভেতর একটা চামড়ার টুকরোও ছিল। বলা হয়ে থাকে, লুইস তাকে ওই প্রাচীন জিনিসটা পাঠিয়েছিলেন। তবে তার মৃত্যুর পর, অন্যান্য অনেক আর্টিফ্যাক্টের সাথে মহিষের চামড়াটাও গায়েব হয়ে যায়।"

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল গ্রে। খুলি মোড়ানো মহিষের চামড়া...মৃত্যুর সময় লুইসের কাছে থাকা চামড়ার টুকরো...জেফারসনের কাছে সংগৃহীত চামড়ার টুকরো...এই সবগুলো একই জিনিস না তো? হয়তো ডেভিল কলোনীর অবস্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে ম্যাস্টোডোনের খুলিতে সংরক্ষিত ইন্ডিয়ান মানচিত্র আর মহিষের চামড়া, দুটো একসাথে ব্যবহৃত হত। তাছাড়া চামড়াটার ভেতরের দিকেও নাকি একটা দৃশ্য আঁকা ছিল।

যদি সবগুলো চামড়াকে একই ধরা হয়, তাহলেও কথা থেকে যায়। জেফারসনের সংগ্রহশালা থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার পর, লুইসের মৃত্যুর সময় জিনিসটা তার কাছে এল কীভাবে? আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় বলা 'সফল হয়েছি আমি' কথাটার

মাধ্যমে ভদ্রলোক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? হতে পারে, নিজের কাছে থাকা সোনার প্লেটটা হারিয়ে ফেলার পরও কোনও না কোনওভাবে চামড়াটা আবার ফিরে পেয়েছিলেন তিনি।

ক্যাটও এতক্ষণ তাদের কথাগুলো শুনছিল। এবার মুখ খুলল সে। "ড. হেইসম্যান, লুইসের মৃতদেহের কী হয়েছিল?"

"ওটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার না। মৃত্যুটাকে তৎকালীন তদন্তে আত্মহত্যা বলে রায় দেয়ার পর, টেনেসির ওই সরাইখানার পাশেই কবর দেয়া হয়েছিল তাকে।"

"আর তার সাথে থাকা জিনিসপত্রগুলো?"

"ঐতিহ্য অনুযায়ী, আত্মহত্যাকারীদের সাথে থাকা জিনিসপত্রগুলো সাধারণত তার সাথেই কবর দেয়া হয়। তবে মূল্যবান কিছু থাকলে, এই এমন টাকাপয়সা, সেগুলো উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দেয়ার নিয়ম আছে।"

"রক্তে ভেজা চামড়ার রোবের ক্ষেত্রে অন্তত মূল্যবান কথাটা প্রযোজ্য হয় না," যোগ করল গ্রে।

রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকাল মঙ্ক। "তুমি তাহলে ভাবছ, ওই জিনিসটাও লুইসের মৃতদেহের সাথে কবর দেয়া হয়েছিল?"

"ওটা জানার জন্য তো আপাতত একটা রাস্তাই খোলা আছে," জবাব দিল গ্রে। "মেরিওয়েদার লুইসকে ঘুম থেকে জাগাতে হবে।"

চতুর্থ অংশ

নেকড়ে এবং ঈগল

অধ্যায় ৩৫
১ জুন, ভোর ৪:১৫
ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক

পার্কের ভূ-তাপীয় কেন্দ্রের উপরে পৌছে গেছে হেলিকপ্টারটা, আস্তে আস্তে যেন ফড়িংটার দিকে দিকে উঁচু হয়ে আসছে মালভূমির মেঝে। রাতের অন্ধকার এখনও পুরোপুরি কাটেনি। আলো আঁধারিতে গাছের সারির ফাঁকফোকর গলে, জায়গায় জায়গায় গরম পানির ঝর্ণা, গিজার, লেক ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে।

তবে ভোরের এই সময়টাতেও পার্কের নিচে রাস্তাটা খালি না। সারি সারি হেডলাইটের আলো জ্বলে দিনের মতো আলোকিত করে রেখেছে সবগুলো এক্সিট। পার্ক রেঞ্জারদের গাড়ির উপরে জ্বলতে থাকা লাল-নীল আলো অন্ধকারকে আরও রঙিন করে তুলেছে।

হাতঘড়ি দেখলেন পেইন্টার।

আর মাত্র দুই ঘন্টা বাকি।

ফ্ল্যাগস্টাফে বসেই পুরো এলাকাটা খালি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। তারপর সেখান থেকে গোটা দল নিয়ে প্রাইভেট জেটে করে মন্টানার পশ্চিমদিকের একটা এয়ারপোর্টে পৌছান। এয়ারপোর্ট থেকে পার্কের মধ্যকার দূরত্বটুকু পার করানোর অন্য হেলিকপ্টার অপেক্ষা করেই ছিল।

যান্ত্রিক ফড়িংটার নিচে থাকা পার্কিং লটে ইতিমধ্যে দুটো হেলিকপ্টার বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, রাফায়েল তাদের আগে ঘটনাস্থলে পৌছে গেছে। ওল্ড ফেইথফুল ইন নামের একটা হোটেলে দুই দলের রঁদেভু পয়েন্ট ঠিক করা হয়েছিল। কাঠের তৈরি সাততলা সমান উঁচু হোটেলটা পৃথিবীর সবচেয়ে বিশালাকায় কাঠের স্থাপনা হিসেবে স্বীকৃত।

হোটেলটার নামকরণ একটু দূরে থাকা ওল্ড ফেইথফুল গিজার থেকে করা হয়েছে। পেইন্টারদের হেলিকপ্টারটার স্কিড মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে, ঝর্ণাটা থেকে তীক্ষ্ম আওয়াজে ফুটন্ত পানির ফোয়ারা ছিটকে উঠল। প্রায় দুইশো ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে গেল গরম পানি। গিজারটা প্রতি নব্বই মিনিট পরপর এরকমভাবে পানি উদ্গীরণ করে।

পেইন্টার প্রার্থনা করলেন, পরের ফোয়ারাটা উঁকি দেয়া পর্যন্ত যেন উপত্যকাটা অক্ষত থাকে।

গিজারটা পেরিয়ে গোটা মালভূমির আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়েছে ভূগর্ভস্থ গরম পানির ধমনী। আরও অসংখ্য ছোট ছোট ঝর্ণা আর গিজারে বিভক্ত করে দিয়েছে

এলাকাটাকে। সেগুলোর নামও বেশ অদ্ভুত...বীহিভ, স্প্যাসমোডিক, ক্যাসেল, স্লার্পার, লিটল স্কুইর্ট, জায়ান্টেস ইত্যাদি।

হেলিকপ্টারের দরজা খুলে যেতেই লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল কোয়ালস্কি। পেছন পেছন কাউচকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর হ্যাঙ্ক। তারপর একে একে জর্ডান, পেইন্টার, রোনাল্ড শিন, মেজর রায়ানসহ তিন ন্যাশনাল গার্ড পার্কের মাটিতে পা রাখলেন। মন্টানা এয়ারপোর্ট থেকে বাড়তি গার্ডদের সাথে করে এনেছেন মেজর। দুই দলের সদস্যসংখ্যা সমান থাকার ব্যাপারে আগেই রাফায়েলের সাথে কথা বলে রেখেছিলেন পেইন্টার।

হোটেলের বিশাল কাঠামোটার দিকে তাকিয়ে রইল জর্ডান। পেইন্টার বুঝতে পারলেন, কাই-কে খুঁজছে ছেলেটা। তার নিজের উদ্দেশ্যও একই।

"চলুন," গোটা দলটাকে হোটেলের দিকে এগোতে ইশারা করলেন সিগমা ডিরেক্টর।

বিনাবাক্যে তাকে অনুসরণ করতে লাগল সবাই। সবার পেছনে থাকা ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা কয়েকটা বড় বড় ট্রাঙ্ক হাতে নিয়ে এগোচ্ছে। আগে থেকেই এয়ারপোর্টে এগুলো আনিয়ে রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন পেইন্টার।

সদর দরজা দিয়ে হোটেলের ভেতরে ঢুকতেই, কাঠনির্মিত স্থাপনাটার বিশালত্ব তাকে মুগ্ধ করল। পুরো জায়গাটাকে বিশাল একটা গুহার মতো দেখাচ্ছে। নিচের লবির চারদিক থেকে উপরের সিলিং পর্যন্ত সারি বেঁধে উঠে গেছে প্রতিটা রুম, স্যুইট। একটার পর একটা করে ধাপে ধাপে বেরিয়ে আছে ব্যালকনিগুলো। লবির একেবারে মাঝখানে একটা পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেস। গোটা স্থাপনাটার কেন্দ্রবিন্দু চিহ্নিত করছে ওটা।

শুধু কয়েকজন ক্রু ছাড়া, পার্কের মতো হোটেলটাও খালি করে ফেলা হয়েছে। জনমানবশূন্য হওয়ায় জায়গাটাকে আরও বড় দেখাচ্ছে।

লবির রেস্টুরেন্টে রাফায়েলের দলটাকে বসে থাকতে দেখে সেদিকে এগোলেন পেইন্টার। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে জায়গাটাকে পুরাদস্তুর কম্পিউটার ল্যাব বানিয়ে ফেলেছে ওরা। সেন্ট্রাল মনিটরের সামনে একজন বিশালদেহী আফ্রিকান মহিলা আর এর টেকনিশিয়ানকে বসে থাকতে দেখা গেল।

সামনে এগোতেই মহিলার ছায়ার ভেতর থেকে একটা অবয়ব নড়ে উঠতে দেখলেন পেইন্টার।

"আঙ্কেল ক্রো..."

সবার আগে নড়ে উঠল জর্ডান। "কাই!"

ছেলেটাকে দেখে কাই-এর মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেও সামনে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু হঠাৎ তার একহাত টেনে ধরল আফ্রিকান মহিলা। এক মুহূর্ত পর, কাই-এর হাতে চকচকে স্টিল দেখতে পেলেন পেইন্টার। মহিলাটা তার হাত টেনে ধরেনি। দুজনকে একসাথে একটা হ্যান্ডকাফে আটকে রাখা হয়েছে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে থমকে গেল জর্ডান।

"এসব কী?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

"নিশ্চয়তা, মনসিয়র ক্রো...নিশ্চয়তা," বলতে বলতে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন রাফায়েল। বিকৃত মুখে মুচকি হাসার চেষ্টা করতেই সেটাকে বানরের ভেংচি বলে মনে হলো। পেইন্টার আন্দাজ করতে পারলেন, এই শরীর নিয়ে এতখানি পথ আসাই লোকটার বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"নিশ্চয়তা? কী বোঝাতে চাইছেন আপনি? আমাদের তো একটা চুক্তি ছিল।"

"অবশ্যই, মনসিয়র ক্রো। আমি এক কথার মানুষ। চুক্তিটার কথা এখনও মনে আছে আমার। হারানো শহরটার অবস্থান বলার সাথে সাথেই নিজের ভাতিজিকে পেয়ে যাবেন আপনি।"

"ওটা তো আমি করেছিই!"

"না...করেননি," খেঁকিয়ে উঠে চারদিকের হোটেল রুমগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন রাফায়েল। "কোথায় তাহলে সেই ডেভিল কলোনী?"

পেইন্টার বুঝতে পারলেন, তার ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে গেছে। ঘার ঘুরিয়ে কাই-এর দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন, মেয়েটার কবজিতে আটকানো হ্যান্ডকাফে একটা লাল আলো মিটমিট করছে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ব্যাপারটা ধরতে পারলেন রাফায়েল। "হ্যান্ডকাফের দুটো ব্রেসলেট একটা সার্কিটে যংযুক্ত আছে। পরস্পর আলাদা হওয়ার সাথে সাথে আপনার ভাতিজির কবজিতে ছোট কিন্তু মারাত্মক একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। হাতটা তো যাবেই, সেই সাথে মাথার একটা অংশও উড়ে যেতে পারে।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাচা মুখের দিকে তাকাল মেয়েটা।

"বর্তমান পরিস্থিতিতে একেবারে উপযুক্ত কাজ, কী বলেন?" বলে চলেছেন রাফায়েল। "নয়তো দেখা যেত, বাকি সব ফেলে আমার কাছ থেকে ভাতিজিকে কেড়ে নেয়াটাকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন আপনি।"

ঘরের ভেতর উত্তেজনা ক্রমাগত বাড়ছে। রাফায়েলের পেছনে পাঁচজন সহযোগীসহ বার্নকে দেখে মনে হচ্ছে, যে কোনও মুহূর্তে পেইন্টারের দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কাই-এর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন পেইন্টার। পরক্ষণেই রাফায়েলের দিকে চোখ ফেরালেন। "নেকড়ের মাথাওয়ালা পাত্রটা এনেছেন তো?"

"অবশ্যই," জবাব দিলেন তিনি। "বার্ন, জিনিসটা টেবিলে রাখ তো।"

মাথা নেড়ে একটা বাক্স মেলে ধরল লোকটা। ভেতরে ফোমের প্যাডে, সোনার প্লেট দুটোর পাশাপাশি পাত্রটাকেও শুয়ে থাকতে দেখা গেল। জিনিসটা বের করে ডাইনিং টেবিলে রাখল সে। আরও একবার প্রাচীন আর্টিফ্যাক্টটার সৌন্দর্যে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না পেইন্টার। "কোয়ালস্কি, আমাদের জিনিসগুলো বের কর।"

লাঠি ভর দিয়ে সিগমা ডিরেক্টরের পাশে এসে দাঁড়ালেন রাফায়েল। "আপনার মনে হয়, এই জিনিস দুই মিলিয়ন একরের মধ্য থেকে, আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গাটা খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে?"

"দেখা যাক।"

ইয়েলোস্টোনে আসার পথে, জয়েন্ট চীফ অফ স্টাফের বদৌলতে প্রেসিডেন্ট গান্টের সাথে কথা বলেছেন পেইন্টার। তার অনুমতিতে, গোটা পার্কটাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে চষে ফেলেছে একাধিক স্যাটেলাইট। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

"সমস্যা হচ্ছে," ব্যাখ্যা করতে লাগলেন সিগমা ডিরেক্টর, "পুরো অঞ্চলটা অগণিত গুহা, লাভা টিউব, ভূগর্ভস্থ ঝর্ণা, গিজার ইত্যাদি দিয়ে ভর্তি। এজন্যই স্যাটেলাইটগুলোও তেমন কিছু করতে পারেনি। হারানো শহরটা যে কোনও স্থানে লুকানো থাকতে পারে।"

"আর পদার্থবিদরা?" জিজ্ঞেস করলেন রাফায়েল।

মাথা নাড়লেন পেইন্টার। "নিউট্রিনো আলোড়নটার ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে, ওরা জায়গাটার প্রকৃত অবস্থান বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন।"

"অনর্থক," মন্তব্য করলেন রাফায়েল।

সায় দিলেন পেইন্টারও। তবে একটা আশা আছে। টেবিলের উপর রাখা সোনার পাত্রটার গায়ে একটা দৃশ্য খোদাই করে রেখেছে এর নির্মাতারা- পেছন দিকে গাছের সারিতে ঢাকা পাহাড়, সামনে দিয়ে বয়ে চলা দুটো খাঁড়ির মাঝখানে, মাথা উঁচু করে একটা মোচাকৃতি ঢিবি দাঁড়িয়ে আছে। জিনিসটাকে দেখতে একটা ছোটোখাটো আগ্নেয়গিরির মতো দেখাচ্ছে। আশেপাশে আরও কয়েকটা ছোট ছোট কোন দেখা যাচ্ছে।

জায়গাটা দেখতে একেবার সত্যিকার কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতোই। ভূগর্ভস্থ অবস্থানের বিচারে, এটা পার্কের ভেতরের কোনও এলাকা হতে পারে। নিশ্চয়ই জায়গাটা পুটসিভদের আছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, নয়তো এটা পাত্রের গায়ে খোদাই করা থাকত না।

পেইন্টারের কথামতো ট্রাঙ্ক খুলে, একটা ডিজিটাল লেজার স্ক্যানারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বের করে এনেছে কোয়ালস্কি। রাফায়েলের আনা কম্পিউটার ইকুইপমেন্টগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন সিগমা ডিরেক্টর। "এগুলোর মাধ্যমে স্যাটেলাইট ফ্যাসিলিটির সাথে যোগাযোগ করা যাবে তো?"

"অবশ্যই।"

"আপনার টেকনিশিয়ানকে বলুন, লেজার স্ক্যানারটা সেট করে ফেলতে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন রাফায়েল। "আশান্দা, টি.জে.-র সাথে বরং তুমিও হাত লাগাও। এরকম পরিস্থিতিতে কোনওরকম ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।" বলে পেইন্টারের দিকে ফিরলেন তিনি। "এদিকে সরে আসুন। ওদেরকে নিজেদের হাতের জাদু দেখাতে দিন।"

একহাত হ্যান্ডকাফে আটকানো থাকা অবস্থায়ই ঝটপট লেজার স্ক্যানারটা সেট করে ফেলল আশান্দা। এমনকি কাইও কয়েকটা কেবল জোড়া লাগানোর কাজে

তাকে সাহায্য করল। তবে পেইন্টার লক্ষ্য করলেন, প্রতিবার হ্যান্ডকাফে লাল আলো জ্বলে ওঠার সাথে সাথে মৃদু শিউরে উঠছে মেয়েটা।

এক মিনিট পর, মনিটরে একটা লোগো ভেসে উঠতে দেখা গেলঃ এল.এল.সি.-লেজার টেকনিকস কোম্পানি। ওয়াশিংটনের বেলেভিউতে অবস্থিত এই সংস্থাটা নাসার সাথে কাজ করে। এই লেজার ডিভাইসের সাহায্যে খালি চোখে দেখা যায় না, ধাতুর এমন সূক্ষ্ম ফাটলগুলোও শনাক্ত করা সম্ভব। নাসার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এভাবেই পরীক্ষা করে দেখা হয়।

নিজের কাজ শেষ করে আস্তে করে মাথা নাড়ল আশান্দা।

মহিলা কী বোবা নাকি? ভাবলেন পেইন্টার। যাক গে, এখন এসব ভাবার সময় নেই। আপাতত রহস্যটার সমাধান করা যাক।

এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে পাত্রটা তুলে নিলেন তিনি, তারপর স্ক্যানারের লেজার নির্গমনকারী অংশটা পাত্রের সামনে তুলে ধরে, সুইচ টিপে দিলেন।

সাথে সাথে নিজের কাজ শুরু করল স্ক্যানার। পাত্রের গায়ে খোদাই করা ছবিটা আস্তে আস্তে কম্পিউটারের পর্দায় উঠে আসতে শুরু করল। প্রথমে ঝাপসা হলেও, এক মুহূর্ত পর ত্রিমাত্রিক আকৃতি গঠন করল দৃশ্যটা।

"চমৎকার," রাফায়েলের গলায় উচ্ছ্বাস।

"দেখা যাক, জিনিসটা আমাদের কোনও কাজে আসে কিনা," বলে কিবোর্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পেইন্টার। ত্রিমাত্রিক ছবিটা হস্টনে থাকা নাসার টেকনিশিয়ানদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গত কয়েক ঘন্টা ধরে স্যাটেলাইটের ধারণ করা পার্কের ফুটেজের সাথে দৃশ্যটা মিলিয়ে দেখবে ওরা। কপাল ভালো থাকলে হয়তো, পার্কের কোনও অংশের সাথে জায়গাটা মিলে যাবে।

"কাজটা সারতে কয়েক মিনিত সময় লাগবে," ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন সিগমা ডিরেক্টর।

পাত্রটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন রাফায়েল। "প্রার্থনা করুন, খুব বেশি সময় যেন না লাগে।"

ভোর ৪:৩৪

টেবিলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে, পাত্রটার দিকে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর হ্যাঙ্ক কানোশ। পেইন্টার ঠিকই বলেছিলেন, অবশ্যই পুটসিভদের কাছে পাত্রে খোদাই করা দৃশ্যটা বিশেষ কোনও গুরুত্ব বহন করে।

আরেকটা বিষয় হ্যাঙ্ককে বেশ অবাক করেছে। বারবার কেন জানি তার মনে হচ্ছে, আগেও কোথাও দৃশ্যটা দেখেছেন। তবে এর আগে তো কখনোও ইয়েলোস্টোনে আসেননি তিনি।
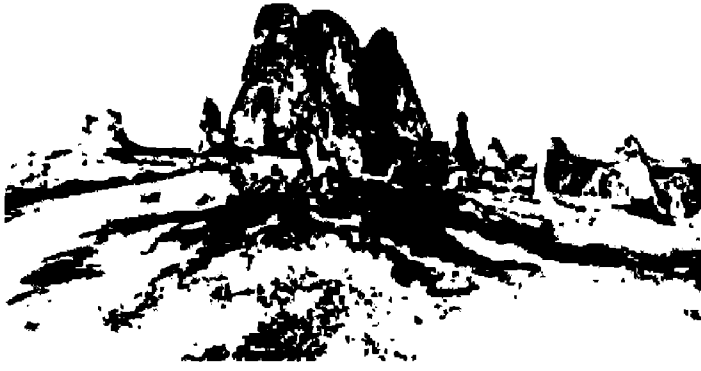
এটা কীভাবে সম্ভব? কোথাও কি ভুল হচ্ছে আমার?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললেন প্রফেসর, তারপর পাত্রের অন্যদিকের অংশে মনোযোগ দিলেন। দৃশ্যটার উল্টোদিকে কিছু লেখা খোদাই করা আছে, অক্ষরগুলো দেখতে অনেকটা বুক অফ মরমনে উল্লেখ করা সেই পরবর্তীত মিশরীয় ভাষার মতো। সোনার প্লেটে খোদাই করা সেই লেখাগুলোকে তার ভাষাবিদ বন্ধু 'অ্যালফাবেট অফ দ্য ম্যাজাই' বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

আসলেই কি পুটসিভরা যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বে হলিল্যান্ড থেকে পালিয়ে আসা কোনও গোত্র ছিল? এই প্রাচীন ইজরায়েলী মানুষগুলো কি আসলেই তাদের গোপন জ্ঞান লুকিয়ে রাখার জন্যই উত্তর আমেরিকায় পা রেখেছিল?

যদি কোনওভাবে তাদের একজনের সাথে কথা বলার সুযোগ পেতাম...

হ্যাঙ্কের গলা বেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তবে হতে পারে, এখন এই লেখাগুলোর মাধ্যমে পুটসিভদেরই কেউ একজন তার সাথে যোগাযোগ করছেন।

রাফায়েলের সাথে কথা বলতে থাকা পেইন্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন প্রফেসর। তাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে যেন, শত্রুতা ভুলে পরস্পরের সহকর্মীতে রূপান্তরিত হয়েছেন দু'জন। তবে সিগমা ডিরেক্টরের চোখের কোনে লুকিয়ে থাকা রাগটাও স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন তিনি।

"পেইন্টার, আপনার স্ক্যানার দিয়ে কি পাত্রের অন্যদিকে থাকা লেখাগুলোর একটা ছবি তোলা সম্ভব? আমার ভাষাবিদ বন্ধুর কাছে ছবিটা পাঠালে, হয়তো সে কোনও সাহায্য করতে পারবে। পুরো লেখাটা না হোক, অন্তত কিছুটা অংশের অর্থ বের করতে পারলেও হয়তো কোনও ক্লু পেয়ে যাব আমরা। ও আগেই আমাকে বলেছিল, অক্ষরগুলোর সাথে প্রাচীন হিব্রুর একটা সম্পর্ক আছে।"

"অবশ্যই। এ মুহূর্তে ক্ষুদ্র কোনও সম্ভাবনাও অবহেলা করা যাবে না।"

পেইন্টারের কাজ শেষ হতেই, ভাষাবিদ বন্ধুর কাছে ছবিটা পাঠিয়ে দিলেন হ্যাঙ্ক।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সিগমা ডিরেক্টর।

"নাসা থেকে খবর এসেছে...পজিটিভ!"

অধ্যায় ৩৬
১ জুন, সকাল ৭:০৬
হোহেনওয়াল্ড, টেনেসি

মেরিওয়েদার লুইস স্টেটপার্কের পার্কিংলটে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ফ্ল্যাটবেড ট্রাক থেকে ব্যাকহো-টা নামিয়ে আনছে গ্রে। সূর্য উঠে গেলেও এখনও খোলেনি পার্কটা। তাড়াতাড়ি করলে হয়তো লোকজনের আনাগোনা শুরু হওয়ার আগেই, কাজ সেরে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে ওরা।

ক্যাট ওদের এই কবর চুরিকে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে, সবার জন্য ভুয়া পানির লাইন মেরামতের কর্মীর পারমিট জোগাড় করেছে। এখানে আসার আগে, চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে হোহেনওয়াল্ডের এমন একটা হেভি ইকুইপমেন্টের দোকান থেকে ট্রাক আর ব্যাকহো ভাড়া করে এনেছে ওরা। এছাড়াও যন্ত্রপাতিগুলোর সাথে দুটো কোদালও আছে।

নীল রঙের কর্মীর পোশাক পরে, পার্কিং লট থেকে পার্কের গেটের দিকে এগোচ্ছে মঙ্ক আর শেইচান। পেছন পেছন গ্রে ব্যাকহো চালিয়ে আসছে। ছোটবেলায় টেক্সাসে থাকার সময় এরকম বুলডোজার আর ব্যাকহো চালিয়েছে সে। বহু বছর পর আবার কাজটা করতে পেরে উদাস হয়ে গেল তার মন।

মেইন গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর কয়েকটা তথ্যসমৃদ্ধ ধাতব সাইন চোখে পড়ল। পার্ক পেরিয়ে রাস্তার একপাশেই দাঁড়িয়ে আছে গ্রাইন্ডার'স ইন। সরাইখানাটা অনেক আগে বন্ধ হয়ে গেলেও, কাঠের কেবিনগুলো এখনও সদর্পে বিদ্যমান। গেট ছাড়িয়ে একটু সামনেই লাইমস্টোনের তৈরি লুইসের কবরের ফলক, পাথরের ভিতের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে চারকোণাকৃতি কাঠামোটা।

কাছাকাছি পৌঁছে গ্রে-র উদ্দেশ্যে হাত নাড় মঙ্ক। "ব্যাকহো-টা ঘুরিয়ে নাও।"

তাই করল গ্রে। মেশিনটাকে ঘুরিয়ে, পেছনদিকের বাকেটটা কবরের সামনে নিয়ে এল।

কিন্তু খোঁড়া শুরু করার আগে জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করার পাশাপাশি, তার অন্তিম ঘুম বিঘ্নিত করার জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিল সিগমা কমান্ডার। তারপর চেপে ধরল বাকেট নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাকহো-র হাইড্রোলিক হ্যান্ডেল।

লাইমস্টোনের ফলকসহ, নিচের পাথরের ভিতটা তুলে ফেলতে পনেরো মিনিটের মতো সময় লাগল। তারপরই মাটিতে কামড় বসালো ব্যাকহো-র ইস্পাতের বাকেট।

আস্তে আস্তে, এক খাবলা এক খাবলা করে সরে যেতে লাগল স্যাঁতসেঁতে মাটির দলা।

পাশে দাঁড়িয়ে গ্রে-র কাজ দেখছে শেইচান আর মঙ্ক। সেই সাথে নজর রাখছে, বাকেটের ধারালো দাঁতের ফলা লেগে যেন ভেতরের কিছু ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কিছুক্ষণ পর শিষ বাজিয়ে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল মঙ্ক।

"কাজ হয়ে গেছে। চল বিশ্বখ্যাত অভিযাত্রীর ঘুম ভাঙানো যাক।"

ব্যাকহো-র কেবিন থেকে নেমে দাঁড়াল গ্রে, তারপ কোদাল হাতে বাকি মাটিটুকু সরানোতে লেগে গেল। এক হাতেই আরেকটা কোদাল নিয়ে তাকে সাহায্য করতে লাগল মঙ্ক।

কয়েক মিনিট পর মাটির ভেতর থেকে কাঠের কফিন উঁকি দিতে দেখা গেল। অবশিষ্ট মাটিটুকু সরানো হয়ে গেলে, কফিনের ডালাটা মেলে ধরল গ্রে। ভেতরে শুয়ে আছেন স্বাধীনতার অন্যতম স্থপতি থমাস জেফারসনের সহযোগী মেরিওয়েদার লুইস। কঙ্কালটার গায়ে জায়গায় জায়গায় মাংস শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে।

দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠল মঙ্ক। "আমি বরং বাইরে শেইচানের পাশে গিয়ে দাঁড়াই।"

"ঠিক আছে।"

কঙ্কালটার পায়ের দিকে একটা ভাঁজ করা পুরনো চামড়ার টুকরো দেখা যাচ্ছে। বাইরের দিক লোম উঠে ন্যাড়া হয়ে গেলেও জিনিসটা অক্ষত আছে বলেই গ্রে-র মনে হলো।

চামড়ার টুকরোটা ভালোমতো লক্ষ্য করার জন্য নিচু হলো সিগমা কমান্ডার। পরক্ষণেই একটা রাইফেল গর্জে ওঠার শব্দের সাথে সাথে, হুমড়ি খেয়ে কফিনের ভেতর পড়ে গেল মঙ্ক। কোমরের একপাশ থেকে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিতে লাগল কঙ্কালসহ কাঠের কফিন।

আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় না পেয়ে, গড়িয়ে কবরের ভেতর নেমে এল শেইচান। "আমাদের রাইফেলগুলো কোথায়?"

"ব্যাকহো-র ক্যাবের ভেতর," জবাব দিল গ্রে।

কথাটা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আহত মঙ্কের গলা বেয়ে।

"মনে হচ্ছে, এতক্ষণ নিজেদের কবরই খুঁড়েছি আমরা।"

অধ্যায় ৩৭

১ জুন, ভোর ৫:০৫

ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক

নাসা থেকে মেসেজটা পাওয়ার আধঘন্টা পর, সোনার পাত্রের গায়ে খোদাই করা জায়গাটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন পেইন্টার। হেলিকপ্টারে করে এখানে আসতে আসতে সূর্য পুরোপুরি উঠে গিয়েছে। তবে কেউ জানে না, এই নতুন সকাল তাদের জন্য সাথে করে কি বয়ে এনেছে।

রেঞ্জারদের মতে, পার্কের অন্যতম দুর্গম জায়গাগুলোর ভেতর এই এলাকাটাও পড়ে। কাছাকাছি ট্রেইলটাও প্রায় সতেরো মাইল দূরে। কপাল ভালো, তাদের সাথে হেলিকপ্টার ছিল।

দুই দলের সবাইকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে কপ্টারগুলো, অবশ্য মাথার উপর আরও কয়েকটা যান্ত্রিক ফড়িং উড়ছে। ইনস্যুলেটেড ব্লাস্ট বক্স বহন করছে ওগুলো। প্ল্যান হচ্ছে, লুকানো শহরটা খুঁজে পাওয়ার পর ন্যানোটেক বিস্ফোরক পদার্থগুলো নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব না হলে, ব্লাস্ট বক্সে করে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এভাবেই একমাত্র আগ্নেয়গিরিটাকে জাগিয়ে তোলা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

তারপর পদার্থগুলোর বিস্ফোরণ নিয়ে ভাবা যাবে। ক্যাট ইতিমধ্যে পদার্থবিদদের নিয়ে কাজ করছে। দরকার পড়লে, নিউক্লিয়ার বোমাও ব্যবহার করা হবে।

কিন্তু এসব অনেক পরের ব্যাপার। সবার আগে তাদেরকে পুটসিভদের সেই লুকানো শহর- দ্য ডেভিল কলোনী খুঁজে বের করতে হবে।

রোটরের আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন পেইন্টার, "আর মাত্র একঘন্টা বাকি...এর ভেতর হারানো শহরটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।"

কিন্তু তিনি খুব ভালো করেই জানেন, সুউচ্চ পাহাড়সারি, পাইন বন, আর ক্রীক দুটোর মাঝখানে আসল জায়গাটা খুঁজে পাওয়াটা বেশ কঠিন হবে।

"এটাই সেই জায়গা!" হ্যাঙ্কের গলায় নিখাদ বিস্ময়, "কেন আগে এটা মনে হলো না আমার!"

প্রফেসরের দিকে এগিয়ে গেলেন পেইন্টার। ক্রীকগুলোর পার ধরে, চারদিকে বিস্তৃত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা জিওথার্মাল আকৃতিগুলোর জন্যই এলাকাটাকে ফেয়ারিল্যান্ড বেসিন নাম দেয়া হয়েছে। শিনের মতে, জিনিসগুলো আসলে গিজারাইট কোন। ছোট ছোট গিজারের মুখে বিভিন্ন খনিজ জমে তৈরি হয়েছে লম্বা লম্বা আকৃতিগুলো। আশেপাশে প্রায় চল্লিশটার মত কোন চোখে পড়ল, চারদিকের অর্ধেক ফুটবল মাঠের মতো এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে। কয়েকটা হাঁটু সমান লম্বা,

কয়েকটার উচ্চতা আবার দশ ফুট। বেশিরভাগ গিজার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও, কয়েকটার কিনার বেয়ে এখনও ফুটন্ত পানি আর বাষ্প প্রবাহিত হচ্ছে। পার্ক রেঞ্জারদের মতে, এগুলোর নামও বেশ অদ্ভুত- ম্যাজিক মাশরুম, ফ্যালিক কোন, পিচারস মাউন্ড ইত্যাদি।

এগুলোর মধ্যে সর্বশেষটা, অর্থাৎ পিচারস মাউন্ডের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর হ্যাঙ্ক কানোশ। চারদিকের মোচাকৃতি কোনগুলোর উপর দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সবার মাঝখানে চুনাপাথরের মেঝে ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে একটা লিলিপুট আগ্নেয়গিরি। পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ফুটন্ত পানির ধারা।

প্রফেসরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জর্ডান, তবে তার দৃষ্টি কাই-এর দিকে নিবদ্ধ। দলবল নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে রাফায়েল। বার্নকে চারদিকে খোঁজা শুরু করতে আদেশ দিলেন তিনি। শহরটা যদি এখানেই কোথাও মাটির নিচে লুকানো থাকে, তাহলে কোনও প্রবেশপথ অবশ্যই থাকবে।

"মেজর রায়ান," চেঁচিয়ে উঠলেন পেইন্টার। "আপনার লোকদের নিয়ে উপত্যকার ধারগুলো পরীক্ষা করুন। শিন, তুমি আমার সাথে এসো।"

"ওই ফ্রেঞ্চ শালাকে বিশ্বাস করার চাইতে, সাপ ঢুকে থাকা বুট পায়ে দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করব আমি," বিড়বিড় করে বলল কোয়ালস্কি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন পেইন্টার। জানেন, কথাটা সত্যি। তবে ভাগ্যের পরিহাসে, এখন ওদের সাথেই কাজ করতে হচ্ছে।

"হ্যাঙ্ক, কী পেয়েছেন আপনি?" জিজ্ঞেস করলেন সিগমা ডিরেক্টর।

পিচারস মাউন্ডের দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রফেসর। "দেখুন, বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে খনিজ পদার্থের সংযুক্তি হয়তো কোনগুলোর আকৃতি বেশ পাল্টে ফেলেছে। কিন্তু তারপরেও মিলটা অস্বাভাবিক।"

"মিল? কীসের সাথে?"

"ইহুদিদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা ল্যান্ডমার্কের সাথে...বুক অফ এক্সোডাস অনুযায়ী, ওই পাহাড় থেকেই দশটা অনুজ্ঞা নিয়ে নেমে এসেছিলেন ঈশ্বরের দূত মোজেস।"

"সিনাই পর্বতের কথা বলছেন তো আপনি?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার। আগেও ইহুদিদের পরম পূজনীয় পাহাড়টার ছবি দেখেছেন তিনি। কোমরে হাত দিয়ে নিচু হয়ে, জিনিসটাকে ওই পাহাড়ের একটা ছোট মডেল হিসেবে কল্পনা করলেন সিগমা ডিরেক্টর। প্রফেসরের ধারণা মোটামুটি সঠিক, আকৃতি দুটোর ভেতর বেশ মিল আছে বলতে হবে।

শ্রাগ করল কোয়ালস্কি। "ধুর! সবগুলো কোনই তো আমার কাছে পুরুষাঙ্গের মতো মনে হচ্ছে।"

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন পেইন্টার। "তো? ধরে নিলাম, কোনটা দেখতে সিনাই পর্বতের মতো। এতে কী প্রমাণ হয়?"

"কেন বুঝতে পারছেন না!" হ্যাঙ্কের গলায় অধৈর্যের সুর। "টটসি আন্টসউ পুটসিভরা ইজরায়েল থেকে এখানে এসেছিল। তারপর নিশ্চয়ই নিজেদের ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ একটা নিদর্শনের অনুলিপি এখানে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়েছিল ওরা। জায়গাটাকে অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব দেবে লোকগুলো। তাছাড়া, নিজেদের পরবর্তী আবাসস্থল নির্ধারণ করার মতো সবগুলো গুণই এই এলাকাটার আছে।"

"হ্যাঁ," মাথা নাড়লেন পেইন্টার। "মনে হচ্ছে, আপনার ধারণাই সঠিক।"

তবে শিন তাদের সাথে একমত হয়নি। সিনটার নামে পরিচিত শুষ্ক খনিজ পদার্থের স্তরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে। "একজন ভূতাত্ত্বিক হিসেবে আমি বলব, এই জায়গাটা বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত তাদের জন্য সঠিক ছিল না।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার। "নিচে একটা সুপ্ত সুপারভলক্যানো আছে বলে?"

"ওটাতো বেশ নিচে," জবাব দিল শিন। "এটা ছুঁয়ে দেখুন।"

হাঁটু গেড়ে বসে চুনাপাথরের মেঝে স্পর্শ করলেন সিগমা ডিরেক্টর।

"কী করছেন আপনারা?" কাই আর আশান্দাকে নিয়ে এগিয়ে এলেন রাফায়েল।

"এটা তো কাঁপছে," বলে উঠলেন পেইন্টার, গলায় বিস্ময়ের সুর।

ব্যাখ্যা করল শিন, "জায়গাটা একটা হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের উপর বসে আছে। অনেকটা স্টিম ইঞ্জিনের সাথে কল্পনা করা যায় এটাকে। মাটির নিচের উত্তাপের কারণে, পানি ক্রমাগত বাষ্প হয়ে উপরে উঠে আসছে, তারপর আবার পাথরের স্তরে বাধা পেয়ে নিচে চলে যাচ্ছে। এভাবেই চক্রাকারে আবর্তীত হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। ভেতরের চাপের কারণেই কাঁপছে পাথরের স্তর।"

কেউ কিছু বলার আগেই হ্যাঙ্কের ফোন বেজে উঠল। কলার আইডি চেক করলেন প্রফেসর। "আমার সেই ভাষাবিদ বন্ধু।"

"কথা বলুন," বললেন পেইন্টার। "দেখা যাক, লোকটা লেখাগুলো থেকে কিছু বের করতে পেরেছে কিনা।"

একটু দূরে সরে গিয়ে ফোনটা কানে ঠেকালেন প্রফেসর। কথা বলতে বলতে তার মুখে দ্বিধা ফুটে উঠতে দেখলেন সিগমা কমান্ডার। একটু পর কথা শেষ করে আবার বাকিদের কাছে ফিরে এলেন তিনি।

"প্রফেসর?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার। "কী হয়েছে?"

"আমার বন্ধু পাত্রের লেখাগুলোর কিছু অংশ অনুবাদ করতে পেরেছে। কথাগুলো অনেকটা মৃত্যু আর ধ্বংস সংক্রান্ত।"

"সতর্কবার্তা," যোগ করলেন পেইন্টার।

খেঁকিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। "তাহলে ব্যাটারা এত হাঙ্গামা না করে, শুধু একটা কঙ্কালের মাথার খুলি এঁকে দিলেই পারত। তাহলেই সতর্ক হয়ে যেতাম আমরা সবাই...যত্তসব।"

"তাই করেছে ওরা," জবাব দিলেন হ্যাঙ্ক। "মিশরীয়রা আসলে এরকম পাত্র মৃতদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহার করত। এখানে আসার

পর, ইন্ডিয়ান ম্যাপটা লুকিয়ে রাখার জন্য একটা প্রাগৈতিহাসিক বিলুপ্ত প্রাণীর খুলি ব্যবহার করেছিল ওরা; এমন একটা জিনিস, যাকে তৎকালীন অধিবাসীরা বেশ ভয় পেত। এতেই বোঝা যায়, অনাগত বিপদ আর আমাদের বিলুপ্তির ব্যাপারে আগেই সতর্ক করতে চেয়েছিল পুটসিভরা।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে রাফায়েলের চোখেমুখে ফুটে ওঠা বিতৃষ্ণা অনুভব করলেন পেইন্টার।

বলে চলেছেন হ্যাঙ্ক "পেইন্টারের লোকের পাঠানো, ইন্ডিয়ান মানচিত্রটার গায়ে লেখা লাইনগুলোও অনুবাদ করতে পেরেছে আমার বন্ধু।"

আঁতকে উঠলেন রাফায়েল। "মনসিয়র ক্রো, আপনি তো আমাকে ওই লেখাগুলোর ব্যাপারে কিছু জানাননি!"

জবাবটা হ্যাঙ্কের মুখ থেকে বেরোলো। "কারণ, কথাগুলো প্রায় নিরর্থক বলা যায়।"

"কী লেখা ছিল ওখানে?" জিজ্ঞেস করলেন রাফায়েল।

"যেদিকে তাকিয়ে আছে নেকড়ে আর ঈগল।"

"মানে কী?"

মাথা নাড়লেন প্রফেসর। "জানি না।"

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন পেইন্টার। নিজের কাজ ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছে গ্রে। মঙ্ক আর শেইচানকে নিয়ে এখন আরেকটা রহস্যের পেছনে ছুটছে ও। দেখা যাক, ভাগ্য ওদের কতটুকু সাহায্য করে।

অধ্যায় ৩৮
১ জুন, সকাল ৭:০৬
হোহেনওয়াল্ড, টেনেসি

যা হয় কপালে...

হাতে থাকা একমাত্র অস্ত্র- কোদালটাই মাথার উপর তুলে ধরল গ্রে।

"এটা দিয়ে ওদের পাছায় গর্ত করবে নাকি?" কাতরানোর ফাঁকে বলে উঠল মঙ্ক। খোদাই করা কবরের ভেতর, কফিনের গায়ে লেপ্টে শুয়ে আছে ও। "গুলি কোমরের চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ওটা কোনও সমস্যা না। দুঃখের ব্যাপার হলো, কাপড়গুলো নষ্ট হয়ে গেছে।"

"হাঁটতে পারবে?" জানতে চাইল গ্রে।

"ঝামেলা হয়ে যাবে।"

"তাহলে এখানেই থাক।"

নিচু হয়ে বাইরের দিকে তাকাল শেইচান। "আট থেকে দশজন হবে, এই মাত্র পার্কিং লট থেকে সরাইখানার কেবিনের দিকে দৌড়ে গেল। কভার নিয়েছে।"

"হয়তো ভেবেছে, আমাদের কাছে অস্ত্র আছে," জবাব দিল গ্রে।

"কি করা যায়?" জিজ্ঞেস করল শেইচান।

"ক্যাব থেকে রাইফেল আনার সময়টুকু কোনওভাবে ওদের থামিয়ে রাখতে হবে। ব্যাকহো-টা খুব বেশি দূরে নেই। ওটার আড়ালে যেতে পারলে নিরাপদ থাকা যাবে, কিন্তু এই গর্ত থেকে ওঠাটাই তো মুশকিল।"

মঙ্কের হাতে নিজের কোদালটা তুলে দিল গ্রে। "কোদালদুটো বাড়ি দিয়ে আওয়াজ কর।"

সায় দিল মঙ্ক। "যাতে লোকগুলো বুঝতে পারে, তাদের দিকে গুলি করা হচ্ছে।"

"হ্যাঁ। তবে ধাপ্পাটা একটু পরই ধরা পড়ে যাবে। আশা করা যায়, ততক্ষণে ক্যাবে পৌঁছে যাব আমরা।"

"ঠিক আছে।"

"আমি বলার সাথে সাথে," বলে শেইচানের পাশে নিচু হয়ে দাঁড়াল গ্রে, ব্যাকহো-র দিকে মুখ। দৌড়ানোর জন্য তৈরি।

"এখন..."

কবরের একপাশে নিজের কোদালটা রেখে গ্রে-র কোদালটা হাতে তুলে নিল মঙ্ক। তারপর বাড়ি মারল যত জোরে সম্ভব। চারদিক বদ্ধ থাকায় আওয়াজটা বন্দুকের গুলির না, বরং কামানের গোলার মতো বিকট শোনাল। সাথে সাথে নড়ে উঠেছে

গ্রে। লাফিয়ে উঠে কবর থেকে বেরিয়ে, ব্যাকহো-র আড়ালে চলে এল সে। শেইচানও তাকে অনুসরণ করল।

মঙ্ক আরেকবার আওয়াজ করার ফাঁকে দরজা খুলে ব্যাকহো-র ক্যাবের ভেতর ঢুকে গেল দু'জন। সিটে বসার সাথে সাথে বিশালাকায় বাকেটের হাইড্রোলিক পাম্প রিলিজ করল গ্রে। মেঝেতে রাখা রাইফেল দুটো আঁকড়ে ধরল শেইচান। ততক্ষণে সামলে উঠেছে হামলাকারীরা। ব্যাকহো-র ছাদ ঘেঁষে একটা গুলি বেরিয়ে গেল।

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল দু'জন। পালানোর পক্ষে এটা মোটেই উপযুক্ত বাহন না। তাছাড়া মঙ্ককে এভাবে ফেলে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ব্যাকহো-র পেছনদিকে থাকা ফ্রন্টলোডারটা সোজা করে উইন্ডশিল্ডের সামনে তুলে ধরল গ্রে, তারপর অন্ধের মত পেছনদিকে যাওয়া শুরু করল। পাশ থেকে নির্দিষ্ট বিরতিতে গুলি করতে করতে লোকগুলোকে কেবিনের পেছনেই আটকে রাখল শেইচান। রাস্তার পাশে পৌঁছাতেই, একপাশের দরজা খুলে নেমে পড়ল শেইচান।

এতক্ষন যাবত আটকে রাখা দীর্ঘশ্বাসটা সশব্দে ছাড়ল গ্রে। সহজ কাজটা শেষ হয়েছে। এবার কঠিনটার দিকে চোখ ফেরানো যাক।

সকাল ৭:০৭

কোদালটা হাতে নিয়ে খোলা কবরের ভেতর বসে আছে মঙ্ক।

উপরদিক থেকে গুলির আওয়াজ হতেই বুঝল, তার কাজ হয়ে গেছে। হাতের কোদালে ভর করে দাঁড়িয়ে, বাইরের দিকে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করল টেকোমাথার সিগমা এজেন্ট। দেখতে চায়, বাইরে কী হচ্ছে। কিন্তু মাথা সোজা করতেই, অল্প একটুর জন্য বিশালাকায় ধাতব ফ্রন্টলোডারের সাথে বাড়ি খাওয়া থেকে বেঁচে গেল।

ব্যাকহো নিয়ে ফিরে এসেছে গ্রে। পেছনদিক থেকে মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

কবরের ভেতর ব্যাকহো-র ফ্রন্টলোডার নামিয়ে দিল সিগমা কমান্ডার। তারপর বন্ধুর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল। "উঠে এসো!"

আহত শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে ফ্রন্টলোডারের মধ্যকার গহ্বরে ঢুকে পড়ল মঙ্ক। পরক্ষণেই মাথার উপর দিয়ে একটা গুলি চলে গেল। লোকগুলোকে দমিয়ে রাখতে পারছে না শেইচান। লোডারের ভেতর গুটিশুটি মেরে বসার চেষ্টা করতেই মঙ্কের কোমরে কিছু একটার খোঁচা লাগল। ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেল, বন্ধুরা তার জন্য লোডারে করে একটা অ্যাসল্ট রাইফেল পাঠিয়েছে।

যাহ শালা...জন্মদিন ছাড়াই এমন উপহার!

সকাল ৭:০৮

মঙ্কের জন্য লোডারের ভেতর একটা রাইফেল রেখে, সরাইখানার দিকে ছুট লাগিয়েছে শেইচান। কেবিনগুলো তার আর হামলাকারীদের মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে সে খুব ভালো করেই জানে, খুব তাড়াতাড়ি দুই পাশ থেকে বেরিয়ে আসবে লোকগুলো।

দৌড়ানোর মাঝেই, বাইরের দিকের কেবিনের জানালা লক্ষ্য করে পরপর তিনটা গুলি করল শেইচান। কাচের ফ্রেমে নিখুঁত একটা ত্রিভূজ গঠন করেছে বুলেটগুলো। কাছাকাছি পৌছে লাথি মেরে কাচটা ভেঙে ফেলল সে, তারপর শরীর গলিয়ে দিল কেবিনের ভেতর।

স্থির হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই উল্টোদিকের জানালায় একটা মাথা দেখা গেল...হামলাকারী কমান্ডো। রাইফেল তাক করে ট্রিগার টিপল শেইচান।

পপ...লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

গুলি করেই সাথে সাথে শরীর গড়িয়ে দিয়েছে সে, একটা পুরনো স্টোভের আড়ালে চলে গিয়ে তবেই থামল। ভেতরদিকের জানালা দিয়ে রাইফেলধরা একটা হাত উঁকি দিল। এক মুহূর্ত সময় নিয়ে হাত বরাবর নিচে নিশানা করল শেইচান, দম আটকে টিপে দিল ট্রিগার। কাঠের দেয়াল ফুঁড়ে লক্ষ্য আঘাত হানল বুলেট। একটা আর্তনাদের শব্দে বোঝা গেল, পটল তুলেছে রাইফেলধারী।

এক মুহূর্ত পর, কেবিনের জানালা গলে একটা গ্রেনেড ঢুকে পড়ল।

আঁতকে উঠল শেইচান। দেখা যাচ্ছে, শত্রুপক্ষ বেশ ভালো স্বাগতমের ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সকাল ৭:০৯

ব্যাকহো-র ফ্রন্টলোডার আর বাকেট নিয়ে যুঝতে যুঝতে, কেবিনের দিক থেকে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজে চমকে উঠল গ্রে।

শেইচান...না!

এক মুহূর্ত নীরবতার পর, কেবিনের দুই পাশ দিয়ে দু'জন কমান্ডো বেরিয়ে এল। কিন্তু তাদের জন্য অভ্যর্থনার ডালি সাজিয়ে বসে আছে মঙ্ক। লোডারের দুই দাঁতের ফাঁকে রাইফেল রেখে ধীরেসুস্থে নিশানা ঠিক করল সে।

পপ পপ...অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ।

পরক্ষণেই ব্যাকহো লক্ষ্য করে একটা গ্রেনেড উড়ে আসতে দেখা গেল। কিন্তু হামলাকারীরা জানে না, স্কীট শুটিং- এ মঙ্কের নিশানা কতখানি ভালো। রাইফেল ঘুরিয়ে উড়ন্ত গ্রেনেড লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল সিগমা এজেন্ট। গ্রেনেডের উপরের ধাতব ফ্রেমে আঘাত করল বুলেট। যেখান থেকে এসেছিল, গোত্তা খেয়ে সেই কেবিনের পেছনদিকেই ল্যান্ড করল জিনিসটা।

বুম...

এক মুহূর্ত দেরিতে, আরও কয়েকটা গুলির আওয়াজের পর কেবিনের জানালা গলে চিকন একটা অবয়ব বেরিয়ে আসতে দেখা গেল...শেইচান। হাত উঁচু করে পার্কের পার্কিং লটের দিকে ইশারা করল মেয়েটা। কিন্তু পালানোর কথা বোঝাচ্ছে না ও।

লটে পার্ক করে রাখা একটা হামভির পাশে আরেকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

মিচেল ওয়ালডর্ফ।

দরজা খুলে গাড়িতে ওঠা চেষ্টা করল ফোর্ট নক্সের বিশ্বাসঘাতক অফিসার ইনচার্জ। তবে মঙ্ক তার চেয়েও একধাপ এগিয়ে। গুলি করে গাড়িটার একটা টায়ার উড়িয়ে দিল সে। লোকটাকে জীবিত ধরতে পারলে গিল্ড সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।

ওয়ালডর্ফও ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে।

কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করে নিজের মাথার একপাশে তাক করল সে।

আঁতকে উঠে ব্যাকহো-র গিয়ার টেনে ধরল গ্রে। দৌড়াতে শুরু করেছে শেইচানও। তবে দু'জনেই বেশ ভালো করে বুঝতে পারছে, পার্কিং লট পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই খারাপ কিছু একটা ঘটে যাবে।

মুচকি হেসে তাদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল ওয়ালডর্ফ: "খেলা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।"

পরক্ষণেই গর্জে উঠে আগুন বর্ষাল তার পিস্তল। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি লেগে ছিটকে গেছে লোকটার মাথার অর্ধেক অংশ। রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে নিজের রক্ত আর মগজে কংক্রিট ভিজিয়ে দিতে লাগল ফোর্ট নক্সের অফিসারের ছদ্মবেশধারী গিল্ড এজেন্ট।

লোকটার শেষ কথাটা যেন ঝড় বইয়ে দিতে লাগল গ্রে-র মাথার ভেতর। মরার আগে কি বোঝাতে চেয়েছে শুয়োরটা?

সকাল ৭:১৯

দশ মিনিট পর, পার্কিং লটে থাকা কমান্ডোদের দ্বিতীয় হামভিটা নিয়ে ন্যাটশেজ ট্রেস পার্কওয়ে ধরে ছুটতে দেখা গেল ওদের।

পেছনের সিটে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে মঙ্ক। কোমরের একপাশের ক্ষতটা পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে গ্রে। এখানে আসার আগেই আসন্ন রক্তারক্তির কথা মাথায় রেখেছিল কমান্ডোরা। অন্তত গাড়িতে রাখা ফার্স্ট এইড বক্স সেটাই প্রমাণ করছে। ব্যান্ডেজ আর সিরিঞ্জের পাশাপাশি বক্সে একটা মরফিনের অ্যাম্পুলও ছিল। বন্ধুর উরুতে ওষুধটা পুশ করে দিয়েছে সিগমা কমান্ডার। ব্যাথা কমে যেতেই ঘুম ঘুম ভাব নেমে এসেছে মঙ্কের দু'চোখে।

ড্রাইভ করছে শেইচান। পাশে বসে মহিষের চামড়ার টুকরোটা পরীক্ষা করছে গ্রে। ওখান থেকে পালাবার আগে জিনিসটা উদ্ধার করে আনতে ভোলেনি।

কালের আঁচড়ে জিনিসটা বিবর্ণ হয়ে গেলেও ভাঁজটা সহজেই খোলা গেল। ভেতরের অংশে একটা যুদ্ধের দৃশ্য আঁকা আছে। ঘোড়ায় চড়ে প্রতিপক্ষকে ধাওয়া করছে অশ্বারোহী সৈন্যরা। ঢাল বহন করছে কেউ কেউ। কারও হাতে আবার বর্শা। মাথার উপর দিয়ে উড়ছে তীরের সারি।

ক্যাটের মুখে শোনা পেইন্টারের রিপোর্টের কথা মনে করল গ্রে। টটসি'আন্টসউ পুটসিভদের নিদর্শন চুরি করার পর, আনাসাযিদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালানো হয়েছিল। হয়তো সেই দৃশ্যটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে।

তবে একটা বিরাট গলদ রয়ে গেছে। কোলের উপর ছড়ানো চামড়াটার মাঝ বরাবর চোখ ফেরাল গ্রে। মাঝখানের একটা অংশের ছবি কিছু দিয়ে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে। খসখসে হয়ে আছে জায়গাটা।

"মনে হচ্ছে, লুইস এখানকার দৃশ্যটুকু ঘষে তুলে ফেলেছিলেন," বলে উঠল গ্রে।

"কেন?" জানতে চাইল শেইচান।

"ফাঁকা জায়গাটুকুতে কিছু একটা লিখে রেখেছেন তিনি।"

গুলি খাওয়ার পর, নিজের রক্ত দিয়ে এই কাজটা করেছিলেন লুইস। সময়ের সাথে সাথে রক্তের দাগ শুকিয়ে গেলেও লেখাগুলো এখনও পড়া যাচ্ছে।

"তবে অর্থহীন লাইনগুলোর মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। হয়তো এগুলো কোনও কোড।"

এক সেকেন্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার রাস্তার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল শেইচান। "হেইসম্যান তো বলছিলেন, লুইস আর জেফারসন নিজেদের মধ্যে কোডের মাধমে যোগাযোগ করতেন।"

"হ্যাঁ," সায় দিল গ্রে।

জায়গাটার উপর হাত বুলাতে লাগল সিগমা কমান্ডার। মৃত্যুর আগে এটা কী লিখে গিয়েছেন লুইস? নিজের খুনির নাম? এখানে আগে কী ই বা আঁকা ছিল? রক্তের দাগের নিচে আবছাভাবে দৃশ্যটার কিছু অংশ বোঝা যাচ্ছে। পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে বয়ে চলা একটা নদীর একাংশ, অন্যপাশে একটা লেক...এটা কী ডেভিল কলোনীর অবস্থান নির্দেশ করছে? হতে পারে, ইন্ডিয়ান মানচিত্রটা শুধুমাত্র জায়গাটাকে চিহ্নিত করেছে। বিস্তারিত বর্ণনা এখানে আঁকা ছিল। হয়তো এই ছবিটা অনুসরণ করে লুকানো শহরটায় পৌছে গিয়েছিলেন তিনি। আদৌ পৌঁছাতে পেরেছিলেন তো?

সবকিছু মাথার ভেতর খাপে খাপে বসিয়ে নিল গ্রে। "আমার মতে, জেনারেল উইলকিনসন লুইসের কাছে থাকা সোনার প্লেটটার জন্যই তাকে খুন করেছিল। কিন্তু লোকটা এই চামড়ার টুকরোটার মাহাত্ম্য আন্দাজ করতে পারেনি। মরার আগে, এই মহামূল্যবান জিনিসটা শত্রুপক্ষের হাতে পড়তে দিতে চাননি লুইস। তাই দৃশ্যটা মুছে ফেলে একটা কোডেড মেসেজ লিখে রাখেন তিনি। তারপর নিজের দেহের দেহের আড়ালে লুকিয়ে রাখেন জিনিসটা।"

"লুকিয়ে রাখেন কেন?"

"হয়তো তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, একদিন কেউ না কেউ রহস্যটা সমাধান করতে আসবে। যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে, পেইন্টারের কোনও কাজে আসবে না জিনিসটা।"

কথা শেষ হতে না হতেই গ্রে-র ডিস্পোজেবল ফোন বেজে উঠল। ক্যাট কল করেছে।

"হ্যাঁ...ক্যাট, বল।"

অপর প্রান্তে দূর্বল শোনাচ্ছে মেয়েটার গলা, "মঙ্ক কী করছে?"

"বাচ্চার মতো ঘুমাচ্ছে।"

পার্ক থেকে রওনা হওয়ার পরপরই ফোন করে ক্যাটকে সবকিছু জানিয়েছিল গ্রে।

"কলাম্বিয়ার কাছে, একটা প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে তোমাদের জন্য একটা জেট অপেক্ষা করছে।"

ঠিকানাটা টুকে নিল গ্রে। "ঠিক আছে। আর কয়েক মিনিটের ভেতরই ওখানে পৌঁছে যাব আমরা। কিন্তু লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটা কী হবে? শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এখনও খুঁজছে নাকি আমাদের?"

"না। সবার নজর এখন ইয়েলোস্টোনের দিকে ঘুরে গেছে। তাছাড়া, তোমাদের ব্যাপারে একটা ইন্টেলিজেন্স ব্রিফিং করেছি আমি। সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, কীভাবে ওয়ালডর্ফ গোটা নাটকটা সাজিয়েছিল। এখন আর কোনও সমস্যা হবে না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো।"

"হুম। কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আমাদের লুইসের সমাধিতে আসার কথা ওয়ালডর্ফ জানল কীভাবে? যতদূর জানি- তুমি, কিউরেটর হেইসম্যান আর তার অ্যাসিস্টেন্ট শেরিন ছাড়া ব্যাপারটা কারও জানার কথা না।"

"ওদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি আমি। দু'জনেই ক্লিয়ার। অন্য কোনওভাবে ব্যাপারটা ওয়ালডর্ফের কানে গেছে। আর গিল্ডের হাত কতটুকু লম্বা, তা তো ভালো করেই জানা আছে তোমার।" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ক্যাট। "চামড়ার টুকরোটার কী হলো? জানতে পেরেছ কিছু?"

"না," জবাব দিল গ্রে। "মনে হচ্ছে, এবার পেইন্টারকে যা করার একাই করতে হবে।"

অধ্যায় ৩৯
১ জুন, ভোর ৫:২০
ফেয়ারিল্যান্ড বেসিন, ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক

গাছের সারির ভেতর দিয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে এগোচ্ছে কাই। পেছন পেছন তার ছায়াসঙ্গী হয়ে আসছে বিশালদেহী আফ্রিকান আশান্দা। ছায়াসঙ্গী না হয়ে উপায়ই বা কী? দুজনের হাত যে এক ডোরে বাঁধা। হাতে আটকানো বোমার মতোই মহিলার উপস্থিতি ক্রমেই চিন্তিত করে তুলছে মেয়েটাকে।

কিন্তু আশান্দার মনের অবস্থাও উপলব্ধি করতে পারছে কাই। যা ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে, তাতে তো তার কোনও স্বার্থ নেই। রাফায়েল একটা ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে তাকে। সে নিজেও কী বন্দী নয়? তার হাতেও তো হ্যান্ডকাফ রয়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্য মহিলার নীরবতার জন্য তাকে বেশ ভালোই লাগে কাই-এর।

কিন্তু যতই ভালো লাগুক, হাতের বোমাটা সারাক্ষণ যেন পাথরের মতো তার বুকে চেপে আছে। প্রতিবার লাল আলো ঝলকানোর সাথে সাথে আঁকড়ে উঠছে বুকের ভেতরটা।

আর মাত্র এক ঘন্টা বাকি। সলের বাকি সবার মতো তাই পুটসিভদের আবাস খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে কাই। ঢালের সবগুলো প্রান্ত খুঁজে দেখার পর, খালি হাতে ফিরে এসেছে সৈন্যরা। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

হ্যাঙ্কের কথাটা অনেকক্ষণ যাবত তার মনের ভেতর খচখচ করছে।

যেদিকে তাকিয়ে আছে নেকড়ে আর ঈগল...

মানে কী?

এই নেকড়ে আর ঈগলকে কোথায় পাওয়া যাবে?

ভাবতে ভাবতে একটা কোন নজরে পড়তেই ব্যাপারটা ধরতে পারল কাই।

"প্রফেসর হ্যাঙ্ক! আঙ্কেল ক্রো!"

মেয়েটার চিৎকার শুনে ছুট লাগালেন দু'জনই।

"কী হয়েছে?"

সামনে থাকা ছয় ফুট লম্বা একটা কোনের দিকে ইঙ্গিত করল কাই। "উপরের প্রান্তটা দেখুন। দুইপাশে কীভাবে ছড়িয়ে আছে চওড়া পাথর। জিনিসটাকে কুকুরের দুটো কানের মতো মনে হচ্ছে না? সামনের দিকেও মুখের আকৃতির চোখা অংশ রয়েছে।"

"ঠিক বলেছ," হ্যাঙ্কের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস ফুটে উঠল। "নেকড়ে আর ঈগলের প্রতীক ইন্ডিয়ানদের মাঝে বেশ পরিচিত। এরকম আকৃতির পাথরেরই কথাই উল্লেখ করা ছিল মানচিত্রে।" বলে কোনটার উপরের অংশে হাত বুলালেন তিনি। "ধরে দেখুন।"

কুকুরের মাথার মতো আকৃতিটাতে হাত বুলালেন পেইন্টার। "কোনের মাথা কেটে এরকম আকৃতি দেয়া হয়েছে!"

"হ্যাঁ," সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। "তবে সময়ের সাথে সাথে নতুন খনিজ পদার্থ জমে ওটার উপর নতুন স্তর তৈরি করেছে, তাই পুরোপুরিভাবে নেকড়ের মাথার আকৃতিটা বোঝা যাচ্ছে না।"

এগিয়ে এলেন রাফায়েল। "এবার তাহলে ঈগলটা খুঁজে বের করতে হবে।"

আবার শুরু হলো খোঁজা। তবে এবার সাফল্য বেশ তাড়াতাড়িই ধরা দিল।

"এখানে," নেকড়ের মাথা ছাড়িয়ে খানিকটা সামনে থেকে চেঁচিয়ে উঠল জর্ডান।

ঘাড় ঘোরাতেই পেইন্টার দেখতে পেলেন, একটা ভাঙা পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। কিন্তু পাথরটাকে কোনওভাবেই ঈগলের আকৃতির সাথে মেলানো যাচ্ছে না।

"এই যে, এখানে," বলে পাথরটার নিচের দিকে ইঙ্গিত করল জর্ডান। "পাথরের একাংশ ভেঙে পড়ায় আকৃতিটা বোঝা যাচ্ছে না," বলে নিচে পড়ে থাকা একখন্ড পাথর তুলে উপরের পাথরটার মাথায় বসিয়ে দিল সে। এবার আবছাভাবে ডানা ছড়িয়ে থাকা একটা ঈগলের মাথার প্রতিকৃতি দেখা গেল।

"এটাই সেই দ্বিতীয় ল্যান্ডমার্ক," উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যাঙ্ক।

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল কাই আর জর্ডান। দু'জনের ঠোঁটেই মুচকি হাসি। কেউ মুখে কিছু না বললেও, নিশ্চুপ কথোপকথনটা ঠিকই ধরতে পারলেন প্রফেসর।

আমরা দু'জনেই একটা একটা করে ল্যান্ডমার্ক খুঁজে পেয়েছি...

নেকড়ের মাথার কোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কাই, জর্ডানকেও ঈগলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইশারা করল। তারপর প্রাণী দুটোর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে, সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল দু'জন। পায়ে পায়ে একটা কোণ গঠন করে পরস্পরের দিকে এগোতে লাগল ছেলেমেয়ে দুটো।

প্রায় চল্লিশ পা হাঁটার পর অবশেষে তাদের পথ একে অন্যকে অতিক্রম করল। সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, প্রায় চার ফুট লম্বা আর তিন ফুট মোটা আরেকটা কোনের সামনে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে পথটা। জিনিসটা দেখতে আর দশটা সাধারণ মাশরুম আকৃতির কোনের মতো।

"কিছুই বুঝলাম না," বলে উঠলেন রাফায়েল।

সবার আগে নড়ে উঠল শিন। এগিয়ে গিয়ে চারদিক থেকে কোনটা পরীক্ষা করল সিগমা ভূতাত্ত্বিক। "অন্যান্য কোনগুলোর মতোই দেখতে..." বলে একহাতে জিনিসটা স্পর্শ করল সে। "কিন্তু এটা কাঁপছে না। সাধারণত এমনটা দেখা যায় না। নিষ্ক্রিয় গিজার কোনগুলোর গায়েও মৃদু কম্পন অনুভূত হওয়ার কথা।"

"মানে?" জিজ্ঞেস করল কাই।

"মানে, এটা প্রাকৃতিক না... নকল।"

ভোর ৫:৩৮

"জিনিসটাকে উড়িয়ে দেয়া যাক," প্রস্তাব করল কোয়ালস্কি।

"মনে হচ্ছে, সেটাই করতে হবে," জবাব দিলেন পেইন্টার। "তবে হ্যাঙ্ক আর আগে শিন দেখুক, অন্য কোনও উপায় বের করা যায় কিনা। ভালো কথা, তোমার কাছে সি-ফোর আছে তো?"

এখানে রওনা হওয়ার আগে পেইন্টার আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, তাদের হয়ত কোনও গুহা কিংবা টানেল ভেঙে পথ করে নিতে হতে পারে। তাই সিগমার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞকে সাথে করে কিছুটা সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ নিয়ে আসতে বলেছিলেন তিনি।

"আছে অল্প একটু," জবাব দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল কোয়ালস্কি। তারপর তার হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ডাস্টার জ্যাকেটের জিপার খুলে মেলে ধরতেই দেখা গেল, ভেতরে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দলা দলা সি-ফোর আটকানো আছে।

"এটুকু তোমার কাছে অল্প বলে মনে হচ্ছে?" আঁতকে উঠলেন পেইন্টার।

শ্রাগ করল বিশালদেহী লোকটা। "আরও লাগবে নাকি?"

কোনটা পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন হ্যাঙ্ক আর শিন। "মনে হচ্ছে, পাথরটা আলগা করে টানেলের মুখে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কয়েকজন মিলে হয়তো ওঠানো যাবে। জিনিসটা বেড় দিয়ে ধরার জন্য কমপক্ষে চারজন শক্তসমর্থ লোক লাগবে।"

কোয়ালস্কি, মেজর রায়ান, বার্ন আর শিন এগিয়ে এল। হাঁটু গেড়ে বসে পাথরটার চারপাশে হাত ছড়িয়ে দিল তারা। তারপর আঁকড়ে ধরল একে অন্যের হাতের কবজি। এক...দুই...তিন গোনার সাথে সাথে পাথরটাকে বেড় দিয়ে ধরে, একসাথে টান শুরু করল সবাই। এক মুহূর্ত পর কর্কশ শব্দের সাথে সাথে একটু নড়ে উঠল জিনিসটা। টান আরেকটু বাড়াতেই মাটি থেকে উপড়ে উঠে এল।

এগিয়ে এলেন পেইন্টার। "পাথরের গোড়ায় ওগুলো কী সোনা নাকি?"

"হ্যাঁ," সায় দিলেন হ্যাঙ্ক। "সোনার প্রলেপ দিয়ে ছিদ্রের মুখের ফাঁকফোকর আটকে রাখা হয়েছিল।"

ছিদ্রের ভেতর উঁকি দিল কোয়ালস্কি। "চলুন বস, দেখা যাক, ভেতরে আর কী কী গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছে ব্যাটারা।"

ভোর ৫:৪৫

পেইন্টারের পেছন পেছন ছিদ্র গলে নিচে নেমে এলেন হ্যাঙ্ক। গর্তটা প্রায় চার ফুটের মতো গভীর। কিন্তু ক্রমেই নিচু হয়ে সামনে এগিয়েছে একটা টানেল। ভেতরের বাতাস বেশ গরম, সেই সাথে সালফারের কড়া গন্ধ।

একটা ফ্ল্যাশলাইট হাতে নিয়ে সবার আগে আগে চললেন পেইন্টার। একে একে তাকে অনুসরণ করতে লাগল হ্যাঙ্ক, শিন আর কোয়ালস্কি। তাদের পেছনে রাফায়েল, আশান্দা আর বার্নের দলের দু'জন লোক। আশান্দার সাথে হাত বাঁধা থাকায় কাই-কেও আসতে হয়েছে।

কাউচ, জর্ডান, মেজর রায়ান আর বার্নসহ বাকি সৈনিকরা উপরেই রয়ে গেছে।

সামনে বাড়ার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে আরও নিচু হয়ে আসছে টানেলটা। সেই সাথে বাড়ছে উত্তাপের পরিমাণ। টানেলের পাথুরে দেয়ালে হাত বুলালেন হ্যাঙ্ক। বেশ গরম বোধ হলো।

আর কয়েক মিনিট পর প্রফেসরের মনে হতে লাগল, তা পক্ষে আর সামনে এগোনো সম্ভব না। সালফারের ঝাঁজে গলা, বুক সব যেন জ্বলে যাচ্ছে।

আর কতদূর যেতে হবে?

এক মুহূর্ত পর তার নীরব প্রশ্নের জবাব দিলেন পেইন্টার। "পৌছে গেছি বলে মনে হচ্ছে।"

খানিকটা সামনে সরু হয়ে এসেছে টানেল, সেই সাথে মোড় নিয়ে ঘুরেও গেছে।

দম আটকে ফাঁকটা গলে ঢুকে পড়লেন সিগমা ডিরেক্টর। পরক্ষণেই তার বিস্ময়সূচক গলা শুনতে পেলেন হ্যাঙ্ক। তাড়াতাড়ি ফাটলে ঢুকে পড়লেন তিনিও, সাথে সাথে ভেতরের দৃশ্য দেখে চোখ কপালে উঠে গেল তার।

পেছন পেছন পৌছে গেছে বাকি সবাই। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে এল সামনের দৃশ্য।

"মাই গড!" আঁতকে উঠলেন রাফায়েল।

কোয়ালস্কিকেও বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে শোনা গেল। তবে পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও পেইন্টার নিশ্চিত, ওটা কোনও একটা খিস্তিই হবে।

শত শত মমি হয়ে যাওয়া মৃতদেহ গুহার মেঝেতে বিছিয়ে আছে। আর গুহাটাকেও সাধারণ গুহা বললে ভুল হবে, প্রায় সাততলা বিল্ডিং এঁটে যাওয়ার মতো বিশাল ওটা। চাকার কেন্দ্রকে ঘিরে যেভাবে চারদিকের স্পোক সাজানো থাকে, তেমনিভাবে মাঝখানে একটা মন্দিরকে ঘিরে সার বেঁধে শুয়ে আছে লাশগুলো।

কি বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাওয়া হ্যাঙ্ক। উটাহ- এর গুহায় থাকা মমিগুলোর মতো, এই লোকগুলোর পরনেও নেটিভ আমেরিকান বেশভূষা...মাথায় পালক, হাড়ের তৈরি অলংকার, ঢোলা স্কার্ট, লেদার মোকাসিন ইত্যাদি। স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের তুলনায় গায়ের রঙ বেশ ফর্সা আর মাথার চুলও লালচে।

টটসি'আন্টসউ পুটসিভ...

সবার হাতেই ধাতব ছুরি দেখা যাচ্ছে। শুকনো হাতের হাড়ে লেপ্টে থাকায়, নিজেদের শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে হচ্ছে দামাস্কাস ইস্পাতে তৈরি অস্ত্রগুলোকে।

মৃত্যু...

নিজেদের অসাধারণ প্রতিভা, হারানো আলকেমির এক অপার রহস্যকে লুকিয়ে রাখার জন্যই প্রাণ দিয়েছে সবাই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্দিরটার দিকে তাকালেন হাঙ্ক। পাথরের স্ল্যাব কুঁদে তৈরি কাঠামোটা প্রায় ছয়তলা সমান উঁচু, একেবারে সিলিং ছুঁইছুঁই করছে।

তিনি খুব ভালো করেই জানেন এটা কী।

অন্তত যেটার আদলে এই কাঠামোটা গড়ে উঠেছে সেটার ব্যাপারে জানা আছে তার।

বাইবেলে উল্লেখিত মাপগুলোও নিখুঁত বলে মনে হচ্ছে।

প্রশস্তে বিশ কিউবিটস, লম্বায় পঁয়ত্রিশ কিউবিটস।

মেঝে থেকে পাথরের স্ল্যাব জোড়া দিয়ে দিয়ে একটা বারান্দার মতো অংশ নির্মাণ করা হয়েছে। মূল প্রবেশপথটা ঘিরে আছে বোয়াজ আর জাশিন নামের দুটো পিলার। তবে বাইবেলে যেমনটা আছে, পিতলের পরিবর্তে এখানকার পিলার দুটো খাঁটি সোনার তৈরি। মন্দিরের সামনে বসানো বিশালাকায় বোলটার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

সোনালি গোলাকৃতি কাঠামোটা নয় ফুট উঁচু, প্রশস্তে তার দ্বিগুণ। বারোটা ষাঁড়ের পিঠে বসে আছে পুরো জিনিসটা। বোলটার নিচে, মেঝের একটা ছিদ্র থেকে ক্রমাগত গলগল করে বাষ্প আর ফুটন্ত পানি বেরিয়ে, অর্ধবৃত্তাকার কাঠামোটাকে চুমু খেয়ে আবার আরেকটা ফাটলে ঢুকে যাচ্ছে।

পেইন্টারকে বেশ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।

"এবার বিশ্বাস হলো তো আমার কথা?" জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঙ্ক।

"আমি যা ভাবছি, এটা কি ওই জিনিসটাই? বিড়বিড় করলেন সিগমা ডিরেক্টর।

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে সায় দিলেন প্রফেসর। "এটাই সেই সলোমনের মন্দির।"

অধ্যায় ৪০
১ জুন, ভোর ৫:৫০
ফেয়ারিল্যান্ড বেসিনের গভীরে, ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক

কমবয়সী ছেলেমেয়েদের খুব একটা পছন্দ করেন না মেজর রায়ান।

"এখানে চুপচাপ বসে থাক," জর্ডানের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন তিনি। "আর খেয়াল রাখবে, কুকুরটা যেন আমার প্যাকে প্রস্রাব না করে দেয়।"

শ্রাগ করল ছেলেটা।

উটে ইন্ডিয়ান গোত্রটার সাথে এমনিতেও ন্যাশনাল গার্ডদের সম্পর্ক খুব একটা ভালো না। উটাহ- এর পাহাড়ে সেই বিস্ফোরণের পর ইন্ডিয়ানদের আগ্রাসনের কথা এখনও ভোলেনি মেজর।

ছিদ্রটার প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বার্নের দিকে তাকালেন রায়ান। তার নিজের মতো, জার্মান লোকটার সাথেও এখন তিনজন সৈন্য আছে। অবশ্য, জর্ডান আর কুকুরটা হিসাবের বাইরে।

ঘাড় বাঁকা করে উপরদিকে তাকিয়ে আছে বার্ন। বিশেষভাবে তৈরি কতগুলো ব্লাস্ট বক্স বহন করে এনেছে তিনটা হেলিকপ্টার। পাইলটরা ইতিমধ্যে চারটা ক্রেট বেসিনের উপর নামিয়ে দিয়েছে।

ঘড়ির দিকে তাকালেন মেজর রায়ান। সময়সীমা পেরিয়ে যেতে আর মাত্র বিশ মিনিট বাকি। পরক্ষণেই তিনটা হেলিকপ্টারের রোটোরের আওয়াজের সাথে নতুন আরও দুটো যোগ হলো। সাথে সাথে বার্নের উপরদিকে তাকিয়ে থাকার মাহাত্ম্য বুঝতে পারলেন তিনি।

কী হচ্ছে এসব?

বেসিনের উপর পৌঁছেই, ভারী ট্রান্সপোর্ট কেবল নামিয়ে দিল নতুন আসা হেলিকপ্টার দুটো। এক মুহূর্ত পর, প্রতিটা কেবল বেয়ে কয়েকজন কমান্ডোকে নেমে আসতে দেখা গেল। বার্নের দলের লোকগুলোর মতোই, তাদের পরনে কালো বুলেটপ্রুফ ভেস্ট।

ধুশশালা...

গুলির আওয়াজ কানে আসতেই নড়ে উঠলেন রায়ান। রিফ্লেক্সই এ যাত্রায় তার প্রাণ বাঁচাল। নিচু হয়ে বসার ফাঁকে দেখতে পেলেন, বার্নের হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। তার দিকে একটা গুলি পাঠিয়েই পিস্তলের মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে জার্মান মার্সেনারী। আরেকটা গুলির আওয়াজের সাথে সাথে কপালে ফুটো নিয়ে ঢলে পড়ল একজন ন্যাশনাল গার্ড।

"কভার নাও!" চেঁচিয়ে উঠেই জর্ডানকে বসে থাকতে বলা বোল্ডারটার দিকে লাফ দিলেন মেজর। ততক্ষণে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে ছেলেটা। তার বাকি দুই সৈন্য- মার্শাল আর বয়েডসনও শরীর গুলির আওয়াজ শোনার সাথে সাথে শরীর গড়িয়ে দিয়েছে। একসাথে পাথরের বোল্ডারের আড়াল নিলেন তিনজন।

পাথরের ফাঁক দিয়ে সামনের বেসিনের দিকে নজর দিলেন মেজর। দুই হেলিকপ্টার থেকে আটজন আটজন করে মোট ষোলজন নতুন মার্সেনারী যোগ দিয়েছে বার্নের সাথে।

তার মানে, তিনজনের প্রতিপক্ষ এখন বিশজন।

খেলা হবে...

ভোর ৫:৫১

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন রাফায়েল।

এতক্ষণে হয়তো বার্ন উপরের এলাকা নিজের আওতায় নিয়ে নিয়েছে।

গুলির শব্দ শোনার জন্য কান পাতলেন তিনি, কিন্তু মাটি থেকে এতটা নিচে কোনও আওয়াজ আসার কথা না। তাছাড়া বিশালাকায় বোলের নিচে বইতে থাকা গরম পানির ঝর্ণা টগবগ করে ফুটছে। এই কারণেও হয়তো গুলির আওয়াজ চাপা পড়ে গিয়ে থাকতে পারে।

সোনার বোলটা অতিক্রম করল রোনাল্ড শিন। "ভূগর্ভস্থ ঝর্ণাটাকে মাটি খুঁড়ে এপর্যন্ত নিয়ে এসেছিল এখানকার অধিবাসীরা। তার মানে এই জায়গাটা, প্রাকৃতিক স্টিম ইঞ্জিনের একেবারে পাশেই অবস্থিত।"

তবে মুখে ঝর্ণা সম্পর্কে কথা বললেও, লোকটার নজর মন্দিরের প্রবেশপথের দিকে।

এটা কী আসলেই সলোমনের মন্দিরের প্রতিলিপি? ভাবলেন রাফায়েল। ব্যাপারটা ভেবে বেশ উত্তেজিত বোধ করলেন তিনি। কিন্তু পরক্ষণে আসন্ন বিপদটার কথা মনে পড়তেই, উত্তেজনাকে সরিয়ে বুকের ভেতর নিজের স্থান করে নিল হতাশা।

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে লেকচার দেয়ার ভঙ্গিতে মুখ খুললেন প্রফেসর হ্যাঙ্ক কানোশ, "সলোমনের মন্দির- জেরুজালেমের প্রথম ধর্মশালাও বলা হয় ওটাকে। জিয়ন পর্বতের চূড়ায় নির্মাণ করা হয়েছিল মন্দিরটা। ঐতিহাসিকদের মতে, যিশুখ্রিস্টের জন্মের চারশো সাল পূর্বপর্যন্ত স্বমহিমায় বহাল ছিল ধর্মীয় ওই স্থাপনা। তারপরই জেরুজালেমে হামলা করে অ্যাসাইরিয়ানরা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় ইজরায়েলের দশটা প্রাচীন গোত্র।"

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা মন্দিরের প্রবেশপথের দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রফেসর। "জায়গাটা ইজরায়েলীদের জন্য ধর্মশালার পাশাপাশি জ্ঞানেরও সংগ্রহশালা ছিল। রাজা সলোমনকে নিয়ে অনেক কল্পকাহিনি প্রচলিত আছে। বলা হয়ে থাকে,

অনেক রকম জাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু একজনের জাদুই তো আরেকজনের কাছে বিজ্ঞান।"

বারান্দা পেরিয়ে মূল মন্দিরের দিকে এগোলেন প্রফেসর। "খুব সম্ভবত, রাজা সলোমনের সহকারী হিসেবে কাজ করত টটসি'আন্টসউ পুটসিভদের পূর্বপুরুষরা। অ্যাসাইরিয়ানদের আগ্রাসনের পর নতুন পৃথিবীতে পা রাখে গোত্রের সবাই। আর এখানে নিজেদের ধর্মশালার একটা প্রতিকৃতি বানানোর পাশাপাশি, নিজেদের বিশেষ জ্ঞানও লুকিয়ে রাখে।"

প্রবেশপথ পেরিয়ে মন্দিরের ভেতর পা রাখলেন সবাই। প্রফেসরের লেকচার তখনও শেষ হয়নি, "প্রথম চেম্বারটার নাম হচ্ছে 'হেখাল' অর্থাৎ পবিত্র জায়গা।"

"কিন্তু এটা তো খালি," বলে উঠলেন পেইন্টার।

"হ্যাঁ," জবাব দিয়ে আরেকটা সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন হ্যাঙ্ক। "মন্দিরের সবচেয়ে গোপন অংশটা দেখতে চাইলে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হবে আমাদের। 'কোদেশ হাকোদাশিম' নামে নামে ডাকা হয় পরবর্তী চেম্বারটাকে। যার অর্থ হচ্ছে, পবিত্রের মাঝে পবিত্রতম। রাজা সলোমন ওখানেই 'আর্ক অফ দ্য কাভন্যান্ট' অর্থাৎ, ইজরায়েলীদের দশটা অনুজ্ঞা খোদাই করা ট্যাবলেট সম্বলিত সিন্দুকটা রাখতেন।"

সিঁড়ি পেরিয়ে পরবর্তী চেম্বারটার ভেতর পা রাখার সাথে সাথে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সবার মুখ। তিনতলা সমান উঁচু ঘরটার প্রতিটা দেয়াল নিরেট সোনায় মোড়ানো। ছোট ছোট সোনার প্লেটগুলোর মতোই বিচিত্র সব হরফ খোদাই করা সবগুলো দেয়ালে।

এগিয়ে গিয়ে, ডানা ছড়িয়ে থাকা দুটো মাথা ন্যাড়া ঈগলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন হ্যাঙ্ক। "আসল মন্দিরের এই জায়গাটায় দুজন ডানাওয়ালা দেবদূতের প্রতিকৃতি ছিল। কিন্তু এখানে তাদের বদলে ঈগলের মূর্তি শোভা পাচ্ছে।"

এগিয়ে এলেন পেইন্টারও। "জাতীয় সীলের ঈগলটাও ঠিক এরকমই দেখতে। কোনওভাবে কী এই জায়গাটার ছবি দেখতে পেয়েছিলেন জেফারসন?"

মাথা নাড়লেন প্রফেসর। যার অর্থ একটাই, জানি না। বিস্ময়ে যেন হতবাক হয়ে গেছেন তিনি।

সবার আগে বিস্ময় কাটিয়ে উঠলেন রাফায়েল। নিজের লোকদের সবগুলো দেয়ালের ছবি তুলে নিতে আদেশ করলেন তিনি। "এই অমূল্য জ্ঞান কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেয়া যাবে না।"

"কিন্তু ন্যানোটেক পদার্থগুলো কোথায়?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

"আমি কি জানি," জবাব দিলেন রাফায়েল।

ওই জিনিসগুলো এমনিতেই বিস্ফোরিত হতে চলেছে। তাই ওগুলো নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। রাফায়েলের আসল দরকার হচ্ছে, দেয়ালে খোদাই করা লেখাগুলো। এগিয়ে গিয়ে একপাশের দেয়ালে হাত বুলাতে লাগলেন তিনি। যে করেই হোক, এই অমূল্য জ্ঞান সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। এগুলোই তার পরিবারের জন্য প্রকৃত ব্লাডলাইনে ঢোকার পথ উন্মুক্ত করবে।

পেছনে কারও চেঁচিয়ে ওঠার আওয়াজ পেলেও, সেদিকে নজর দিলেন না রাফায়েল। ভবিষ্যতের মোহে পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন তিনি।

চেঁচিয়ে ওঠা কণ্ঠটা সিগমার ভূতাত্ত্বিক রোনাল্ড শিনের। "ডিরেক্টর, এখানে একটা দরজা আছে...সেই সাথে একটা মৃতদেহ।"

ভোর ৫:৫৫

পাথরের বোল্ডারের আড়ালে বসে, নিজেদের ছোট দুর্গটা রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মেজর অ্যাশলি রায়ান আর তার দুই সৈনিক। গোটা উপত্যকাটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পজিশন নিয়েছে বার্নের লোকেরা। এমন অবস্থায় বাড়তি অ্যামুনিশন ভরা নিজেদের ব্যাগের কাছেও পৌঁছাতে পারছে না কেউ।

একপাশ থেকে কাউচের গর্জে ওঠার আওয়াজ পেলেন মেজর। ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলেন, পায়ে পায়ে তার শিবিরের বেশ কাছে চলে এসেছিল বার্নের চার কমান্ডো। কুকুরটা সতর্ক না করলে হয়তো, এক মুহূর্ত পরই লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হত সবাইকে।

পাথরের ফাঁক থেকে বের করে রাইফেলের মাজলটা শত্রুদের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন রায়ান। দুই গুলিতে লুটিয়ে পড়ল দুই কমান্ডো। কিন্তু বাকি দুই সৈন্য ততক্ষণে কুকুরটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে। পায়ে বুলেটের আঘাত পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল কাউচ।

শুয়োরের বাচ্চা...

রায়ান নিশানা ঠিক করার আগেই দৃশ্যপটে যোগ দিল মার্শাল আর বয়েডসন। ভাগাভাগি করে দুই কমান্ডোকে শুইয়ে ফেলল দু'জন।

কিন্তু নতুন আরেকটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

"গুলি শেষ," বলে উঠল বয়েডসন।

সঙ্গীর কথা শুনে নিজের অস্ত্র চেক করল মার্শাল। "আমারও আর এক রাউন্ড বাকি।"

রায়ানের নিজের অবস্থাও খুব একটা সুবিধার না।

প্রতিপক্ষের গুলি প্রায় ফুরিয়ে আসার ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে বার্ন। তার দলের এখনও পনেরোজন জীবিত আছে। সেই সাথে, প্রত্যেকের কাছে আর্মার্ড ভেস্ট আর যথেষ্ট পরিমাণ গোলাবারুদও রয়েছে।

এক মুহূর্ত পর, হাত তুলে নিজের লোকদেরকে প্রতিপক্ষের ছোট দুর্গটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল জার্মান মার্সেনারী।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নিজের রাইফেলের স্কোপে চোখ রাখলেন মেজর।

আসুক শালারা...

সকাল ৯:৫৬

টোকিও, জাপান

জাপানি এসপিওনাজ সংস্থার কভার- পাবলিক সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর একটা কার্যালয়ের কম্পিউটার রুমে বসে আছে ড. রিকু তানাকা। জেনিস কুপারের একটা হাত আঁকড়ে ধরে রেখেছে সে।

সুপার ক্যামিওকান্দে ডিটেক্টরের বিশাল ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর, একবারের জন্যও মেয়েটার হাত ছাড়েনি জাপানি পদার্থবিদ। ব্যাপারটা তাকে মাথা ঠান্ডা রেখে ভাবতে যাহায্য করছে।

অবশেষে আরও কয়েকটা নিউট্রিনো ফ্যাসিলিটির রিপোর্ট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে ওরা। সবগুলো রিপোর্টের রিডিং একটা সফটওয়ারে সাজিয়ে দিয়েছে রিকু। এবার একেবারে কাঁটায় কাঁটায়, আমেরিকার নিউট্রিনো আলোড়নের উৎসটা বিস্ফোরিত হওয়ার প্রকৃত সময় বের করা যাবে।

একটা বিপ আওয়াজ তাকে জানিয়ে দিল, নিজের কাজ শেষ করেছে সফটওয়্যার।

স্ক্রিনে চলে এসেছে ফলাফল।

সংখ্যাগুলোর দিকে এক পলক তাকিয়েই, আরও শক্ত করে কুপারের হাত চেপে ধরল জাপানি পদার্থবিদ।

"হে ঈশ্বর!"

ভোর ৫:৫৬
ফেয়ারিল্যান্ড বেসিনের গভীরে, ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক

মৃতদেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন পেইন্টার।

বুকের উপর হাত আড়াআড়ি করে ধরে, একটা বাইসনের চামড়ায় শুয়ে আছে মমি হয়ে যাওয়া লাশটা।

বাইরের মানুষগুলোর মতো এই লোকটার পরনেও নেটিভ আমেরিকান পরিচ্ছদ। ঘাড় পেঁচিয়ে রেখেছে সাদা ঈগলের পালকে তৈরি নেকলেস, মাথার খুলিতে কয়েকগাছি ধূসর চুলের ফাঁকে গোঁজা কয়েকটা শুকিয়ে যাওয়া ফুল বলে দিচ্ছে, অনেক অনেক বছর আগে কেউ যত্নের সাথে যথাস্থানে সাজিয়ে রেখেছিল জিনিসগুলোকে। লাশটার কাঁধে জড়িয়ে রাখা হয়েছে ফুটকিওয়ালা একটা চাদর।

এই লোকটা বাকিদের মতো আত্মহত্যা করেনি। স্বাভাবিক মৃত্যুর পর, পুটসিভরাই নিজেদের পবিত্রের চেয়েও পবিত্রতম জায়গায় এনে রেখে গিয়েছিল তার লাশ।

মানুষটার পরিচয় আন্দাজ করতে পেরেছেন পেইন্টার।

লাশটার এক হাতে ফ্রেঞ্চ ফ্লেউর-ডে-লিস মনোগ্রাম আঁকা, রূপালি মাথাওয়ালা একটা লাঠি শোভা পাচ্ছে। আরেক হাতে চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা একট ডায়েরী আঁকড়ে ধরে রাখা।

ইনিই সেই বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ অভিযাত্রী- আরচার্ড ফোরটেস্কু।

ডায়েরীটা পড়া ছাড়াই পেইন্টার আন্দাজ করতে পারলেন, লুইস আর ক্লার্কের চলে যাওয়ার পর এখানে থেকে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। ইন্ডিয়ানদের সাথে থাকতে থাকতে, নিজেও তাদের অংশ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মৃতদেহ সাজিয়ে রাখার পদ্ধতি দেখে মনে হচ্ছে, স্থানীয়রাও তাকে নিজেদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।

ঘুরে দাঁড়ালেন পেইন্টার। "শান্তিতে ঘুমাও, বন্ধু। অবশেষে তোমার অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন করতে পেরেছি আমরা।"

ততক্ষণে পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেছে শিন। চেঁচিয়ে উঠল সে, "ডিরেক্টর, এখনই আপনার এই ব্যাপারটা দেখা উচিত।"

ইজরায়েলীদের পবিত্রের চেয়েও পবিত্রতম চেম্বারের পাশের দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন পেইন্টার। পেছন পেছন হ্যাঙ্ক আর কোয়ালস্কিও তাকে অনুসরণ করল।

সদ্য আবিষ্কৃত ঘরটার ভেতরের দৃশ্য দেখে আরও একবার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন সবাই।

"মন্দিরের ধনভান্ডার এটা," বলে উঠলেন হ্যাঙ্ক।

কিন্তু কোয়ালস্কির পরবর্তী কথাটাই জায়গাটাকে আরও ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করল।

"এবার মরেছি!"

ভোর ৫:৫৭

রাইফেলের স্টক কাঁধে রেখে স্থির হয়ে বসে আছেন মেজর রায়ান। স্কোপে চোখ, লক্ষ্যবস্তু- প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জার্মান মার্সেনারী বার্ন। হাত উঁচু করে নিজের লোকদের সবাইকে একসাথে আক্রমণে যেতে ইঙ্গিত করেছে লোকটা।

"মেজর?" ডেকে উঠল মার্শাল।

কিন্তু এখন অন্য কোনওদিকে কান দেয়ার সময় নেই রায়ানের। পাশে বসে থাকা বয়েডসনের হাতে একটা ছুরি বেরিয়ে এসেছে। গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার পর এখন এটাই তার একমাত্র অস্ত্র।

নিজের লোকদের কথা ভাবলেন মেজর। দু'জনের বয়সই সবেমাত্র বিশের কোঠা পেরিয়েছে। বয়েডসনের ঘরে স্ত্রীর পাশাপাশি একটা ছোট বাচ্চা আছে। আর অল্প কিছুদিনের ভেতর গার্লফ্রেন্ডকে প্রপোজ করতে চলেছে মার্শাল, আংটিও কিনে রেখেছে। যে করেই হোক, তরুণ ছেলেগুলোকে বাঁচাতে হবে তার।

ঠান্ডা মাথায় বার্নের হাতের দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছেন রায়ান। আর্মার ভেস্ট পরনে থাকায়, মাথা ছাড়া শরীরের অন্য কোথাও গুলি করে সুবিধা করা যাবে না। তাই চুপচাপ লোকটার মাথা স্কোপের আওতায় আসার অপেক্ষা করছেন তিনি।

চলে এসো...চলে এসো...এই তো নড়ে উঠেছে হাতটা...

কিন্তু পরক্ষণেই নিজের গলা আঁকড়ে ধরল বার্ন। ঝাঁকি খেতে লাগল জার্মান মার্সেনারীর গোটা শরীর। স্কোপ থেকে চোখ সরাতেই রায়ান দেখতে পেলেন, হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়েছে লোকটা। গলা ফুঁড়ে ঢুকে গেছে একটা তীর।

সাথে সাথে গোটা উপত্যকা জুড়ে তীক্ষ্ম শিষের আওয়াজ শোনা গেল। পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল শব্দগুলো। নিজে অজান্তেই শিউরে উঠলেন মেজর।

পেছনে কারও পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ঘোরালেন রায়ান। জর্ডানকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ছেলেটার কাপড়চোপড় আর চোখেমুখে বিধ্বস্ত একটা ভাব। অর্থাৎ, এতক্ষণ এখানে ছিলই না সে। জর্ডানের সাথে পাল্লা দিয়ে যেন এগিয়ে আসছে শিষের আওয়াজগুলো।

"গাছের ফাঁক দিয়ে কারা যেন আসছে," চেঁচিয়ে উঠল মার্শাল। "চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে গোটা বেসিন।"

"দেরি করার জন্য দুঃখিত," একেবারে কাছে জলে এসেছে জর্ডান। "আসলে গোটা উপত্যকাটা ঘিরে ফেলার আগপর্যন্ত কারও চোখে পড়তে চাইনি আমরা।"

আমরা?

চিৎকার শুনে সামনের দিকে চোখ ফেরালেন মেজর। দলপতির মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে বার্নের কমান্ডোরা। পাথর, গাছ ইত্যাদির আড়ালে আশ্রয় নেয়ার জন্য ছুট লাগিয়েছে সবাই। কিন্তু শেষরক্ষা হচ্ছে না। চারদিক থেকে তীর ছুটে আসছে হতভাগ্য লোকগুলোর দিকে। কেউ জঙ্গলের উদ্দেশ্যে একটা গুলি পাঠালে, জবাবে তিনটা গুলি ধেয়ে আসছে। গাছ থেকে আপেল পাড়ার মতো টপাটপ লোকগুলোকে শুইয়ে ফেলছে অজ্ঞাতনামা হামলাকারীরা।

একেবারে কাছে চলে আসায়, গাছের ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে ছুটে চলা অবয়বগুলোকে দেখতে পেলেন মেজর রায়ান। কারও পরনে মিলিটারিদের পোশাক, কারও গায়ে শুধু জিন্স, টিশার্ট।

তবে একটা বিষয় সবার ক্ষেত্রেই এক।

ওরা সবাই নেটিভ আমেরিকান।

নিশ্চিত যুদ্ধজয়ের আমেজ পেলেও মার্শাল আর বয়েডসনের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন রায়ান। ঝুঁকি নেয়ার কোনও মানে হয় না। "আমাদের প্যাকগুলো নিয়ে এসো।"

ব্যাখ্যা করল জর্ডান, "এখানে আসার আগেই, হ্যাঙ্ক আর আমাকে কিছু বিশ্বাসী ইন্ডিয়ান যোদ্ধা যোগাড় করতে বলেছিলেন পেইন্টার। সেই সাথে, সবার জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থাও করেছিলেন। ইয়েলোস্টোনের আসার আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ফ্রেঞ্চ লোকটাকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না।"

সিগমা ডিরেক্টরের দূরদৃষ্টি বুঝতে পেরে অবাক হয়ে গেলেন মেজর।

বলে চলেছে ছেলেটা, "চুপিচুপি উপত্যকার প্রান্তে এসে অপেক্ষা করছিল আমাদের লোকেরা। আর বুঝতেই পারছেন, কীভাবে গাছের ছায়ায় লুকিয়ে থাকতে হয়, তা

নেটিভ আমেরিকানদের চেয়ে ভালো আর কে জানবে। আক্রমণ শুরু হওয়ার পরপরই ওদেরকে সিগন্যাল দেয়ার জন্য পিছিয়ে গিয়েছিলাম আমি।"

"ক্রো আমাকে আগে কেন ব্যাপারটা জানালেন না? তাহলে আমি বাড়তি ন্যাশনাল গার্ডের ব্যবস্থা করতে পারতাম।"

মাথা নাড়ল জর্ডান। "তা সঠিক বলতে পারব না। তবে সরকারি লোকদের ভেতর নাকি রাফায়েলের চর আছে। তাই হয়তো ন্যাশনাল গার্ডদের ব্যাপারটার সাথে জড়াতে চাননি পেইন্টার।"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মেজর।

কুকুরটার খোঁজে আশেপাশে তাকাতে লাগল জর্ডান। "কাউচ কোথায়?"

সাথে সাথে রায়ানের মনে পড়ল, গুলি খাওয়ার পর থেকে কুকুরটাকে আর দেখা যায়নি। কিছুক্ষণ আগেই নিজের জীবন বাজি রেখে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে কাউচ।

এক মুহূর্ত পর, ঘাসের ফাঁকে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকা দেহটা আবিষ্কার করল জর্ডান। "না!"

জবাবে মেজর কিছু বলে ওঠার আগেই, রেডিও হাতে তার দিকে এগিয়ে এল মার্শাল। "স্যার, ওয়াশিংটন থেকে কল এসেছে।"

রেডিওটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। "মেজর রায়ান বলছি।"

"স্যার, ওয়াশিংটন থেকে ক্যাপ্টেন ক্যাট ব্র্যায়ান্ট বলছি," মেয়েটার কণ্ঠস্বরে উদ্বিগ্নতা অনুভব করতে পারলেন মেজর। "পেইন্টার ক্রো কি আপনার সাথে আছেন?"

ছিদ্রটার দিকে তাকালেন মেজর। পাথরের নিচে রেডিও সিগন্যাল পাওয়া যাবে না। পেইন্টারকে কিছু জানাতে হলে কাউকে ওটার ভেতর যেতে হবে। "তার কাছে আমি পৌঁছাতে পারব, তবে কয়েক মিনিট সময় লাগবে।"

"হাতে একেবারেই সময় নেই। এখনই তার কাছে পৌঁছাতে হবে আপনাকে। তাকে বলবেন, জাপানি পদার্থবিদরা বিস্ফোরণের প্রকৃত সময় নির্ণয় করতে পেরেছে। ছয়টা পনেরো না, ছয়টা চারে বিস্ফোরিত হবে ডেভিল কলোনী।"

আঁতকে উঠে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন মেজর। "ছয়টা চার! তার মানে আর-মাত্র চার মিনিট বাকি!"

রেডিওটা নামিয়ে রেখে জর্ডানের দিকে ইশারা করলেন রায়ান। পেইন্টারের কাছে এখন এমন একজনকে পাঠাতে হবে, যাকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করবেন তিনি।

"ছেলে, আমাকে দেখাও কত দ্রুত ছুটতে পারো তুমি?"

সকাল ৬:০০

পুটসিভদের পবিত্রের চেয়েও পবিত্রতম চেম্বারের কুঠুরির ভেতর ফ্ল্যাশলাইট তাক করে রেখেছেন পেইন্টার।

তাকে তাকে অগণিত বিলুপ্ত প্রাণীর মাথার খুলি সাজানো আছে- ম্যাস্টোডোন, সেবার টুথড টাইগার, কেভ বিয়ার এমনকি ছোট আকারের ডাইনোসরের খুলিও দেখা গেল। সেই সাথে আছে ঢাকনার মুখে বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি খোদাই করা অগণিত সোনার পাত্র। স্পর্শ না করেই পেইন্টার বুঝতে পারলেন, সবগুলো পাত্র সেই রহস্যময় ন্যানোটেক পদার্থে ভর্তি।

"আর মাত্র পনেরো মিনিট আছে," বলে উঠল শিন। "সবগুলো সরাতে পারব না আমরা।"

"যতগুলো পারি, চেষ্টা করতে হবে," জবাব দিলেন পেইন্টার। "এতে অন্তত বিস্ফোরণের মাত্রা খানিকটা কমানো যাবে।"

এগিয়ে এল কোয়ালস্কি। "ব্লোটর্চ নিয়ে এলে কেমন হয়? সবকিছু পুড়িয়ে দেয়া যাবে।"

"না," মাথা নাড়ল শিন। "সেই সময় পাব না আমরা।"

"তাহলে উপত্যকার উপরে বোমা ফেললে?"

এই প্রস্তাবটাও নাকচ করে দিলেন পেইন্টার। "না। আমরা মাটির অনেক গভীরে আছি।"

"নিউক্লিয়ার অপশন?"

এবারও মাথা নাড়লেন পেইন্টার। "ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। এতে হয়তো আমরা যা রক্ষা করতে চাইছি, সেটাই ঘটে যাবে। সক্রিয় হয়ে উঠবে ঘুমন্ত সুপারভলক্যানো।"

খেঁকিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। "আরে তাহলে আঙুল চুষব নাকি?" কিছু একটা উপায় তো বের করতে হবে!"

এমন সময় একটা অবয়বকে ছুটে মন্দিরের ভেতর ঢুকতে দেখা গেল। ভেতরের দৃশ্য দেখে নিঃশ্বাস নেয়ার ফাঁকে খাবি খেতে লাগল মানুষটা।

এক পা এগিয়ে গেল কাই। "জর্ডান?"

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল ছেলেটা। হাঁপানোর ফাঁকে কোনওরকমে গলা দিয়ে বেরিয়ে এল কথাগুলো, "ওয়াশিংটন থেকে কল...সময়সীমা...কমে গেছে...ছয়টা চারে...বিস্ফোরণ... "

আঁতকে উঠলেন হাতঘড়ির দিকে তাকালেন পেইন্টার।

দুই মিনিট!

এখন করার মতো শুধু একটা কাজই আছে।

দরজার দিকে ইঙ্গিত করে চেঁচিয়ে উঠলেন সিগমা ডিরেক্টর। "দৌড়াও!"

অধ্যায় ৪১
১ জুন, সকাল ৬:০২
ফেয়ারিল্যান্ড বেসিনের গভীরে, ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক

দুই মিনিট...

মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামছে কাই। প্রতি পদে পদে মনে হচ্ছে, তার পক্ষে আর এগোনো সম্ভব না। কিন্তু পাশে দৌড়ে চলা জর্ডানের উপস্থিতি যেন তাকে শক্তি যোগাচ্ছে।

তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার আছে। হাত একসাথে আটকানো থাকায় কাই-এর পাশ ঘেঁষে দৌড়ে চলেছে আশান্দা। এখন সে পড়ে গেলেও আফ্রিকান মহিলা থামবে বলে মনে হয় না। হয়তো হাত ধরে টেনে তাকে হেঁচড়ে নিয়ে ছুটবে বিশালদেহী আফ্রিকান। তার পেছনে, দুই সৈন্য কাঁধে করে বয়ে আনছে রাফায়েলকে। সবার পেছনে ছুটছে কোয়ালস্কি।

সবার আগে আগে চলেছেন পেইন্টার আর রোনাল্ড শিন। দৌড়ানোর ফাঁকেই কিছু একটা বিড়বিড় করছেন দু'জন। সিগমার ভূতাত্ত্বিক মন্দিরের বাইরের বোলের নিচ দিয়ে বইতে থাকা ঝর্ণাটার দিকে ইশারা করতেই, মাথা নাড়লেন পেইন্টার।

কাই আন্দাজ করতে পারল, তাদের ভেতর কিছু একটা বোঝাপড়া হয়েছে। কিন্তু ওটা নিয়ে এখন তার মাথা না ঘামালেও চলবে। হাঁপানোর ফাঁকে মুখ খুলল সে। "কখনোই বিস্ফোরণের আগে উপরে পৌছাতে পারব না আমরা।"

মাথা নাড়ল জর্ডান। "টানেলের বাঁকটা বেশ সরু, ওটা পেরিয়ে ওপাশে যেতে পারলেই হবে হয়তো।"

নতুন একটা লক্ষ্য পেয়ে যেন গায়ে খানিকটা শক্তি ফিরে পেল কাই।

পেছনদিকে একটা আর্তনাদ শোনা যেতেই থমকে গেল আশান্দা। অনিচ্ছাসত্ত্বে হলেও, কাই-কেও দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সেই সাথে ঘুরে দাঁড়াল জর্ডানও।

পেছনের সিঁড়িতে রাফায়েল আর তার দুই সৈন্য জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। বোঝা কাঁধে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় হয়তো পা হড়কে পড়ে গেছে কেউ একজন। হাচড়েপাচড়ে উঠে দাঁড়াল এক কমান্ডো, এক মুহূর্ত ইতস্তত করেই ছুট লাগাল টানেল লক্ষ্য করে। অবাক হয়ে সঙ্গীকে দায়িত্ব ফেলে পালিয়ে যেতে দেখল আরেকজন। পরক্ষণে সামলে নিয়ে সেও দৌড় দিল।

চেঁচিয়ে উঠল জর্ডান, "কোথায় যাচ্ছ? সাহায্য কর আমাদের!"

শোরগোল শুনে থমকে দাঁড়িয়েছেন পেউন্টার আর শিন। হাত নেড়ে তাদের দিকে ইশারা করল কোয়ালস্কি। "আপনারা এগোন। একে আমি নিয়ে আসছি।"

সামনে এগিয়ে রাফায়েলকে কোলে তুলে নিল বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট। পরক্ষণেই আঁতকে উঠল। লোকটার সরু পা দুটো, ফোমের পুতুলের মতো নড়বড়ে হয়ে ঝুলছে।

"দয়া করুন," গুঙিয়ে উঠলেন রাফায়েল, একহাতে নিজের কোমরের একপাশ আঁকড়ে ধরেছেন। সম্ভবত ওখানেও হাড় আলগা হয়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই অন্য হাত তুলে সামনের দিকে ইশারা করলেন তিনি। "যান।"

আবারও দৌড় শুরু হলো।

পেছনের অবস্থা দেখার জন্য, খানিকটা এগিয়েই থেমে দাঁড়াচ্ছেন পেইন্টার আর শিন। বাকি সবাইও প্রাণপণে ছুটছে। কিন্তু নষ্ট হওয়া ওই অল্প একটু সময়ের মূল্যই এখন অনেক বেশি। হাতে আর এক মিনিটও নেই।

"এগোও!" জর্ডানের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল কাই।

"আমি তোমাকে ছাড়া যাচ্ছি না।"

"আরে বুদ্ধু, তাড়াতাড়ি ওপাশে যাও। নয়তো একসাথে ফাটল দিয়ে ঢুকতে পারব না আমরা। আমি চলে আসব। কথা দিলাম।"

এবার কথাটার অর্থ বুঝতে পেরেছে জর্ডান। ঝটকা মেরে সামনে বাড়ল সে।

কোয়ালস্কি প্রতি পা সামনে এগোনোর সাথে সাথে গুঙিয়ে উঠছেন রাফায়েল। ব্যাপারটা লক্ষ্য করল আশান্দা। কাই-কে সাথে নিয়ে পিছিয়ে গেল সে। তারপর আহত রাফায়েলকে নিজের কোলে নিয়ে, কোয়ালস্কিকে সামনে বাড়তে ইঙ্গিত করল।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সিগমার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। কিন্তু কাই-এর ইশারা পেতেই আবার দৌড় শুরু করল। এবার সবার গতিই খানিকটা বেড়েছে।

টানেলের বাঁকের মুখে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন পেইন্টার। সবাইকে দ্রুত এগোনোর জন্য তাড়া দিলেন তিনি। "তাড়াতাড়ি...বারো সেকেন্ড বাকি।"

টানেলের বাঁক গলে মুচড়ে ঢুকে গেল কোয়ালস্কি।

"তাড়াতাড়ি যাও," বলে আশান্দার দিকে ফিরলেন পেইন্টার। বুঝতে পারছেন, বোঝা কোলে নিয়ে ফাঁক দিয়ে ঢুকতে পারবে না আফ্রিকান মহিলা। কোল থেকে রাফায়েলকে কেড়ে নিয়ে টানেলের ওপাশে ছুঁড়ে দিলেন সিগমা ডিরেক্টর। কোয়ালস্কি যথাসম্ভব আস্তে করে তাকে লুফে নিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখলেও, আবারও হাড় ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল।

"সাত সেকেন্ড!"

কাই-এর দিকে ফিরলেন পেইন্টার। "যাও!"

"রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি," বলে পেছনে থাকা আশান্দার দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা।

"ছয়!"

নিজের ভুল বুঝতে পেরে, বাঁক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন পেইন্টার। কাইও তাকে অনুসরণ করল।

"পাঁচ!"
রাফায়েলের পাশে পৌঁছে গেলেন পেইন্টার। "তাড়াতাড়ি!"
"চার!"
এসে পড়েছে কাইও।
"তিন!"
এখন শুধু বিশালদেহী আফ্রিকান মহিলা বাকি।
"দুই!"
আশান্দার উদ্দেশে গুঙিয়ে উঠলেন রাফায়েল। "চলে এসো!"
এক মুহূর্ত চুপ করে ওপাশেই দাঁড়িয়ে রইল আশান্দা। বোবা ঠোঁটজোড়ায় ফুটে উঠেছে মুচকি হাসি।
"এক!"
পরক্ষণেই ফাঁক গলে ঢুকে গেল বিশালদেহী আফ্রিকান। নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে দাঁড়াল সবাইকে।
সাথে সাথে যেন তার পেছনে প্রলয় শুরু হল।

সকাল ৬:০৪

আঁতকে উঠে কাই-কে আড়াল করলেন পেইন্টার। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যেন তাদের পেছনে গোটা দুনিয়া ভেঙে পড়ছে। আশান্দার শরীরের আকৃতি ছাপিয়ে গুহায় ঝলসে উঠেছে অত্যুজ্জ্বল আলো।

ন্যানোটেক পদার্থগুলো ছড়িয়ে পড়ার দৃশ্যটা কল্পনা করলেন সিগমা কমান্ডার। উটাহ- এর বিস্ফোরণের ফুটেজটাও মনে করতে পারলেন তিনি। ওখানকার বিস্ফোরণে মাত্র একজন মারা গিয়েছিল। বেঁচে গিয়েছিল আশাপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সব সাংবাদিকরা। অর্থাৎ, বিস্ফোরণটা তেমন ক্ষতিকর না। আসল বিপদ তো এখন শুরু হতে চলেছে।
এক পা এগিয়ে এল কাই। "আশান্দা!"
নিস্তেজ ভঙ্গিতে টানেলের বাঁকে লেপ্টে আছে বিশালদেহী আফ্রিকান।
মাটিতে বসেই মহিলার দিকে হাত উঁচু করে দিয়েছেন রাফায়েল। "দয়া করে ওকে সাহায্য করুন।"
কাইকে পিছিয়ে যাওয়ার ইশারা করে নিজে সামনে এগোলেন পেইন্টার। সাবধানে আশান্দাকে ফাঁক থেকে বের করে এনে বসিয়ে দিলেন রাফায়েলের পাশে।
গুহার দিকে ফ্ল্যাশলাইট তাক করতেই দেখা গেল, এখনও নড়বড়ে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের কাঠামো। কিন্তু পরক্ষণেই চোখে সামনে যেন পুরো স্থাপনাটা মোমের মতো গলে যেতে শুরু করল। ধূলো হয়ে যেতে লাগল সোনার পিলার, সামনের বোলসহ বিশালাকায় বারান্দা।
টানেলের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলেন পেইন্টার।

"আমাদের সবাইকে বাঁচিয়েছে ও," বলে উঠল কাই।

পেইন্টার জানেন, শুধুমাত্র রাফায়েলকে বাঁচানোর জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছে আশান্দা। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এটা নিয়ে তর্ক করা যাবে না।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। "হ্যাঁ। আমাদের বাঁচিয়েছে ও।"

আস্তে আস্তে আফ্রিকান মহিলার পেছনদিকের কাপড়ের রঙ ঝাপসা হয়ে আসতে দেখলেন পেইন্টার। ছাইয়ের মতো ধূসর হয়ে আসছে কালো চামড়া। কয়েক সেকেন্ডের ভেতর ছোট ছোট সাদাটে বিন্দু তৈরি হলো সেখানে। তারপর বিন্দুগুলো আস্তে আস্তে ফেটে গিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত।

ন্যানোবট খেয়ে ফেলছে আশান্দার শরীর।

কিন্তু টানেলটাও বেশিক্ষণ নিরাপদ থাকবে না। ইতিমধ্যে ভেতরের গুহা গ্রাস করে নিয়ে, বাঁক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বিধ্বংসী ন্যানোবট।

"উটাহ- এর চেয়ে তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে এখানকার ন্যানো-নেস্ট," ঘোষণা করল শিন।

টানেলের মুখের দিকে ইঙ্গিত করলেন পেইন্টার। "কোয়ালস্কিকে নিয়ে যাও। কী করতে হবে, তা তো তোমার জানাই আছে।"

"হ্যাঁ," সায় দিয়ে টানেল ধরে ছুট লাগাল ভূতাত্ত্বিক। কোয়ালস্কিও তাকে অনুসরণ করল।

রাফায়েলের দিকে ফিরলেন পেইন্টার। "হ্যান্ডকাফের কোডটা দিন।"

কিন্তু ফ্রেঞ্চ লোকটাকে দেখে মনে হলো, কথাটা শুনতে পাননি তিনি। ছলছল চোখে আশান্দার দিকে তাকিয়ে আছে তার চোখদুটো। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকা মহিলার শরীর ঘিরে রক্তের একটা ছোটখাটো পুল তৈরি হয়েছে।

"আশান্দা, এটা কী করলে এটা তুমি?"

"রাফায়েল," গর্জে উঠলেন পেইন্টার। "হ্যান্ডকাফের কোডটা দিন!"

এবারও কথাটা শুনে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না রাফায়েল। কিন্তু নড়ে উঠল আশান্দা। কাঁপা কাঁপা হাত তুলে কাই-এর দিকে ইঙ্গিত করল সে।

মহিলার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে চুপ হয়ে গেলে পেইন্টার। জানেন, তাকে আর কিছু বলতে হবে না। রাফায়েলের পক্ষে এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করা সম্ভব না।

সকাল ৬:০৭

টানেলের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন রাফায়েল, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সরাসরি আশান্দার চোখের দিকে। সারাটা জীবন নিত্যনতুন আবিষ্কারের পেছনে নষ্ট করেছেন তিনি। ছুটে বেরিয়েছেন মরীচিকা লক্ষ্য করে। নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য সম্পূর্ণ তুচ্ছ বৈভব অর্জন করার জন্য বাজি রেখেছেন এই অমূল্য জীবন। আর পুরোটা সময় ধরে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আশান্দাকে ব্যবহার করে গেছেন।

কী লাভ হলো এসব করে?

নিজের দোষেই আজ অন্ধকার গুহায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে হচ্ছে তাকে।

"কী করলে তুমি, আশান্দা?" বিড়বিড় করে মহিলার মাথা নিজের কোলে তুলে নিলেন রাফায়েল।

"সাবধানে," সতর্ক করলেন পেইন্টার।

কিন্তু পাত্তা দিলেন না রাফায়েল। জানেন, তিনি নিজেও বেশিক্ষণ টিকবেন না। দুই পা কয়েক জায়গায় ভেঙেছে। সেই সাথে কোমরের হাড়ও আলগা হয়ে গেছে। পাঁজরের হাড় ভেঙে ক্রমাগত খোঁচা দিচ্ছে ফুসফুসে। নিঃশ্বাসের তালে তালে গলা বেয়ে রক্ত উঠে আসছে মুখে।

শেষবারের মতো তাই ভালোবাসার মানুষটাকে আলিঙ্গন করতে দোষ কী?

আলতো করে নিস্তেজ হয়ে আসা শরীরটা জড়িয়ে ধরলেন রাফায়েল।

অন্তিম ভালোবাসাটুকু উপলব্ধি করতে পেরেই হয়তো মৃদু নড়ে উঠল আশান্দা। মুচকি হাসি খেলে খেল কালো ঠোঁটজোড়ায়।

আবেশে বন্ধ হয়ে আসতে চাইল রাফায়েলের চোখদুটো।

আমার ভালোবাসা...

অনুভব করলেন, আশান্দার শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তে ভিজে যাচ্ছেন তিনি নিজেও। আলতো ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিতে চাইল আফ্রিকান মহিলা, এই অবস্থাতেও তাকে রক্ষা করতে চাইছে।

কিন্তু জবাবে আরও শক্ত করে আশান্দাকে জড়িয়ে ধরলেন রাফায়েল। কেউ আলাদা করতে পারবে না তাদের... এমনকি মৃত্যুও না।

পাশ থেকে জর্ডান ডেকে উঠতেই, পাঁচ সংখ্যার একটা পাসওয়ার্ড উচ্চারণ করলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড পর, মৃদু ক্লিক আওয়াজে হ্যান্ডকাফ খুলে হাতে হাত ধরে টানেল বেয়ে এগিয়ে যেতে দেখলেন দুটো আকৃতিকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথাটা আশান্দার মুখের উপর নামিয়ে আনলেন রাফায়েল। পরম তৃষ্ণায় এক হয়ে গেল দু'জোড়া ঠোঁট। পরক্ষণেই অনুভব করলেন তীক্ষ্ম একটা ব্যাথা ছড়িয়ে পড়ছে ঠোঁটে, হাতের তালুতে, বুকে। আশান্দার দেহ থেকে ন্যানোবটগুলো ছড়িয়ে পড়ছে তার শরীরে। চোখ বন্ধ করে কষ্টটা অনুভব করতে লাগলেন রাফায়েল। শূন্যতাকে দুরে ঠেলে এক অদ্ভুত প্রশান্তি জায়গা করে নিচ্ছে তার মনে।

হয়তো ব্যাথাটা পরম ভালোবাসার মানুষের শরীর থেকে আসছে বলেই এই অনুভূতি।

একটা কণ্ঠ শুনে ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলেন, এখনও পাশে দাঁড়িয়ে আছেন পেইন্টার ক্রো।

"আর কী চান, মনসিয়র ক্রো?" বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করলেন রাফায়েল।

হাঁটু গেড়ে তার সামনে এসে বসলেন সিগমা ডিরেক্টর, কণ্ঠে অসীম সাগরের নিস্তব্দতা। "কে আপনি?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথাটা দেয়ালে হেলান দিলেন রাফায়েল। শরীরে ন্যানোবট হামলা করলেও, অসীম ক্ষমতাশালী মগজটা এখনও কাজ করছে। "বুঝতে পেরেছি আপনি কি চান, মনসিয়র। তবে হতাশ করতে হচ্ছে আপনাকে। যাকে খুঁজছেন, সে আমি নই। তারা আমার পরিবারেরও কেউ না।"

সরাসরি পেইন্টারের চোখের দিকে তাকালেন মৃত্যুপথযাত্রী রাফায়েল। "ওদের নির্দিষ্ট কোনও নাম নেই, মনসিয়র ক্রো...কোনও নাম নেই।"

"ওদের সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি?

"বলছি।" একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রাফায়েলের গলা বেয়ে। "আমি জানি, আমেরিকার কিছু বনেদী পরিবার ষোড়শ শতাব্দীরও আগে থেকে এখনও পর্যন্ত টিকে আছে। কিন্তু ইউরোপে এমনও অনেক পরিবার আছে, যাদের ইতিহাস এদের চাইতেও কয়েকগুণ পুরনো। তবে হাতেগোনা বিশেষ কয়েকটা পরিবার আছে, যাদের ব্লাডলাইন অর্থাৎ রক্তধারা সেই যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্তত গুজব তাই বলে। ফ্রেঞ্চ ভাষায় 'ফ্যামিলিস ডে লেটয়লে' অর্থাৎ 'স্টার পরিবার' বলা হয় ওদের। সময়ের সাথে সাথে জ্ঞান, অর্থ, বৈভব, ঐশ্বর্য, খ্যাতি অর্জন করতে করতে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে সেই পরিবারগুলো। সবার অলক্ষে থাকলেও, প্রতিবার বিশ্বের ইতিহাস পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ওরা। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব ধরণের গোপন সংস্থার চাইতেও গোপন হিসেবে ধরা হয় ওদেরকে।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছেন পেইন্টার। আসলেই কি এতখানি প্রভাবশালী ওই গিল্ড?

বলে চলেছেন রাফায়েল, "সময়ের সাথে সাথে এখন একটা ব্লাডলাইন গঠন করেছে ওরা...প্রকৃত ব্লাডলাইন। নিজেদের শক্তি বজায় রাখার জন্য, মাঝে মাঝে আমাদের মতো বনেদী পরিবারগুলোর ভেতর থেকে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে ওই ব্লাডলাইন। ধাপে ধাপে কয়েকটা এচেলন-এর মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।"

"এচেলন?"

"ব্যাপারটাকে একটা র‍্যাঙ্কিং সিস্টেমের সাথে তুলনা করা যায়। ট্যাটুর মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যের গায়ে নিজেদের পদোন্নতির চিহ্ন রাখা হয়। প্রথম স্তরের চিহ্ন হচ্ছে চাঁদ আর তারা। দ্বিতীয় স্তর বোঝানোর জন্য ওই চাঁদ আর তারার চারদিকে চতুর্ভূজ আর ফ্রিম্যাসন কম্পাস এঁকে দেয়া হয়। সোনার পাত্রটা উদ্ধার করার সাথে সাথে তৃতীয় স্তরে পৌছে গিয়েছিলাম আমি। এই যে দেখুন।" বলে নিজের মাথার পেছনদিকের এক অংশের চুল সরিয়ে দিলেন রাফায়েল।

চিহ্নটা দেখার সাথে সাথে যেন পেইন্টারের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা একটা স্রোত নেমে গেল।

সবার মাঝখানে, চাঁদের ভেতর একটা পাঁচমুখী তারা...এগুলোকে ঘিরে রেখেছে একটা চতুর্ভূজ আর কম্পাস...আর তার বাইরে...
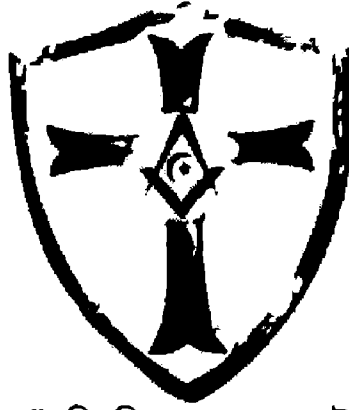
"নাইট টেম্পলারদের ঢাল," বিড়বিড় করলেন পেইন্টার। "আরেকটা গোপন সংঘ!"

"আরও আছে," যোগ করলেন রাফায়েল। "আগেই বলেছিলাম, এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব ধরণের গোপন সংস্থার চাইতেও গোপন আমরা। প্রকৃত ব্লাডলাইনের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু দেখুন, শেষরক্ষা করতে পারলাম না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন পেইন্টার। "কিন্তু এসবের শেষ কোথায়? আপনাদের উদ্দেশ্যই বা কী?"

"জনি না।" মাথা নাড়লেন রাফায়েল। "উত্তরটা আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে।"

উঠে দাঁড়িয়ে টানেলের মুখ লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করলেন পেইন্টার। কিছুটা সামনে এগিয়ে ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলেন, মৃতপ্রায় ভালোবাসার মানুষের ঠোঁটে শেষ চুম্বন এঁকে দিচ্ছেন মুমূর্ষ রাফায়েল সেইন্ট জার্মেইন।

অধ্যায় ৪২
১ জুন, সকাল ৬:২২
ফেয়ারিল্যান্ড বেসিন, ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক

দৌড়ে টানেল থেকে বেরিয়ে এলেন পেইন্টার ক্রো।

মাথার ভেতর ঝড় তুলেছে রাফায়েলের কথাগুলো। কিন্তু এখন তার চেয়েও বড় সমস্যা চেপে বসেছে ঘাড়ে।

যেভাবেই হোক, ন্যানো-নেস্টটা ধ্বংস করতে হবে।

মাটির নিচে থাকার সময়টুকুতে পুরোপুরি পাল্টে গেছে ফেয়ারিল্যান্ড বেসিনের চেহারা। উপস্থিত সবাইকে সরিয়ে নিচ্ছে হেলিকপ্টারের ঝাঁক। কিন্তু আসন্ন বিপদটা থামাতে না পারলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। মরতে হবে সবাইকে।

কাজ করতে থাকা শিন আর কোয়ালস্কির দিকে এগোলেন সিগমা ডিরেক্টর। একটা হেলিকপ্টার অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলেন, ভেতরে হ্যাঙ্কের পাশে, হাত ধরাধরি করে বসে আছে কাই আর জর্ডান। ঝুঁকে মেজর রায়ানের হাত থেকে কম্বলে মোড়ানো একটা ছোটখাট অবয়ব কোলে তুলে নিলেন প্রফেসর...কাউচের শরীর ওটা। হামলার পর মেডিক এসে কুকুরটার ক্ষত পরীক্ষা করে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে।

এক মুহূর্ত পর সবাইকে নিয়ে আকাশে উড়াল দিল যান্ত্রিক ফড়িং। দৌড়ে শিন আর কোয়ালস্কির সাথে যোগ দিলেন পেইন্টার। "তোমরা তৈরি?"

"প্রায় শেষ," জবাব দিল কোয়লস্কি। হাঁটু গেড়ে বসে এতোক্ষণ নিজের পোশাকে থাকা সি-ফোর এক্সপ্লোসিভের টুকরোগুলো একটা ব্লাস্টিং কর্ডে গাঁথছিল সিগমার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। "ব্যাপারটা অনেকটা মালা গাঁথার মতোই।"

শ্রাগ করলেন পেইন্টার। "ক্রিসমাসে কিন্তু তোমার বাড়িতে দাওয়াত দিও না আমাকে।"

কোয়ালস্কি আর আতসবাজি...দুয়ের মিশেলে কী ঘটতে পারে ভাবতেই সিগমা ডিরেক্টরের গলা শুকিয়ে এল।

জবাবে পাল্টা শ্রাগ করল বিশালদেহী লোকটা। "তা ঠিক আছে। তবে আপনার বাড়ির দরজা তো আমার জন্য সবসময়ই খোলা।"

পিচারস মাউন্ড নামের গিজারটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রোনাল্ড শিন। তার সামনে, মাটিতে কয়েকটা টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ আর স্যাটেলাইট রিপোর্ট ছড়িয়ে রাখা। "এটাই একেবারে উপযুক্ত জায়গা," ঘোষণা করল সিগমার ভূতাত্ত্বিক। "গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং স্যাটেলাইটের রিপোর্ট অনুযায়ী, এখানেই নিচের জিওথার্মাল ভেন্টের সবচেয়ে কাছাকাছি আছে আমাদের গুহার প্রবেশপথ।"

বুদ্ধিটা পেইন্টারের মাথা থেকে বেরিয়েছিল। শিন আগেই ব্যাখ্যা করেছিল, কীভাবে ভূগর্ভস্থ উত্তাপে মাটির নিচের পানি বাষ্প হয়ে এদিক দিয়ে উঠে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু পাথরে বাধা পেয়ে আবার নিচেই ফিরে যেতে হচ্ছে সেই রাশি রাশি বাষ্প আর ফুটন্ত পানিকে। ন্যানো-নেস্টটা ধ্বংস করর জন্য বিপুল পরিমাণ তাপের প্রয়োজন। কাজটার জন্য ভূগর্ভস্থ এই প্রাকৃতিক স্টিম ইঞ্জিনই একমাত্র সমাধান হতে পারে।

এখন তাদের কাজ হলো, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোনওভাবে সেই উত্তপ্ত স্টিম ইঞ্জিনকে ন্যানো-নেস্টে ঢোকার পথ করে দেয়া। তাহলেই সুপ্ত সুপারভলক্যানোকে জেগে ওঠার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

"ঠিক আছে," উঠে দাঁড়াল কোয়ালস্কি। "খেলা শুরু করা যাক।"

শিনের দিকে সি-ফোর আটকানো ডেটোনেশন কর্ডের কুণ্ডলীটা বাড়িয়ে দিল সে। দু'জন মিলে আস্তে আস্তে লম্বা মালাটা ঢুকিয়ে দিতে শুরু করল পিচারস মাউন্ডের মাঝখানে থাকা লিলিপুট আগ্নেয়গিরির খোলা মুখ দিয়ে। কাঙ্ক্ষিত বিস্ফোরণটা ঘটাতে কতখানি এক্সপ্লোসিভ লাগতে পারে, তা আগেই হিসাব করে বের করেছিল শিন। কিন্তু পরিমাণটাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে কোয়ালস্কি। নিজের সাথে যতটুকু সি-ফোর ছিল, পুরোটাই কর্ডে আটকে দিয়েছে বিশালদেহী লোকটা।

এই প্রথমবারের মতো তার কোনও সিদ্ধান্তে খুশি হলেন পেইন্টার।

কাজ শেষ করে চটজলদি উঠে দাঁড়াল দুই সিগমা এজেন্ট। ততক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা হেলিকপ্টারের দিকে দৌড় শুরু করে দিয়েছেন পেইন্টার। তারাও ডিরেক্টরকে অনুসরণ করল।

ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়াই ছিল, কোনওরকমে সবাই ভেতরে উঠে বসার সাথে সাথে কন্ট্রোল স্টিক টেনে ধরল পাইলট। আকাশে উড়াল দিল যান্ত্রিক ফড়িংটা। গুহার মুখ থেকে খানিকটা সরে আসার পর, কোয়ালস্কিকে বিস্ফোরণ ঘটানোর ইঙ্গিত দিলেন পেইন্টার।

"এই নে শালা ন্যানোবট," বলে ট্রান্সমিটারের বাটন টিপে দিল সিগমার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। "পানি খেয়ে মর।"

মৃদু গুড়গুড় আওয়াজে কেঁপে উঠল নিচের উপত্যকা। তবে পরিবর্তন বলতে, শুধু পিচারস মাউন্ডের মুখ থেকে বেরোনো ধোঁয়ার সারি আরেকটু ঘন হলো।

"ধুশশালা..." কোয়ালস্কির কণ্ঠে হতাশা। "আমি তো ভেবেছিলাম-"

পরক্ষণেই বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজে চাপা পড়ে গেল তার কথার বাকি অংশ। হেলিকপ্টারের খোলা দরজা দিয়ে নিচের দিকে উঁকি দিলেন পেইন্টার। লাফিয়ে উপরে উঠে এসেছে পিচারস মাউন্ডের ভিত হিসেবে থাকা চুনাপাথরের টুকরোটা। এক মুহূর্ত পর উপত্যকার প্রান্তে আছড়ে পড়ল বিশালাকায় পাথরের খন্ড। চিনামাটির বাসনের মত ফেটে গেছে পুরো বেসিনের মধ্যভাগ। পিচারস মাউন্ড যেখানে ছিল, সেখান থেকে আস্ত বাস ঢুকে যাওয়ার মতো প্রশস্ত এক ফাটল তৈরি হয়েছে গুহামুখ

পর্যন্ত। এক সেকেন্ড পর ফাটলটা দিয়ে গলগল করে বাষ্প আর ফুটন্ত পানির ধারা বেরিয়ে এল। কয়েকশো ফুট ফুট পর্যন্ত উঠে গেল সেই পানির সারি।

"এইতো..." উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। "এটাই তো চাই।"

"আশা করা যায়, এই বিপুল তাপে ধ্বংস হয়ে যাবে গুহার ন্যানো-নেস্ট," ঘোষণা করল শিন।

তারপরও আরেকটা প্রশ্ন থেকে যায়ঃ এই বিস্ফোরণের ফলে নিচের সুপ্ত সুপারভলক্যানো আবার জেগে উঠবে না তো? দম আটকে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। কিন্তু খারাপ কিছু চোখে পড়ল না। পরবর্তী এক মিনিটে আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেল ফুটন্ত পানির ফোয়ারা।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন পেইন্টার। "মনে হচ্ছে, সবকিছু ঠিকঠাকই আছে।"

কন্ট্রোল স্টিকের তীক্ষ্ম মোচড়ে উপত্যকার উপর থেকে হেলিকপ্টার সরিয়ে নিলেন পাইলট। কিন্তু ফড়িংটা পুরোপুরি ঘুরে যাওয়ার আগেই দেখা গেল, অদ্ভুত সুন্দর এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে ফেয়ারিল্যান্ড বেসিন জুড়ে। সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রতিটা গিজার, প্রতিটা ঝর্ণা। গলগল করে ফুটন্ত পানির ফোয়ারা বেরোচ্ছে সবগুলো কোনের মুখ দিয়ে।

ততক্ষণে তুড়ি বাজিয়ে গান ধরেছে আমুদে কোয়ালস্কি। "পরের বার, সাথে করে আরও সি-ফোর নিয়ে আসতে হবে।"

মুচকি হেসে সিটে হেলান দিলেন ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো। নিষ্ক্রিয় হয়েছে বিধ্বংসী ন্যানোবটগুলো। আরও একবার মানবসভ্যতাকে বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে তার সংগঠন- সিগমা ফোর্স।

অধ্যায় ৪৩
১ জুন, সকাল ১১:০২
ওয়াশিংটন ডি.সি.

এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি ন্যাশনাল আর্কাইভে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করেছে গ্রে। ইয়েলোস্টোনের সবকিছু ভালোয় ভালোয় শেষ হওয়ার খবর পেয়ে, কলাম্বিয়া থেকে আসার পথে বিমানেই একটা ছোটোখাটো ঘুম সেরে নিয়েছিল সে। তবে আরও দুই তিনদিন ওখানে থাকবেন বলে ঠিক করেছেন পেইন্টার, ব্রিগহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে কাই-কে ভর্তি করে তবেই ফিরবেন।

এয়ারপোর্টে পৌছানোর পর, মঙ্কের গুলির ক্ষতটা চেকআপ করানোর জন্য বন্ধুকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে চেয়েছিল গ্রে। কিন্তু তখনই ক্যাট ফোন করে জানায়, চামড়ার টুকরোতে লেখা মেরিওয়েদার লুইসের কোডেড মেসেজের পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন কিউরেটর এরিক হেইসম্যান। তাই বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে, শেইচানকে নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে বসেছে সিগমা কমান্ডার।

ন্যাশনাল আর্কাইভ বিল্ডিং- এর সামনে এসে থেমে গেল গাড়িটা।

"পৌছে গেছি," বিড়বিড় করল শেইচান। নীল রঙের শ্রমিকের পোশাক পাল্টে নিজের ধূসর টিশার্ট, কালো জিন্স আর কালো জ্যাকেটে ফিরে এসেছে সে। বেশ সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে। ট্যাক্সির ড্রাইভারকেও আড়চোখে কয়েকবার রিয়ার ভিউ মিররে তার দিকে তাকাতে লক্ষ্য করেছে গ্রে।

ভাড়া মিটিয়ে নেমে এল দু'জন। শেইচানের পায়ে অর্কার কামড়ের ক্ষত প্রায় সেরে গেছে। কিন্তু তারপরও মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগল গ্রে, শেইচানও নির্দ্বিধায় তার কাঁধে মাথা রেখেছে।

মেইন গেটে অপেক্ষা করছিলেন হেইসম্যান। তাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন তিনি।

"এইতো চলে এসেছেন আপনারা," অভ্যর্থনা জানানোর ভঙ্গিতে বলে উঠলেন প্রৌঢ় কিউরেটর। "আসুন। কনফারেন্স রুমে সবকিছু তৈরি করে রেখেছি আমি। তবে চামড়ার টুকরোটা সাথে করে নিয়ে এলেও পারতেন। ইমেইলে ছবিটা পাওয়ার পর থেকে, আসল জিনিসটা দেখার জন্য আর তর সইছে না আমার।"

"সমস্যা নেই। সেই ব্যবস্থা পরে একসময় করা যাবে।" মুচকি হেসে জবাব দিল গ্রে।

কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করল সবাই। আগের থেকে ঘরটাকে বেশ সাফসুতরো দেখাচ্ছে। টেবিলে কয়েকটা বই রাখা আছে। শতাব্দী পুরনো কয়েকটা লাইনের অর্থোদ্ধারের জন্য এই বই ক'টাই হয়তো যথেষ্ট, ভাবল গ্রে।

"তারপর...কীভাবে করলেন কাজটা?" চেয়ার বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল গ্রে।

"কাজটা খুব একটা কঠিন ছিল না। প্রায়শই নিজেদের ভেতর এই কোড ব্যবহার করতেন লুইস আর জেফারসন। আগের বেশ কিছু দলিলপত্র থেকে এই আর্টিশোক-টা ভাঙার উপায় বের করে ফেলেছিলেন ঐতিহাসিকরা।"

"আর্টিশোক?"

"হ্যাঁ। এই নামেই ডাকা হয় কোডটাকে।" বলে একটা বই নিজের দিকে টেনে নিলেন কিউরেটর। "বুঝিয়ে দিচ্ছি, দেখুন... আলফানিউমেরিক সংখ্যার এই আটাশটা কলাম..."

পকেটে রাখা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গ্রে। "মাফ করবেন।"

দরজার দিকে এগিয়ে আসতে আসতেই সে লক্ষ্য করল, ভয়েস মেইল সেইভ হওয়ার সংকেত দিয়েছে ফোনটা। "আহ ড. হেইসম্যান, আপনি বরং কোডের খুঁটিনাটিগুলো আমার সঙ্গীকে ব্যাখ্যা করুন। আমি দু'মিনিট পর এসে বাকিটা শুনছি।"

"ঠিক আছে," জবাব দিলেন কিউরেটর। "কোনও সমস্যা নেই।"

হেইসম্যানের কথা শুনে শেইচানের মুখের শুকিয়ে যাওয়া দেখে হাসতে হাসতে হলওয়েতে বেরিয়ে এল গ্রে। ওয়াশিংটনে পৌঁছানোর আগপর্যন্ত, ডিস্পোজেবল ফোন ব্যবহার করছিল সে। তাই নিজের ফোনের ব্যাটারি খুলে রাখার কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। বিমান থেকে নামার পর ব্যাটারি লাগিয়ে নিতেই, গতকাল থেকে আসা সবগুলো ভয়েস মেইল একে একে ডাউনলোড হতে শুরু করেছে। এইমাত্র সবগুলো সেইভ হওয়ার নোটিফিকেশন এল।

কিন্তু ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে মেইলের নাম্বারটা চেক করতেই গ্রে-র গলা শুকিয়ে গেল। মোট বাইশটা ভয়েস মেইল, সবগুলোই তার বাড়ির নাম্বার থেকে। কাঁপা কাঁপা হাতে একেবারে প্রথম মেইলটা প্লে করল সে।

"গ্রে, মা বলছি। সাড়ে দশটা বাজে। তোমার বাবার অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে। দুশ্চিন্তা করো না। বেশি খারাপ কিছু হলে জানাব আমি। রাখছি।"

ওহ হো...

পরের মেসেজগুলো শুনে সময় নষ্ট করতে চাইল না গ্রে। সাথে সাথে বাড়ির নাম্বারে কলব্যাক করল। কিন্তু কেউ ধরল না ফোনটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরের মেইলটা প্লে করল সে।

"গ্রে, অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। তোমার রেখে যাওয়া ইমারজেন্সী নাম্বারটায় ফোন করছি আমি।"

খুব ভালো...

পরের ভয়েস মেসেজগুলোতে, স্বাস্থ্যকর্মী বাসায় এসে তার বাবাকে চেক করার বর্ণনা দিয়েছেন ভদ্রমহিলা।

"গ্রে, ওরা বলেছে, তোমার বাবার অবস্থা খুব একটা ভালো না। কয়েকদিনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানোর কথাও বলেছে। যাই হোক, দুশ্চিন্তা কোরোনা। সবকিছু ঠিক আছে।"

পরের আরও পাঁচটা ভয়েস মেইলে বিভিন্ন টেস্ট আর ওষুধপত্রের কথা বলেছেন ভদ্রমহিলা।

"ফোন ধরছ না কেন, গ্রে? শহরের বাইরে কোথাও গিয়েছ নাকি? বলোনি তো...আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার বাসার ওদিকে গেলে না হয় আমি গাছগুলোতে পানি দিয়ে আসব। সবসময় ব্যাপারটা ভুলে যাও তুমি।"

সর্বশেষ মেসেজটা ঘন্টাখানেক আগে এসেছে। তখনও বিমানে ছিল সে।

"গ্রে, চুল কালার করানোর জন্য তোমাদের ওদিকে যাচ্ছি আমি। এখনও বাসায় ফেরোনি নাকি? আচ্ছা...ফেরার পথে তোমার গাছগুলোতে পানি দিয়ে আসব। চাবি তো আমার কাছে আছেই। প্রায় একটা বাজে। যদি কিছুক্ষণের ভেতর ফিরে আসো, তাহলে ফোন করো। একসাথে লাঞ্চ করব আমরা।"

ঠিক আছে, মা...

হাতঘড়ির দিকে তাকাল গ্রে। এখানকার কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে। মা অপেক্ষা করবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কনফারেন্স রুমে ফিরে এল সে।

"কী হয়েছে?" জানতে চাইল শেইচান।

"তেমন কিছু না। পারিবারিক ব্যাপার।" জবাব দিয়ে কিউরেটরের দিকে ফিরল গ্রে। "তো বলুন, ড. হেইসম্যান, মারা যাওয়ার আগে কী এমন কথা লিখে গেছেন লুইস?"

একটা কাগজ তুলে পড়া শুরু করলেন কিউরেটর, "অনেক প্রচেষ্টার পর, সরকার এবং সেনাবাহিনীতে লুকিয়ে থাকা বেশিরভাগ শত্রুদের চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম আমরা, তাদের বিনাশ করতেও সমর্থ হয়েছিলাম। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারিনি।"

কথা মাঝখানে বাগড়া দিল গ্রে, "হ্যাঁ। আপনি তো এই ব্যাপারে তেমন কিছু বলেননি আমাদের। লুইসের সাহায্যে কীভাবে নিজেদের ভেতর থেকে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর খুঁজে বের করেছিলেন জেফারসন?"

মাথা নাড়লেন হেইসম্যান। "কিন্তু পুরোপুরি সফল হননি তারা। দাঁড়ান, বলছি।"

আবারও মেসেজে ফিরে গেলেন কিউরেটর। "এখনও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। দক্ষিণের একটা ক্ষমতাশালী পরিবারের মূল আমরা উচ্ছেদ করতে পারিনি। প্রচুর ক্ষমতাধর ওরা, ধরাছোঁয়ার বাইরে। এখানে ওদের নাম উল্লেখ করাটাও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। সতর্ক হতে যেতে পারে শত্রুপক্ষ। হে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তোমাদের জন্য ছবিতে ওদের নাম লিখে রেখে গিয়েছেন জেফারসনঃ ইন দ্য টার্নিং

অফ দ্য বুল, খুঁজে বের করো G, C, R, J, T নামধারী সেই পাঁচজনকে, যাদের ওখানে থাকার কথা নয়। সংখ্যার ক্রম হচ্ছে-১, ২, ৪, ৪, ১."

"শেষের অংশটার মানে কী?" জিজ্ঞেস করল শেইচান।

"জানি না," জবাব দিলেন কিউরেটর। "মনে হচ্ছে, আপনাদের জন্য কোডের ভেতর আরেকটা কোড লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন লুইস।"

আবারও গ্রে-র পকেটে রাখা ফোনটা বেজে উঠল। নিশ্চয়ই মা কল করেছে, ভাবতে ভাবতে কলার আইডি চেক করল সে। মা না, এবার ক্যাট ফোন করেছে।

"হ্যাঁ, ক্যাট। গ্রে বলছি।"

ওপ্রান্ত থেকে বন্ধুপত্নীর উদ্বিগ্ন গলা ভেসে এল। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তুমি ঠিক আছ!"

"আর্কাইভেই আছি আমি। কেন, কী হয়েছে?"

শান্ত হয়ে এল মেয়েটার কণ্ঠ। "মঙ্ককে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার আগে, কাপড় পাল্টানোর জন্য অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছিলাম আমি। কিন্তু বাসায় ঢোকার আগে দরজাটা দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়। জানোই তো, ইন্টেলিজেন্সে কাজ করার সময় থেকেই ব্যাপারটা একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। একটু সতর্কভাবে খেয়াল করতেই দেখতে পাই, দরজায় একটা বুবি ট্র্যাপ আটকানো আছে। বম স্কোয়াড এসে আবিষ্কার করে, কালকে তোমাদের জেটে ওয়ালডর্ফ যেই বোমাটা লাগিয়েছিল, ট্র্যাপের বোমার মডেলটাও অনেকটা সেরকম। এটাও ওই বদমাশটারই কাজ। তোমাদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই এগুলো করেছে ও।"

মরার আগে লোকটার বলা শেষ উক্তিটা মনে করতে পারল গ্রে- খেলা এখনও শেষ হয়নি।

বলে চলেছে ক্যাট, "বম স্কোয়াডকে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে পাঠাচ্ছি আমি। হয়তো তোমার ওখানেও বুবি ট্র্যাপ লাগানো আছে।"

ব্যাপারটা আন্দাজ করার সাথে সাথে গ্রে-র শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল।

"ক্যাট! মা আমার বাসায় যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছে! তার কাছে চাবিও আছে!"

"এক্ষুনি যাও," চেঁচিয়ে উঠল সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড। "লোকাল ফোর্সকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি আমি। বম স্কোয়াড নিয়ে নিজেও বেরোচ্ছি।"

ফোনটা নামিয়ে রেখেই দরজা লক্ষ্য করে ছুট লাগাল গ্রে। খারাপ কিছু একটা ঘটেছে আন্দাজ করে শেইচানও তার পিছু নিল।

রাস্তায় কোনও খালি ট্যাক্সি নেই। খানিকটা সামনে একটা মোটরসাইকেল পার্ক করা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোলো শেইচান। হাতে বেরিয়ে এসেছে সিগ সাওয়ার পিস্তলটা।

"নামুন।"

থতমত খেয়ে নেমে দাঁড়াল আরোহী।

মোটরসাইকেলটা পড়ে যাওয়ার আগেই হ্যান্ডেল টেনে ধরল মেয়েটা। "চালাতে পারবে?"

মাথা নেড়ে হ্যাঁ-বোধক ইশারা করেই সাথে সাথে বাইকে চেপে বসল গ্রে।

শেইচান পেছনে উঠল। "কোনও নিয়মের ধার ধারবে না।"

পরবর্তী দশ মিনিটে, মোটরসাইকেলের দুই পাশ দিয়ে গোটা শহরটাকে শুধু আবছাভাবে সরে যেতে দেখল শেইচান। ষোল নাম্বার সড়কের মোড়ে পৌঁছতেই খানিকটা সামনে আকাশে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেল। গিয়ার পাল্টে থ্রটল পুরোটা খুলে দিল গ্রে।

বাড়ির সামনে ব্রেক করে হাচড়েপাচড়ে মোটরসাইকেল থেকে নেমে এল দু'জন। ইতিমধ্যে পুলিশ আর ফায়ার সার্ভিস পৌঁছে গেছে। সাইরেনের আওয়াজে সরগরম হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা।

গ্রে-কে পৌঁছাতে দেখে একটা অ্যাম্বুলেন্সের সামনে থেকে ছুটে এল মঙ্ক, এখনও পরনে হাসপাতালের গাউন। ক্যাটের কাছ থেকে খবরটা পেয়ে এক মুহূর্তও দেরি করেনি সে, অ্যাম্বুলেন্স চুরি করে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছে।

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ল মঙ্ক। এতেই যা বোঝার, বুঝে নিয়েছে গ্রে। হাঁটু ভেঙে রাস্তার মাঝে বসে পড়ল সে।

"না..."

অধ্যায় ৪৪
৮ জুন, সকাল ৭:২২
ওয়াশিংটন ডি.সি.

"আমার মেয়েরা কোথায়?" অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে ঢুকতে ডেকে উঠল মঙ্ক।

"ঘুমাচ্ছে," জবাব দিল ক্যাট। "আর এখন যদি ওদের ডেকে তোল, তাহলে তোমাকেই দুজনকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে হবে বলে দিলাম।"

পিঠের নিচে বালিশ দিয়ে একটা সোফায় আধশোয়া হয়ে ছিল ক্যাট। স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দেখে সোজা হয়ে বসল। তিনদিন আগে একটা মেয়েসন্তান জন্ম দিয়েছে সে। এখনও আড়ষ্ট হয়ে আছে গোটা শরীর।

স্ত্রীর পাশে বসে হাতের প্যাকেটটা তুলে ধরল মঙ্ক। "এই নাও, তোমার পছন্দের ব্রেড আর ক্রিম চীজ।"

পেটে হাত বুলাল ক্যাট, কণ্ঠে কপট বিষণ্ণতা। "অনেক মোটা হয়ে গেছি আমি।"

"এখনও তুমি আগের মতোই সুন্দরী," বলে তার কপালে চুমু খেল মঙ্ক। "গোসলের জন্য টাবে পানি ভরতে দেই, কি বল? আমাদের দুজনের জন্য?"

স্বামীর বুকে মাথা রাখল ক্যাট। "ঠিক আছে।" পরক্ষণেই একটা কথা মনে পড়ল তার। "পেইন্টার কী বললেন?"

"আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন উনি। তবে আরও কয়েকটা দিন চিন্তাভাবনা করে জানাতে বলে দিয়েছেন।"

আবারও স্বামীর বুকে মুখ গুঁজল ক্যাট। সিগমা থেকে পদত্যাগের ব্যাপারে অনেকবার আলোচনা করেছে দু'জন। গুলি খাওয়ার পর বাড়িতে বোমা পেতে রাখা, সেই সাথে গ্রে-র পরিবারের উপর নেমে আসা বিপর্যয় দেখে মঙ্ক বুঝতে পেরেছে, সরে দাঁড়াবার এখনই সময়। তাছাড়া ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনের কয়েকটা বায়োটেক কোম্পানি থেকে চাকরির অফার পেয়েছে সে।

মঙ্কের নতুন প্রস্থেটিক হাত তৈরি হতে কয়েকদিন সময় লাগবে। একহাতেই স্ত্রীর পায়ের তালু ঘষা শুরু করল সে। ক্যাট এই ব্যাপারটা খুব পছন্দ করে। আবেশে বুজে এল মেয়েটার দু'চোখ।

কিন্তু পাশের ঘর থেকে তীক্ষ্ণ কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতেই দু'জনের রোমান্সে ব্যাঘাত ঘটল। মঙ্ক ভেবে পায় না, ছোট্ট গলাটা থেকে এত জোরে আওয়াজ বের হয় কীভাবে!

"মনে হচ্ছে খিদে পেয়েছে ওর," বলল ক্যাট।

উঠে দাঁড়াল মঙ্ক। "আমি নিয়ে আসছি।"

পাশের ঘরে গিয়ে, দোলনা থেকে জীবনের নতুন সুখের উৎসটা কোলে তুলে নিল সে। আলতো করে বুকে চাপড় দিতেই থেমে এল বাচ্চাটার কান্না।

গ্রে-র মায়ের অন্তেষ্টিক্রিয়ার দিন জন্মেছে ও। কবরস্থান থেকে সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে আসতে হয়েছিল ক্যাটকে। প্রিয় বন্ধুকে সেদিন কোনও সান্ত্বনা দেয়ার সময় পায়নি মঙ্ক। কিন্তু মনে মনে একটা ব্যাপার ঠিক করে রেখেছিল সে। ক্যাটও একমত হয়েছিল।

বাচ্চাটার জন্মের পর, ক্যাটকে হাসপাতালে দেখতে আসার সময় ব্যাপারটা জানতে পারে গ্রে। কষ্টমাখা এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল তার ঠোঁটে।

বাচ্চাটা আবার কেঁদে উঠতেই চাপড়ের বেগ বাড়াল মঙ্ক। "কাঁদে না বাবা, কাঁদে না...খিদে পেয়েছে তোমার, হ্যারিয়েট?"

সকাল ৮:০৪

মুখে হাত চেপে হাসপাতালের বেডের পাশে বসে আছে গ্রে।

গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন তার বাবা, নিঃশ্বাসের তালে তালে বুকটা মৃদু ওঠানামা করছে। এক সপ্তাহ আগে এই হাসপাতালেই তাকে ভর্তি করে গিয়েছিলেন গ্রে-র মা।

এমআরআই স্ক্যানে দেখা গেছে- অ্যালঝেইমার, প্যানিক অ্যাটাক, হ্যালুসিনেশনের পাশাপাশি অতিরিক্ত ওষুধ সেবনের ফলে ছোটোখাটো একটা স্ট্রোক করেছিলেন ভদ্রলোক। তবে দ্রুত সেরে উঠছেন তিনি।

আরও সপ্তাহখানেক পর তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নেয়া যাবে বলে মত দিয়েছেন ডাক্তাররা। ভাইয়ের সাথে কথা বলে পরবর্তী করণীয় ঠিক করে ফেলেছে গ্রে। একটা প্রাইভেট নার্সিং ফ্যাসিলিটিতে রাখা হবে তাকে। কিন্তু গ্রে খুব ভালো করেই জানে, কাজটা খুব একটা সহজ হবে না।

মায়ের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছিল গ্রের ভাই- কেনি। তাদের পৈতৃক বাংলোটার ব্যাপারে উকিল আর রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সাথে কথা বলে গিয়েছে সে। ভাইয়ের সাথে ভালো বোঝাপড়া না থাকায় ব্যাপারটায় আপত্তি করেনি গ্রে। কেনিকে জানানো হয়েছে, পূর্বশত্রুতার জের ধরে গ্রে-কে মারার জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছিল শত্রুপক্ষ। সেই ফাঁদে পড়ে মরতে হয়েছে তাদের মাকে। এতে দুই ভাইয়ের মধ্যকার সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছে।

পেছনে একটা কণ্ঠ শুনে গ্রে-র সম্বিত ফিরল। মেরী এসেছে। তার বাবার নার্স হিসেবে কাজ করছে মেয়েটা। "একটু পর নাস্তা দেয়া হবে। আপনার জন্যও কি একটা ট্রে আনব?"

"না," জবাব দিল গ্রে। "ধন্যবাদ মেরী। গতকাল রাত কেমন কেটেছে?"

"ভালোই। নতুন ওষুধটা উনাকে বেশ শান্ত রাখছে।"

"আজ কাকে এনেছ? কিউটি নাকি শাইনার?

মুচকি হাসল মেয়েটা। "দু'জনকেই।"

কিউটি আর শাইনার মেরীর পোষা কুকুর। গবেষকরা সম্মত হয়েছেন, অ্যালঝেইমার রোগীর ক্ষেত্রে প্রাণীর সাহচর্য একটা টনিকের মতো কাজ করে। তবে এটা যে তার বাবার ক্ষেত্রেও সত্যি হবে, তা ভাবতে পারেনি গ্রে। গত রবিবারে এসে দেখতে পায়, ভদ্রলোক শাইনিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন।

মেরী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আবারও বাবার দিকে তাকাল গ্রে। ঘুম থেকে জাগার সময়, প্রতি সকালে তার কাছে এসে বসে থাকে সে। স্ত্রীর মৃত্যুর খবর আগে পেলেও ব্যাপারটা প্রায় প্রতিদিনই ভুলে যান তিনি। তাই একে একে তিনবার, কষ্টের কথাটা বলতে হয়েছে গ্রে-কে। এবং প্রতিবারই কান্নার স্রোতে ভিজে উঠেছে ভদ্রলোকের চেহারা।

দরজা দিয়ে উঁকি দিল মেরী। "কেউ একজন আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।"

"পাঠিয়ে দাও।"

পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকল শেইচান, আরেকটা চেয়ার টেনে গ্রে-র পাশে এসে বসে পড়ল। "জানতাম, এখানেই পাব তোমাকে। একটা খবর জানানোর ছিল।"

"কী?"

"হেইসম্যান আর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট, কী যেন নাম?"

"শেরিন," জবাব দিল গ্রে।

"হ্যাঁ, শেরিন। দু'জনেই নির্দোষ। একা একাই কাজটা করেছে ওয়ালডর্ফ, হয়তো গিল্ডের কেউ সাহায্য করেছে ওকে। তবে আমার মনে হয়, ফোর্ট নক্সে ব্যর্থতার পর বেশ রেগে উঠছিল লোকটা। টেনেসিতেও আমাদের খুন করতে ব্যর্থ হওয়ার ভয় থেকেই ফাঁদটা পেতেছিল ও। যাতে ওকে কোনওক্রমে হারাতে পারলেও, তোমার আর মঙ্কের শেষরক্ষা না হয়।"

এখনও ওয়ালডর্ফের শেষ কথাটা গ্রে-র কানে বাজে।

খেলা এখনও শেষ হয়নি...

বিছানার দিক থেকে আওয়াজ কানে যেতেই ঘাড় ঘোরাল গ্রে। জেগে গিয়েছেন তার বাবা। মৃদু চোখ পিটপিট করতে করতে, কয়েকবার কেশে গলা পরিষ্কার করলেন তিনি।

"আরে তুমি শেইচান না?" ঘুমজড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

"হ্যাঁ," জবাব দিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, চলে যাবে।

গ্রে ভেবে পায় না, কীভাবে যেন যেসব কথা মনে থাকার কথা না, সেগুলোই মনে রাখতে পারেন তিনি।

ছেলের দিকে ঘুরে গেল আধখোলা চোখদুটো। "তোমার মা কোথায়?"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল গ্রে-র বুক চিরে। "বাবা, আসলে মা তো..."

ঝটকা মেরে দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়াল শেইচান। নিচু হয়ে গ্রে-র বাবার হাতে আলতো চাপড় দিল সে। "উনি চুল কালার করতে গেছেন। একটু পরে আসবেন।"

মাথে নাড়লেন ভদ্রলোক। "এই মহিলাকে নিয়ে আর পারা যায় না বুঝলে।"

মুচকি হেসে সোজা হয়ে দাঁড়াল শেইচান। তারপর গ্রে-র হাত ধরে টেনে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

পেছন থেকে ডেকে উঠলেন তার বাবা। "নাস্তা?"

"দিয়ে যাবে এখনই," বলে বেরিয়ে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিল গ্রে।

হাত ধরে তাকে হলওয়ের একপ্রান্তে নিয়ে এল শেইচান।

"কী করলে এটা?" গ্রে-র কণ্ঠে রাগ দানা বেঁধে উঠছে।

"তোমাকে বাঁচালাম, সেই সাথে উনাকেও," জবাব দিল মেয়েটা। "প্রতিবার কথাটা উচ্চারণ করতে তোমার কতখানি কষ্ট হয়, তা দেখেছি আমি গ্রে। এভাবে চলতে পারে না। আসল সত্যিটা উনি জানেন। এক সময় ঠিকই বুঝতে পারবেন। শুধু উনাকে সেই সময়টুকু দাও।"

চিন্তায় বাবার কপাল কুঁচকে যাওয়ার দৃশ্য কল্পনা করল গ্রে। কিন্তু এক মুহূর্ত আগে, শেইচানের কথা শুনে চিন্তিত চেহারাটায় ফুটে ওঠা এক টুকরো প্রশান্তি নজর এড়ায়নি তার।

গ্রে-র বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

ভুলে যাওয়াও কখনও কখনও শান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মোবাইল বেজে ওঠার শব্দে সম্বিত ফিরল তার। পকেট থেকে ফোনটা বের করতেই দেখা গেল, একটা মেসেজ এসেছে। তবে সেন্ডারের আইডি 'ব্লকড' দেখাচ্ছে। দুরুদুরু বুকে মেসেজটা ওপেন করল গ্রে। সাথে সাথে বুঝে গেল কারা পাঠিয়েছে এটা।

এটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না

লাইনটা পড়ার সাথে সাথে যেন আগুন জ্বলে উঠল তার বুকের ভেতর। চোখের সামনে দুলে উঠল গোটা পৃথিবী। এক মুহূর্ত পর, মনের রাগকে সরিয়ে তার স্থান দখল করে নিল অসীম কষ্ট। দু'চোখ ফেটে বেরিয়ে এল পানির ধারা।

মেসেজটা শেইচানও দেখতে পেয়েছে। এগিয়ে এসে দুই হাতের তালুতে গ্রে-র মুখটা তুলে ধরল সে। "আমি তোমাকে সাহায্য করব। ওদেরকে এর মূল্য চুকাতে হবে। একসাথে প্রতিশোধ নেব আমরা।"

গ্রে-র চোখের পানি যেন তার ভেতরের সব অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দিচ্ছে। আলতো হাতে ভেজা গালদুটো মুছিয়ে দিল শেইচান।

তারপর হিলে ভর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে।

পরস্পর আলিঙ্গন করল দু'জোড়া তৃষ্ণার্ত ঠোঁট।

সকাল ১১:৪৫
সান রাফায়েল উচ্চভূমি

ফিরে আসতে পেরে বেশ ভালো লাগছে...

একটা পুয়েবলো কেবিনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে কাই। রোদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে গোটা সান রাফায়েল উচ্চভূমি। তবে মৃদুমন্দ হাওয়া বয়ে চলায় তাপটা খুব একটা গায়ে লাগছে না। থেকে থেকে ধূলোর মাঝে ঘূর্ণি তৈরি করছে দূর্দম বায়ুপ্রবাহ।

পুরো এক সপ্তাহ পর আবার দৃশ্যগুলো দেখছে কাই। ব্রিগহ্যাম ইয়ং ইউনিভার্সিটির নেটিভ আমেরিকান ক্লাসে যোগ দিয়েছে সে। কিন্তু এখন গরমের ছুটি থাকায় চলে এসেছে হুমেতেওয়াদের কেবিনে। দুই দিন আগে উটাহ- এর বিস্ফোরণের সব রকমের দায় থেকে তাকে মুক্ত করা হয়েছে। তবে সে খুব ভালো করেই জানে, ব্যাপারটার পেছনে আঙ্কেল ক্রো আর প্রফেসর হ্যাঙ্কের হাত আছে।

"ট্রে-টা কে পোড়ালো?" পেছন থেকে একটা কণ্ঠ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কাই। আরেকটা ট্রে হাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আইরিস হুমেতেওয়া।

কী জবাব দেবে ভেবে পেল না কাই। নিজে নিজে বাদাম ভাজতে গিয়ে এই কাণ্ড করেছে সে।

হাসতে হাসতে আরেকটা কেবিনের ছায়া থেকে বেরিয়ে এলেন আলভিন। "ছেড়ে দাও। বুঝতে পারেনি মেয়েটা।"

নিজের কপট রাগ ধরা পড়ে যেতেই পাল্টা হাসলেন আইরিস।

রাফায়েলের লোকদের গুলির মুখ থেকে বেঁচে গিয়েছেন প্রৌঢ় হুমেতেওয়া দম্পতি। ইন্ডিয়ানদের নিয়ে একটা কথা প্রচলিত আছেঃ নিজের এলাকায় কখনও কোনও ইন্ডিয়ানকে তাড়া করতে হয় না। তবে রাফায়েল কিংবা তার লোকদের ব্যাপারটা জানা ছিল না। আর এটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে হুমেতেওয়াদের।

আইরিস আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, ফ্রেঞ্চ লোকটার সৈন্যরা অবশ্যই তাদের ধাওয়া করে আসবে। তাই এটিভিতে চড়ার সাথে সাথে পাশের বালুময় উপত্যকার দিকে রওনা হয়েছিলেন তিনি। সেই সাথে বাহনটার ধোঁয়ার পাশাপাশি ধুলো উড়িয়ে নিজেদের চারদিকে একটা ধোঁয়াশা আবরণ তৈরি করেছিলেন। তারপর স্নাইপারের গুলির আওয়াজ শোনার সাথে সাথে এটিভি-টা উল্টে দিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন বালির ভেতর। আর তাতেই তাদের মৃত বলে ধরে নিয়েছিল লোকগুলো।

"আমি দুঃখিত, আন্টি আইরিস," জবাব দিল কাই। "ট্রে-টা পরিষ্কার করে দিচ্ছি।"

জবাবে মুচকি হেসে চোখটিপ দিলেন আইরিস। পরক্ষণেই ইঞ্জিনের আওয়াজে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন ট্রেইলের দিকে। "মনে হচ্ছে, ছেলেরা তাদের রাইড শেষ করে ফিরে এসেছে।"

এক মুহূর্ত পর, আপদমস্তক ধুলোয় ঢাকা দু'জন আরোহী কেবিনের সামনে এসে এটিভি থেকে নেমে দাঁড়াল। তাদের বাহনগুলোর গায়ে ধুলোময়লা জমে অনেকটা ফসিল হয়ে যাওয়া পাথরের সারফেসের মতো দেখাচ্ছে।

হেলমেট খুলে একটা রুমাল দিয়ে মুখ থেকে ধুলো মোছার প্রয়াস পেল জর্ডান। ছেলেটাকে ফিরতে দেখে হাসি ফিরে এল কাই-এর ঠোঁটে।

জর্ডানের দেখাদেখি নিজের মাথা থেকেও হেলমেট খুলে ফেললেন অন্য এটিভির আরোহী মেজর অ্যাশলি রায়ান। ইয়েলোস্টোনের ঘটনাটার পর বেশ ভালো বন্ধু হয়ে গেছে জর্ডান আর মেজর।

"জানো নাকি কাই," বলে উঠল জর্ডান। "আজ ডেডম্যান গিরিখাতে তোমার রেকর্ড ভেঙে ফেলেছি আমি।"

"না না না," মেজরের কণ্ঠে কৌতুকের সুর। "এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।"

হৈহৈ করে তার কথায় সমর্থন দিলেন আইরিস আলভিন দুজনেই। "ব্যাটাকে একহাত দেখিয়ে দাও, কাই।"

শ্রাগ করল জর্ডান, মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। "ধুর...ও পারবেই না।"

বারান্দা থেকে নেমে, মেজর রায়ানের হাত থেকে হেলমেটটা নিয়ে এটিভিগুলোর একটায় চড়ে বসল কাই, বাতাসে উড়ছে খোলা চুল। "তবে রে...দেখাচ্ছি মজা!"

দুপুর ২:১৭
সল্ট লেক সিটি

এক মন্দির থেকে এখন আরেকটায়...

সল্ট লেক সিটিতে অবস্থিত, মরমন মন্দিরের 'কোদেশ হাকোদাশিম' অর্থাৎ পবিত্রের চাইতেও পবিত্রতম চেম্বারে প্রবেশকারী প্রথম মরমন ইন্ডিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করতে চলেছেন প্রফেসর হ্যাঙ্ক কানোশ।

প্রবেশপথ পেরিয়ে চেম্বারের দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি। সামনের বন্ধ দরজাটা পনেরো ফুট উঁচু, দু'পাশের পাল্লার প্রশস্ততা আট ফুট। মাতে হাতেগোনা কয়েকজনেরই ওপাশের দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

মাথা নিচু করে বসে আছেন হ্যাঙ্ক। নিশ্চুপ কয়েক মুহূর্ত কাটার পর, মৃদু আওয়াজে ফাঁক হয়ে গেল দরজার পাল্লা দুটো। মেঝেতে ফুটে ওঠা ছায়া দেখে বুঝতে পারলেন, চিকন একটা অবয়ব বেরিয়ে এসেছে দরজা দিয়ে।

চুপচাপ হাতে ধরা উপহারটা সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন হ্যাঙ্ক। দুটো হাত ধীরেসুস্থে উঠিয়ে নিল সোনার প্লেটটা, ভারমুক্ত করল তাকে।

ওল্ড ফেইথফুল হোটেল থেকে জিনিসটা চুরি করেছিলেন হ্যাঙ্ক। সোনার পাত্রের গায়ে খোদাই করা ছবিটার সাথে ফেয়ারিল্যান্ড বেসিনের মিল খুঁজে পাওয়ার পর, ব্যাপারটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সবাই। সেই সুযোগে রাফায়েলের বাক্স থেকে একটা সোনার প্লেট তুলে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তখন জানতেন

না, এটা দিয়ে কী করবেন। কিন্তু গুহার ভেতর সলোমনের মন্দিরের প্রতিলিপিটা দেখার সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, এই মন্দিরেই ফিরিয়ে দিতে হবে প্লেটটা।

জিনিসটা নিয়ে নেয়ার পর, আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল মৃদু পদশব্দ। দরজাটা বন্ধ হওয়ার সরসর আওয়াজ কানে আসতেই, মাথা তুলে সোজা সামনের দিকে তাকালেন হ্যাঙ্ক।

অত্যুজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে দরজার ওপাশের চেম্বার। একেবারে মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের বেদী। ওটার উপর সোনালি রঙের কিছু একটা রাখা। সরাসরি আলো পড়ায় যেন ঝিলিক দিচ্ছে জিনিসটা। চোখ ধাঁধিয়ে গেল হ্যাঙ্কের।

ওগুলোই কি জোসেফ স্মিথের সেই আসল সোনার প্লেট?

দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতেই উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা বাড়ালেন পেছনের প্রবেশপথের দিকে।

চোখের পাশাপাশি তার মনের ভেতরেও স্থান করে নিয়েছে সেই সোনালি ঝিলিক।

সন্ধ্যা ৫:৪৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

পায়ে পায়ে ন্যাশনাল মলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন একাকী পেইন্টার ক্রো।

শান্ত হয়ে এসেছে সবকিছু। আইসল্যান্ডের অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হয়েছে, হাইড্রোথার্মাল ভেন্টে বিস্ফোরণ ঘটায় কয়েকটা মৃদু ভূমিকম্পের পর আবার চুপচাপ হয়ে গেছে ফেয়ারিল্যান্ড বেসিন। তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য, ভূতাত্ত্বিকদের একটা দল নিয়ে ওখানে থেকে গিয়েছে রোনাল্ড শিন। জাপানি পদার্থবিদ রিকু তানাকা আর নতুন করে কোনও অস্বাভাবিক নিউট্রিনো আলোড়ন ধরতে পারেননি।

আগের মতোই ঘুমিয়ে আছে ইয়েলোস্টোন পার্কের গভীরে থাকা সুপারভলক্যানো। তবে শিন যেমনটা বলেছিল, খুব তাড়াতাড়ি একসময় না একসময় ঠিকই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিস্ফোরিত হবে ওটা।

ফেয়ারিল্যান্ড বেসিনে একটা নতুন লেক তৈরি হয়েছে। লেকটাকে নিজের নামে নামকরণ করার জন্য আদালতে পিটিশন দায়ের করেছিল কোয়ালস্কি। কিন্তু খারিজ হয়ে গেছে সেই প্রস্তাব।

সেইন্ট জার্মেইন পরিবার সম্পর্কে তদন্ত করতে চেয়েছিলেন পেইন্টার। তবে রাফায়েলের মারা যাওয়ার পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টার ভেতর, পুরো পরিবারের চোদ্দজন সদস্যকে বিভিন্ন জায়গায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ওদের সাথে সব সম্পৃক্ততার প্রমাণ মিটিয়ে ফেলতে দেরি করেনি গিল্ড।

বেলজিয়ামের নিউট্রিনো আলোড়নের জায়গাটা ট্র্যাক করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ওখানেও শুধুমাত্র একটা পোড়া বাড়ির ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, আরেকটা কানাগলি।

শুধুমাত্র একটা রাস্তাই খোলা আছে।

ইউ.এস. ক্যাপিটল- আর এখন সেদিকেই যাচ্ছেন পেইন্টার।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আর মাত্র পনেরো মিনিট জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে স্থাপনাটা। তবে তার কাজের জন্য এই সময়টুকুই সথেষ্ট।

লিসার সাথে আজ ডিনারের প্ল্যান আছে। কিন্তু জিনিসটা নিজ চোখে না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছেন না পেইন্টার। এখনও ব্যাপারটা কাউকে জানাননি তিনি। আর কাকেই বা জানাবেন? মিশন শেষ করার পর নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই।

নতুন বাচ্চা আর সংসারের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে মঙ্ক। আজ সকালে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছে ও। আপাতত কাগজটা রেখে দিলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি পেইন্টার। কয়েকদিনের ছুটি দিয়েছেন ওকে, বলেছেন ব্যাপারটা আবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখতে। তবে তার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে বলে মনে হয় না।

মায়ের মৃত্যুর পর অসুস্থ বাবাকে নিয়ে বেশ ঝামেলায় আছে গ্রে। এই অতিরিক্ত চাপ কি তাকে আরও শক্ত করে তুলবে? নাকি ভেঙে ফেলবে তার ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা?

উত্তরটা সময়ই দেবে।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে উপরের বিশালাকায় ডোমটার দিকে তাকালেন পেইন্টার। নিচে দাঁড়িয়ে কথা বললে সাথে সাথে প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সিঁড়ি পেরিয়ে সেকেন্ড ফ্লোরের গ্যালারিতে উঠে এলেন তিনি। দক্ষিণদিকের দেয়ালে চোখ ফেরাতেই কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা চোখে পড়ল।

জন টার্নবুল-এর আঁকা 'স্বাধীনতার ঘোষণা' নামের সেই বিখ্যাত ছবিটা।

ক্যানভাসের উপর চিত্রকরের হাতটাকে ঘুরে বেড়াতে কল্পনা করলেন পেইন্টার। কিন্তু ছবিটার পেছনে অবদান শুধু টার্নবুলের একার না, আরেকটা হাত সাহায্য করেছিল তাকে।

থমাস জেফারসন।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সাক্ষর করা সবাইকে ক্যানভাসে তুলে এনেছেন টার্নবুল। কিন্তু তাদের বাইরেও আরও পাঁচজনকে ছবিতে জায়গা দিয়েছেন তিনি।

কেন?

শতাব্দী ধরে প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন ঐতিহাসিকরা। কিন্তু জবাবটা জানা হয়ে গেছে পেইন্টারের। গ্রে-র আনা চামড়ার টুকরোতে লেখা মেসেজটার কথা মনে করলেন তিনিঃ "হে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তোমাদের জন্য ছবিতে ওদের নাম লিখে রেখে গিয়েছেন জেফারসনঃ ইন দ্য টার্নিং অফ দ্য বুল, খুঁজে বের করো G, C, R, J, T নামধারী সেই পাঁচজনকে, যাদের ওখানে থাকার কথা নয়। সংখ্যার ক্রম হচ্ছে ১, ২, ৪, ৪, ১."

ধাঁধাটা খুব সহজেই সমাধান করতে পেরেছেন পেইন্টার।

টার্নিং অফ দ্য বুল, মানে টার্নবুল। আমেরিকার অনেক ঐতিহাসিক ছবির সাথে তার নাম জড়িয়ে আছে।

তারপর খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে সেই পাঁচজনকে, যাদের ওখানে থাকার কথা নয়। অর্থাৎ, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাড়তি উপস্থিত থাকা সেই পাঁচজন। নামগুলোও জানেন পেইন্টারঃ জন ডিকিনসন, রবার্ট লিভিংস্টোন, জর্জ ক্লিনটন, থমাস উইলিং এবং চার্লস থমসন।

ধাঁধার পরের লাইনে, তাদের নামগুলো G, C, R, J, T ক্রমে সাজাতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, নামের ইংরেজী বানানের প্রথম অংশের আদ্যাক্ষরের উপর ভিত্তি করে সাজাতে হবে তাদের।

George
Charles
Robert
John
Thomas

এরপর ১, ২, ৪, ৪, ১ ক্রমানুযায়ী নামগুলোর অক্ষরকে নির্দেশ করা হয়েছে।

1	George	George
2	Charles	Charles
4	Robert	Robert
4	John	John
1	Thomas	Thomas

Ghent.

মেরিওয়েদার লুইস, তথা স্বাধীনতার পথপ্রদর্শকদের শত্রুপক্ষের নাম ছিল ঘেন্ট।

ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন পেইন্টার। মরার আগে র‍্যাফায়েল তাকে বলে গিয়েছিল, গিল্ড হচ্ছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বৈভব ইত্যাদি অর্জন করতে থাকা কয়েকটা পরিবারের মেলবন্ধন। পরবর্তীতে একজোট হয়ে একটা ব্লাডলাইন গঠন করে তারা। চামড়ার টুকরোতে লেখা লুইসের মেসেজের সাথেও মিলে গিয়েছে কথাগুলো।

বেলজিয়ামের একটা শহরের নাম ঘেন্ট। আইসল্যান্ডে গ্রে-দের উপর হামলা করা কমান্ডো দলটা ওই শহর থেকে এসেছিল। এমনকি নিউট্রিনোর ছোট একটা আলোড়নের উৎসও ওই শহরটাই ছিল। ব্যাপারটা অবাক করেছে পেইন্টারকে? এসব কি শুধুই কাকতালীয়?

অনুসন্ধান চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। ওই শহরের লোকজনের মধ্যে, ঘেন্ট বেশ প্রচলিত সাধারণ একটা উপাধি। তবে শব্দটা আক্ষরিক উচ্চারণের চেয়ে ইংরেজ উচ্চারণ সহজ হওয়ায়, বেশীরভাগ সময় ওই পরিবর্তীত উচ্চারণটাই ব্যবহার করে সবাই।

তারপরই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পেয়েছেন পেইন্টার।

কিন্তু ওইটুকু পর্যন্তই শেষ... তার পক্ষে আর সামনে এগোনো সম্ভব না।

জেফারসন আর লুইসের কথা মনে করলেন তিনি। তাদের মতো তার হাতও অদৃশ্য শেকলে বাঁধা। অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, আমেরিকায় আসার আগে ঘেন্ট উপাধিই ব্যবহার করত ওই পরিবারের লোকেরা। সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের পাশাপাশি, আমেরিকার সরকারব্যবস্থার উচ্চ পর্যায়েও নিজেদের শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে তারা।

তাহলে কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে সিগমা?

গিল্ড, এচেলন, ফ্যামিলিস ডে লেটয়লে, স্টার পরিবার ইত্যাদি অগণিত নামে ডাকা হলেও, এগুলোর একটাও তাদের আসল নাম না। ছায়ার মতো গোটা আমেরিকার সাথে নিজেদের ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখেছে সেই মূর্তিমান বিভীষিকা।

এখন আর নিজেদের ঘেন্ট বলে পরিচয় দেয় না সেই পরিবারের লোকেরা।

তারা এখন নিজেরকে বলে গ্যান্ট।

ঠিক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জেমস টি. গ্যান্ট- এর মতো।

লেখকের বক্তব্যঃ সত্যি নাকি কল্পনা

প্রতিটা বইয়ের শেষেই পাঠকদের চোখে সত্যির সাথে কল্পনার পার্থক্যটা ধরিয়ে দেই আমি। দ্য ডেভিল কলোনী-তে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তিনটা ব্যাপারঃ মরমনিজম, নেটিভ আমেরিকানদের ইতিহাস আর স্বাধীন আমেরিকার স্থপতি। এই প্রধান তিনটা বিষয়ের পাশাপাশি উপন্যাসে উল্লেখিত আরও কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

মরমনিজম– ছোটবেলা থেকে রোমান ক্যাথলিক হিসেবে বেড়ে উঠলেও, মরমন ধর্ম আর তাদের ধর্মগ্রন্থ দ্য বুক অফ মরমন-এর প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল আমার। তাদের বিশ্বাস, নেটিভ আমেরিকানদের ইতিহাস ইজরায়েল থেকে নির্বাসিত হওয়া একটা প্রাচীন গোত্রের সাথে সম্পর্কিত। এই ব্যাপারে আগ্রহী পাঠকরা অনলাইনে প্রকাশিত ডক্টর জেফরি মেলড্রাম আর ট্রেন্ট স্টিফেনস এর লেখা হু আর দ্য চিলড্রেন অফ লেহি নামের একটা জার্নাল থেকে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

উপন্যাসে নেটিভ আমেরিকানদের ভাষার সাথে প্রাচীন হিব্রু ভাষা এবং পরিবর্তীত মিশরীয় ভাষার সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছি আমি। সবকিছুই সত্যি। এ ব্যাপারে আরও জানতে চাইলে পড়তে পারেন জন এল সোরেনসনের লেখা আরেকটা অনলাইন জার্নাল ওয়াজ দেয়ার হিব্রু ল্যাঙ্গগুয়েজ ইন আমেরিকা?

নেটিভ আমেরিকান ইতিহাসঃ উপন্যাসে উল্লেখিত সকল ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ঐতিহাসিক চরিত্র, যেমন ইন্ডিয়ান চীফ ক্যানাসাটেগো, ইরোকি ঐক্যজোট, ইরোকিদের নীতিমালার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আমেরিকান সংবিধান, ককেশিয়ান মমি, পেট্রোগ্লিফ, নেটিভ আমেরিকানদের জনসংখ্যা, আনাসাযিদের অন্তর্ধান ইত্যাদি সবকিছুই সত্যি।

স্বাধীন আমেরিকার স্থপতি চীফ ক্যানাসাটেগোর কথা তো বললামই। এবার আসা যাক বাকিদের কাছে। থমাস জেফারসন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, লুইস এবং ক্লার্ক সম্পর্কে উপন্যাসে উল্লেখিত সব তথ্য সত্যি এবং অবিকৃত।

আমেরিকার জাতীয় সীল সীল সম্পর্কে উপন্যাসে উল্লেখ করা চীফ ক্যানাসাটেগো আর তীরের ঝাঁক সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহ সবই সত্যি। ঈগলের থাবায় ধরা জলপাইয়ের ডাল আর তীরের ঝাঁক আসলেই ইজরায়েলের মানাসেহ গোত্রের প্রতীক। আর বুক অফ মরমন অনুযায়ী, এরাই প্রাচীন আমেরিকায় দেশান্তরিত হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র উপন্যাসে উল্লেখিত সুপার ক্যামিওকান্ডে ডিটেক্টর, ব্রিগহ্যাম ইয়ং ইউনিভার্সিটির ভূগর্ভস্থ ল্যাব ফ্যাসিলিটি, দামাস্কাস স্টিলসহ

আগ্নেয়গিরি সংক্রান্ত সকল তথ্য সঠিক। এছাড়াও কোয়ালস্কির হাতে থাকা **টৈজার** শটগান, ফোর্ট নক্স থেকে গ্রে-র পালানোর সময় ব্যবহার করা আর্মারযুক্ত **হামভি**, ফ্ল্যাশব্যাং গ্রেনেড ইত্যাদির অস্তিত্ব আসলেই বর্তমান।

ঘটনাস্থলঃ উপন্যাসে বর্ণীত ঘটনাপ্রবাহের সংগঠনস্থলের বেশিরভাগই আমেরিকায় অবস্থিত। সবগুলোর অবস্থানই সত্যি। বিশেষ কয়েকটা বিষয় আমি নিচে উল্লেখ করছিঃ

১। সাপ আকৃতির প্রাচীন ইন্ডিয়ান ঢিবি আসলেই আছে, তবে ওহাইওতে। কাহিনীর প্রয়োজনে ওটাকে কেনটাকিতে নিয়ে এসেছি আমি।

২। সানসেট ক্রেটারের নিচে আসলেই সারা বছর বরফ জমে থাকা গুহার অস্তিত্ব আছে।

৩। উপাতকি-তে আসলেই একটা ব্লোহোল আছে। মাটির নিচে সাত মিলিয়ন কিউবিক ফুট বিস্তৃত গুহার অস্তিত্ব আসলেই বর্তমান আর সেগুলোর ভেতর দিয়ে ত্রিশ মাইল বেগে বাতাসও বইতে দেখা যায়।

৪। অ্যারিজোনা মরুভূমিতে একটা বেসিনের উপর আসলেই 'পাথরের ফাটল' নামে একটা পুয়েবলোর ধ্বংসাবশেষ আছে।

৫। আইসল্যান্ডের এলিরেই দ্বীপ, হেইমেই দ্বীপসহ গোটা ওয়েস্টম্যান দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কিত বর্ণনা সত্যি।

৬। উপন্যাসে আমি ফেয়ারিল্যান্ড বেসিন আর পিচারস মাউন্ড বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিলেও এগুলোসহ ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের প্রতিটা স্থাপনার অস্তিত্ব এখনও বর্তমান।

৭। উপন্যাসে উল্লেখিত ইয়েলোস্টোন পার্কের নিচে ঘুমিয়ে থাকা সুপারভলক্যানো এবং হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট সম্পর্কিত সব তথ্য সঠিক। রোনাল্ড শিনের কথামতো, যে কোনও সময় বিস্ফোরিত হতে পারে ওই বিশাল আগ্নেয়গিরি।

অন্যান্য বইঃ উপন্যাসটা লিখতে নিচের বইগুলো আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছে।

১। ক্রিস্টোফার নাইট আর ওয়ালান বাটলারের লেখা সলোমনস পাওয়ার ব্রোকারস
২। সিলভিও এ. বেডিনির লেখা জেফারসন অ্যান্ড সায়েন্স
৩। ল্যাভান মার্টিনিউর লেখা সাউদার্ন পাইউটেস
৪। পল সেমোনিনের লেখা আমেরিকান মনস্টার
৫। ফ্র্যাঙ্ক জোসেফের লেখা আনারথিং অ্যানশিয়েন্ট আমেরিকা
৬। ক্রিস্টোফার হার্ডাকারের লেখা দ্য ফার্স্ট আমেরিকান
৭। রবার্ট হিরোনিমাসের লেখা ফাউন্ডিং ফাদার্স, সিক্রেট সোসাইটিজ

সংযুক্তিঃ অনুবাদকের পক্ষ থেকে
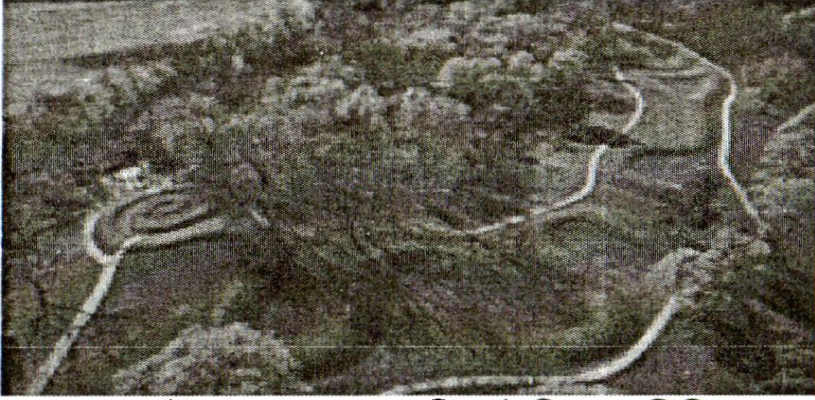
ওহাইও'র সাপ আকৃতির ইন্ডিয়ান ঢিবি
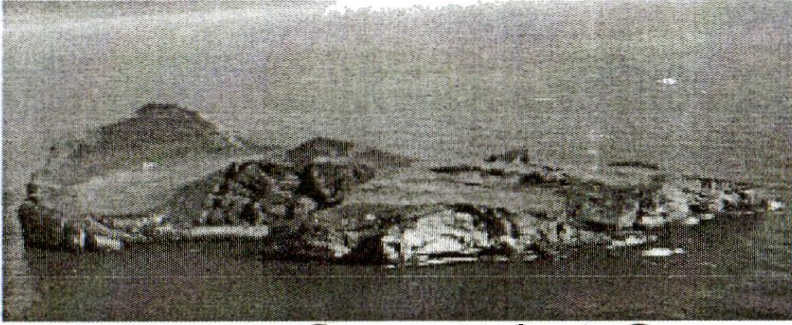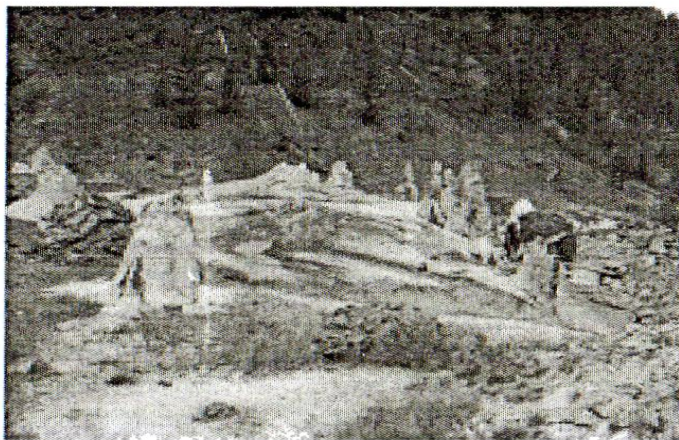
ওয়েস্টম্যান দ্বীপপুঞ্জের এলিরেই দ্বীপ
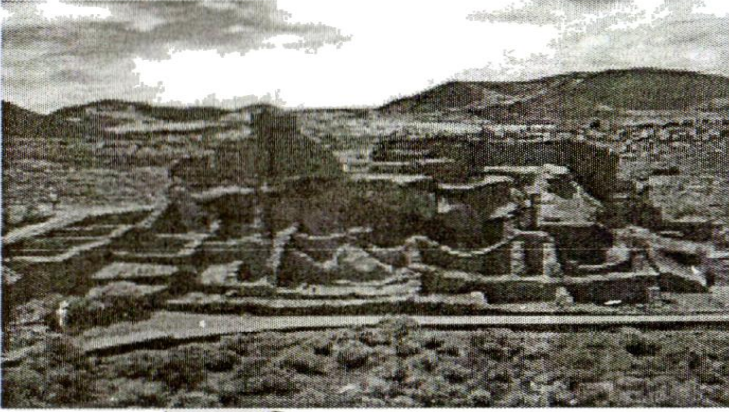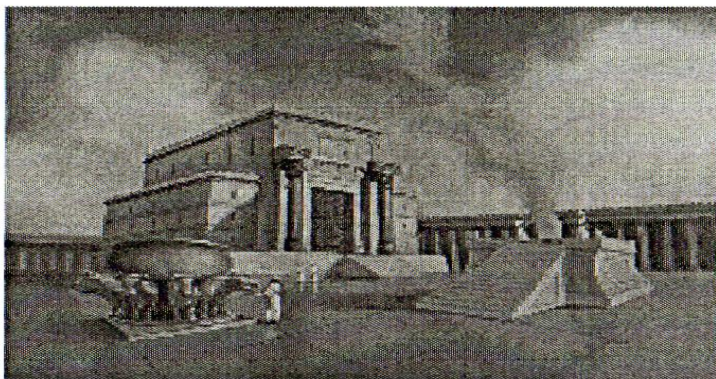
উপাতকির ধ্বংসাবশেষ

ফেয়ারিল্যান্ড বেসিনের গিজারাইট কোন

পিচারস মাউন্ড

সলোমনের মন্দির